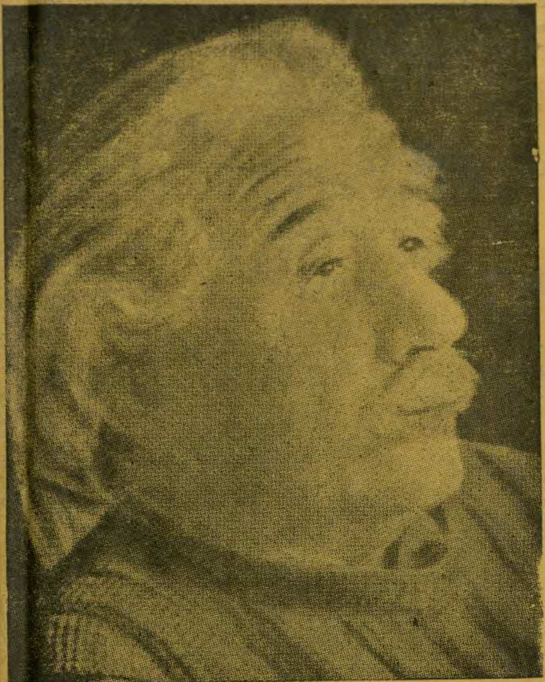


অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দ্বিজেশ চন্দ্র রায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ • কলিকাতা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দ্বিজেশচন্দ্র রায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
শ্রীরতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-6

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, 1973
দ্বিতীয় সংস্করণ (আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী
সংস্করণ) ঃ নভেম্বর, 1980

মূল্য ঃ ২৫·০০ টাকা

মুদ্রক ঃ
শ্রীমলয় ভট্টাচার্য
নীলাচল প্রেস
9, এ্যাণ্টনিবাগান লেন
কলিকাতা-9

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

স্নেহের বুবলু,

আমার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি (আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ) তোমাকে দিলাম।

জেঠুমণি

প্রস্তাবনা

চারশো বছর আগে গ্যালিলিওর বিচার হয়েছিল তাঁর দেশের দরবারে। তখন সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতো পৃথিবীই স্থির কেন্দ্র সারা ব্রহ্মাণ্ডের। সূর্য-চন্দ্র-তারা তাকে বেষ্টন করে ঘুরছে তাই দিন রাত। ঋতু পরিবর্তনে গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত-বসন্ত ঘুরে ঘুরে আসছে।

গ্যালিলিও এ সবের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবী অচলা নয়—লাট্টুর মত মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এধরনের চাল-চলন যে শুধু পৃথিবীরই, তা নয়। তাঁর তৈরী দূরবীণে চোখ দিলে নজরে পড়বে—আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের চারদিকে পরিক্রমা করছে এইভাবে তার উপগ্রহেরা।

রোমক সাম্রাজ্য খ্রীস্টধর্মী। সে ধর্মের যাজকেরা বলতেন, বাইবেলে লেখা আছে ভগবানের সিংহাসনে শৃঙ্খলে বাঁধা পৃথিবী, সুতরাং এই পৃথিবীই নিশ্চয় ব্রহ্মাণ্ডের অনড় স্থিরবিন্দু। কাজেই তাঁরা দূরবীণে চোখ লাগাতে চাইলেন না, বরং বাদ সাধলেন। ধর্মদ্বেষী বলে গ্যালিলিওর বিচারে কারাদণ্ড হলো।

* * *

তবুও বিজ্ঞান এগিয়ে চললো। গ্রহ-তারকার গতিবিধি নিখুঁতভাবে লিখে গিয়েছিলেন জ্যোতির্বিদ টাইকো-ব্রাহী। শিষ্য কেপ্‌লার সেই সব তথ্যরাশি নিয়ে গবেষণা করলেন বহু বৎসর—শেষ অবধি দেখলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাভাস পথে চলছে সব গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীও, এই বললে সুন্দর সামঞ্জস্যে আসা যায়। তিনি এই গতিবেগের ব্যাখ্যা করলেন এবং সুর্যের থেকে দূরত্বের সঙ্গে প্রতি গ্রহের সূর্য পরিক্রমণের বর্ষকালের যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তা-ও গণনায় মিললো। বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র যে রীতি অনুসরণ করে—পৃথিবীতে তার ব্যতিক্রম নেই।

পরে নিউটন এসে তাঁর মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করে সেই মতে গণনা করে কেপ্‌লারের নীতির ব্যাখ্যা দিলেন—সেই সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের পাকা ভিত প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর বল-বিজ্ঞানে।

বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে মহাকর্ষ নীতির সূত্র ধরে জড় জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করছি আমরা। সেই ভাবে হিসাব করে রকেটযানে মানুষ চন্দ্রলোকে গিয়ে পোঁছেছে।

* * *

নিউটনের পরে এই তিনশো বছরে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। আলোর গতি ধরা পড়েছে। বিরাট শক্তিশালী দূরবীণে—জগতে আমাদের থেকে বহুদূর পর্যন্ত নক্ষত্র, নীহারিকার আবিষ্কার হয়েছে—যা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে কোটি বর্ষ। আবার সূর্য আমাদের থেকে কত দূরে জিজ্ঞাসা করলে বলবো—সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসছে কমবেশী আট মিনিটে আর আলো চলে সেকেণ্ডে 3×10^5 কিলোমিটার বেগে।

এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত করে ছুটেছে বিজ্ঞানের জয়রথ। নিউটনের পরে এলেন নানা বিজ্ঞানী—লাপ্‌লাস্, গাউস, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল। আলোকে বুঝলেন বিদ্যুৎ-চুম্বকের বাঁধা নিয়মসূত্রে। এদিকে বস্তুর গঠন-বৈচিত্র্য বুঝতে কণাদের মূল কণা থেকে অনেক দূরে এসেছি আজ—ড্যালটন, মেণ্ডেলিয়েফ, রাদারফোর্ড, বরের কল্যাণে। এঁদের নাম সকলের পরিচিত।

বিদ্যুতের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে জড়কণার ভাঙ্গাগড়ার যে নিবিড় সম্পর্ক তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আমরা সারা জড় জগৎকে বুঝবার চেষ্টা করছি।

* * *

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে বিজ্ঞানী এসে কয়েকটি নতুন কথা বলে বিজ্ঞান চর্চার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন—তিনিই আইনস্টাইন। গরীব ইহুদী পরিবারে জন্মেছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে দেশ কাল পরিচয়ে দর্শকের আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কার করে সারা বিজ্ঞানীমহলকে চমৎকৃত করেছিলেন। তারপর চললো তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যা। অনেক নতুন কথা বললেন—ব্রহ্মাণ্ডে জড়ের বিস্তার, নক্ষত্র নীহারিকার সমাবেশ ও তারই সঙ্গে বর্ণনা করতে যে ভাবে দেশ-কাল ভাবতে হয়, তাদের নিবিড় সম্পর্ক। জড়, শক্তি ও আলোর বিকিরণ নিয়ে অনেক নতুন কথা।

এর ফলে অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলেছে। মহাকর্ষসূত্র ধরে গণনায় গ্রহ চলনেও যে অল্প গরমিল থেকে যেত—তার নিরসন হলো।

জড় ও শক্তির মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তিনি এনে দিলেন—তার ফলে মানুষ আজ স্পর্ধা করে গড়ে তুলেছে এই বিরাট জগতের গঠন বৈচিত্র্য ও আদি লীলার বিষয়ে নানা জল্পনাকল্পনা।

* * *

তাঁর জীবন ঘটনাবহুল। নানা সুখ-কষ্ট-গৌরব-দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিজীবন। স্বদেশ পরিত্যাগ করে বিদেশ আমেরিকায় যেতে হল। হিটলারী দৌরাত্ম্যে আর্যামি ও বিকৃত দেশাত্মবোধের দুয়ারে বলি হলো ইহুদী জাতি—জার্মান জাতির গুণ্ডামির তাড়নে দেশত্যাগী হলেন আইনস্টাইনের মত বহু বিজ্ঞানী-ইহুদী!

* * *

প্রায় বিশ বৎসর কাটলো তাঁর তিরোভাবের পর। তবু লোকের তাঁর বিষয় জানবার আগ্রহ অসীম। জীবিতকালে বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে—পত্র বিনিময় ও সাক্ষাতে আলোচনা—এমন কি জওহরলাল পর্যন্ত তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আলোচনা ছাপা হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বইয়ে।

বিশ্বে তাঁর বিষয়ে কৌতূহল আজও অটুট, শুনেছি শিগ্‌গির তাঁর অপ্রকাশিত পত্রাবলীও ছাপা হবে। সার্বিক আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা চালাতে আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপনের নিয়মকানুনের আলোচনা চলেছে।

* * *

বাংলাভাষায় তাঁর বিষয়ে অনেক নিবন্ধ ছাপা হলেও এই বর্তমান গ্রন্থের একটা বিশেষ স্থান মিলবে আশা হয়। গ্রন্থকার নিপুণভাবে তাঁর জীবননাট্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখক নিজে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, সারা জীবন রেডিও-ইঞ্জিনিয়াররূপে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে ব্যাপৃত থেকে আজ

অবসর সময় বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞানকথা এ দেশে প্রচার করতে নেমেছেন। বিজ্ঞান পরিষদ এই বই প্রকাশ করে পাঠকের সঙ্গে এক নতুন জগতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। জীবনের অবসরে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রন্থকার দেশের কল্যাণে মাতৃভাষার চর্চায় নেমেছেন বলে তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি, এই পুস্তকের বহুল প্রসার হবে ও দেশের সুধীমণ্ডলের প্রশংসা অর্জন করবে।

18ই ডিসেম্বর, 1972
কলিকাতা

সত্যেন বোস

লেখকের বক্তব্য

1924 খ্রীস্টাব্দে একজন তরুণ বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর তত্ত্বীয় গবেষণার কাজে চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সেই গবেষণালব্ধ কাজের ভিত্তিতে সৃষ্ট "বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান" (Bose-Einstein Statistics) বিজ্ঞান জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেদিনকার সেই তরুণ বিজ্ঞানী পরবর্তী কালে বাঙ্গলার তথা ভারতের গৌরব জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আমি আইনস্টাইনের জীবনীটি লিখতে অনুপ্রাণিত হই এই মনীষীর উপদেশে।

প্রায় তিন বছর পূর্বে Arthur Beckhard-এর লেখা আইনস্টাইনের জীবনী অবলম্বনে একটি নাটক লিখেছিলাম। তাতে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ-গুলি ও তাঁর চরিত্রের অন্যান্য সব দিকগুলি সংক্ষেপে সহজভাবে উপস্থাপনা করেছিলাম। আমি লেখাটি নিয়ে আচার্য বসুর সঙ্গে দেখা করে লেখাটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও উপদেশ চাই। তিনি বললেন যে, নাটক লেখা সমীচীন হবে না এবং উপদেশ দিলেন এই মনীষীর জীবনী লিখতে। তিনি কয়েকটি বইয়ের কথা উল্লেখ করে উপদেশ দিলেন সেই বইগুলি খুব ভালভাবে পড়তে ও অন্যান্য যে সব বই ও পত্রিকাতে আইনস্টাইন ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে লেখা আছে, সে সব পড়ে একটি জীবনী লিখতে। তাঁর কাছে যে আমি কত কৃতজ্ঞ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। আমার পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি।

তাঁর উপদেশমত আমি প্রায় আড়াই বছর ধরে বিভিন্ন বই ও পত্রিকা পড়ে এই বইটি লিখেছি। এতে আমি অনেক কিছু শিখেছি। জানি না এই বিরাট মনীষীর জীবনী লিখতে কতটা সফলতা লাভ করেছি। এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা আমার মত অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সমুদ্রের জলের পরিমাপ যেমন একটি ঘটি দিয়ে করা যায় না, কিংবা গভীরতা যেমন একটি এক ফুট স্কেল দিয়ে মাপার কথা ভাবা যায় না, তেমনি আমার পক্ষেও সেই জটিল মতবাদ সম্যকরূপে উপলব্ধি করে প্রকাশ করা অসম্ভব! তবুও আমি গভীর শ্রদ্ধার

সঙ্গে চেষ্টা করেছি যদি কিছুটা উপলব্ধি করে উপস্থাপনা করতে পারি। এই অসাধারণ মানুষটির চরিত্রের মাধুর্য, তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের ও মানবতার বিষয় বিভিন্ন বইতে পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি ও চেষ্টা করেছি তাঁর চরিত্রের সমস্ত দিকটা কিছু কিছু লিখতে, যাতে পাঠকেরা তাঁর বিষয়ে কিছু পরিচয় লাভ করতে পারেন। তাঁর চিন্তাধারা বুঝবার জন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মূল জীবনীতে লিখে, বইটির শেষাংশে এগুলি কিছুটা বিশদভাবে লিখেছি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা বিষয় সহজ করে সর্বজনের বোধগম্য করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এখানে এই বিষয়ে আইনস্টাইন নিজে Lincoln Barnett-এর লেখা "The Universe and Dr. Einstein" বইটির ভূমিকাতে যা লিখেছেন, তার প্রথম বাক্যটি উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন—"Anyone who has ever tried to present a rather abstract scientific subject in a popular manner knows the great difficulties of such an attempt".

বাংলাভাষায় এখনও পর্যন্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দের উপযুক্ত পরিভাষায় সৃষ্টি হয়নি বলে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেক পরিভাষা পেয়েছি Sansad English to Bengali Dictionary ও চলন্তিকা থেকে আর খুব সাহায্য পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের "Institute of Radio Physics and Electronics" বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্তের কাছ থেকে। এইজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তারপর অনেক বিদেশী বিজ্ঞানীর বাংলা উচ্চারণের সাহায্য পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ শ্যামদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁর কাছ থেকে এই বইটি লেখার বিষয়ে খুবই উৎসাহ পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক পরিমল কান্তি ঘোষ আমার পাণ্ডুলিপিটি যত্নসহকারে পড়ে অনেক মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা আমার লেখার মানকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর অধ্যাপক ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ জয়ন্ত বসুর নিকট থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ ও পরামর্শ এবং নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি এই বইটির রচনা ও প্রকাশনায়। এজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, যে মনীষীর জীবনী আমি লিখেছি, তিনি তাঁর পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় একজন বিত্তবান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন, নইলে তাঁর কলেজের পাঠ সমাপন হত কিনা সন্দেহ। অর্থাভাবে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে না। এইজন্যে এই বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থের আমার প্রাপ্য অংশের অর্ধেক যাবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্যে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের সাহায্য তহবিলে (West Bengal Governor's Benevolent Fund) ও বাকী অর্ধাংশ পাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। এই পুস্তকে আলোচিত মহান মানুষটির সম্বন্ধে পাঠকদের কিছুটা ধারণা দিতে পারলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব!

আমার শেষ বক্তব্য—সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই পুস্তকটিতে কিছু ভুলত্রুটি ঘটায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই ভুলত্রুটি সমূহের শুদ্ধিপত্র পুস্তকের পরিশেষে সংযোজিত হল।

কলিকাতা — দ্বিজেশচন্দ্র রায়

ডিসেম্বর 1972

দ্বিতীয় সংস্করণ

(আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ)

লেখকের নিবেদন

আমি প্রথম সংস্করণে 'লেখকের বক্তব্যে' লিখেছিলাম যে, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর "বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান" (Bose-Einstein Statistics)-এর আবিষ্কর্তা বাংলা তথা ভারতের গৌরব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপদেশে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বাংলায় লিখতে অনুপ্রাণিত হই।

প্রায় তিন বছর বহু বই ও পত্রিকা পড়ে কঠিন পরিশ্রমের পর বইটি লিখে অধ্যাপক সত্যেন বসু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ করতে চাই। এখানে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করতে চাই। শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় আইনস্টাইনের নানা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধনিবন্ধ-গুলির প্রায় সব বিভিন্ন পত্রিকা থেকে অনেক চেষ্টা করে সংগ্রহ করে 'My Views' বলে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এটি অতি প্রয়োজনীয় বই। এটির থেকে আমি অনেক বিষয় আমার বইয়ে নিয়েছি। এই বইয়ে অধ্যাপক বসু আইনস্টাইনের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী মাত্র সাত পৃষ্ঠায় অতি সুন্দরভাবে লিখেছেন। এই লেখা পড়ে পাওয়া যায় তাঁর গভীর জ্ঞানের ও সাবলীল রচনাশক্তির পরিচয়। এই লেখা পড়ে আমি আমার বইয়ে লিখবার জন্য অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি তাঁকে এই কথা বললে তিনি খুশী হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইংরেজী না বাংলাতে লেখা বইটি আমি পড়েছি, কারণ তিনি দুটো বইয়েই লিখেছেন। আমি বললাম যে, ইংরেজী বইটি। পরে জেনেছি যে, বোধ হয় 'জীবন জিজ্ঞাসা' বলে এই বইটির বাংলায় অনুবাদ বেরিয়েছে।

বইটি প্রকাশিত হবার মাস তিনেকের ভিতরে আমি দু-জন পাঠকের কাছ থেকে চিঠিতে ও টেলিফোনে একজন পাঠকের কাছ থেকে অভিনন্দন পাই এত সুন্দরভাবে আইনস্টাইনের সামগ্রিক জীবনী লিখবার জন্য।

জানলাম যে, তাঁরা বিজ্ঞান পরিষদ থেকে আমার টেলিফোন নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করেছেন। আমি বিস্মিত হলাম যখন জানতে পেলাম যে, প্রায় তিন বছরের ভিতরে আমার সমস্ত বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। The Orient Longman Ltd-এর উপর ভার ছিল বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত বইগুলি বিক্রি করবার। 1976 খ্রীস্টাব্দে এই কোম্পানীর একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, আমার বইটির খুবই চাহিদা এবং তাঁদের কাছে প্রদত্ত আমার বইয়ের কপিগুলি অনেকদিন পূর্বেই সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

আমার বিস্ময়ের কারণ এই যে, আমি যখন বইটি ছাপাতে দিই, আমার কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু নিষেধ করেছিলেন এই বলে যে, অবসর গ্রহণের পর এত টাকা খরচ করা সমীচীন হবে না। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, আইনস্টাইনের দুর্বোধ্য ও জটিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি জানতে পাঠকদের আগ্রহ হবে না, বিশেষ করে বাংলাতে লেখা বই পড়ে। কিন্তু আমি Leopold Infeld-এর আত্মজীবনী Quest বইটি পড়ে এই মানুষটির চরিত্রের মাধুর্য, সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও সমস্ত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার সুধারসে ভরা হৃদয়টির পরিচয় পেয়ে এত অভিভূত হয়েছিলাম যে, আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম এই অসাধারণ মানুষটিকে বাঙালী পাঠকদের কাছে পরিচিত করাতে।

আমি এর মধ্যে বেশ কয়েকজন পাঠকদের কাছ থেকে চিঠিতে ও টেলিফোনে অভিনন্দন পেয়েছি বইটি লেখার জন্য। আমি বুঝলাম যে, বাঙালী পাঠকেরা এই অসাধারণ মানুষটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বইটি অনেক দিন ধরে কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছিল না, কেউ কেউ আমার কাছে খোঁজ করেছেন আমার বইটি আবার কবে পাওয়া যাবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকেও আমি জানতে পেলাম যে, সেখানেও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আমার বইটির খোঁজ করেছেন, বিশেষ করে আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকীতে।

বইটি যখন প্রথম বিজ্ঞান পরিষদে ছাপিয়ে প্রকাশ করতে দেই, তখন আমি প্রকাশ করবার খরচের জন্য বিজ্ঞান পরিষদকে কিছু অর্থ দেই। পরে জানতে পেলাম যে, বিজ্ঞান পরিষদও নিজের তহবিল থেকে কিছু অর্থ খরচ করেন এবং বাকি অর্থ তদানীন্তন রাজ্য সরকারের নিকট থেকে সাহায্য

হিসাবে পান এই শর্তে যে, সাধারণের কাছে বইটি সহজলভ্য হবে বলে বইটির দাম ছয় টাকার বেশি করা যাবে না।

আমার প্রথম সংস্করণের বই বিক্রি হয়ে গেলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আমার রয়্যালটি বাবদ যে মোট অর্থ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে আমি পাই, প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত লেখকের বক্তব্যতে উল্লেখ অনুসারে সেই অর্থ থেকে কয়েক শত টাকা বিজ্ঞান পরিষদকে সাহায্য হিসেবে দিলাম। কয়েক শত টাকা Governor's All Purpose Benevolent Fund-কে পাঠাবার পূর্বে এই Fund যে সহকারী সচিবের দায়িত্বে, তাঁকে অনুরোধ করে একটি চিঠি দিয়াছিলাম যে, এই অর্থ যেন সবটাই গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সাহায্যের জন্য ব্যয় করা হয়। তিনি তাতে তাঁর সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। বাকি কয়েক শত টাকা কয়েকটি গরীব পরিবারকে দেই। আমি নিজের খরচের জন্য কিছুই রাখিনি।

আমি 1977 খ্রীস্টাব্দ থেকে মাঝে মাঝেই বিজ্ঞান পরিষদে টেলিফোন করে খোঁজ নিতাম যে, আমার বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার কতদূর কী হয়েছে। আমি জানতে পেলাম যে, আমার বইটির যথেষ্ট চাহিদার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব খুবই চেষ্টা করছেন নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার পুস্তক প্রকাশনার জন্য যে-কোন লেখক বা প্রকাশককে অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বলে বিজ্ঞান পরিষদ খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। আমিও একবার রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমার বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে। তাঁর লেখা একটি চিঠি এই বিষয় সম্বন্ধে আমি পাই; তিনি লিখেছেন, "কোন প্রকাশক বা লেখককে পুস্তক প্রকাশনার জন্য অর্থ সাহায্যের বিষয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন প্রকাশক বা লেখক সরকারকে তাঁর পুস্তকের সর্বস্বত্ব দিতে চান এবং সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি যদি পুস্তকটি প্রকাশের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন—তবে লেখক বা প্রকাশককে এককালীন অর্থ/রয়্যালটি বাবদ উপযুক্ত অর্থ দিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা সরকার করিতে পারেন।"

1978 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখ থেকে 1979 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখ (আইনস্টাইনের শততম জন্মদিন) পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দেশে

কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এই মনীষীর জন্মবার্ষিকী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পালন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এই জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জন্ম-শতবার্ষিকী কী ভাবে অনুষ্ঠিত হল তার কিছু বিবরণ আমি এই নতুন সংস্করণের শেষ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আইনস্টাইন জন্ম-শত বছরেই প্রকাশিত হোক যাতে এই সংস্করণটির নামও তাই হবে, কিন্তু বিজ্ঞান পরিষদের কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছিলেন না।

1978 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে, বোধ করি অক্টোবর মাসে, জানতে পেলাম যে, বিজ্ঞান পরিষদের নতুন সভাপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখলাম আমার অভিপ্রায় জানিয়ে। কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে টেলিফোন করে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি বহু পূর্বেই আমার বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরা এই বই প্রকাশের জন্য অর্থের ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন এবং কার্যকরী সমিতি দ্বারা তা অনুমোদিত হয়েছে। আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম।

এই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশের সূচনা 1978 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখের কয়েক মাস পূর্বেই শুরু করা হল বলে আমি দ্বিতীয় সংস্করণের নাম 'আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী' সংস্করণ বলে লিখলাম। এই সংস্করণটির প্রকাশের বিলম্ব হওয়ার কারণ কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্মূল্যতা, বিশেষ করে প্রতিদিন ঘন ঘন দীর্ঘকাল স্থায়ী লোড-শেডিংয়ের জন্য প্রেসের কাজে বিঘ্ন ঘটা ও কিছু কিছু অনিবার্য প্রতিবন্ধক।

এই সংস্করণ প্রকাশে অধ্যাপক ডঃ সেনশর্মার দৃঢ় সংকল্পের জন্য ও তা কার্যে পরিণত করার জন্য আমি তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এই বিষয়ে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব সিটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ রতনমোহন খাঁর বহুদিনের আন্তরিক চেষ্টার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইন্স্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত বসু তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ

সত্ত্বেও তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্করণটিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বিজ্ঞান পরিষদের অন্যান্য কর্মীদের নানা ভাবে চেষ্টার জন্য তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

1লা সেপ্টেম্বর, 1980
14/2 গল্‌ফ্ ক্লাব রোড
কলিকাতা-33

দ্বিজেশচন্দ্র রায়

বিষয়-সূচী

বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী

উপক্রমণিকা

নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীর তীরে রিভারসাইড চার্চের ভিতরে পুরাকাল থেকে বর্তমান কালের প্রসিদ্ধতম মনীষীদের ছয় শতটি স্ট্যাচু বা মূর্তি আছে। এর ভিতরে একটি সারিতে রাখা আছে চৌদ্দজন বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠদের। এই চৌদ্দজনের ভিতরে প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হচ্ছেন হিপোক্রেটস (Hipocrates), যাঁর মৃত্যু হয়েছে খ্রীস্ট জন্মের 370 বছর পূর্বে।

এই চার্চে 1930 সালে একদিন এলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁদের দু-জনেরই মাথায় কাঁচাপাকা চুল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মাথায় কাঁচাপাকা বড় বড় কোঁকড়ান চুল এলোমেলো, অবিন্যস্ত। প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটির মুখে এক প্রগাঢ় শান্ত সৌন্দর্য, স্নেহ ও করুণার ছাপ। দু-জনে মূর্তিগুলি দেখছেন। এক সময় ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর হাত ধরে একটি মূর্তির দিকে নির্দেশ করে বললেন, "আলবারতল, ঐ যে তোমার মূর্তি।" দু-জনে এসে সেই মূর্তিটির কাছে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকটি একটু লজ্জিত ও সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁর মূর্তিটির দিকে তাকালেন ও কি ভাবতে ভাবতে তাঁর ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি আরও স্বপ্নালু হয়ে উঠল। তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর অবিন্যস্ত চুল আরও অবিন্যস্ত করতে লাগলেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! বাকী পাঁচশো নিরানব্বুইটি মূর্তি যাঁদের, সেইসব মনীষী মৃত। শুধু এই মূর্তিটি যে জীবন্ত মনীষীর, তিনি এসে দাঁড়িয়ে দেখছেন নিজের মূর্তি—নিজের অভূতপূর্ব কীর্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্বজ্জনেরা সর্ব-সম্মতি ক্রমে যে মূর্তি গড়িয়ে রেখেছেন অন্য সব কীর্তিমানের পাশাপাশি। পাঁচশো নিরানব্বুইটি মূর্তি যেন বিস্ময়ে দেখছে জীবন্তকে ও তাঁর পাথরের মূর্তিটিকে। পাথরের মূর্তিটি যেন একটু মুচকি হেসে বলছে, "আমি তোমার কীর্তি, তুমি আমার রক্তমাংসের শরীর। তোমার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তোমার নিজস্ব ধারণা মৃত্যু সম্বন্ধে—যে ধারণার কথা তুমি বলেছিলে 1916 সালে তোমার কঠিন রোগের সময় তোমার বন্ধুপত্নী মিসেস বর্ণের প্রশ্নে যে,

তুমি মরতে ভয় পাও কিনা—যার উত্তরে তুমি বলেছিলে এবং এখনও মনে মনে বলছ, 'না, আমি সমস্ত জীবন্ত সত্তার সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোন একজন ব্যক্তিত্বের কোথায় যে শুরু আর কোথায় যে-শেষ—সে সম্বন্ধে জানতে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত নই'—কেমন ঠিক কি না।"

এই মূর্তিটির নীচে লেখা—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জন্ম 14ই মার্চ, 1879 খ্রীস্টাব্দ। মৃত্যুর তারিখ সেদিন লেখা ছিল না। আজ কেউ গেলে দেখবেন লেখা আছে– মৃত্যু 18ই এপ্রিল, 1955 খ্রীস্টাব্দ।

কেন বিদ্বজ্জনেরা সর্বসম্মতিক্রমে আইনস্টাইনের জীবদ্দশাতেই তাঁর মূর্তি গড়িয়ে রেখে তাঁকে অমর করে রাখতে চেয়েছেন? কারণ হল যে, এই মানুষটি তাঁর তরুণ বয়সেই মানব চেতনা-নিরপেক্ষ বিশ্বের (extra "personal world") যে রূপ কোন প্রকার যন্ত্রের বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য ছাড়াই শুধু মাত্র ধ্যানের নেত্রে দেখেছেন ও যে রূপ তিনি তাঁর মতবাদে প্রকাশ করেছেন, সেই রূপকে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন।

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে আইনস্টাইন দম্পতিকে সেখানকার বিরাট বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দেখাবার সময় মিসেস এল্‌সা আইনস্টাইন ঐ বিরাট যন্ত্রটির প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উত্তর পেলেন যে, যন্ত্রটির প্রয়োজন হয় মহাবিশ্বের আকৃতির সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার জন্যে। তখন তিনি বিস্মিতা হয়ে বলেছিলেন, "আমার স্বামী তো কখনও এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেন না। তিনি এই সব তথ্য বের করেন অঙ্ক কষে এক টুকরো কাগজে, হয়ত বা একটি পুরনো খামের পিছন দিকটাতে।"

এই হচ্ছে কিছুটা পরিচয় এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতার প্রমাণের বার্তা সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীদের কাছে বহন করে এনেছে 1919 সালের 29শে মে তারিখের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অন্ধকারে তারকার আলো সূর্যের দিকে কিছুটা নুয়ে গিয়ে। এই নুয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা ও পরিমাণ আইনস্টাইন দিয়েছেন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে। আর 1945 সালের 6ই অগাষ্ট হিরোসিমার হতভাগ্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে যে পরমাণু বোমায়, তার সৃষ্টির মূল ভিত্তি হল আইন-

স্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের এক অনুসিদ্ধান্ত। এটি হল যে, পদার্থ আর শক্তিতে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। পদার্থ হল জমাটবাঁধা শক্তি, যে শক্তি আমরা এখন অঙ্ক কষে বের করতে পারি তাঁর সূত্র $E = m \times c^2$ দিয়ে, যেখানে E হল শক্তির পরিমাণ, m হল পদার্থের স্থিতাবস্থায় (at rest) ভরের পরিমাণ এবং c হল আলোর বেগ, যার পরিমাণ এক সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বা 3 লক্ষ কিলোমিটার।

এই শতাব্দীর আর একজন অতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং কণাবাদের আবিষ্কারক প্লাঙ্ক (Planck) তরুণ আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখে 1910 সালে বলেছিলেন, "আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে, তা শীঘ্রই হবে, তবে আইনস্টাইন হবেন বিংশ শতাব্দীর কোপার্নিকাস"। এর অর্থ হল যে, ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস যখন প্রায় দু-হাজার বছর ধরে প্রচলিত টলেমীর (Ptolemy) ভূ-কেন্দ্রিক (geocentric) মতবাদকে ভুল বলে ঘোষণা করে সূর্যকেন্দ্রিকের (heliocentric) বিষয় প্রকাশ করলেন, তখন বিজ্ঞানে নব যুগের সূচনা হল। তেমনি আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিজ্ঞান জগতে এক নূতন পথের সন্ধান দেবে। প্লাঙ্কের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে কিরূপ সত্য হয়েছে, তা এখন সবাই জানেন।

পৃথিবীতে বহু যুগ পরে এইরূপ একজন মনীষীর আবির্ভাব হয়, যাঁর মতবাদ বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। এঁদের কেউ কেউ কখনও হন ধর্মযাজকদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত, যেমন হয়েছিলেন গ্যালিলিও, যেমন হতে পারতেন কোপার্নিকাস, কিন্তু 1543 খ্রীস্টাব্দে তাঁর ত্রিশ বছরের সাধনার ফল গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যুই তাঁকে এই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে। আবার কেউ কেউ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেদের দ্বারা আখ্যায়িত হন উদ্ভট, খামখেয়ালী ও অর্থহীন ধারণা পোষণকারী বলে, যেমন বহু লোকে বহু দিন পর্যন্ত বলেছে আইনস্টাইনকে। তারপর যখন এই নব জটিল মতবাদ, যা আপাতবিরোধী সত্য (paradoxical), যথার্থ বলে প্রমাণিত হয় ও জনসাধারণের মনে চালু হয়ে যায়, তখন তার চমকপ্রদ ভাব থাকে না এবং লোকে এটিকে স্বাভাবিক ও এই হওয়াই তো উচিত বলে মেনে নেয়। যেমন আজকাল বিদ্যালয়ের একজন অল্পবয়স্ক ছাত্রও জানে যে,

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, যেমন্ লোকে এই পরমাণুর যুগে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে যে, বস্তু আর শক্তিতে বিশেষ তফাৎ নেই, বস্তু শুধু জমাটবাঁধা শক্তি।

মানুষ যে কতদূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে, তার প্রকট উদাহরণ আইনস্টাইন আর তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ। নিজের দৈনন্দিন জগৎ থেকে নিমেষে নিজের মনের চিন্তাকে মনের গভীরে বিশ্বের রহস্যের উন্মোচনের চিন্তায় নিয়ে যাওয়া কেবলমাত্র আইনস্টাইনের মত মহামানবেরাই পারেন।

বিশ্বের রূপ ও বিশ্বের ঘটনাবলীর কারণ সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে নানা মতবাদ চলে এসেছে। এগুলি সম্বন্ধে কিছুটা জানা থাকলে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এই বিশ্ব সম্বন্ধে আইনস্টাইনের দুটি রূপের ধারণা ছিল। এর প্রথম রূপটি হল The world as a unity dependent on humanity—অর্থাৎ গোটা বস্তুরূপে বিবেচনা করলে বিশ্ব মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, যার মানে হল যে, বিশ্ব মানুষের চেতনায় উপলব্ধ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। একে ইংরেজীতে বলা যায় 'merely personal world'। এইরূপে বিশ্বের সৌন্দর্য ইত্যাদি বিশ্বের গুণাবলী মানুষের অস্তিত্ব-নির্ভর। মানুষ না থাকলে কিছুই নেই। এই বিশ্বের সত্য মানুষের চিন্তায় ধরা পড়ে বলে শাশ্বত নয় এবং সেই জন্যে সময়ে সময়ে এই সত্যের পরিবর্তন হয়, কারণ কোন মানুষের পক্ষে খাঁটি সত্য জানা সম্ভবপর নয়। আজ যে ধারণা বা মতবাদ সত্য বলে জানা যাচ্ছে, তাই হয়ত এক শত বা দুই শত বা হাজার বছর পরে ঠিক খাঁটি নয় বলে জানা যাবে, যেমন জানা গেছে টলেমীর (Ptolemy) ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্বকে ও বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক মতবাদকে।

বিশ্বের দ্বিতীয় রূপটি হল—The world as a reality independent of the human factor—অর্থাৎ বাস্তব বিশ্বের সত্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশ্ব মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, যাকে বলা যেতে পারে 'objective, extra-personal world'। এই বিশ্বের সত্য চিরন্তন, কারণ মানুষের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, এই বিশ্বের সত্য অপরিবর্তিত হয়ে শাশ্বতভাবে বিরাজ করবে।

বার্লিনে 1930 সালে আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা কালে বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর উক্ত ধারণা ব্যক্ত করেন।

1949 সালে সত্তর বছর বয়সে আইনস্টাইন নিজের জীবন যাচাই করে তাঁর আত্মজীবন সংক্রান্ত কিছু কিছু মন্তব্য লেখেন। এগুলি Philosopher—Scientist গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়। জীবনের অস্তাচলে এসে অল্প বয়সে বিশ্বের যে রূপ মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"বাইরে অদূরে ছিল এই বিশাল বিশ্ব। এই বিশ্ব মানুষের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ এবং আমাদের সামনে রয়েছে একটি বিরাট প্রহেলিকাময় বস্তুর মত। এটি সম্যকরূপে না হলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে আমাদের বিচারে ও চিন্তায় উপলব্ধ হয়। এই বিশ্বের চিন্তায় আমি মুক্তির ইঙ্গিত পেলাম এবং আমি শীঘ্রই বুঝতে পেলাম যে, যে সব মনীষীকে আমি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতে শিখেছিলাম, তাঁদের অনেকেই এই বিশ্বের ঐকান্তিক চিন্তায় অন্তরে মুক্তি ও নিরাপত্তা বোধ লাভ করেছিলেন। আমাদের জানা সকল সম্ভাব্য বিষয়ের কাঠামোতে এই মানব চেতনা-নিরপেক্ষ বিশ্বের ধারণা সম্বন্ধে মানসিক উপলব্ধি কিছুটা জ্ঞাত ও কিছুটা নিজ্ঞাতভাবে আমার মনশ্চক্ষের সামনে মহত্তম উদ্দেশ্য বলে ভেসে উঠল। বর্তমানের ও অতীতের এই একই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ মনীষীদেরকে ও তাঁদের উপলব্ধিকে আমার পরম বন্ধু বলে মনে হল, যে বন্ধুত্ব কখনও হারান যেতে পারে না। এটি স্বর্গের রাস্তার মত আরামদায়ক ও প্রলোভনাত্মক নয়; কিন্তু এটি নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং আমি এই পথকে বেছে নেবার জন্যে কখনও অনুতাপ করি নি।"

প্রথম জীবনেই বিশ্ব সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকার জন্যে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

য়ের্নস্ট মাখের (Ernst Mach) মত বিশিষ্ট এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের দার্শনিক মতবাদ ছিল প্রত্যক্ষবাদ (positivism)। এঁদের ধারণায় বিজ্ঞানীদের বিশ্বের ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করে লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর করবার কিছুই নেই। এই প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতেরা অণু-পরমাণুগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে পরমাণু-তত্ত্বকে (atomic theory) বিশ্বাস করতেন না।

তাঁদের মতে এই বিষয়টি পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভূ'ত না হয়ে হওয়া উচিত অধিবিদ্যার (metaphysics) অন্তর্ভূ'ত।

তেমনি বার্কলের (Berkeley) মত এক শ্রেণীর ভাববাদী বা জ্ঞানতত্ত্বীয় (epistemological) পণ্ডিতদের মতে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই, আছে শুধু আমাদের চেতনায়। এই বিশ্বের ঘটনাবলী ও সত্য শুধুমাত্র আমাদের মনের ধারণা। মন না থাকলে কিছুই নেই। এই সব দার্শনিক হলেন জড়বাদের ঘোর বিরোধী।

এই সব মতামতের কঠিন সমালোচনা করেছেন আইনস্টাইন। তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত যুক্তি ও বিচার বোধের অভাব থেকেই এইসব মতবাদের ধারণা জন্মায়। এঁদের মতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে হলে বিশ্বের অস্তিত্বের ও প্রাকৃতিক সত্যের সূত্র বের করতে হবে চিন্তার গভীরতায় ও সেই সব সূত্র ও উপলব্ধিকে প্রমাণ করতে হবে অভিজ্ঞতার দ্বারা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আইনস্টাইনের 'ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব' (Brownian Movement Theory) অণু-পরমাণুর অস্তিত্বভিত্তিক ও এই তত্ত্বের প্রকাশের চার-পাঁচ বছর পরেই পেরাঁ (Perrin) কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অণু-পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতদের মতবাদের সমুচিত জবাব। তারপর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সর্বপ্রকারে যাথার্থ্যের প্রমাণ ভাববাদী দার্শনিকদের বিশ্বের ঘটনাবলীর সত্যতাকে ও বিশ্বের বাস্তব অস্তিত্বকে অলীক বলে ধারণাকে খণ্ডন করার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বিশ্ব-তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর-তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীন যুগ থেকে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের মত অল্প কয়েকটি ধর্ম ছাড়া প্রায় সব ধর্মেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছে Personal God হিসাবে, অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের আকারধারী ও মানুষের গুণসম্পন্ন। এই মতবাদকে বলা হয় anthropomorphism বা নরত্বারোপ। এই সব ধর্মে প্রচার করা হয় যে, এই ঈশ্বর বিশ্ব থেকে আলাদা। তিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা ঘটাচ্ছেন ও বিশ্বকে চালাচ্ছেন। তিনি ইচ্ছা করলে বিশ্বকে তাঁর খুশীমত চালাতে পারেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট যুক্তিবাদ (rationalism) ও

বিচারবোধের দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে ঐ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক-বিজ্ঞানী স্পিনোজার (Spinoza—জন্ম 1612 খ্রীঃ ও মৃত্যু 1677 খ্রীঃ) মতবাদে বিশ্বাসী আইনস্টাইনের যদিও ঈশ্বরে ও ধর্মে গভীর বিশ্বাস ছিল, তবুও তিনি কখনও এইরূপ মানুষের আকার ও গুণসম্পন্ন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, "যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদেরকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দান করেন, এইরূপ ঈশ্বরকে আমি কল্পনা করতে পারি না। আর আমি কল্পনা করতে পারি না কিংবা কল্পনা করতে চাইও না যে, কোন ব্যক্তি তার শারীরিক মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে পারে; যারা এই সব আত্মা, পরলোক ইত্যাদি বিষয় বিশ্বাস করে, তারা করে ভয় থেকে আর না হয়ত ভ্রান্ত অহংবাদ থেকে।"

আইনস্টাইন ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন, "ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বর্তমান যুগের সংঘাতের মূল কারণ হল ঈশ্বরের এই নরত্বারোপমূলক কল্পনা।"

আইনস্টাইন এই Personal God ও প্রচলিত ধর্ম (conventional religion) বিশ্বাস করতেন না বলে ধর্মযাজকেরা ও বহু ব্যক্তি তাঁকে জড়বাদী ও নাস্তিক বলতেন। নাস্তিক মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস। কিন্তু আইনস্টাইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন দিন বিশ্বাস হারান নি এবং এই জন্যেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কণা-বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানীদের যুক্তিকে ও মূল সত্যকে জানতে চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু অস্বীকার করেছেন ঈশ্বরের মানবাকৃতি রূপ, যা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলতেন "স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।"

স্পিনোজার ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—যে সত্তা (Being) আদি অন্তহীন, অনন্যগত অর্থাৎ কারোর উপর নির্ভরশীল নয় এবং অনন্তকাল ধরে পরমরূপে (absolute) বিরাজমান, যার অসংখ্য অঙ্গ, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির প্রত্যেকটিতে প্রকাশিত হচ্ছে শাশ্বত ও সীমাহীন অস্তিত্বের, যার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে না বলে বাইরের কোন কিছুর দ্বারা তার ভিতরে কোন ক্রিয়া ঘটান যেতে পারে না এবং এই জন্যে যা নিজের নিয়মেই চালিত হয়, যা হল অনন্ত উপলব্ধিতে ঘটে যাওয়া সব কিছুর ফলপ্রদ কারণ, যার সত্য হল সব কিছুর সত্য—এই হল স্পিনোজার ঈশ্বর বা প্রকৃতি।

প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝেছেন কেবলমাত্র বস্তু বা তার গুণাগুণ পরিবর্তনকারী নয়, কিন্তু বস্তু ছাড়াও অসংখ্য অপর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য। যে হেতু প্রকৃতির শক্তি ও কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা আর ঈশ্বরের শক্তি ও কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা এক এবং প্রকৃতির নিয়মাবলী ঈশ্বরেরই নিয়ম, সেই জন্যে সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রকৃতির শক্তি অসীম এবং তার নিয়মাবলীতে আছে সব কিছু, যা ঈশ্বর-কল্পিত। মানুষ যত প্রকৃতির ঘটনাবলীর কারণ উপলব্ধি করবে, ততই তার ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে। এখানে বলা যেতে পারে যে, স্পিনোজা ঈশ্বরের নরত্বারোপমূলক ধারণা পোষণ করতেন না, কারণ যে সত্তা অসীম ও অনন্ত, তাকে সীমাবদ্ধভাবে কল্পনা করা খুবই অযৌক্তিক বলে তিনি মনে করতেন।

প্রকৃতিতে অচিন্তনীয় বিরাট শক্তির অস্তিত্ব, যার অতি সুন্দর সমন্বয়রূপে প্রকাশ প্রতিটি ঘটনার বাস্তবতার ভিতর দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি—তাই ছিল আইনস্টাইনের কাছে ঈশ্বর আর সেই উপলব্ধি করবার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর কাছে ধর্ম। প্রকৃতির ঘটনাবলীর কার্যকারণে অপূর্ব যুক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হতেন। তাঁর মনে বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতি গভীর বিস্ময় উদ্রেক করত। তিনি কয়েকটি লেখায় তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

'জগৎকে আমি যেমনটি দেখি" নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "যে সুন্দরতম বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি, তা হল প্রকৃতির দুর্বোধ্য রহস্য। প্রকৃত সাহিত্য, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদির মূলে হল এই রহস্যে অভিভূত হওয়া। যে তা জানে না এবং আর আশ্চর্য বোধ করে না, বিস্ময়ে আর বিহ্বল হয়ে যায় না, সে বেঁচে থেকেও মৃত, সে একটি নিঃশেষ হয়ে নিভে যাওয়া মোমবাতির মত। যার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারি না এইরূপ একটি কিছুর অস্তিত্বের, প্রগাঢ়তম যুক্তির এবং উজ্জ্বলতম সৌন্দর্যের নানাভাবে প্রকাশের জ্ঞান, যে জ্ঞানের অতি প্রাথমিক রূপ মাত্র আমরা আমাদের বুদ্ধিতে উপলব্ধি করতে পেরেছি—এই যে জ্ঞান, এই যে অনুভূতি—এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম ; এই অর্থে এবং কেবলমাত্র এই অর্থেই আমি নিজেকে পরম ধার্মিক বলে মনে করি।"

আইনস্টাইন স্পিনোজার মত ঈশ্বরকে বিশ্ব থেকে আলাদাভাবে

(isolated) কখনও কল্পনা করেন নি। তাই বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা কালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে বিশ্ব থেকে আলাদাভাবে বিশ্বাস করেন ?"

এই দুই বিরাট মনীষীর আলোচনা পড়লে তাঁদের ধারণা সুন্দরভাবে জানা যায়।

আইনস্টাইনের নিজের ধারণা মত ঈশ্বরে ও ধর্মে গভীর বিশ্বাস থাকবার জন্যে পদার্থবিদ্যায় কণা-বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হতে দেখে মনে খুবই দুঃখ বোধ করেছিলেন। বিশের দশকের মাঝামাঝি কণাবাদের ভিত্তিতে হাইসেনবার্গ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোরের নেতৃত্বাধীনে পদার্থবিদ্যায় এই কণা-বলবিদ্যার (quantum mechanics) প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা দেখলেন যে, সনাতন পদার্থবিদ্যার (classical physics) নিয়মাবলীতে তাঁদের সমস্যার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই জন্যে তাঁরা প্রচলিত তত্ত্ব ও মতবাদের স্থানে পরিসংখ্যানের (statistics) সাহায্য নিলেন। পদার্থ-বিদ্যায় কার্য-কারণত্বের (causality) বদলে এল অনিশ্চয়তা (uncertainty) ও সম্ভাব্যতা (probability)। এই সব তরুণ বিজ্ঞানী তাঁদের ঈপ্সিত ফল পেলেন। সনাতন পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী অবহেলিত হল। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা এগুলির বিষয়ে সেরূপ চিন্তা করেন না।

প্রকৃতির ঘটনাবলীতে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা মানতে হলে, মানতে হবে causality ও determinism, অর্থাৎ কার্য-কারণের সম্বন্ধ। এতে ছিল আইনস্টাইনের অটল বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই কার্য-কারণের উপর। তিনি অনেক লেখাতে এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে। কেননা জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে।" বহির্জগতের (macrocosm) ঘটনাবলীতে পূর্ণতার অভাব কেউ অস্বীকার করবে না। কণিকা-জগতে (microcosm) এই তরুণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার দ্বারা ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা যদিও আইনস্টাইন অস্বীকার করলেন না, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার অভাব কখনও হতে পারে না বলে কণা-বলবিদ্যার মূল সত্যটি এই সব

বিজ্ঞানী খুঁজে পান নি। স্পিনোজার মত তিনিও বিশ্বাস করতেন 'প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা বলে কিছুই নেই।' তিনি এই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চেষ্টা করেছেন—কিসের অভাবহেতু কণিকা-জগতের নিয়মাবলীতে এইরূপ কল্পনাতীত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল, সেটি খুঁজতে, যাতে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের (unified field theory) মীমাংসা পাওয়া যায় আর সেই মূল সত্য পাওয়া গেলে বিশ্বের সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তিনি এতে বিশেষ সফলতা লাভ করে যেতে পারেন নি এই জন্যে যে, এখনকার বিজ্ঞানীরা তাঁর এই মতবাদকে সেরূপভাবে মেনে নেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভবিষ্যতে কোন বিজ্ঞানী সন্দেহাতীত ভাবে এই সত্যকে আবিষ্কার করবেন। ভবিষ্যতই বিচার করবে আইনস্টাইনের এই বিশ্বাসের মূল্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রকাশিত হলে পণ্ডিতদের চিন্তাধারায় নূতন জাগরণ এল। এই নূতন চেতনায় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদের ও বিচারবোধের সৃষ্টি হল, তাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পণ্ডিতেরা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বিশ্ব-তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করলেন ও নিজেদের ভিতরে আত্মতুষ্ট তর্কাতর্কি ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সত্যকে জানতে চেষ্টা করলেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। গ্যালিলিও ও কেপ্‌লারকে বলা যেতে পারে এর পথ-প্রদর্শক। তাঁরা প্রতিটি ঘটনার একটি সুষ্ঠু কার্য-কারণ সম্বন্ধ বের করতে লাগলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এল কার্য-কারণ সম্বন্ধ (causality), যা গণিতের সূত্রে জানা যায়। তাঁদের মতে গণিতই হল প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচনের চাবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচারবোধ অতি প্রখর হল। সাধারণ জীবনধারাতে এই বিচারবোধ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করল। আধ্যাত্মবোধকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু বিচারবোধের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা হতে লাগল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হল। পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের কাছে বিশ্বের ঘটনাবলীতে নিয়মাবলী সহজ ও সরল বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা সমস্যার সমাধান করতে করতে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগলেন।

বিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মের পথে না গিয়ে বিজ্ঞানীরা গণিতের সাহায্যে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিশ্বকে জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সনাতন নিয়মাবলী পদার্থবিদ্যায় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিজ্ঞানীরা সেগুলির দ্বারা তাঁদের সমস্যার সূত্র খুঁজে পেলেন না। এই সনাতন নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হল।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকলে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা বুঝতে সুবিধা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে 112 নং মারসার স্ট্রীটের বাড়ীটির পাঠকক্ষের দেওয়ালে আইনস্টাইন টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন তিনজন মনীষীর ফোটো। এঁদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই তিনজন মনীষী হলেন ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও গান্ধীজী। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ও বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ম্যাক্সওয়েলের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মহাকাশকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এর পরিচয় পাওয়া যাবে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজে।

আইনস্টাইনের শান্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধীজীর সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর লেখা কতকগুলি নিবন্ধে। পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া দেখে আইনস্টাইন গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই তাঁর একটি লেখাতে দেখতে পাই—"আমরা ভাগ্যবান ও কৃতজ্ঞ যে, ভাগ্যের গুণে আমাদের সমকালে আমরা পেয়েছি এমন জ্যোতির্ময় মানুষটিকে—যে মানুষটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছেও আলোর শিখারূপে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।" বিশ্বে শান্তিস্থাপনের প্রয়াসে আইনস্টাইনের গভীর আগ্রহ ও চেষ্টার কথা জানতে পারা যায় তাঁর নানারূপ কার্যাবলীতে।

আইনস্টাইনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে জার্মানির ইতিহাস বিসমার্কের আমল থেকে হিটলারের আমল পর্যন্ত।

আইনস্টাইনের সামাজিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনযাত্রার পদ্ধতি থেকে ও এই বিষয়ে লেখা কয়েকটি নিবন্ধ থেকে। এর একটিতে

তিনি লিখেছেন, "আমরা যে গৃহে বাস করি, তা অপরে বানিয়েছে, যে পোশাক পরি, তা অপরে তৈরি করেছে, যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকি, তাও অপরে উৎপন্ন করেছে। প্রতি দিন শত শতবার আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, আমার অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ দুই-ই নির্ভর করছে জীবিত ও মৃত বহু মানুষদের পরিশ্রমের উপর এবং আমি যে পরিমাণে গ্রহণ করেছি ও এখনও করছি, সেই পরিমাণে আমাকেও অন্যকে দান করতে হবে।" তিনি বলতেন যে, আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় যে, প্রতিটি ছাত্র যেন কেবলমাত্র নিজের উন্নতির বিষয় শিক্ষালাভ না করে সমষ্টির কল্যাণের বিষয় শিক্ষা লাভ করে, কারণ এটিই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সর্বযুগের একজন মহত্তম মানুষ হিসাবে আইনস্টাইন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কেবলমাত্র তাঁর বিরাট প্রতিভার জন্যেই কি? তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন লিখেছেন, "এই মানুষটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে, তাঁরা স্থির করতে পারেন না যে, এই মানুষটির যে মস্তিষ্কের চিন্তায় বিশ্বের রূপ ধরা পড়েছে, সেই মস্তিষ্কটিই বড়, না যে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকত সব মানুষের প্রতি ভালবাসা—সেই হৃদয়টিই বড়।" এই জন্যে জানতে হবে আইনস্টাইনের জীবনের কার্যাবলী, জানতে হবে তাঁর মানবতার পরিচয়, জানতে হবে কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে অত্যাচারিত হতে দেখলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর মনোভাবের পরিচয়—সেই অত্যাচারী যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, জানতে হবে তাঁর সমস্ত সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়, আর সর্বস্তরের মানুষের প্রতি ভালবাসার সুধারসে ভরা ছিল যে হৃদয়—তার পরিচয়।

———



ছয় বছর বয়সে অ্যালবার্ট ও তাঁর বোন মাজা



বেহালা বাদনরত আইনস্টাইন



আইনস্টাইন ও মিলেভা



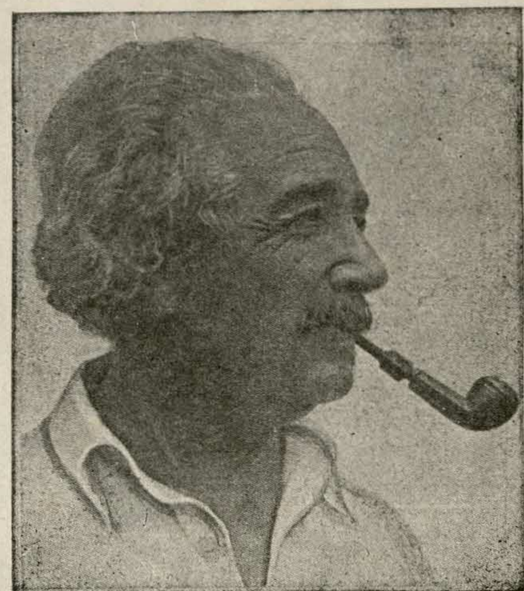
হেরম্যান আইনস্টাইন



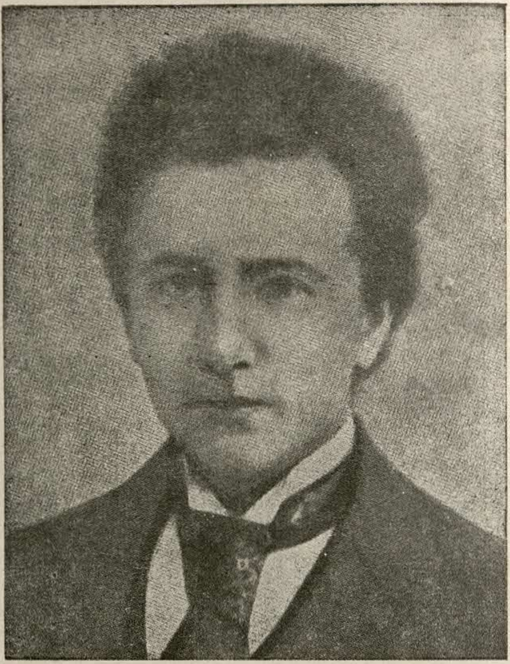
আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ



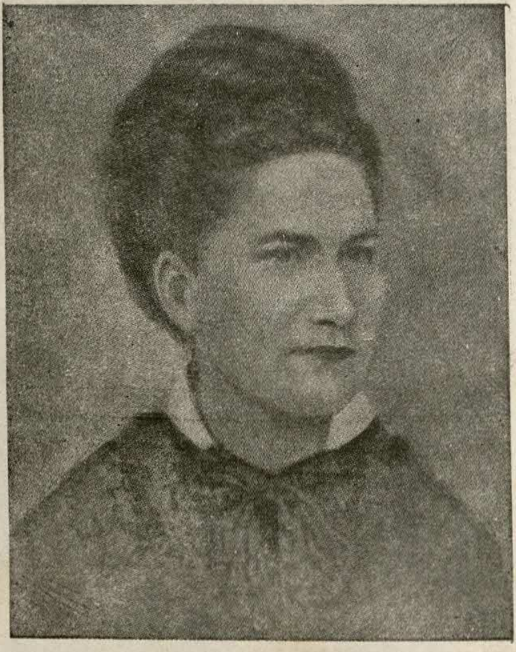
আইনস্টাইন ও এল্‌সা



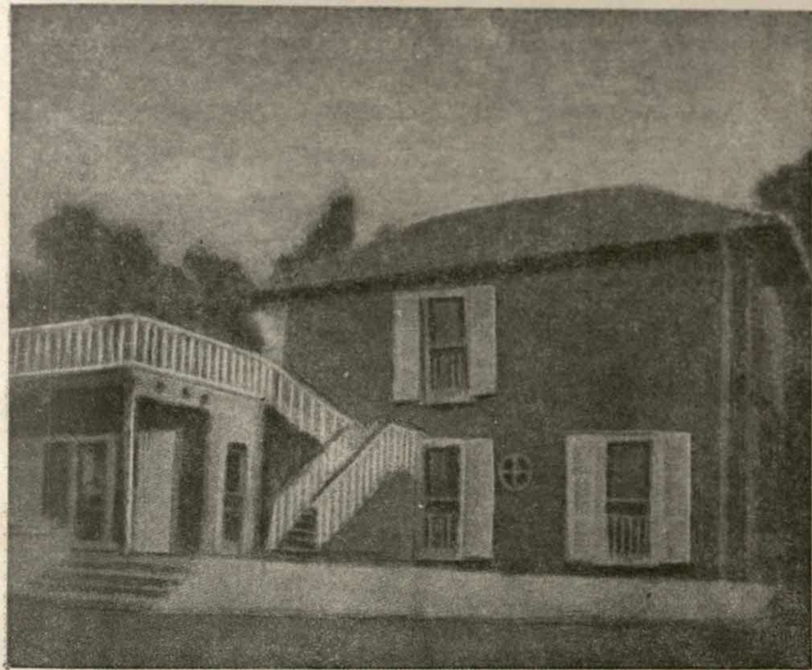
অধ্যাপনা-কালে আইনস্টাইন



ছাত্রাবস্থায় আইনস্টাইন



পলিন আইনস্টাইন



কাপুতে আইনস্টাইনের বাড়ী



অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমিতে হ্যাবিক্ট, সোলোভিন ও আইনস্টাইন



সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1925-26)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল ও কৈশোর

মধ্য য়ুরোপের মানচিত্র খুললে দেখা যাবে জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াবিয়া (Swabia) অঞ্চল। এই অঞ্চলটির জমি উঁচু-নীচু, অনেকটা ভারতবর্ষের সাঁওতাল পরগণার মত। এই অঞ্চলে দানিয়ুব নদীর (Danube) পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচীন সহর উল্‌ম্‌ (Ulm)। এইখানে জন্মগ্রহণ করেন এক ইহুদী পরিবারে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন 1879 খ্রীস্টাব্দে 14ই মার্চ তারিখে। এই সহরের বেশীর ভাগ অধিবাসীই ছিলেন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের। ইহুদী ছিলেন মাত্র কয়েক শতর মত। অ্যালবার্টের ঠাকুর্দা এই সহরে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন 1868 খ্রীস্টাব্দ থেকে। অ্যালবার্টের বাবা হেরম্যানের (Hermann) ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবার। তাঁর গণিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু সঙ্গতির অভাবে ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য হলেন জীবিকা উপার্জনের জন্যে। তাঁর ভাই জ্যাকব (Jacob) ছিলেন একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরা উল্‌মে একটি বৈদ্যুতিক জিনিষপত্রের দোকান খোলেন। উলমের কিছু দূরেই হেসিনগেনে (Hechingen) হেরম্যানের খুড়তুতো ভাই রুডলফ আইনস্টাইন বাস করতেন। হেরম্যান বিয়ে করেন স্টুটগার্ট (Stuttgart) সহরের একজন বিত্তশালী শস্য ব্যবসায়ীর মেয়ে পলিন কচকে (Paulin Koch) 1878 খ্রীস্টাব্দে। পলিনের বোনকে বিয়ে করেন রুডলফ। তাঁদের মেয়ে এল্‌সা। এই এল্‌সা ছিলেন অ্যালবার্টের সমবয়সী ও ভবিষ্যতে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সোয়েবিয়ান অঞ্চলের কথ্যভাষা শ্রুতিমধুর। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথার উচ্চারণে এই ভাষার প্রভাব বেশ কিছুদিন ছিল, কিন্তু এল্‌সা আইনস্টাইনের কথার উচ্চারণে ত্রুটি বরাবরই ছিল, যার জন্য তিনি অ্যালবার্টকে ডাকতেন 'অ্যালবারতল' বলে। অ্যালবার্টের জন্মের প্রায় বছরখানেক পরে 1880 খ্রীস্টাব্দে হেরম্যান ও জ্যাকব পরিবারবর্গ নিয়ে উল্‌ম্‌ থেকে চলে এলেন মিউনিখে (Munich)। এখানে তাঁরা একটি ছোটখাট বৈদ্যুতিক

কারখানা (workshop) খুললেন। অ্যালবার্টের পাঁচ বছর বয়সের সময় তাঁরা উঠে গেলেন সেগুলিং নামে মিউনিখের একটি সহরতলীতে (suburb)। সেখানে তাঁরা একটি গৃহ নির্মাণ করলেন ও একটি ছোট কারখানা করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করলেন। তাঁরা ব্যবসায়ে সেরূপ সফলতা লাভ না করলেও মোটামুটি ভাবে তাঁদের জীবিকা ভালই চলছিল। 1881 খ্রীস্টাব্দে অ্যালবার্টের বোন মায়ার (Maja) জন্ম হয়। মিউনিখের চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। হেরম্যান সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে মিউনিখের বাইরে পিকনিক করতে যেতেন। কখনও কখনও রুডলফ তাঁর মেয়ে এল্সাকে নিয়ে সেই পিকনিকে যোগ দিতে আসতেন। বাল্যকাল থেকেই অ্যালবার্ট ও এলসার বেশ ভাব ছিল।

অ্যালবার্টের মা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা। তিনি ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন ও ভাল গাইতে পারতেন। হেরম্যান ও জ্যাকবের গলা ছিল গম্ভীর ও মধুর। তাঁরাও ভাল গাইতে ও আবৃত্তি করতে পারতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের গৃহে সন্ধ্যাবেলায় পারিবারিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। পলিন পিয়ানোতে বীটোফেন, মোজার্ট প্রমুখ বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীত রচনাকারীদের রচিত সঙ্গীত বাজাতেন, কখনও কখনও সবাই জার্মানীর প্রাচীন পল্লীগীতি গাইতেন, আবার কখনও হেরম্যান, গ্যেটে, শীলার প্রমুখ বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিকদের লেখা থেকে আবৃত্তি কিংবা পাঠ করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই 'আইনস্টাইন গৃহ' মিউনিখে বিখ্যাত হয়ে উঠল। অনেকে এই সান্ধ্য মজলিসে যোগ দিতে আসতেন। কখনও কখনও কোন অনুষ্ঠান না করে সবাই মিলে নানা বিষয়ের, নানা নূতন নূতন আবিষ্কারের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

অতি অল্প বয়স থেকেই অ্যালবার্ট এই সান্ধ্য মজলিসের সময় মায়ের কাছে বসে থাকতেন। পিয়ানোর উপর দিয়ে মার দ্রুত অঙ্গুলি চালনা তাঁকে মুগ্ধ করত। অনুষ্ঠান ও আলাপ আলোচনা বুঝতে না পারলেও সেগুলি তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করত, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন, কিছুতেই ঘুমাতে যেতে চাইতেন না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল, যার জন্যে ভবিষ্যৎ জীবনে যখনই সুযোগ হয়েছে, তাঁর নিজের গৃহে এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি সনাতন

(ক্লাসিকাল) সঙ্গীত ও সনাতন সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠলেন। গ্যেটে ও শীলারের লেখা, বিশেষ করে ফাউস্ট (Faust) তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই ফাউস্ট থেকে আবৃত্তি করতেন। ছয় বছর বয়স থেকে তিনি শিক্ষকের কাছে বেহালা বাজনা শিখতে আরম্ভ করলেন ও চৌদ্দ বছর বয়স থেকে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি অনেক জায়গায় বেহালা বাজিয়েছেন।

আইনস্টাইনের যদিও বেহালায় সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধে খুব উচ্চ-স্তরের দক্ষতা ছিল না, কিন্তু তাঁর বাজনায় সুরের প্রকাশের মিষ্টতা, সাবলীলতা ও আন্তরিকতা ছিল। বাখ্ (Bach), হেদন্ (Haydn), সুবার্ট (Schubert) ও মোৎসার্ট (Mozart) তাঁর খুবই প্রিয় সুরকার ছিলেন। তিনি যখন বেহালায় এই সুরকারদের কোন রচনা বাজাতেন, তিনি নিজের বিশেষত্বের উপর জোর না দিয়ে রচনাটিকে বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর আর একটি সখ ছিল, সেটি হল পিয়ানোয় বেশী করে দক্ষতা অর্জন করা। তিনি বলতেন যে, বাইরে কোথাও গেলে তাঁর খুব মনে হত কখন গিয়ে পিয়ানোর ঘাটগুলির উপর দিয়ে আঙুল চালাবেন। তিনি বলতেন যে, সঙ্গীত বিশেষ করে মোৎসার্টের রচনা ও বৈজ্ঞানিক বিষয় দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদরের।

বাল্যকাল থেকেই অ্যালবার্ট ছিলেন শান্ত ও সংযত। তিনি সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গ ও দুরন্তপনা পরিহার করে চলতেন। অ্যালবার্ট ও মায়া—দুই ভাই-বোন শৈশব কাল থেকেই প্রকৃতি-প্রিয় ছিলেন। যুদ্ধের বাজনা ও তার তালে তালে সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়া অ্যালবার্টের মনে শৈশবকাল থেকেই ভীতির সঞ্চার করত। এই অনুভূতিই ভবিষ্যতে তাঁকে একজন বড় শান্তিবাদী (pacifist) করে তুলেছিল, যার জন্যে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রোমা রোঁলা প্রমুখ বিখ্যাত শান্তিবাদী মনীষীদের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়তে চেয়েছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণেই হিটলার জার্মানীর ফুহ্‌রার হয়ে যখন প্রচণ্ড রণোন্মাদনায় জার্মান অধিবাসীদের উত্তেজিত করছিলেন ও ইহুদীদের প্রতি বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছিলেন, নিজের জীবনের বিপদ জেনেও তিনি প্রবলভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই সব প্রবল

প্রতিবাদের ফলেই তাঁকে 1933 খ্রীস্টাব্দে জার্মানী থেকে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

4/5 বছর বয়স্ক বালক অ্যালবার্টকে একবার অসুখের সময় তাঁর বাবা একটি দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র (compass) দিয়েছিলেন। ঐ চৌম্বক কাঁটাটির সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান এবং অন্য যে-কোন দিকে থেকে ছেড়ে দিলে আন্দোলিত হয়ে উত্তর-দক্ষিণ দিকে ফিরে আসা—এই ক্রিয়াটি বালকের মনে গভীর বিস্ময় জাগরিত করেছিল। তিনি ঐ কম্পাসটিকে সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করতেন ও তাঁর শয্যাপার্শ্বে রাখতেন। ঐ কম্পাসটি তাঁর শিশুমনে যে গভীর ও স্থায়ী অনুভূতি জাগিয়েছিল, আইনস্টাইন ভবিষ্যতে এক জায়গায় সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, এইরূপ বিস্ময় জাগরিত হয় যখন আমাদের কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের মনের কতকগুলি বদ্ধমূল কল্পনার সংঘাত বাধে। প্রকৃতপক্ষে : এইরূপ অনুভূতিই পরে তাঁর মনে 'extra-personal' বা মানবচেতনা-নিরপেক্ষ জগতের সত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্রজীবন

মিউনিখ

বাল্যকালে অ্যালবার্টের লেখাপড়া নিয়ে তাঁর বাবার ও মার বিশেষ চিন্তা ছিল, কারণ লেখাপড়ায় তাঁর মনোযোগ ছিল না। ছয় বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল মিউনিখের একটি ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে কারণ ইহুদীদের জন্যে বিদ্যালয়টি ছিল অনেক দূরে ও সেখানকার মাইনেও ছিল অতি বেশী, যা তাঁর বাবার আর্থিক অবস্থায় কুলিয়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। দশ বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল মিউনিখের লুইৎপোল্ড জিমনাসীয়ামে (Luitpold Gymnasium)। বিদ্যালয়ে তিনি ইহুদী-বিদ্বেষের কিছু কিছু আভাস পান। যে কয়েকজন ইহুদী ছাত্র ছিল, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছাত্রেরা তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। এই আচরণ অ্যালবার্টের শান্ত, সরল ও সমন্বয়পূর্ণ অন্তর-জগতে কঠিন আঘাত করত। শিক্ষকদের কঠোর ব্যবহার তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করত। তাঁর মনে হত বিদ্যালয় একটি কয়েদখানা, ছাত্রেরা সব কয়েদী এবং শিক্ষকেরা সব পালা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসঘরে এধার থেকে ওধারে ঘুরে পাহারা দিচ্ছেন। এই জন্য তিনি বিদ্যালয়ে যেতে চাইতেন না। বিদ্যালয়ে যাবার অনিচ্ছার আরও একটি কারণ ছিল। শৈশব থেকেই তাঁর একটি অভ্যাস ছিল বাড়ীতে বাবা, মা ও কাকাকে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা, কারণ তিনি কোন বিষয় শিখতে, মুখস্থ করতে কিংবা গ্রহণ করতে চাইতেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বিষয়ের মানে বা তাৎপর্য বুঝতেন। এই স্বভাবের জন্যে শিক্ষকেরা তাঁর উপরে বিরূপ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে রুলার দিয়ে তাঁকে মারতেন।

বিদ্যালয়ের এই সব ঠাট্টাবিদ্রূপ ও শিক্ষকদের অত্যাচারের কথা মনে করে অ্যালবার্ট মাঝে মাঝে জিদ ধরতেন যে, তিনি বিদ্যালয়ে যাবেন না; বিদ্যালয়কে তিনি ঘৃণা করেন। একদিন তিনি বললেন যে, বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে শিখানো হয় না, বোঝানো হয় না, কেবল মুখস্থ করতে হয় এবং তিনি

না বুঝে কোন বিষয় মুখস্থ করতে চান না বলে তাঁকে শিক্ষকেরা মারেন। তাঁর বাবা ও মা যদিও এতে মনে ব্যথা পেলেন, কিন্তু তাঁকে বোঝালেন যে, লেখাপড়া না করলে তিনি ডিপ্লোমা পাবেন না এবং জার্মানীর তখনকার আইনানুযায়ী কোন ব্যক্তি ডিপ্লোমা ব্যতিরেকে কোন চাকরী পেত না। অ্যালবার্ট চাকরী না পেলে সংসার চলবে কি করে? তাঁর বাবা, মা ও বোনের খাওয়াপরা চলবে কেমন করে? অ্যালবার্ট উত্তর দিলেন যে, তিনি বেহালাবাজিয়ে হবেন এবং বেহালা বাজিয়েই সবার খরচ চালাবেন। তাঁর মা তখন বললেন যে,পেশাদার বাজিয়ে হতে হলে অ্যালবার্ট'কে বহু বছর ভালভাবে শিখতে হবে, সাধনা করতে হবে, নইলে লোকে পয়সা দিয়ে তাঁর বাজনা শুনবে কেন।

তাঁর কাকা জ্যাকব এই সময়েই উপস্থিত হয়ে তাঁকে বুঝালেন, যে কাজ করতে কারো ভাল লাগে, সে কাজ সে নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু যদি কেউ এমন অবস্থায় এসে পড়ে যে, তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে, সেটি তার পছন্দ নয়, তবে তাকে এমন একটি উপায় বের করতে হবে, যাতে কাজটি ভালভাবে করা যায়। পৃথিবীতে ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে হলে এই দৃঢ় ইচ্ছা থাকতেই হবে। তারপর জ্যাকব জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কোন্ বিষয় তাঁর পড়তে ভাল লাগে না? অ্যালবার্ট উত্তর দিলেন, বীজগণিত ও জ্যামিতি তাঁর পড়তে ইচ্ছে হয় না। তখন জ্যাকব দুটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর ভাইপোর এই অনিচ্ছা দূর করেন। তিনি প্রথমটিতে বললেন, 'মনে কর, আমরা শিকার করতে গিয়ে অজানা কোন একটি ছোট প্রাণীর পিছু ধাওয়া করছি। অজানা বন্য প্রাণীটিকে বলব 'x'। দেখ বীজগণিতেও আমরা অজানা সংখ্যাকে বলি 'x'। তারপর যখন শিকারটি ধরব, তখন আমরা সেটিকে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানব সেটি কোন্ প্রাণী। আমাদের নানা উপায় খুঁজতে হবে অজানাকে জানতে।' তারপর দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বললেন, 'মনে কর, তুমি একজন ডিটেকটিভ। তোমার উপরে আদেশ হয়েছে একজন লোককে ধরতে। তুমি লোকটির নাম জান না, পরিচয় জান না, সে কি দুষ্কর্ম করে তাও জান না। তুমি একটি ফাইল খুললে এবং তার নাম দিলে 'x'। তারপর নানারকম সূত্র বের করে চেষ্টা করতে লাগলে লোকটিকে ধরতে এবং ফাইলে তোমার মন্তব্য

লিখতে লাগলে। একদিন তার পিছু নিলে, এ রাস্তা দিয়ে ঢুকলে অন্য রাস্তা দিয়ে বেরুলে কিংবা একটি সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ (hypotenuse) দিয়ে গড়িয়ে পড়লে, সে লোক হয়ত লম্ব (perpendicular) বেয়ে উঠে পড়ল, তারপর হয়ত লোকটি একটি সামন্তরিক (parallelogram) ঘরের পাশের দেয়ালগুলো ঘেঁসে পালাতে চেষ্টা করল, তুমি কর্ণ (diagonal) দিয়ে দৌড়ে অবশেষে তাকে ধরলে। তখন তুমি তার সব জানতে পারলে এবং তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে তোমার ফাইল সমেত তোমার উপরওয়ালার কাছে দিয়ে দিলে। বীজগণিতই বল আর জ্যামিতিই বল, এই হল সব।' অ্যালবার্ট এতে সত্যই খুব আমোদ ও প্রেরণা পেলেন এবং নানা সূত্র দিয়ে অজানাকে জানবার আগ্রহে তাঁর বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রতি ভীতি দূর হয়ে গেল এবং এই দুটি বিষয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ থেকে অনেক অগ্রসর হয়ে গেলেন। তারপর তিনি বিদ্যালয়ে যেতেও আর আপত্তি করতেন না।

স্বল্পভাষী, শান্ত অ্যালবার্ট যদিও তাঁর লেখাপড়ায় অসাধারণত্ব কিছু দেখাতে পারেন নি, তবুও বছর বছর প্রমোশন পেয়ে যেতে লাগলেন। অঙ্কে ও পদার্থবিদ্যায় তিনি খুবই আনন্দ পেতেন ও পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতেন। কিন্তু জীববিদ্যা (biology), ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা (languages) প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে আনন্দ পেতেন না, সেই জন্যে পড়তে চাইতেন না। এই বিষয়গুলিতে তিনি ভাল নম্বর পেতেন না।

এই সময় অ্যালবার্টদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন পোল্যাণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন ছাত্র ম্যাক্স টালমে (Max Talmey)। তিনি অ্যালবার্টের মনে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগালেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে। টালমে অ্যালবার্টকে নানাপ্রকার জনপ্রিয় বই পড়তে দিতেন। এই সব বই পড়ে অ্যালবার্টের ভাল ধারণা হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বিশ্বজনীন কারণগুলি সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব ধর্মীয় ব্যাখ্যা শুনেছিলেন, সেগুলি তাঁর মন থেকে মুছে গিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি তাঁর মনে স্থায়ী হয়। এই সময় থেকেই তিনি যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন। দে কার্তে, স্পিনোৎসা প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। কি বৈজ্ঞানিক, কি সামাজিক, কি ধর্মীয় যে-কোন dogma,

প্রচলিত আইনকানুন, শাস্ত্রীয় শাসন তাঁর মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতেন যে, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কি না।

এই সময় বাবা ও কাকার ব্যবসার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। এর কারণ বোধ হয় যে, জার্মানীতে সামরিক শাসন ও কায়দাকানুন উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল। সামরিক অফিসারেরা নানারূপ চলতি ব্যবসা কিনে নিতে লাগলেন ও ক্রেতাদের আদেশ করা হতে লাগল তাঁদের দোকান থেকে জিনিষপত্র কিনতে। উপায়ান্তর না দেখে তাঁর বাবা ও কাকা অনেক অনুসন্ধানের পর ইতালির মিলান সহরে ব্যবসা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। মিলান সহরে ইহুদী-বিদ্বেষ ও সামরিক শাসনের দাপট ছিল না। মিউনিখ ছাড়বার সময় অ্যালবার্টের বিদ্যালয়ের পড়া শেষ না হওয়ার জন্যেহেরম্যানঅ্যালবার্টকে এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে গেলেন।

পনের বছর বয়স্ক কিশোর অ্যালবার্ট নানা কারণে একাকী মিউনিখে খুবই অসুখী বোধ করতে লাগলেন। তাঁর গণিতে ও পদার্থবিদ্যায় বেশী করে জানবার স্পৃহা জীমনাসিয়ামের শিক্ষকেরা মিটাতে পারছিলেন না। শিক্ষকদের গভীর জ্ঞান ছিল না, ছিল ভাসা-ভাসা। তারপর স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যার উপর অত্যধিক মূল্য-আরোপকর প্রণালীগুলি তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। নীরস ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা গাদা গাদা মুখস্থ করা তার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হতে লাগল। তারপর বাবা, মা ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন, সামরিক আইনকানুনের দাপট, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহানুভূতিহীন ব্যবহার ও ঠাট্টাবিদ্রূপ তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। ডিপ্লোমা পাবার জন্যে শেষ পরীক্ষার এক বছর আগেই তিনি ঠিক করলেন, মিউনিখ ছেড়ে মিলানে যাবেন। এজন্যে তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে স্নায়বিক দৌর্বল্যের দরুণ অসুস্থতার জন্যে ছয় মাসের ছুটির সার্টিফিকেট জোগাড় করলেন। তাঁর স্বাধীনভাবে চিন্তা ও ধর্মীয় নিয়মাবলী না মানার জন্যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের ভয় ছিল অন্য ছাত্রেরা তাঁর উদাহরণে না অশিষ্ট হয়ে যায় ও বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে শুরু করে। ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেখে অধ্যক্ষ অ্যালবার্টকে বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি মিলানে বাবা-মার কাছে চলে গেলেন।

ইতালি দেখে অ্যালবার্ট মুগ্ধ হলেন। সেখানকার প্রদর্শশালা (museum)

আর্ট গ্যালারী, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, স্ফূর্তিবাজ ও অতিথিপরায়ণ লোকদের সহজ সরল ব্যবহার, সঙ্গীত ইত্যাদি তাঁর খুব ভাল লাগল। তিনি জেনোয়ায় ও অন্যান্য সহরে ভ্রমণ করলেন। জার্মানীর কঠোর জীবনের তুলনায় ইতালিতে তিনি মুক্তির আনন্দ পেলেন। তিনি ইতালিতে এসেই তাঁর জার্মানীর নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন।

মিলানেহেরম্যান ও জ্যাকব প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাঁদের ব্যবসায় ভালভাবে দাঁড় করাতে পারলেন না, তাঁদের জমানো টাকা ক্রমশঃ খরচ হয়ে যেতেলাগল এবং দু-জনের স্বাস্থ্যই ভেঙ্গে পড়ছিল। হেরম্যান তাঁর ছেলেকে বলতে বাধ্য হলেন যে, উচ্চতর গণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। সেজন্যে অ্যালবার্টকে যথাসত্বর কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কোন চাকরিতে ঢুকে পড়তে হবে। অ্যালবার্টের খুব ইচ্ছে যে, তিনি পদার্থবিদ্যায় ও গণিতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু মিউনিখ জীমনাসিয়ামের ডিপ্লোমা না থাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সম্ভব নয়। এজন্যে অনেক পরামর্শের পর ঠিক হল যে, সুইৎজারল্যাণ্ডের জুরিখ (Zurich) সহরের অতি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সুইস ফেডারেল পলিটেকনিকে(Swiss Federal Polytechnic) অ্যালবার্ট উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন। সেখানে গণিতশাস্ত্র ও পদার্থ-বিদ্যা ছাড়াও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়েও শিক্ষালাভ করা যাবে। কিন্তু সেখানে ভর্তি হবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় অ্যালবার্ট গণিত ও পদার্থবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা দেখানো সত্ত্বেও বিদেশী ভাষা, প্রাণিবিদ্যা (zoology) ও উদ্ভিদ-বিদ্যাতে (botany) ভাল না করার জন্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। এ ছাড়া তাঁর জীমনাসিয়ামের ডিপ্লোমা না থাকার জন্যেও অসুবিধা হল।

যা হোক, পলিটেকনিকের কর্মকর্তারা তাঁর গণিত ও পদার্থবিদ্যায় গভীর জ্ঞান দেখে তাঁকে একেবারে নিরাশ করলেন না। তাঁরা পরামর্শ দিলেন অ্যালবার্টকে সুইৎজারল্যাণ্ডের একটি ছোট সহর আরাউয়ের (Aarao) ক্যান্টনাল বিদ্যালয়ে (Cantonal School) এক বছর ঐ সব বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে পরের বছর পলিটেকনিকে পড়তে আসতে। উপায় না দেখে অ্যালবার্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরাউতে গেলেন। মিউনিখ জীমনাসিয়ামের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি ঘৃণা ও ভীতির জন্যেই অন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে তাঁর আগ্রহ ছিল না।

আরাউ

আরাউতে পড়তে এসে অ্যালবার্টের ভয় ঘুচল। সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী তাঁকে মুগ্ধ করল, মুগ্ধ করল সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক—ঠিক যেমনটি তিনি চাইতেন। সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য ও পড়াবার পদ্ধতির জন্মে ছাত্রদের কোন বিষয় বোঝবার অসুবিধে হত না। শিক্ষকেরা বুঝতে পারতেন কোন্ ছাত্রের কোন্ বিষয়ে কতখানি দখল আছে। সেই অনুসারে তাঁরা ছাত্রদের প্রতি মনোযোগ দিতেন। ছাত্ররা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ল্যাবরেটরীতে ইচ্ছামত কাজ করতে পারতেন; প্রাণিবিদ্যার প্রদর্শশালাতে (zoological museum) ছাত্রেরা নানারূপ প্রাণী সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতেন; উদ্ভিদবিদ্যার বাগানে ব্যবহারিক ক্লাশে(practical class)ছাত্রেরা বিভিন্ন উদ্ভিদ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করবার সুযোগ পেতেন। অ্যালবার্ট খুব মন দিয়ে সব বিষয়ে পড়তে লাগলেন। সুইৎজারল্যাণ্ডে অনেক বাস্তুত্যাগী তরুণ বিপ্লবী বসবাস করতেন। বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাশের ছাত্রেরা নানারূপ রাজনীতি, সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তরুণ বয়সে এইসব আলোচনা অ্যালবার্টের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁর মনে রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে নিজস্ব সুন্দর ধারণা গড়ে ওঠে।

আরাউতে অধ্যাপক উইনটেলার ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁদের মধুর ব্যবহারে অ্যালবার্ট সব দুঃখ ভুলে গেলেন। এই পরিবারটিও আইনস্টাইন পরিবারের মত সঙ্গীতপ্রিয় ছিল এবং প্রায়ই সন্ধ্যাকালে সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। অ্যালবার্ট'ও বেহালা নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। অধ্যাপক উইনটেলার ও স্কুলের ডীন দু-জনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হল, অ্যালবার্ট ভবিষ্যতে একজন উঁচুদরের বিজ্ঞানী হবেন। হেরম্যানের ব্যবসার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল, সেইজন্মে ছেলের সব খরচ মিটাতে পারছিলেন না। অধ্যাপক উইনটেলারের চেষ্টায় জেনোয়াবাসী তাঁর এক ধনী বন্ধু, যিনি আবার অ্যালবার্টের মায়ের দিক দিয়ে আত্মীয় হতেন, অ্যালবার্ট'কে প্রতি মাসে একশত ফ্রাঁ মুদ্রা দিয়ে সাহায্য করতেন। এই অর্থ না পেলে অ্যালবার্টে'র হয়ত আর লেখাপড়া করা সম্ভবপর হত না। অ্যালবার্ট খুব হিসেব করে খরচ করতেন। নিজের অনেক সুখসুবিধে ত্যাগ করে অতি

কষ্ট করে থেকে তিনি প্রতি মাসে ঐ সামান্য এক শত ফ্রাঁ থেকে বিশ ফ্রাঁ করে জমাতেন সুইশ নাগরিক হবেন বলে। সুইৎজারল্যাণ্ডে চাকরী পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে ভেবে এই নাগরিকত্ব লাভের জন্যে তিনি অত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। এক বছর পরে আরাউয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর অ্যালবার্ট মিলানে ফিরে যাবার সময় অধ্যাপক উইনটেলারের ছেলে কার্লকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। কার্ল অ্যালবার্টের সমবয়সী। দু-জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কার্ল ভবিষ্যতে হেরম্যানের ব্যবসাতে যোগ দিয়ে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। পরে কার্লের সঙ্গে অ্যালবার্টের বোন মায়ার বিয়ে হয়।

এইখানে পড়বার সময় থেকেই আলোর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য গুণ সম্বন্ধে আইনস্টাইনের মনে চিন্তা শুরু হয়। প্রথম বিষয়টি হল ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) 1865 খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তার কিছু পূর্বে ফ্রেনেল ও ইয়ং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আলোর তরঙ্গরূপ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই তরঙ্গের বেগও বের করেন। এই আলোর বেগ হল প্রতি সেকেণ্ডে 186,000 মাইল বা 300,000 কিলোমিটার। ম্যাক্সওয়েল তাঁর আবিষ্কৃত বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের বেগও একই মানের প্রমাণ করে বললেন যে, আলো হল ঐ বেগে গতিশীল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ, অর্থাৎ আলো মানেই চলন্ত তরঙ্গ।

আইনস্টাইন চিন্তা করতেন যে, যদি কোন লোক একটি চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে সমান বেগে ছুটতে থাকে, তবে তার কাছে গাড়ীটিকে চলন্ত বলে মনে হবে না। এই লোকটি যদি একটি আলোর রশ্মির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান বেগে ছোটে রশ্মিটিকে ধরবে বলে—যাকে আইনস্টাইন বলতেন 'catch up', তবে লোকটি আলোর তরঙ্গকে সচল অবস্থায় না দেখে, দেখবে স্থির অবস্থায়। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বমতে আলো-কে সচল তরঙ্গ হতেই হবে, এই অসঙ্গতির কি মীমাংসা হতে পারে?

অপর বিষয়টি হল মাইকেলসন ও মর্লের অতি বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল। প্রথমে 1881 খ্রীস্টাব্দে ও পরে 1887 খ্রীস্টাব্দে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইনটারফেরোমিটার (interferometer) নামক একটি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা গেল যে, ঈথারের কোন অস্তিত্ব নেই এবং আলোর রশ্মিকে পৃথিবীর পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, কি দক্ষিণ

থেকে উত্তরে, যে-কোন দিকে পাঠানো যাক না কেন, আলোর বেগের মান একই থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না ; পৃথিবীতে অবস্থিত কোন উৎস থেকে নির্গত কোন আলোর রশ্মির বেগের উপর পৃথিবীর আবর্তনের বেগের কোন প্রভাব থাকে না। পৃথিবীর বেগ হল সেকেণ্ডে প্রায় 30 কিলোমিটার।

আলোর বেগের উপর আলোর উৎসের কিংবা আলোর গ্রাহকের বেগের কোন প্রভাব থাকে না—এই বিষয়টি আইনস্টাইনের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল। অথচ আমরা জানি যে, শব্দের বেগ উৎসের কিংবা শব্দের গ্রাহকের বেগের উপর নির্ভর করে।

আইনস্টাইন প্রায়ই কোন সমস্যা উপস্থিত হলে একটি রেল-ইঞ্জিনকে কল্পনা করে তাঁর প্রশ্নের জবাব খুঁজতেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—মনে করা যাক যে, একটি ইঞ্জিন কোন গুমটির দিকে ঘণ্টায় প্রায় 72 কি.মি. অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 20 মিটার বেগে আসছে। গুমটিতে দাঁড়ানো একজন ব্যক্তি একটি ঘণ্টা বাজাচ্ছে। শব্দের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 400 গজ বা 360 মিটার। ঐ ইঞ্জিনটিতে উপবিষ্ট কোন পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে যে, শব্দের বেগ সেকেণ্ডে $360+20=380$ মিটার। আবার ইঞ্জিনটি যখন গুমটি পেরিয়ে চলে যাবে তখন পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে শব্দের বেগ সেকেণ্ডে $360-20=340$ মিটার। শব্দের বেগের সঙ্গে এগিয়ে আসা ইঞ্জিনের বেগের যোগ হওয়ায় শব্দের আপেক্ষিক বেগ বেড়ে যাচ্ছে। আবার যখন ইঞ্জিনটি গুমটি পেরিয়ে চলে যাবে, তখন চলে-যাওয়া ইঞ্জিনের বেগ শব্দের বেগের থেকে বিয়োগ হওয়ায় মোট বেগ কমে যাবে।

কিন্তু চলন্ত কোন ইঞ্জিনের বেগ যত দ্রুত মানেরই হোক না কেন, গুমটিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি একটি মশাল জ্বাললে, ইঞ্জিনের পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগের কোন তারতম্য হবে না, যা বোঝা গেছে মাইকেলসন ও মর্লের পরীক্ষার ফলে। ইঞ্জিনের বেগের সঙ্গে যোগ কি বিয়োগ হয়ে আলোর বেগ বেশী কি কম মনে হবে না, যেমন হয়েছিল শব্দের বেলায়। আলোর বেলায় এটি হয় না কেন ?

এই সব চিন্তা থেকেই আইনস্টাইন বার্নে চাকরী করবার সময় 1905

খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করলেন যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ। এই বিষয়টি পরে আলোচনা করা হবে।

জুরিখ

1

মিলানে কিছুদিন থেকে আইনস্টাইন (এখন থেকে অ্যালবার্টকে আইনস্টাইন বলে উল্লেখ করা হবে) জুরিখে পড়তে এলেন। আরাউতে শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্যে জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হবার সময় আর পরীক্ষা দিতে হল না। তিনি ভর্তি হলেন 1896 খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তাঁর পাঠ্য বিষয় হল পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভূবিদ্যা (geology), দর্শন, ইতিহাস, অর্থবিদ্যাশাস্ত্র (economics) এবং সাহিত্য।

য়ুরোপের অনেক জায়গা থেকে—যেমন জারের সাম্রাজ্য রাশিয়া হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, ব্যাভেরিয়া, সার্বিয়া ইত্যাদি যে সব দেশের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই সব দেশ থেকে অনেক উদ্বাস্তু, অনেক ছাত্র-ছাত্রী সুইৎজারল্যাণ্ডে এসেছিলেন জ্ঞান বাড়াবার জন্যে, নিজেদের পছন্দমত লেখাপড়া করবার জন্যে। আইনস্টাইনের বন্ধুসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, তাঁরা হলেন মার্সেল গ্রসম্যান (Marcel Grossman), ফ্রেডারিক অ্যাডলার (Fredrick Adler), লুই কল্‌রস (Louis Kollros) এবং জ্যাকব য়েহ্‌রাত (Jacob Ehrat)। এ ছাড়া একজন ছিলেন সহপাঠিনী মিলেভা মারিৎস (Mileva Maritsch), যাঁর সঙ্গে পরে আইনস্টাইনের বিয়ে হয়। তিনি আইনস্টাইনের চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। মিলেভা ছিলেন সার্বিয়ার মেয়ে। তিনি আইনস্টাইনের মত জার্মানীকে খুবই ঘৃণা করতেন সেখানকার সামরিক শাসন ও দেশজয়ের মনোবৃত্তির জন্য। তিনি জুরিখে এসেছিলেন উচ্চ স্তরের বিজ্ঞান শিখে গবেষণা বা দেশে গিয়ে শিক্ষকতা করবেন বলে, কারণ তাঁর দেশ ছিল গরীব ও অনগ্রসর। মিলেভা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি লঘু পরিহাস কি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন না এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়েও বিশেষ আকর্ষণীয়া ছিলেন না। তিনি যে-কোনরূপ আলোচনায় নীরব শ্রোতা ছিলেন। আইনস্টাইন ছিলেন এই সব বিষয়ে মিলেভার বিপরীত। কিন্তু এক বিষয়ে দু-জনের বেশ মিল ছিল। সেটি

হচ্ছে প্রসিদ্ধ পদার্থবিদদের কাজ সম্বন্ধে আগ্রহ ও তাঁদের বৈজ্ঞানিক তথ্য-তত্ত্বাদি পাঠ।

অধ্যাপকদের কয়েক জনের, বিশেষ করে ওয়েবারের (Waber) পড়ানো আইনস্টাইন পছন্দ করতেন না। ওয়েবার পড়াতেন, পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং। ওয়েবারের ক্লাশে প্রায়ই তিনি অনুপস্থিত থাকতেন বলে ওয়েবার তাঁর উপরে খুবই বিরূপ ছিলেন। ওয়েবার যা পড়াতেন, আইনস্টাইনের সে সব জানা ছিল। হেরম্যান মিন্‌কৌস্কির মত অতি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন তাঁর গণিতের কোন কোন বিষয়ের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁর পড়ানোও আইনস্টাইনের পছন্দ হত না। বেশীর ভাগ দিনই তিনি এই অধ্যাপকের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতেন। মিন্‌কৌস্কি পরে আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ গাণিতিক কাঠামোতে রূপ দিয়েছেন। এই দুর্বোধ্য তত্ত্ব যখন প্রকাশিত হয়, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে মিন্‌কৌস্কি—যখন তিনি শুনলেন যে, এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা তাঁরই ক্লাসপলাতক ছাত্র অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—যে ছেলেটি বেশীর ভাগ দিনই ক্লাশে অনুপস্থিত থাকত ও লেখাপড়ায় মন দিত না, সেই ছেলেটির চিন্তাধারায় এইরূপ জটিল ও বৈপ্লবিক তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা তাঁর পক্ষে কল্পনা করাই শক্ত।

আইনস্টাইনের অন্তরঙ্গ বন্ধু মার্সেল ক্লাসে যত্ন করে সব বিষয়ে অধ্যাপকদের বক্তৃতার নোট লিখতেন। আইনস্টাইন সেই সব নোট পড়ে পরীক্ষায় পাশ করতেন। এইভাবে মার্সেল তাঁর অনেক উপকার করেছিলেন, যা তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে স্বীকার করেছিলেন।

ক্লাশ কামাই করে আইনস্টাইন লাইব্রেরীতে তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি যেমন গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, কারসফ, বোল্‌ৎস্‌ম্যান, হার্ৎজ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি আগ্রহভরে পাঠ করতেন। এইভাবে সাধারণের চেয়ে তিনি অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করলেন।

এখানে বলা যেতে পারে যে, গত শতাব্দীর শেষ পাঁচটি বছর, যা ছিল আইনস্টাইনের কলেজ জীবন—বিজ্ঞানের উন্নতির দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 1895 সালে বিজ্ঞানী রোয়েন্টগেন (Roentgen) এক রকম আকস্মিক-

ভাবেই আবিষ্কার করলেন এক রশ্মি, যার কারণ প্রথমে অজানা ছিল। নাম হল এক্স-রে (X-Ray) বা অজানা রশ্মি। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। এই রশ্মি আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞানী বেকরেল চেষ্টা করতে লাগলেন যে, গবেষণাগারে তৈরী কোন বস্তুর পরিবর্তে প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত কোন বস্তু থেকে এক্স-রে পাওয়া যায় কিনা। তিনি ইউরেনিয়ামের একটি যৌগিক (compound) বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে 1896 সালে আবিষ্কার করলেন ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা (spontaneous radioactivity)। 1898 সালে বিজ্ঞানী কুরীদম্পতি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম ধাতু, যার তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এর কিছু পূর্বে 1897 সালে বিজ্ঞানী টমসন আবিষ্কার করেন বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণিকা ইলেকট্রন, যা ঋণাত্মক বিদ্যুৎসমন্বিত। পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ—বিজ্ঞানীদের প্রায় আড়াই হাজার বছরের এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। চেষ্টা চলল পরমাণুর গঠন জানবার জন্যে।

এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার স্বভাবতঃই তখনকার বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও আলোচনার বিষয় হল।

আইনস্টাইন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে কাফে মেত্রোপলে প্রায়ই সন্ধ্যায় নানা বিষয় আলোচনা করতেন। আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও বেশীর ভাগ ছিল বিজ্ঞানবিষয়ক, কিন্তু অন্যান্য বিষয় যেমন—সমাজ, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদিও থাকত। বিজ্ঞানের প্রধান বক্তা ছিলেন আইনস্টাইন। তিনি সহজ করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি বুঝিয়ে বলতেন। বন্ধুরা, বিশেষ করে মিলেভা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন আর অবাক হতেন আইনস্টাইনের পাণ্ডিত্য দেখে। আইনস্টাইনের একটি অভ্যাস ছিল—তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে অনর্গল বলতে পারতেন যদি সেরূপ শ্রোতা পেতেন। এই বিষয়ে মিলেভাই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত শ্রোতা, কারণ অন্যান্যদের মত তর্ক না করে তিনি নীরবে আইনস্টাইনের কথা শুনে যেতেন। এই জন্যে আইনস্টাইনের মিলেভাকে ভাল লাগত। এই ভাবেই এই দুই তরুণ তরুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কোন কোন দিন যুদ্ধবিরোধী আলোচনা হত। ফ্রেডারিক অ্যাডলার ছিলেন ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী। সামরিক শাসনের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি নিজের বাবা-মাকে বিজয়ী জার্মান সৈন্যদের দ্বারা

নিহত হতে দেখেছেন। তিনি ও আইনস্টাইন দু-জনেই ছিলেন বড় শান্তিবাদী। এই সময় থেকেই আইনস্টাইনের মনে ইচ্ছে জাগে 'বিশ্বনাগরিক' (Citizen of the World) হবার। পৃথিবীর সবাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক পৃথিবীর নাগরিক। স্বদেশভক্তির অথবা জাতীয়তাবাদের কোন মানে নেই, দুই-ই অবান্তর ও হাস্যকর। One World Government বা এক বিশ্ব-সরকারের প্রতিষ্ঠার জন্যে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন ও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন।

2

সেই সময় জার্মান সম্রাটের মত ছিল যে, মেয়েদের শিক্ষার বা রাজনীতি করবার কোন প্রয়োজন নেই। মেয়েরা জীবনযাপন করবে শুধু তিনটি বিষয় নিয়ে, যেগুলিকে জার্মান ভাষায় বলা হয় তিনটি K—Kueche, Kirche এবং Kinder—যার ইংরেজী মানে হয় তিনটি C দিয়ে—Cooking, Church এবং Children। বাংলায় বলা যেতে পারে, রান্নাঘর, গির্জাঘর এবং সন্তানপালন। মিলেভা এই মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, মেয়েরা ইচ্ছামত যে কোন চাকরী করতে পারবেন এবং পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করতে পারবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারে।

আইনস্টাইনের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সস্তায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী ধোলাই-খানার কাপড় ইস্ত্রী করে জীবিকা উপার্জন করতেন। এই বৃদ্ধা কাজ করবার সময় সঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন বলে আইনস্টাইন মাঝে মাঝে এবং এমন কি কখনও কখনও কাফে মেত্রোপোলে তাঁর প্রিয় সান্ধ্য মজলিসে না গিয়ে বৃদ্ধাকে বেহালা বাজিয়ে শুনাতেন।

আইনস্টাইন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁর মাকে সব খবর জানিয়ে চিঠি লিখতেন। প্রত্যেক ছুটিতে তিনি মিলানে যেতেন বাবা মার কাছে। হেরম্যান ও জ্যাকব দু-জনেরই স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছিল! কার্ল বিপুল উদ্যমে ও চেষ্টায় হেরম্যানের ব্যবসাকে কিছুটা দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। কার্ল ও মায়া পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন।

আইনস্টাইনও ছুটিতে এসে তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কার্ল মায়াকে বিয়ে করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলে হেরম্যান ও পলিন তাতে সম্মতি দিলেন। তৃতীয় গ্রীষ্মের ছুটিতে আইনস্টাইন মিলানে এলে কার্লের সঙ্গে মায়ার বিয়ে হয়। আইনস্টাইন এই বিয়েতে বেস্ট ম্যান হলেন। আইনস্টাইন পরিবারে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কয়েকদিন ধরে পারিবারিক অনুষ্ঠানে নানা প্রকার সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি হল। আইন-স্টাইন, কার্ল ও মায়া নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। পার্কে, ময়দানে নদীতীরে ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াবার সময় আইনস্টাইন মাঝে মাঝে খুসীতে ভরপুর নবদম্পতিকে একলা থাকবার সুযোগ দিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসতেন। আইনস্টাইন তাঁর আদরের বোনটির সুখ দেখে নিজেও খুবই সুখী হলেন এবং তাঁর মনেও একটি পরিবর্তন অনুভব করলেন—যেটি হল মিলেভার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর মনেও প্রেমের জোয়ার এসেছে! তিনি জুরিখে ফিরে এসে মিলেভাকে সেই কথা বললেন। মিলেভাও স্বীকার করলেন যে, তিনিও আইনস্টাইনকে ভালবাসেন। তখন এই তরুণ-তরুণী ভবিষ্যতের অনেক জল্পনাকল্পনা করলেন। ঠিক হল যে, পাশ করবার পর আইনস্টাইনের একটি চাকরি হলেই তাঁরা বিয়ে করবেন। আইনস্টাইন তাঁর মাকে এই কথা জানালেন। কিন্তু তাঁর মা ও বাবা এই বিয়েতে সম্মতি দিলেন না। তখনকার মত এই ব্যাপারটি চাপা পড়ে রইল।

তরুণ বয়স থেকেই আইনস্টাইনের চিন্তাজগতে সহজ ও জটিল—এই দুই বিপরীত গুণের অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছিল, যা অন্য মানুষের ক্ষেত্রে দুর্লভ বললেই চলে। সহজ গুণের জন্যে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত পরিবারদের পারিবারিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, বৃদ্ধা রমণীর অনুরোধে তার খুসীর জন্যে বেহালা বাজাতেন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ ও হাসি ঠাট্টায় যোগ দিতেন। আবার কিছু পরেই জটিল চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতেন চেতনানিরপেক্ষ বিশ্বের ঘটনাবলীর কার্য-কারণের রহস্য নির্ণয় করতে। যে চিন্তায় সৃষ্টি হল 1905 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে অতি জটিল দুর্বোধ্য এবং অতি মাত্রায় বৈপ্লবিক আপেক্ষিকতাবাদ, যে তত্ত্ব দুই শত বছরের অধিককাল বিজ্ঞান জগতে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত নিউটনের বলবিদ্যার

(Newtonian mechanics) ভিত টলিয়ে দিল, নিউটনের তত্ত্বের সংশোধন করল বলা চলে, সেই চিন্তা তিনি শুরু করেন তাঁর ষোল-সতের বছর বয়স থেকে অর্থাৎ জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হবার সময় থেকে।

3

1900 খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে পলিটেকনিকের শেষ পরীক্ষা পাশ করে আইনস্টাইন গ্র্যাজুয়েট হলেন। কেবল মিলেভাকে আরও এক বছর পড়তে হল। পরীক্ষার ফল দেখে বন্ধুরা বিস্মিত হলেন। যে আইনস্টাইনের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল যে কোন ছাত্রের চেয়ে অনেক বেশী এবং এমন কি তাঁদের মতে কোন কোন অধ্যাপকের চেয়েও কম নয়, সেই অসাধারণ মেধাবী আইনস্টাইন সাধারণভাবে পাশ করলেন। এর বোধ হয় দুটি কারণ ছিল—একটি কারণ তাঁর উপরে কয়েকজন অধ্যাপকের বিরূপ মনোভাব এবং অন্যটি হল তিনি পরীক্ষা পাশের জন্যে পড়া কোনদিনই পড়তেন না, পড়তেন নিজের জানবার আগ্রহে।

আইনস্টাইনের ইচ্ছে ছিল পরীক্ষার পরে পলিটেকনিকে পদার্থবিদ্যায় কাজ করবার। কিন্তু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ওয়েবার ছিলেন তাঁর উপরে সব চেয়ে বিরূপ। শোনা যায় যে, কয়েক মাস পরে যখন আইনস্টাইন অনেক চেষ্টা করে একটি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদ পাবার আশা করছিলেন, অধ্যাপক ওয়েবার তা জানতে পেরে গোপন চেষ্টায় সেটি বাতিল করে দিয়েছিলেন। মার্সেল, এহ্রাত প্রভৃতি বন্ধুরা সুইস নাগরিক বলে এবং পরীক্ষায় ভাল করার জন্য পলিটেকনিকে কাজ করবার সুযোগ পেলেন। আইনস্টাইন তখনও সুইস নাগরিক হতে পারেন নি। তিনি 1901 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সুইস নাগরিকত্ব পান। এই সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তাঁর পায়ের শিরা অস্বাভাবিক রকম স্ফীত ও প্রলম্বিত (varicose vein), যার জন্যে সামরিক শিক্ষা থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন।

কলেজের পাঠ শেষ হলে আইনস্টাইন চেষ্টা শুরু করলেন একটি চাকরী পাবার জন্যে। এই সময়েই Capillary Phenomenon বা কৈশিক নল সংক্রান্ত ঘটনার উপরে তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত

হয়। এরপর Thermodynamics বা তাপগতিবিদ্যার উপর কিছু লেখা বের হয়। তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল শিক্ষক হবার। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষাদানকে তিনি জীবনের ব্রত করবেন ঠিক করেছিলেন। তাই জুরিখের ও তার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দরখাস্ত পাঠাতে লাগলেন। দিনের পর দিন চলে গেল, কিন্তু কোথা থেকেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন চেষ্টা শুরু হল সরকারী, বেসরকারী অফিসে যে-কোন একটি কাজের জন্যে। জুরিখে চাকরি পাবার সব চেষ্টাই নিস্ফল হল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে দিন কয়েকের জন্যে একটি ছাত্রকে পরীক্ষার পড়া তৈরি করে দেবার জন্যে গৃহশিক্ষকের কাজ পেলেন। পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কাজের শেষ হল। তিনি কিছুদিনের জন্যে মিলানে গেলেন। সেখানে খবর পেলেন যে, দু-মাসের জন্যে অর্থাৎ 1901 খ্রীস্টাব্দের 15ই মে থেকে 15ই জুলাই পর্যন্ত উইনটেরথার (Winterthur) সহরের টেকনিকাল স্কুলে শিক্ষকের কাজ পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কেমন করে তিনি এই কাজটি পেলেন, কে তাঁর নাম স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছেন। আর্থার বেখার্ডের (Arthur Beckhurd) লেখা আইনস্টাইনের জীবনী থেকে জানা যায় যে, ফ্রেডারিক অ্যাডলার ঐ চাকরী স্থায়ীভাবে পেয়েছিলেন। তাঁকে সুইৎজারল্যাণ্ডের নিয়মানুযায়ী দু-মাসের জন্যে সামরিক শিক্ষায় যেতে হয়। তখন তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ দু-মাসের জন্য আইনস্টাইনকে চাকরীটি দেবার সুপারিশ করেছিলেন। বন্ধু আইনস্টাইনের পাণ্ডিত্যের উপর অ্যাডলারের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ভবিষ্যতেও জুরিখের পলিটেকনিকে অধ্যাপকের পদ থেকে তিনি নিজে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন আইনস্টাইনকে ঐ পদটি দেবার জন্যে।

মাত্র দু-মাসের জন্যে অস্থায়ী চাকরীটি পেয়ে আইনস্টাইন খুব খুশী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন বাধাবিপত্তি কোনদিনই আইনস্টাইনের চিত্তকে দমন করতে পারে নি। তিনি কোন শোকে কি দুঃখে অভিভূত হতেন না। কোনদিন হিসেব করেন নি কি পেলেন আর কি না পেলেন। সামান্য কিছু পেলেই খুসী হতেন। না-পাওয়ার বেদনায় কোনদিন মুষড়ে পড়েন নি।

4

উইনটেরথার বিদ্যালয়টি ছিল গরীব ছেলেদের কার্যকরী বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যে। ঐ সব ছেলেদের শিক্ষার মানও উঁচু ছিল না। ছাত্রেরা শৃঙ্খলার বিশেষ ধার ধারত না। ক্লাশে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হত। বেখার্ড আইনস্টাইনের শিক্ষকজীবনের প্রথম দিনটির সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম দিন ক্লাশ শুরু হবার আধ ঘণ্টা আগে আইনস্টাইন ক্লাশে গিয়ে বোর্ডে একটি অঙ্কের সূত্র লিখতে লাগলেন। সাড়ে আটটায় ছাত্রেরা বাঁধভাঙা জলের মত হুড়মুড় করে ক্লাশে ঢুকে গান গাইতে গাইতে, চীৎকার করতে করতে যে যার জায়গায় বসতে লাগল। আইনস্টাইন অবিচল চিত্তে ছাত্রদের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডে লিখে যেতে লাগলেন। ছাত্রেরা কাগজের গুলি পাকিয়ে এ ওর দিকে ছুড়তে লাগল। আইনস্টাইন যখন বুঝলেন যে, সবাই যে যার জায়গায় বসেছে, হঠাৎ তাদের দিকে ঘুরে দু-হাত উঁচু করে সবাইকে চুপ করতে বললেন। কিছুক্ষণের জন্যে ছাত্রেরা চুপ করে গেল। তখন তিনি তাঁর নাম বলে বললেন যে, তিনি তাদের নূতন শিক্ষক। ছাত্রদের ভিতরে আবার গোলমাল শুরু হল। কেউ শিস্ দিতে লাগল, কেউ কেউ 'আইনস্টাইন', 'আইনস্টাইন' বলে সুর ধরে গাইতে লাগল। আইনস্টাইন তখন পিছন ফিরে বোর্ডে লিখলেন যে, যারা তাঁর কাছে পড়তে চায় না, তারা বাড়ী যেতে পারে। এতে বিশেষ কাজ হল। ছাত্রেরা কিছুটা চুপ করল। একটু মৃদু গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন যে, অভিভাবকেরা তাদেরকে পয়সা খরচ করে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন কিছু একটি কাজ শিখে অর্থোপার্জন করতে। কিন্তু কেউ কেউ যদি লেখাপড়া না করতে চায়, তবে চলে যেতে পারে। তিনি থাকবেনই কারণ তিনি বিদ্যালয় থেকে মাইনে পাবেন। কেউ যদি পড়তে না চায়, তিনি কোনরূপ শাস্তি দিবেন না বা লেখাপড়া করার জন্যে জোর কিংবা চাপ দিবেন না। তিনি এই সব শাস্তিতে বিশ্বাস করেন না। কারণ স্কুলে ছাত্রজীবনে ঐরূপ শাস্তি দিয়ে লেখাপড়ার পদ্ধতির জন্যে নিজে অনেক ভুগেছেন। এতে খুবই কাজ হল। ছাত্রেরা সবই শান্ত হয়ে গেল। আইনস্টাইন পড়াতে লাগলেন। তিনি ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠলেন। এইভাবেই শিক্ষকজীবনের প্রথম দিনটিতেই তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করলেন এবং নিজেও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন।

ছ-মাস শেষ হয়ে গেলে তিনি জুরিখে ফিরে এলেন। আবার সেই বেকার সমস্যা। এদিকে আইনস্টাইন ও মিলেভা ছু-জনেই তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে আগ্রহান্বিত। মিলেভা প্রস্তাব করলেন যে, আইনস্টাইন যেহেতু চাকরী পাচ্ছেন না এবং মিলেভার পক্ষে হয়ত চাকরী পাওনা কঠিন হবে না হয় জুরিখে কিংবা সার্বিয়াতে, সে অবস্থায় মিলেভা নিজে একটি চাকরী যোগাড় করে নেবেন যেখানেই হোক এবং ছু'জনে বিয়ে করে মিলেভার কার্যস্থলে যাবেন। এতে যদি আইনস্টাইন রাজী না থাকেন, তবে আর বিয়ের প্রয়োজন নেই, মিলেভা দেশে ফিরে যাবেন। আইনস্টাইন ও তাঁর বন্ধুরা মিলেভাকে বুঝিয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজী করালেন। কিছুদিন পরে মার্সেল আইনস্টাইনকে সঙ্কোচের সঙ্গে একটি চাকরীর কথা উল্লেখ করলেন। সঙ্কোচ এই জন্যে যে, সেটি শিক্ষকতার কাজ নয় এবং আইনস্টাইনের পাণ্ডিত্যের তুলনায় কিছুই নয়। এ কাজটি হল সুইৎজারল্যাণ্ডের বার্ণ (Bern) সহরের পেটেণ্ট (Patent) অফিসে একটি সামান্য পেটেণ্ট পরীক্ষকের কাজ, মাইনেও সেরূপ নয়। মার্সেলের বাবা ঐ অফিসের কর্মকর্তার বন্ধু। তাঁর বাবার অনুরোধে হয়ত আইনস্টাইন কাজটি পেতে পারেন। আইনস্টাইন বন্ধুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললেন যে, সামান্য কি অসামান্য তিনি তার মূল্য যাচাই করবেন না, তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের কদরও এতদিন খুব দেখেছেন, যা পাবেন তাই তাঁর কাছে মহামূল্যবান।

আইনস্টাইন বার্ণের অফিসের কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি ছু-একটি প্রশ্ন করে আইনস্টাইনকে ঐ চাকরীর জন্যে মনোনীত করলেন। আইনস্টাইন জুরিখে ফিরে এলেন।

বন্ধুরা সবাই খুসী হলেন। বন্ধুরা তাঁদের প্রিয় সুদর্শন আইনস্টাইনকে তাঁর পাণ্ডিত্য, শিশুর মত সরল ব্যবহার ও আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও হাসি-খুসী ভাবের জন্যে খুবই ভালবাসতেন। এই সময়ে আইনস্টাইনের দেহের গঠন সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি; চওড়া কাঁধ; মাথার খুলি কিছুটা ছোট কিন্তু অদ্ভুত চওড়া; গায়ের রঙ কিছুটা মলিন; ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ, নাক তীক্ষ্ণ ও খাড়া, বাদামী রঙের ছুই চোখের গভীর দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সরল; গলার স্বর সেলো (cello) বাজনার মত গম্ভীর ও মধুর।

জীবনের প্রথম ও প্রধান সমস্যা জীবিকার্জন। তার সমাধান হল, মাইনে আশানুরূপ না হলেও। হেরম্যানের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ছেলে বড় বিজ্ঞানী হবে। যাহোক, ছেলের একটি স্থায়ী চাকরী হল জেনে বাবা ও মা আনন্দিত হলেন। এখন দ্বিতীয় সমস্যা হল মিলেভাকে বিয়ে করা। এর পূর্বে আইনস্টাইন মিলানে মার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। যদিও প্রথমবার এই বিয়েতে মার অমত ছিল, কিন্তু এই আলোচনাতে মিলেভাকে বিয়ে করবার জন্যে ছেলের অত ইচ্ছা দেখে আর অমত করলেন না। আইনস্টাইন জুরিখ থেকে বাবার সম্মতির জন্যে চিঠি লিখলেন। তিনি মার্সেলকে বললেন যে, সম্মতি পেলে এক শনিবার বিয়ের দিন ঠিক করতে হবে, যাতে অ্যাডলার উইনটেরথার থেকে জুরিখে এসে বিয়েতে বেস্ট ম্যান হতে পারেন ও সোমবার সকালে উইনটেরথারে গিয়ে ক্লাস নিতে পারেন এবং মার্সেলকে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে।

কিন্তু বাবার সম্মতি তখনও পাওয়া গেল না এবং বাবার অমতে আইনস্টাইন বিয়ে করবেন না বলে বিয়ে জুরিখে হল না। 1902 খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে আইনস্টাইনকে বার্ণে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হল। ইতিমধ্যে হেরম্যান বুঝতে পারলেন যে, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে তিনি ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি ছেলেকে আর নিরাশ করতে চাইলেন না। তিনি সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন। মহানন্দে বার্ণে একটি রেস্তোরাঁতে 1903 খ্রীঃ 6ই জানুয়ারী এই বিয়ে সম্পন্ন হল। আইনস্টাইন বার্ণের নতুন বন্ধুদেরকে রেস্তোরাঁতে আদর আপ্যায়ন করলেন ও খাওয়ালেন। বিয়ের পরে এই নূতন সুখী দম্পতি রেস্তোরাঁ থেকে হেঁটে ফ্ল্যাট বাড়ীতে ফিরলেন। ফ্লাটের তালা খুলতে গিয়ে আইনস্টাইন কিছুতেই চাবিটা পেলেন না। শেষে তিনি স্বীকার করলেন যে, চাবিটি কোথাও হারিয়েছেন। গম্ভীর প্রকৃতির মিলেভা তাঁর পূর্বতন সহপাঠীর ও বর্তমানে স্বামীর ভোলা মনের বিষয় আগেই অবহিত ছিলেন বলে তিনি বিস্মিত হলেন না।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আইনস্টাইনের অন্যমনস্কতার ব্যাপার নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্পের প্রচলন আছে। তার মধ্যে একটি হল যে, তিনি একবার কোন সহরে বাসে যাবার সময় কণ্ডাক্টরকে একটি পুরো মুদ্রা দিলেন। কণ্ডাক্টর টিকিট ও বাকী চেঞ্জ তাঁকে ফেরৎ দিলে, তিনি কিছুতেই হিসেব

মিলাতে পারছিলেন না বলে কণ্ডাক্টরকে বললেন যে, চেঞ্জ কম হয়েছে। তখন কণ্ডাক্টর তাঁর হাত থেকে চেঞ্জগুলি নিয়ে এক দুই করে হিসেব করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, চেঞ্জ ঠিক আছে। কণ্ডাক্টর আইনস্টাইনকে চিনতেন না। চেঞ্জগুলি বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি অঙ্কে কাঁচা।' আইনস্টাইন নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে একটু মৃদু হেসে চেঞ্জগুলি পকেটে রাখলেন। এই ঘটনাটিকে কৌতুক করে বলা হয়, "The greatest mathematician is weak in arithmetic."

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বার্ণ

1

পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনস্টাইন 1902 খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে বার্ণের পেটেন্ট অফিসে কাজে যোগ দিলেন। তাঁর মাইনে হল বছরে 3500 ফ্রাঁ। তিনি বাস করবার জন্য একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। পেটেন্ট অফিসের কাজ হল যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর আবিষ্কৃত কোন যন্ত্রের এক-চেটিয়া অধিকারের সরকারী সনদ পেতে চান, তবে তাঁকে ঐ যন্ত্রের কলা-কৌশল প্রণালী লিপিবদ্ধ করে একটি দরখাস্ত পেটেন্ট অফিসে পাঠাতে হবে। এই যান্ত্রিক আবিষ্কারের বেশ কিছু সত্যই প্রশংসার যোগ্য, মানুষের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করবার যোগ্য, আবার বেশ কিছু হয়ত খামখেয়ালী মানুষের আজগুবী ও উদ্ভট কল্পনা, যার কোন বিশেষ মানে হয় না। আইন-স্টাইনের কাজ হল এইসব দরখাস্ত পরীক্ষা করে দেখা, পূর্বে এইরূপ কোন যন্ত্রের পেটেন্ট কেউ নিয়েছেন কিনা, তারপর যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্ণ বিবরণী পেশ করা। এই সব কাজ আইনস্টাইনের ভাল লাগায় তিনি আগ্রহের সঙ্গে এই কাজগুলি করতেন। এই কাজে তাঁর বেশী সময় লাগতো না বলে তাঁর হাতে বেশ সময় থাকতো। তিনি এই বাকী সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত করলেন, যার ফলে মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন কয়েকটি তত্ত্ব ও মতবাদ। কিন্তু প্রত্যেকটি আবিষ্কার যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক। অনেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর মতে তিনি যদি শুধু এর একটি মাত্র আবিষ্কার করতেন, তাহলে তাতেই বিজ্ঞান জগতে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় ও অমর হয়ে থাকত। এগুলি হল—ব্রাউনীয় বিচলনের (Brownian Movement) ব্যাখ্যা; আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব (Photo-Electric Effect) এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (Special Theory of Relativity)। এগুলি সম্বন্ধে উদাহরণসমেত আলোচনা শেষের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনস্টাইন পেটেন্ট অফিসের কাজ সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—"যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে

সেগুলির সম্বন্ধে ঠিকমত বিবরণী লেখাটা আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ মনে হত, কারণ এর জন্য পদার্থবিদ্যার নানা বিষয়ে ভাববার সুযোগ হত। তা ছাড়া ব্যবহারিক বৃত্তি আমার মত লোকের পক্ষে মুক্তির উপায় হয়েছিল। শিক্ষাবৃত্তিধারী বেশীর ভাগ যুবকই বৈজ্ঞানিক চিন্তার শুধু ভাসা-ভাসা বিশ্লেষক হন। কেবলমাত্র অটল, দৃঢ়নিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌রাই এই প্রলোভন ত্যাগ করে চিন্তার গভীরে যেতে পারেন।"

এখানে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ব্যবহারিক বৃত্তিতে বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতী বিজ্ঞানী খুবই বিরল। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার হয়েছে সেই সব গবেষকের দ্বারা, যাঁরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তবে আইনস্টাইনের তুলনা বিরল। তাঁর মত চিন্তাশীল মানুষ—যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, চেতনা-নিরপেক্ষ জগতের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে পারেন, তাঁর পক্ষে জীবিকার্জনের বৃত্তি উপলক্ষ মাত্র। বিশেষ করে বার্ণের মত জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি গবেষণাগার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আইনস্টাইনের পক্ষে বিজ্ঞানের চিন্তায় মনোনিবেশ করা সহজ হয়েছিল। তাই বোধ হয় তিনি জীবনের শেষে বিচার করে ভেবে বলেছেন যে, বার্ণের কাজ তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে।

আইনস্টাইন শুধু যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ আকৃতি জানবার জন্য কিংবা পদার্থ-বিদ্যার তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য গভীর চিন্তা করতেন, তা নয়। তাঁর প্রযুক্তি-বিদ্যাতেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। বার্ণে তাঁর এক বন্ধুর ভাই পল হাবিখ্‌তের (Paul Habicht) বৈদ্যুতিক পরিমাপ যন্ত্রের (measuring instruments) কারখানা ছিল। 1908 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন পলের সহযোগে অতি ক্ষুদ্র মানের, যেমন 0.0005 ভোল্ট, বৈদ্যুতিক বিভব (electrical potential) পরিমাপ করবার যন্ত্র তৈরি করলেন। এত ক্ষুদ্র মানের বিভব মাপবার যন্ত্র তৈরি করা বিশেষ কৃতিত্বের কথা। 1910 খ্রীস্টাব্দে তাঁরা দু-জনে 'আইনস্টাইন-হাবিখ্‌ৎ বিভব বর্ধনকারী' যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ভবিষ্যৎ জীবনেও তিনি নানাপ্রকার যন্ত্রের প্রস্তুতি-প্রণালী উদ্ভাবন করেন।

2

বার্ণে এসে তাঁর আয় বাড়বার জন্য বাড়তি সময়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করলেন। এর জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন।

অল্প কয়েকজন উৎসুক ছাত্র এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মরিস সোলোভিন (Maurise Solvine) বলে রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। সোলোভিন তখন বার্ণের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। পদার্থবিদ্যা তাঁর পাঠ্য বিষয় না হলেও তিনি আইনস্টাইনের কাছে এই বিষয়ে শিক্ষা নিতে উৎসুক হলেন। সোলোভিনের সঙ্গে আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় এবং এই বন্ধুত্ব আইনস্টাইনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কার্যোপলক্ষে সোলোভিনকে 1905 খ্রীস্টাব্দে বার্ণ থেকে চলে যেতে হলেও দু-জনের ভিতরে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হত। 1955 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর 1956 খ্রীস্টাব্দে সোলোভিন আইনস্টাইনের স্মৃতি সম্বন্ধে ও তাঁর কাছে লেখা আইনস্টাইনের চিঠিপত্রসমেত একটি বই প্রকাশ করেন। এই সব চিঠিপত্রে আইনস্টাইনের নানা দিকের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে কনরাড হাবিখ্‌ৎ (Conrad Habicht) বার্ণে গণিতে উচ্চশিক্ষার জন্য এলেন। তিনিও আইনস্টাইনের কাছে পদার্থবিদ্যা শিখতে শুরু করলেন এবং অল্পকালের ভিতরেই তিনি আইনস্টাইন ও সোলোভিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন।

এই তিনজনের চিন্তাধারায় অনেক মিল ছিল বলে তাঁদের মধ্যে একটি প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠল। প্রতিদিন আইনস্টাইনের অফিস ঘরেই কাজের শেষে শিক্ষাদান চলত এবং প্রতিদিনের বিষয় শেষ হলে অনেক সময় ধরে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলত। কোন কোন দিন আলোচনা চলত স্পিনোজা ও হিউমের দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে, কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এর্ণষ্ট মাখের (Earnst Mach) লেখা নূতন বইয়ের সম্বন্ধে, আবার কোন কোন দিন অন্যান্য বিষয় নিয়ে। আলোচনার শেষে তাঁরা তিনজনেই পায়ে হেঁটে যেতেন তাঁদের যে কোন একজনের ফ্ল্যাটে। সেখানে তাঁরা একসঙ্গেই রাতের খাবার যা পেতেন খেতেন ও অনেক রাত অবধি আবার পাঠ ও আলো চনা করতেন।

এই তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁদের মিলনকে নাম দিলেন "অলিম্পিক অ্যাকাডেমী" (Olympic Academy)। এটি স্থায়ী ছিল 1905 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন সোলোভিন ও হাবিখ্‌ৎ বার্ণ থেকে অন্যত্র চলে যান। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে আইনস্টাইন সোলোভিনকে এই 'অলিম্পিক অ্যাকাডেমী' সম্বন্ধে লেখেন,

"Immortal Olympian Academy,

In your short life time you took childish joy in clarity and reason. Your members founded you to make fun of your cumbrous, pompous old sisters. How right we were, has been made clear to me in the course of many years of direct observation. Your three members stand fast as ever. They have faded somewhat, but your pure, vivifying light continues to illumine them in their solitude, for you have not aged like overgrown lettuce with them.

To you our fidelity and devotion to the last highly enlightened breath !

Your now only corresponding member,

A.E.

Princeton, 3.IV.53.

এই লেখাতে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আইনস্টাইনের মনের বিষণ্ণতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বহু জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে এসে ও বহুজনের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনার শেষে তাঁর বার্ণের ঐ সহজ স্বাধীন কয়েকটি বছরের কথা খুব মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল বড় বড় সভা, সমিতি, আলোচনা-চক্রের আড়ম্বরপূর্ণ ও বাহ্যিক সৌজন্য প্রদর্শনের তুলনায় কত সরল ছিল ঐ জীবন ও ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হত কত সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্ভূত তত্ত্বগুলির জন্যেই অজ্ঞাত, অখ্যাত একজন কেরাণী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আজকের পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। 'Cumbrous, pompous, old sisters' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, যেমন প্রাগ, জুরিখ, বার্লিন ইত্যাদি। অমর 'অলিম্পিক অ্যাকাডেমীর' প্রতিষ্ঠাতা তিন সদস্যই যদিও তখনও অবিচল, কিন্তু কিছুটা নিষ্প্রভ (বোধ হয় মনে করেছেন বার্ধক্যের হেতু)। অথচ অ্যাকাডেমীর পবিত্র ও জীবন সঞ্চারকারী আলো তখন পর্যন্ত সদস্যত্রয়ের নিঃসঙ্গতাকে আলোকিত করছে, কারণ অমর অ্যাকাডেমী

চিরযৌবনা, সদস্যত্রয়ের মত বার্ধক্যের হেতু রসস্রাবী শাক লেটুসের মত তার রস নিঙড়ে যাবে না।

3

1903 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমে মিলেভা বার্ণে এলেন। 6ই জানুয়ারী আইনস্টাইনের সঙ্গে মিলেভার বিয়ে হল এক রেস্তোরাঁতে। আইনস্টাইন ও মিলেভা সংসার পাতলেন। বন্ধুরা অবশ্য পূর্বের মতই মিলতে লাগলেন ও আলোচনা-চক্র চলতে লাগল। মিলেভা নীরবে সব আলোচনা শুনে যেতেন ও সবার জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম আইনস্টাইন ও মিলেভা দু-জনেই খুব খুসী হয়েছিলেন। কয়েক বছর প্রতীক্ষার পর এই মিলন তাঁদের কাছে মধুর মনে হল। মাঝে মাঝে আইনস্টাইন তাঁর মনের চিন্তাধারা মিলেভার সঙ্গে আলোচনা করতেন। আইনস্টাইনের আয় সামান্য, তা সত্ত্বেও মিলেভা বুদ্ধিমতী গৃহিণীর মত সংসার চালাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সংসারের আয় বাড়াবার জন্য মিলেভা আইনস্টাইনের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন বিদ্যালয়ে একটি চাকরীর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু 1904 খ্রীস্টাব্দে মিলেভার প্রথম ছেলের জন্ম হওয়ায় চাকরীর চেষ্টা বন্ধ করতে হল। ছেলের নাম রাখা হল হান্স অ্যালবার্ট (Hans Albert)। হান্স জুরিখে লেখাপড়া করেছিলেন এবং 1937 খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔদক (Hydraulic) বিষয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

ছেলে হওয়ায় সংসারের খরচ বাড়ল। কিন্তু আইনস্টাইনের কোন চিন্তাভাবনা নেই। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে যে মধুর সম্পর্ক ছিল, তা কমতে আরম্ভ করল। মিলেভা সব সময় ছেলেকে নিয়ে মেতে থাকতেন। সংসারের অভাব-অনটন মেটাতে গিয়ে তাঁর মেজাজ খিট্‌খিটে হল। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, মিলভা ক্রমশঃই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আইনস্টাইনও আস্তে আস্তে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অফিসে ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অধিক সময় কাটাতে লাগলেন।

সোলোভিন তাঁর বইয়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা তিন বন্ধুতে মাঝে মাঝে মনের সাধ মিটিয়ে অলোচনা ও সেই সঙ্গে ধূমপানের

পর আইনস্টাইনের বেহালা বাজনা শুনতেন কিংবা রাত্রিতেই বেরিয়ে পড়তেন দীর্ঘ হাঁটাপথে আলোচনা করতে করতে। একদিন মাঝরাতে তাঁরা বার্নের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত গার্ডেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। তারকাখচিত আকাশ তাঁদের চিন্তাকে নিয়ে গেল জ্যোতিবিদ্যায়। তাঁরা সমস্ত রাত সেখানে থেকে ভোলবেলার সূর্যোদয় দেখলেন। উষার প্রথম আলো দিক্‌চক্রবালের আড়াল থেকে অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য আল্পস পর্বতের চূড়ায় অপূর্ব রঙের খেলা দেখাল, ক্রমশঃ সূর্য আড়াল থেকে প্রকাশ পেতে লাগল এবং চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল দিগন্তবিস্তৃত বিশাল পার্বত্যভূমি। তিন বন্ধু একটি রেস্তোরাঁতে কফি পান করে বেলা প্রায় 9টায় নীচে নেমে এলেন, যদিও রাত্রি জাগরণে কিছুটা ক্লান্ত, কিন্তু মনে স্ফূর্তি ছিল খুব। কখনও কখনও তাঁরা সকাল 6টায় হাঁটা আরম্ভ করে প্রায় 30 কি.মি. দূরে অবস্থিত তুন সহরে পৌঁছতেন দুপুর-বেলায়। চারিদিকে আল্পস পাহাড় ঘেরা জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি, ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করতেন। তুনে তাঁরা লাঞ্চ খেয়ে, সমস্ত দিন হ্রদের তীরে কাটিয়ে, সন্ধ্যেবেলায় ট্রেনে বাড়ী ফিরতেন।

আলোচনার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে সোলোভিন লিখেছেন যে, আইনস্টাইন ধীরে, সমস্বরে কথা বলতেন, মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে চিন্তায় নীরব হয়ে যেতেন এবং প্রায়ই নিজের চারপাশের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন।

সোলোভিন কতকগুলি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেছেন, যার থেকে একটি এখানে লেখা হল। বার্নে প্রায়ই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞেরা আসতেন এবং বন্ধুরা সাধারণতঃ ঐ সব সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনতে যেতেন। একবার একটি চেক ঐকতান-বাদন দল (symphony orchestra) বার্নে এলে সোলোভিন প্রস্তাব করলেন যে, সবাই মিলে ঐ সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাবেন। ঐ সময় আইনস্টাইন বন্ধুদের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন, যার জন্য আইনস্টাইন বললেন যে, সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাবার পরিবর্তে সবাই সোলোভিনের গৃহে উপস্থিত হবেন। কিন্তু পরদিন সোলোভিনের অন্য এক বন্ধু তাঁকে ঐ অনুষ্ঠানে যাবার একটি টিকিট দিয়েছিলেন বলে তিনি একলাই ঐ সঙ্গীতা-

নুষ্ঠানে যাবার সঙ্কল্প করলেন, কারণ সোলোভিন নিজে খুবই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি যাবার আগে বন্ধুদের জন্য তাঁদের প্রিয় কড়া ডিম সিদ্ধ দিয়ে রাতের খাবার তৈরি করে ঘরে রেখে গেলেন এবং সঙ্গে ল্যাটিনে লেখা এক লাইন "Amicis carrissimis ova dura et salutation" (প্রিয় বন্ধুদের জন্যে, কড়া ডিম সিদ্ধ ও নমস্কার)। আইনস্টাইন ও হাবিখ্‌ৎ ঠিকই এসেছিলেন; তৃপ্তি করে খাবার খেয়ে, প্রাণভরে ধূমপান করে ঘর ধোঁয়ার ভরিয়ে দিয়ে যাবার আগে ল্যাটিনে এক লাইন "Amica carrissimo fumum spissum et salutation" (একজন প্রিয় বন্ধুর জন্যে, অনেক ধোঁয়া ও নমস্কার) লিখে রেখে গেলেন।

পরদিন সকালে আইনস্টাইন মুখে একটি কৃত্রিম ও কঠোর ভ্রূকুটি ভাব এনে সোলোভিনের ফ্ল্যাটে এসে সোলোভিনকে সম্বোধন করে কপট ক্রোধে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, "রে হতভাগা! কী দুঃসাহসে তুই আমাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তত্ত্বমূলক আলোচনার বদলে বেহালা বাজনা শুনিতে গিয়াছিলি? যে বর্বর ও মূর্খ! ফের যদি এইরূপ আর একবার পলায়ন করিস, তোকে আমরা অ্যাকাডেমী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" এইরূপ হাস্য-পরিহাসের পরে আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে হিউমের (Hume) লেখা নিয়ে সমস্ত দিন আলোচনার শেষে মধ্যরাতের অনেক পরে বাড়ী ফিরলেন। এখানে অ্যাকাডেমী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন "অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমী"।

এর থেকে আইনস্টাইনের দুটি পাশাপাশি দিক বোঝা সহজ হয়। তিনি যে সময় বন্ধুদের সঙ্গে ঐরূপ হাস্য-পরিহাস করছেন, হয়ত ঠিক সেই সময় তাঁর মনে জটিল আপেক্ষিকতাবাদের দানা বাঁধছে। যে সময় তিনি বিশ্বের বাস্তব রূপ, নিউটন প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের মহাকাশ ও সময়ের (space and time), অসীমতার (infinity) ও অনন্যগতর (independence) ধারণা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তার খণ্ডনের এবং এইরূপ আরও দুর্বোধ্য ও বিমূর্ত (abstract) তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা করছেন, সেই একই সময় বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করে সারা রাত বাইরে কাটানো, কি ঠাট্টা-তামাসা করা—কোন মানুষের মনে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের সহাবস্থান, এটি কল্পনার অতীত।

4

1904 খ্রীস্টাব্দে মাইকেল এঞ্জেলো বেসো (Michele Angelo Besso) নামে একজন ইতালীয় ইঞ্জিনীয়ার বার্ণে এলেন। তাঁর স্ত্রী হলেন আরাউয়ের অধ্যাপক উইন টেলারের মেয়ে আনা, যাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের আরাউ থাকতে খুবই আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। আইনস্টাইনের সাহায্যে বেসো বার্ণের পেটেন্ট অফিসে একটি চাকরী পেলেন। বেসোকে নিয়ে আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা হল চার। বেসোর পদার্থবিদ্যায়, গণিতে, কারিগরিবিদ্যায়, দর্শনশাস্ত্রে ও সমাজ-বিজ্ঞানে বেশ ভাল জ্ঞান ছিল বলে আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন ও কাজের শেষে আলোচনা করতে করতে বাড়ীতে ফিরতেন। বেসোর মনে নানারূপ নূতন নূতন কল্পনার উদয় হত। এজন্য আইনস্টাইনের কিছুটা উপকার হয়েছিল। বেসো এক জায়গায় বলেছেন, “Einstein, the eagle, carried me, the sparrow, to lofty heights. Up there the sparrow could flutter a little higher.” বেসো নিজেকে ক্ষুদ্র চড়ুই পাখী ও আইনস্টাইনকে শক্তিশালী ঈগলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঈগল উড়তে পারে অনেক উঁচুতে আর চড়ুই পাখী অল্প উঁচুতে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে ওড়ে। তাই বেসো বলেছেন যে, আইনস্টাইন তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্যে অনেক জটিল তত্ত্বে চলে যেতেন। আর সেই সব আলোচনা বেসো যখন বুঝতেন, তখন হয়ত আরও কিছুটা কল্পনা দিয়ে আইনস্টাইনের কল্পনাকে বাড়াতে চেষ্টা করতেন।

এখানে বেসো উল্লেখ করেছেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতবাদের কল্পনার প্রথম মৌখিক প্রকাশ ও আলোচনা। বেসো এই কল্পনার তাৎপর্যে ও অসাধারণত্বে বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞানে এক নূতন যুগের সুচনা হতে চলেছে। এই সময়ে তাঁদের এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় বেসো কয়েকটি নূতন কল্পনা উত্থাপিত করেছিলেন, যেগুলি আইনস্টাইনের বেশ পছন্দ হয়েছিল। ভবিষ্যতে আইনস্টাইন “On the Electrodynamics of Moving Bodies” (চলন্ত বস্তুর বিদ্যুৎ-গতিবিদ্যা) নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছেন, “I should like to note in conclusion that my friend and colleague M. Besso was my devoted assistant in the elaboration of the questions herein and I am indebted

to him for a number of valuable suggestions.” তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বেসো অনেকগুলি মূল্যবান ধারণা দিয়ে ঐ প্রবন্ধে উত্থাপিত সমস্যাকে বিশদভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিলেন। এই প্রবন্ধই আইনস্টাইনের ‘Special Theory of Relativity’ বা ‘বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের’ অন্তর্নিহিত ভাবের প্রথম প্রকাশ এবং মহাকাশ ও কালের প্রচলিত মূল ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্ণষ্ট মাখের লেখা বিখ্যাত ‘বলবিদ্যার ইতিহাস’ (History of Mechanics) পড়ে আইনস্টাইন গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসা অনেক বেড়ে যায়, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে আপেক্ষিকতাবাদ।

আইনস্টাইন তরুণ বয়স থেকে অনেক বছর মাখের বৈজ্ঞানিক যুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মাখের দার্শনিকমতবাদের বিরূপ সমালোচক ছিলেন। কারণ তাঁর মতে মাখের দার্শনিক মতবাদ ছিল প্রত্যক্ষবাদ (positivism) এবং এই মতবাদ ও মাখের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ছিল পরস্পর বিরোধী। মাখ তাঁর বই ‘বলবিদ্যার ইতিহাসে’ নিউটনের কতকগুলি সিদ্ধান্তকে বিশেষ করে absolute space বা মহাকাশ অনন্ত ও মৌলিক, যা পরনির্ভর নয়—এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন।

5

এখানে মহাকাশ ও সময় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। নিউটনের ধারণা ছিল যে, মহাকাশ ও সময় হল মৌলিক (fundamental)। সাধারণ বুদ্ধিতেও এটিই উপলব্ধ হয়। এটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয় যে, মহাকাশ মৌলিক এবং কারোর উপর এর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আমরা চিন্তায় ধারণা করতে পারি একটি সম্পূর্ণ শূন্য মহাকাশের অস্তিত্ব এবং এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, এই অসীম ও শূন্য মহাকাশে কোন বস্তু থাকা বা না থাকা অবান্তর, বস্তুর অস্তিত্বে মহাকাশের কোন তারতম্য হয় না। আমাদের কল্পনায় এই বাস্তব বা বস্তু দিয়ে গড়া বিশ্বের আবির্ভাবের পূর্বে মহাকাশ যেমন ছিল, এই বাস্তব বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মহাকাশ তেমনই থাকবে, তার

কোনই পরিবর্তন হবে না। এই মহাশূন্য বা মহাকাশ বাস্তব বিশ্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন।

ঠিক তেমনিই ধারণা সময় নিয়েও। সময় বলতে আমরা কি বুঝি? কোন ঘটনার (event) সূচনাকে বা প্রকাশকে আমরা সময় দিয়ে পরিমাপ করি। আমাদের সময়ের জ্ঞান বা হিসেব কোন ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। সূর্য উদয় হল, সূর্য অস্ত গেল—আমরা দিনের হিসেব পাই। রোজ রাতে চাঁদের দেহের পরিবর্তন দেখে আমরা তিথির হিসেব পাই। ঘড়ির দোলকের (pendulum) নিয়মিত গতি বা টিক টিক আওয়াজ সময়ের হিসেব দেয়, যে সময় পৃথিবীর ঘূর্ণনের উপর নির্ভর করে। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা সবই ঘটনা-নির্ভর। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় সময়ের স্রোত অনন্ত কাল ধরে বয়ে এসেছে, অনন্ত কাল ধরে চলবে, কোন ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক। কল্পনা করা যাক যে, মহাকাশে কোন বস্তু নেই এবং কখনও কোন ঘটনার অস্তিত্ব নেই, তা হলে মহাকাশকে যেমন মনে হবে অনন্ত ও মৌলিক, সময়কেও তাই। অনন্ত মহাকাশের মত অনন্ত মহাকাল।

কিন্তু সত্যই কি তাই? এই মহাকাশের ও সময়ের অস্তিত্ব কি সম্পূর্ণভাবে অন্যের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ? যদি মহাকাশ না থাকত, তবে সময়কে কি কল্পনা করা যেত? যদি মহাকাশ একটি বিন্দুতে এসে পরিণত হয়, তা হলেও কি সময়ের অস্তিত্ব থাকবে? যদিও এর উত্তর সহজে পাওয়া যায় না, তবে কিছুটা মনে যেন কোথাও সময় ও মহাকাশের সংযোগ আছে এবং তা পরস্পর নির্ভরশীল। যা হোক, নিউটন মনে করতেন যে, মহাকাশ ও সময় পরস্পর নিরপেক্ষ এবং এদের অস্তিত্ব মৌলিক ও অনন্ত।

তৃতীয় বিষয় হল বস্তু। তবে এটি সম্পূর্ণভাবে পরনিরপেক্ষ নয়। মহাকাশের কোন স্থান অধিকার করে নেই কিংবা কোন সময়ে তার অস্তিত্ব ছিল না, এরূপ কোন বস্তু আমরা কল্পনা করতে পারি না। বস্তুর অস্তিত্বের জন্যে মহাকাশ ও সময় উভয়েরই অতি প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুর সত্তা পৃথক, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে মহাকাশ ও সময় থেকে আলাদা। এটি যেন একটি বাইরের কিছু, যেটিকে মহাকাশ ও সময়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি নিয়েই বিজ্ঞানীরা বাস্তব বিশ্বতনুর গঠনের কথা ভেবেছেন। আপেক্ষিকতা-বাদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন যে, বিশ্ব হল বস্তু দিয়ে

গড়া মৌলিক মহাকাশে ও মৌলিক সময়ে চলমান জগৎ। বস্তুর ভর বা পদার্থের পরিমাণের বিষয়ে ধারণা ছিল যে, সব সময় এই পরিমাণ একই মানের থাকবে, কখনও কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের এক অনুসিদ্ধান্তে বললেন যে, চলমান বস্তুর ভর বেড়ে যাবে।

নিউটন প্রকৃতিকে একটি যন্ত্ররূপে কল্পনা করতেন। তাঁর মতে প্রকৃতির সব ঘটনা একটি অতি বৃহৎ যন্ত্রের মত একের পর এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। নিউটনের এই মতবাদকেও মাখ (Mach) কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। নিউটনের এই সব মতবাদ মেনে নিতে তরুণ বয়স থেকে আইনস্টাইনেরও খট্কা লাগত। মাখের বইতে নিউটনের মতবাদ সম্বন্ধে ধারণার ও প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের কঠোর সমালোচনা আইনস্টাইনের খুবই মনোমত হয়েছিল এবং বস্তুর স্থিতির জন্যে মহাকাশের বাস্তব রূপ জানবার জন্যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নিউটনের ধারণা যে মহাকাশ অন্তহীন, সীমাহীন ও মৌলিক, যা পরনির্ভর নয়, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে এই যুক্তির খণ্ডন করেন। তেমনি খণ্ডন করেন সময় সম্বন্ধে নিউটনের ধারণা। তাঁর প্রবন্ধগুলি 'Annalen der Physik' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রাচীন যুগ থেকে বহু শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে এরূপ কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবধারার উল্লেখ করা হচ্ছে—আইনস্টাইনের চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয় পাবার জন্যে।

খ্রীস্ট জন্মের কয়েক শ' বৎসর পূর্ব থেকে বেশীর ভাগ গ্রীক পণ্ডিতেরাই বিশ্বাস করতেন ভূকেন্দ্রিক (geocentric) মতবাদ, অর্থাৎ পৃথিবী স্থির ও বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকাগুলি। তখন জ্যোতির্বেত্তারা আবিষ্কার করেছেন প্রথম পাঁচটি গ্রহ, অর্থাৎ বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter) ও শনি (Saturn)। বাকী তিনটি গ্রহ ইউরেনাস (Urenus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto) সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই মতবাদেই সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ হয়েছিল, যা আজও চলে আসছে। যথা—

রবিবার—Sunday—Day of the Sun.

সোমবার—Monday—Day of the Moon.

মঙ্গলবার—Tuesday—Day of Tiw=Mars.

বুধবার—Wednesday—Day of Woden=Mercury.

বৃহস্পতিবার—Thursday—Day of Thor=Jupiter.

শুক্রবার—Friday—Day of Frig=Venus.

শনিবার—Saturday—Day of Saturn.

আপাত-দৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান হয়, তাকে ভিত্তি করে প্রাচীন কালের মতবাদগুলির সৃষ্টি হয়েছে। লোকে দেখত সূর্য পূবে ওঠে, এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি পূবদিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথা দু-একজন পণ্ডিত ছাড়া অন্য পণ্ডিতেরা কল্পনা করতে পারেন নি। যে দু-একজন পণ্ডিতের মনে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রশ্নটি জেগেছিল, তাঁদের কথা পরে উল্লেখ করা হবে।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিষয়টি তখন স্বীকৃত না হলেও পণ্ডিতদের তিথি ও গ্রহণের সময়ের গণনায় কোন ভুল হত না। কারণ পৃথিবীকে স্থির ধরলে অন্য সব গাগনিক বস্তুর গতি হবে আপেক্ষিক এবং তাতে জ্যোতির্বিদ্যার গণনায় কোন ত্রুটি থাকত না। এই মতবাদকে ভিত্তি করে প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতেরা, বিশেষ করে খ্রীস্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিপ্পারকাস (Hipparchus) ও খ্রীস্টজন্মের পরে দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা ও ভূগোলবিৎ টলেমি (Ptolemy) সূর্য, গ্রহ ও তারকাদির বিচলন (movement) সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। সেজন্যে এই মতবাদকে টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ বলা হয়।

প্রাচীন যুগ থেকেই বেশীর ভাগ লোকের মনে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি গাগনিক বস্তুগুলি অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এই সব বস্তুর বিচলন ও পারস্পরিক ক্রিয়াদি ঈশ্বরের সৃষ্টি। তখনকার পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত ভূকেন্দ্রিক মতবাদের মত বিশ্বসংক্রান্ত মতবাদ ধর্মশাস্ত্রে স্থান পেয়েছিল এবং কোন লোক এর বিপরীত মত পোষণ করলে দেশের আইনানুযায়ী তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত।

ভূকেন্দ্রিক মতবাদ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কোপার্নিকাস (Copernicus, 1473-1543) দু-হাজার বছর ধরে প্রচলিত এই মতবাদটির পরিবর্তন সাধন করলেন। খ্রীস্টপূর্বের যে অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী এই ভূকেন্দ্রিক মতবাদকে স্বীকার করতেন না, তাঁদের দু-জনের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এথেন্সের হেরাক্লিডস (Heraclides, খ্রীস্টপূর্ব 388-310) এই মতবাদকে মানতে চান নি দুটি কারণে। প্রথমটি হল—শুক্র ও মঙ্গল এই দুটি গ্রহের সূর্য থেকে কৌণিক দূরত্ব (angular distance) কখনও খুব বেশী দেখা যায় না। সেজন্যে এর ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, গ্রহ দুটি পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করছে না, করছে সূর্যের চারদিকে। দ্বিতীয়তঃ, আপাতদৃষ্টিতে গাগনিক বস্তুগুলির পৃথিবীর চারদিকে যে দৈনিক আবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেটির ব্যাখ্যা হল—পৃথিবী দৈনিক তার কক্ষের চারদিকে ঘুরছে।

হেরাক্লিডসের এই দুঃসাহসিক কল্পনা তখনকার দিনের প্রচলিত, সর্বজনস্বীকৃত ও ধর্মের অনুশাসনে উল্লেখিত মতবাদের বিরুদ্ধ বলে পণ্ডিত মহলে খুবই আলোড়ন এনেছিল। কারণ তা বিশ্বের কল্পনার ভিত্তিকে নাড়া দিল দু-ভাবে—প্রথম, সূর্যকে বিশ্বের একটি দ্বিতীয় কেন্দ্রের কল্পনাতে এবং দ্বিতীয়, পুরনো স্থির কেন্দ্রে পৃথিবীর আবর্তন করার কল্পনাতে। বিশ্বের দুটি কেন্দ্রের কল্পনাতে খুবই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হল, যার মীমাংসা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না বলে হেরাক্লিডসের ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা অনুমোদন করলেন না।

যে সালে হেরাক্লিডসের মৃত্যু হয়, সেই সালে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা অ্যারিস্টারকাস (Aristarchus, খ্রীস্টপূর্ব 310-230)। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সূর্যকেন্দ্রিক (heliocentric) বিশ্বের কল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, "স্থির তারকাগুলি ও সূর্য অচল অবস্থায় আছে, কিন্তু পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে আবর্তন করছে। সূর্য এই কক্ষপথের কেন্দ্রে অবস্থিত।"

কিন্তু তখনকার দিনের এথেন্সের পণ্ডিতেরা অ্যারিস্টারকাসকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বললেন যে, এই অধার্মিকের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। এতে বিজ্ঞানী নিজেকে খুবই বিপদগ্রস্ত বলে মনে করলেন। ফলে অন্য কোন বিজ্ঞানী এই নতুন মতবাদ অনুসরণ করতে সাহস পেলেন না।

এভাবে এই নতুন মতবাদের জন্মকালেই মৃত্যু হল। বহু শতাব্দী পরে ষোড়শ খ্রীস্টাব্দে কোপার্নিকাস বিশ্বের এই লুপ্ত সত্যের পুনরুজ্জীবন দান করলেন। কোপার্নিকাস মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর প্রায় 30 বছরের গবেষণা ও অক্লান্ত সাধনালব্ধ সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি বই প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি বললেন যে, পৃথিবী স্থির নয় এবং বিশ্বের কেন্দ্রেও নয়—বিশ্বের কেন্দ্রে আছে সূর্য (heliocentrism) এবং সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তন করছে। এই মতবাদ পরবর্তী বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ (telescope) যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করলেন। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করছে ও পৃথিবী নিজের অক্ষের (axis) চারিদিকে 24 ঘন্টায় ঘুরছে, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রায় দু-হাজার বছরের টলেমিতত্ত্ব লুপ্ত হয়ে গেল। এখানে বলা যেতে পারে যে, সূর্য বিশ্বের কেন্দ্র এই মতবাদও বেশী দিন ছিল না। এখন বিজ্ঞানীদের কাছে বিশ্বের কেন্দ্র বলে কিছু নেই।

বিজ্ঞানী কেপ্‌লার (1571-1630), গ্যালিলিও (1564-1642) প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা কোপার্নিকাসের তত্ত্ব নিয়ে আরও গবেষণা করে গ্রহাদি সম্পর্কিত অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। গ্রহাদির গতি ও কক্ষপথ সম্পর্কে কেপ্‌লার তাঁর বিখ্যাত তিনটি তত্ত্ব প্রকাশ করলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু তিনি জানতে পারেন নি কিসের বলে (force) গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করছে। এটি আবিষ্কার করেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন (1642-1727)। তাঁর বিখ্যাত 'সাধারণ মহাকর্ষ-তত্ত্ব' (universal law of gravitation) আজকাল সর্বজনবিদিত। এই তত্ত্বে আমরা জানি যে, বিশ্বের যে কোন দুটি বস্তুকণা যে কোন দূরত্ব থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি বল দিয়ে, যার মান হল ঐ বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক (directly proportional) এবং তাদের ভিতরের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional)। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর কাছাকাছি কোন বস্তুর উপর রয়েছে পৃথিবীর আকর্ষণ, যাকে বলা হয় অভিকর্ষ। তার জন্যে গাছ থেকে ফল বিচ্ছিন্ন হলে মাটির উপরে পড়ে। কোন বস্তুর পড়বার সময় অভিকর্ষজ ত্বরণের (acceleration due to gravity) জন্য বেগ বাড়তে থাকে। নিউটনের গতিতত্ত্ব (laws of motion) থেকে বল, ত্বরণ (acceleration) ইত্যাদির সংজ্ঞা পাই। নিউটন তাঁর সব তত্ত্ব 'প্রিন্সিপিয়া,

(Principia) গ্রন্থে 1687 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। গ্রহাদি সম্পর্কে সব সমস্যা দূর হয়ে গেল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে একটি খট্‌কা থেকে গেল, এমন কি নিউটন নিজেও সেটির কোন ভাল যুক্তি দেখাতে পারেন নি। সেটি হল বহু কোটি মাইল দূরত্ব থেকে গাগনিক বস্তুগুলির (celestial bodies) কোন সংযোগ বিনা পরস্পরকে আকর্ষণ। এটি কি করে সম্ভবপর হতে পারে? যদিও এই বিষয়ে নিউটনের নিজেরও সন্দেহ ছিল, কিন্তু তিনি দেখলেন যে, অন্যান্য সব প্রশ্নের সমাধান করতে হলে এটিকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিককতাবাদে বলের বা আকর্ষণের কোন প্রশ্নই তুললেন না। তাঁর তত্ত্বে বল বা আকর্ষণ বলে কিছু নেই, আছে শুধু মহাকাশের বক্রতা, যার বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

6

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) কর্তৃক প্রচলিত মতবাদও প্রায় দু-হাজার বছর ধরে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। এতে ধর্মীয় কোন অনুশাসন ছিল না। অ্যারিস্টটলের মতবাদের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল যে, মানুষ কোন বিষয়ে চরম সত্যে উপনীত হতে পারে স্বত:প্রমাণিত তত্ত্বগুলিকে (self-evident principles) বিচার করে। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর নিজের নিজের একটি উপযুক্ত স্থান আছে। সেটি জানতে পারলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। যেমন, কোন বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে, সেটি মাটিতে পড়ে। কেন এমন হয়? কারণ মাটিই হল বস্তুর উপযুক্ত স্থান, ধোঁয়া উপরে যায়, কারণ উপরেই ধোঁয়ার স্থান। এই মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাগুলি কেন (why) ঘটল, তার জবাব বের করা। কেমন করে (how) ঘটল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। 'কেমন করে' এই অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত করলেন গ্যালিলিও। বলতে গেলে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন এবং তখন থেকে বিজ্ঞানের নবযুগের সূত্রপাত হল। পিসাতে (Pisa) যখন তিনি গণিতের অধ্যাপক ছিলেন, তখন অ্যারিস্টটলের একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সংশোধন করেন। অ্যারিস্টটলের ঐ তত্ত্বে বলা হত যে, বিভিন্ন বস্তু উপর থেকে একই সময়ে ছেড়ে দিলে বিভিন্ন সময়ে এসে মাটিতে পড়বে। কিন্তু গ্যালিলিও এই এই তত্ত্ব মানতে রাজী হলেন না। তিনি পিসার হেলানো মিনার (leaning

tower) থেকে বিভিন্ন ওজনের বস্তু এক সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে দেখালেন যে, সব বস্তুই এক সঙ্গে মাটির উপরে পড়ে। এইভাবে তাঁর বিখ্যাত পতনশীল বস্তুর তত্ত্ব (laws of falling bodies) আবিষ্কার করলেন।

গ্যালিলিওই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র (telescope) প্রস্তুত করেন, যা দিয়ে তিনি সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। কয়েকটি গ্রহের উপগ্রহগুলিও আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপ কল্পনা করেন এবং তাঁরই উত্তরসূরী নিউটন, যিনি জন্মগ্রহণ করেন গ্যালিলিওর মৃত্যুবছর 1642 খ্রীস্টাব্দে, প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে গ্যালিলিওর অবদান প্রচুর। কিন্তু যেহেতু তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বারা কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণ করলেন এবং যে তত্ত্ব তখনকার প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে, সেই হেতু তাঁকে ধর্মযাজকদের কাছে যথেষ্ট অবমাননা ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি বাধ্য হয়ে লিখে দিলেন যে, তাঁর সব তথ্য ভুল। তিনি মুক্তি পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ও নিরাশ হয়ে গ্রামে চলে যান ও সেখানে খুবই ক্লেশে ও মনোকষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। গ্যালিলিওর সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে : Proprios impendit oculos, cum iam nil amplius haberet nature, quod ipse videret (তিনি তাঁর দৃষ্টি-শক্তি হারিয়েছিলেন, কারণ প্রকৃতিতে তাঁর দেখবার আর কিছুই বাকী ছিল না)। বিশ্বের সত্য আবিষ্কারের জন্যে বৃদ্ধ বয়সে ধর্মীয় কুসংস্কারের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর ব্যর্থমনোরথ ও ভগ্ন-হৃদয়ে মৃত্যু—মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিরাট কলঙ্ক।

7

মানবসৃষ্টির আদি যুগে মানুষ ও পশুর ভিতরে কোন পার্থক্য ছিল না। মানুষ অরণ্যে ও গুহায় বাস করত এবং পশুর মত জীবনযাপন করত। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক পশুর মস্তিষ্কের চেয়ে উন্নত। সেজন্যে কালক্রমে মানুষের জ্ঞানোন্মেষ ও চিন্তা করবার ক্ষমতা জন্মাতে থাকে। তখন থেকে প্রকৃতির

বিপর্যয় যেমন, বন্যা, ঝড়, বিদ্যুৎঝলক, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দেখে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হত। অজানা ভয়ঙ্কর একটা কিছু আছে, যার জন্যে এই সব হয়—এই অনুভূতি হতে থাকল। প্রকৃতিতে সূর্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি দেখে মানুষের বিস্ময়বোধ হত। ক্রমশঃ রহস্যময় বিশ্বের একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মাল। মানুষের ভাষা হল, মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ ও সামাজিক হতে থাকল। প্রকৃতির ভয় ও রহস্য থেকে ধর্মের জন্ম হল। মানুষ কল্পনা করে নিল প্রকৃতির এই সব ব্যাপার ও বস্তু কোন একজন অসীম ক্ষমতাধরের কাজ। এর থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা হল। মানুষ নিজের আকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরকেও একজন বিরাট মনুষ্যাকৃতিধারী ও মনুষ্যের গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা করল। এই নরত্বারোপমূলক মতবাদকে ইংরেজীতে বলা হয় Anthropomorphism। এই হল 'Personal God'-এর সূত্রপাত। এইরূপ বিশ্বাস প্রবর্তন হল যে, প্রকৃতির সব কিছু তৈরি করেছেন ও করছেন ঈশ্বর। প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা তাঁরই ইচ্ছামত হচ্ছে। মানুষের ধর্মগ্রন্থে এসব স্থান পেল। এসব প্রচারই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হল। কালের স্রোত বেয়ে এই বিশ্বাস চলে আসছে। অজানার ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে, মৃত্যুর পরে কি হবে এই ভয়ে মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিল। ধর্মযাজকেরা সমাজে ও দেশে প্রাধান্যলাভ করলেন এবং ধর্মীয় অনুশাসন রাজা, প্রজা সবাইকেই মান্য করতে হত। ক্রমে ক্রমে ধর্মের নামে নানাপ্রকার কুসংস্কারের সৃষ্টি হল। ধর্মের গোঁড়ামির জন্যে বহু দেশে বহু মানুষকে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। গ্যালিলিওর বিষয় কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সক্রেতিসের (Socrates, খ্রীস্টপূর্ব 469-399) মত মহাপণ্ডিত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মানুষ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ধর্মের অনুশাসনকে যাচাই করতে ভয় পেত। কিন্তু ক্রমে এর প্রতি-ক্রিয়া শুরু হল, বিশেষ করে কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রকাশের পরে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বকে জানবার চেষ্টা শুরু হল। এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদের (rationalism) ও বিচারবোধের সৃষ্টি হল, তাতে বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে ও চিন্তাধারায় নতুন চেতনা এল।

কোপার্নিকাসের মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই উত্তরসূরী গ্যালিলিও ও কেপ্‌লার প্রকৃতি থেকে নানারূপ তথ্যাদি আবিষ্কার করতে লাগলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাদি থেকে বিশেষ কতকগুলি তথ্যকে তাঁরা বেছে

নিলেন, যেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সূত্রবদ্ধ করা সম্ভবপর। এই বিষয়গুলি রঙ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির মত মানসিক (subjective) বা গৌণ (secondary) গুণাবলী নয়, এগুলি আয়তন, পরিমাণ, ভর, গতি ইত্যাদির মত মুখ্য (primary) বা বাস্তব (objective) এবং মাত্রিক (quantitative) গুণাবলী। তাঁরা বিবেচনা করে দেখলেন যে, এগুলির মধ্যে সুষ্ঠু গাণিতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্যে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, গণিতই হল প্রকৃতির রুদ্ধ দ্বার খুলবার চাবি। গণিতের সাহায্যেই বিশ্বকে জানা যায়।

এই সব পণ্ডিতদের মতবাদে মহাকাশ (space) ও বিশেষ করে সময়ের (time) ধারণার পরিবর্তন সাধিত হল। গ্যালিলিওর পূর্বে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, সময় এমন একটি অতীত থেকে চলে আসা ক্রমবর্ধমান পদ্ধতি, যার ভিতর দিয়ে প্রতিটি সত্তা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে উচ্চতর অবস্থার দিকে। ভবিষ্যৎকালকে বর্তমানের ভিতরে টেনে আনা হত। এভাবে চলতে চলতে সব কিছুই সর্বোচ্চ পর্যায় পৌঁছে ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে যাবে এবং তখন সময়ের গতি হয়ে যাবে স্তব্ধ (standstill), অর্থাৎ সময় বলে আর কিছুই থাকবে না।

কিন্তু গ্যালিলিও সময়ের এই ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করলেন। তিনি সময়ের ধারণা করলেন অনন্তকাল ধরে চলা একটি গাণিতিক বিন্দুর সঞ্চারপথের (locus) দ্বারা। তাঁর মতে বর্তমান মুহূর্তটির কোন অবস্থানকাল নেই। এটি হল অতীতকালে ও অস্তিত্ববিহীন (non-existent) ভবিষ্যৎ-কালের সীমানা নির্দেশক। এভাবে বিবেচনা করলে সময়কে অতি সহজ গাণিতিকভাবে একটি সরল রেখার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সময়ের এই ধারণাই—অর্থাৎ সময় অনন্ত ও অনন্যগত (independent)—বিজ্ঞানে চলে এসেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইন সময়ের এই ধারণার পরিবর্তন করে বললেন যে, প্রকৃতিতে বস্তু না থাকলে, ঘটনা না ঘটলে সময় বলে কিছুই নেই, আর সময়কে মহাকাশ থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না।

যা হোক, গ্যালিলিও কর্তৃক সময়ের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধারণার পরি-বর্তনের ফলে কারণ (cause) সম্বন্ধেও অনুরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। পূর্বে যখন সমস্ত কিছুকেই মনে করা হত ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এই লীন হয়ে যাওয়াই ছিল কারণ বা পরিণতি। কারণকে

বোঝা হত তার শেষ পরিণতি দিয়ে। ঘটনাবলীর কারণকে উপলব্ধি করা হত ঘটনাগুলির ঘটবার উদ্দেশ্য থেকে। কিন্তু সময়ের এই নতুন ধারণাতে বর্তমানের উপর অস্তিত্ববিহীন ভবিষ্যতের কোন প্রভাব নেই। পণ্ডিতেরা উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, যে ঘটনা ঘটছে তার কারণ নিহিত আছে সেই মুহূর্তে বিগতকালে। আরও বোঝা যেতে লাগল যে, যা বাস্তবে ঘটছে সেগুলি হল গতি (motion)—বাস্তব বিশ্ব গঠিত যে বস্তুগুলির দ্বারা, তাদের কণিকাগুলির গতি এবং এই সব গতি নিজেরাই হল পূর্ববর্তী গতির ফল। এভাবে বিজ্ঞানে এল causality বা কার্যকারণ সম্বন্ধ।

এই সম্পর্কে দেকার্তেও (Descartes, জন্ম 1596, মৃত্যু 1650) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ সম্বন্ধে মানুষের আকারধারী ঈশ্বরের কোন উল্লেখ না করে, অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত আছে, তার কোন উল্লেখ না করে তিনি বললেন যে, এগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে গতিতত্ত্বের দ্বারা, বস্তুগুলির ভিতরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা (by actions and reactions) এবং বাস্তব বিশ্বকে জানা যাবে বস্তুগুলির গতির দ্বারা। তাঁর মতে "The world picture logically deduced on the basis of a small number of initial postulates is a unique, exact—and in this sense an ultimate representation of the real world"—অর্থাৎ, "অল্পসংখ্যক মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে যুক্তির দ্বারা বিচার করে বিশ্বের যে রূপ পাওয়া যায়, তাই হল বাস্তব বিশ্বের অদ্বিতীয়, সঠিক এবং একেবারে পরম রূপের ধারণা।" তাঁর পদার্থবিদ্যার মতবাদ ছিল ontological বা তত্ত্ববিদ্যাগত।

এই যুক্তিবাদ খ্রীস্টজন্মের পূর্বেও কিছু প্রচলিত ছিল। সে যুগের কোন কোন পণ্ডিত ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতির শক্তিই হল সব সৃষ্টির মূল কারণ। এসব পণ্ডিতদের ভিতরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্ট্র্যাটো (Strato)। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন শ' বছর পূর্বে এই বিজ্ঞানী ছিলেন এথেন্সে টলেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম টলেমির ছেলে ফিলাডেলফাসের শিক্ষক। স্ট্র্যাটো বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "যা কিছুর অস্তিত্ব আছে কিংবা সৃষ্টি হচ্ছে, তা হল কেবলমাত্র নৈসর্গিক শক্তির গুণে। ঈশ্বরকে ও

প্রকৃতিকে আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না। সমস্ত ঐশ্বরিক শক্তি বিরাজ করছে প্রকৃতিতে।" এই মতবাদের সঙ্গে স্পিনোজার মতবাদের অনেক মিল আছে।

স্পিনোজা (Spinoza, 1632-1677) বলেছেন, "Causa sen ratio, ratio sen causa" ; "A body in motion or at rest must be brought into that state of motion or rest by the action of another body, which in turn is brought into its state of motion or rest by a third body, and so on infinitum."—অর্থাৎ "কোন একটি চলন্ত বা স্থির বস্তুকে ঐ অবস্থায় আনতে হলে প্রয়োজন হবে অপর একটি বস্তুর ক্রিয়া, আবার এই দ্বিতীয় বস্তুটির গতির বা স্থিতাবস্থার জন্যে প্রয়োজন হবে তৃতীয় একটি বস্তুর এবং এভাবে চলবে সংখ্যাতীত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।"

স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন যে, "যে সমস্ত কারণকে বস্তুগুলির ভিতরে প্রতিক্রিয়ার হেতু বলে খাপ খাওয়ানো যায় না, সেগুলিকে বিশ্বসংক্রান্ত কার্যকারণ সম্বন্ধ থেকে বাদ দিতে হবে।"

বহু বছর পর্যন্ত আইনস্টাইনের চিন্তাধারায় এই যুক্তিটি বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। স্পিনোজাই বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর একমাত্র দার্শনিক, যাঁর লেখা প্রায় সব বই-ই আইনস্টাইন তরুণ বয়সে গভীর মনদিয়ে পড়েছেন। এর কারণ হয়ত যে, যুক্তিবাদী স্পিনোজা আইনস্টাইনের মত ইহুদী ছিলেন বলে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করেছেন এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, যা আইনস্টাইনের খুবই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া স্পিনোজার Ethics বইটি শিক্ষাপ্রদ বলে শিক্ষিতসমাজে বেশ সমাদর লাভ করেছিল। ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আইনস্টাইন বলতেন, "Spinoza's God is my God"—অর্থাৎ "স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।" আইনস্টাইনের চিন্তাধারায় স্পিনোজার মতবাদের প্রভাব বেশ কিছুটা পরিলক্ষিত হয় বলে ঐ শতাব্দীর যে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতবাদ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের ভিতরে স্পিনোজার মতবাদই সংখ্যায় বেশী।

স্পিনোজা বলেছেন যে, বিশ্বের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষকের

অবস্থানস্থলের উপর তাঁর কল্পনা কখনও নির্ভর করবে না এবং কেবলমাত্র তখনই কল্পনাগুলি সঠিক হবে। তিনি তাঁর Ethics বইতে লিখেছেন—"True ideas always agree with those things of which they are ideas"—অর্থাৎ তাঁর মতে কোন বিষয়ের সঠিক কল্পনার দ্বারাই তার মীমাংসা পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের চিন্তাধারাতেও এই যুক্তিটি খুবই লক্ষ্য করা যেত।

স্পিনোজার মতবাদের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) কোন বস্তুকে সীমিত (limited) বলা যাবে তখনই, যখন সেই বস্তুটিকে অনুরূপ ধরণের অপর একটি বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে সীমা নির্দেশ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি বস্তুকে বলা হয় সীমাবদ্ধ (finite), যখন আমরা অন্য আর একটি বস্তুকে প্রথমটির চেয়ে বৃহত্তর দেখি। তেমনি একটি চিন্তাকে অপর একটি চিন্তার দ্বারা সীমিত বলে ভাবা যায়। কিন্তু একটি বস্তু একটি চিন্তার দ্বারা সীমিত হয় না, তেমনি একটি চিন্তা একটি বস্তুর দ্বারা সীমিত হয় না।

(2) একটি বস্তুর (substance) ধারণা করতে হলে তা করতে হবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে, এতে অন্য কোন বস্তুর ধারণার প্রয়োজন হয় না।

(3) একটি নির্ধারিত কারণ থেকে একটি কাজের ফল অপরিহার্যভাবে পাওয়া যায় এবং যদি কোন নির্ধারিত কারণ বর্তমান না থাকে, তবে কোন ফল লাভ করা অসম্ভব।

(4) প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা (chance) বলে কিছু নেই। আইনস্টাইন মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই মতবাদটি বিশ্বাস করে গিয়েছেন।

(5) স্পিনোজার ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে এই বইয়ের উপক্রমণিকাতে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচন্য করা হল।

যে সত্তা (Being) অনাদি ও অনন্ত, অনন্যগত অর্থাৎ কারোর উপর নির্ভরশীল নয় এবং পরমরূপে (absolute) অনন্তকাল ধরে বিরাজমান, যার অসংখ্য অঙ্গ, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির প্রত্যেকটিতে প্রকাশিত হচ্ছে শাশ্বত ও সীমাহীন অস্তিত্ব, যার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে

পারে না বলে বাইরের কোন কিছুর দ্বারা তার ভিতরে ক্রিয়া ঘটানোর প্রশ্ন ওঠে না এবং এজন্যে যার নিজের নিয়মেই নিজের ভিতরে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিষয় ঘটছে, যা হল অনন্ত উপলব্ধিতে (infinite intellect) ঘটিত সব ঘটনার ফলপ্রদ কারণ, যার সত্য হল সব কিছুর সত্য—এই হল স্পিনোজার ঈশ্বর বা প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন কেবলমাত্র বস্তু বা তার গুণাগুণ পরিবর্তনকারী নয়, কিন্তু বস্তু ছাড়াও অসংখ্য অপর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য। যেহেতু প্রকৃতির শক্তি ও কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা আর ঈশ্বরের শক্তি ও কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা এক এবং প্রকৃতির নিয়মাবলীই ঈশ্বরেরই নিয়ম (decree), সেজন্যে সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রকৃতির শক্তি অসীম এবং তার নিয়মাবলীতে আছে সব কিছু, যা ঈশ্বরকল্পিত। মানুষ যত বেশি প্রকৃতির ঘটনাবলীর কারণ উপলব্ধি করবে, ততই তার ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে।

স্পিনোজা বলেছেন যে, অনেকে বিশ্বাস করেন দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষমতা (power) আছে। প্রথমটি ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃতির ক্ষমতা, আর এই দ্বিতীয়টি ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা যে এই সব মানুষ কি মনে করেন কিংবা ঈশ্বর বলতে বা প্রকৃতি বলতে কি বোঝেন, তা তাঁরা নিজেরাই বলতে পারবেন না। তাঁরা হয়ত ঈশ্বরকে কোন রাজা রূপে (royal potentate) মনে করেন বলে ঐশী ক্ষমতাকে এই রাজকীয় ক্ষমতা হিসেবে মনে করেন, আর প্রকৃতির বেলায় মনে করেন যে, প্রকৃতিতে আছে শুধু বল আর শক্তি (force and energy)।

স্পিনোজা আরও বলেছেন যে, অনেকে বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের মানুষের মত শরীর ও আত্মা আছে, আর আছে কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি প্রচণ্ড আবেগাদি। এই ধারণার বশবর্তী মানুষের ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান কিছুই নেই। 'শরীর' বলতে বোঝা যায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ অর্থাৎ সীমিত একটি আকার; সুতরাং আদি ও অন্তহীন ঈশ্বরকে এরূপ সীমিতভাবে বিশ্বাস করা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

স্পিনোজা ঈশ্বরের সাহায্যকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রকৃতির নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বিন্যাসের (order) দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতির ধারাবাহিক ঘটনাবলীর দ্বারা। কারণ প্রকৃতির সর্বজনীন নিয়মাবলীর দ্বারাই সব কিছুই

অস্তিমান, নির্ধারিত এবং এই নিয়মাবলীই ঈশ্বরের বহিঃস্থ (external) নিয়মের অপর এক নাম, যা সর্বদাই চিরন্তন সত্য নির্দেশ করে। সুতরাং সবই ঘটছে প্রকৃতির নিয়মে বলাও যে কথা, আর সবই ঈশ্বরের নির্দেশানুসারে ঘটছে বলাও তাই। এখন যেহেতু প্রকৃতির ক্ষমতাতে অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষমতাতে সব কিছু ঘটছে এবং নির্দেশিত হচ্ছে, সুতরাং মানুষ প্রকৃতির অংশ হিসেবে নিজের সাহায্যের এবং অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে যা কিছু নিজের প্রয়াসে প্রস্তুত করে বা যোগাড় করে, কিংবা প্রকৃতি মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেই তাকে যা কিছু দেয়, তা হল সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ক্ষমতাতে এবং এই সাহায্য মানুষ তার স্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ নিজের গুণে পায় আর না হয়ত বাইরের কোন উপায়ের দ্বারা পায়। সুতরাং মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে নিজের চেষ্টায় যা লাভ করে, তাকে বলা যায় তার অন্তর্জগতে ঈশ্বরের সাহায্য, আর বাইরের কোন কারণে মানুষ যা লাভ করে, তাকে বলা যেতে পারে তার বাইরের জগৎ থেকে ঈশ্বরের সাহায্য।

সাধারণতঃ বেশীর ভাগ মানুষ অলৌকিক ঘটনা সহজেই বিশ্বাস করে। তারা যুক্তি দিয়ে এর সত্যাসত্য যাচাই করতে চায় না। যদি সত্যই কোন ঘটনা প্রকৃতিতে ঘটে থাকে, যা অলৌকিক বলে মনে হয়, মানুষ মনে করে যে, প্রকৃতির ক্ষমতাতে এটি ঘটছে না, ঘটছে ঈশ্বরের ক্ষমতাতে। স্পিনোজা বলেছেন যে, কোন ঘটনাকে মানুষ অলৌকিক বলে, যখন সমসাময়িক কালে মানুষের প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞানের দ্বারা ঘটনাটির ঘটবার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, হয়ত কয়েক বছর পরে—তা দশ কি বিশ বছর হতে পারে কিংবা কয়েক শত বছরও হতে পারে, ঐ অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে, তখন ঐ ঘটনাকে আর কেউ অলৌকিক বলবে না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব ভালভাবে জানা যাবে প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের দ্বারা, কোন অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নয়।

ঈশ্বরের প্রতি একান্তভাবে আস্থা-স্থাপন ও কোন শাস্তির ভয়ের বা পুরস্কারের আশার মত কতকগুলি মিথ্যা ধারণার বশবর্তী না হয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসাই হল মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম ও তার পক্ষে সবচেয়ে সুখের ও শান্তির বিষয়।

কুজ্‌নেৎসভের (Kuznetsov) মত কোন কোন পণ্ডিত স্পিনোজার এই মতবাদকে বলেছেন Monism বা অদ্বৈতবাদ, কারণ স্পিনোজার ঈশ্বর বা প্রকৃতির বর্ণনাতে আমরা যে সত্তার পরিচয় পেলাম, তাতে বোঝা যায় যে, সব কিছুকে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তারা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ।

আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতন বিশিষ্ট দার্শনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সম্বন্ধে লেখা তাঁর বইতে স্পিনোজার মতবাদকে বলেছেন Pantheism, অর্থাৎ যে মতবাদে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভিন্ন বলে ভাবা যায় না। এই মতবাদকে সংক্ষেপে বলা যায় সর্বেশ্বরবাদ। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে স্পিনোজার মতবাদ থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতি থেকে কখনই আলাদা করে ভাবেন নি।

ছেলেবেলা থেকেই আইনস্টাইন ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ছেলেবেলাতে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ পড়ে প্রচলিত ধর্মে তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরের যুক্তি ও সামঞ্জস্যের (reason and harmony) ধারণা বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জোরাল হয়ে উঠতে লাগল, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে ইহুদী-বিদ্বেষ (anti-semitism) দেখে তিনি মনে গভীর আঘাত পেলেন। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের সময় পোল্যাণ্ড থেকে আগত ম্যাক্স টলমে (যাঁর কথা 'ছাত্রজীবন' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে) তাঁর মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর ও আগ্রহ ঔৎসুক্য জাগালেন। টলমের কাছ থেকে নানাবিধ বিজ্ঞানের বই পেয়ে তিনি আগ্রহের সঙ্গে সব পড়ে ধর্মদ্রোহী হলেন, অর্থাৎ ধর্মের অনুশাসনের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন এবং ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত বিশ্বের সৃষ্টির কথা তাঁর কাছে অত্যন্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে মনে হল। তাঁর ধর্মপরায়ণ মন খুঁজতে লাগল প্রকৃত ধর্ম কি ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি—জানবার জন্যে। কিছুকাল পরে তিনি স্পিনোজার বইগুলি পড়ে তাঁর সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন এবং ঈশ্বর, প্রকৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে যে বোধ জন্মাল, তা তাঁর মনে আজীবন ছিল। তাঁর ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা এই বইয়ের উপক্রমণিকাতে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনস্টাইন প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনায় অপূর্ব কার্যকারণ সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন এবং এর ভিতরে ঈশ্বরের অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিরাজমান অসীম শক্তির

সুষ্ঠু প্রকাশ উপলব্ধি করতেন, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনার কারণ অনুধাবন করে প্রগাঢ় যুক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এই সম্বন্ধে তাঁর লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল। তিনি লিখেছেন, "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God."

এই শতাব্দীর বিশ দশকে কণা-বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা তরুণ বিজ্ঞানীরা কার্যকারণভিত্তিক সনাতন নিয়মবলীর (classical laws) স্থলে পদার্থবিদ্যায় প্রচলন করলেন অনিশ্চয়তা (uncertainty), সম্ভাব্যতা (probability)। এতে আইনস্টাইন মনে গভীর দুঃখ বোধ করেছিলেন। তিনি এই সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা কালে বলতেন, "I cannot conceive of a God who can play dice"—অর্থাৎ "দ্যূত-ক্রীড়ক ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি কল্পনাও করতে পারি না।" অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, এগুলি হল পাশার দানের মত, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। বহির্জগতের (macrocosm) ঘটনাবলীর কারণে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও দেখা যায় না। সেইজন্যে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকার জন্য প্রকৃতির অপর অংশ কণিকা-জগতের (microcosm) নিয়মাবলীতে শৃঙ্খলার অভাব তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলতেন যে, এই সব বিজ্ঞানীরা প্রকৃত সত্য খুঁজে পান নি। এই সময়ে থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন—কিভাবে কণিকা-জগতের নিয়মাবলীতে উচ্ছৃঙ্খলতার বদলে সুষ্ঠু সমন্বয় ও পূর্ণতা আনা যায়, অর্থাৎ এমন কোন সূত্রের আবিষ্কার, যা দিয়ে বিশ্বের বহির্জগতের কি কণিকা-জগতের—সব কিছুর প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

স্পিনোজা এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য সমমতের যুক্তিবাদীরা এই বিশ্বের সব ঘটনাগুলির কারণ সহজ ও সরল বলে বিবেচনা করতেন এবং তাঁদের মতে বিশ্বে আছে কেবলমাত্র বস্তুগুলির ভিতরে পরস্পরের উপর ক্রিয়া (reciprocal)

interactions)। তাঁরা এই বিশ্বকে মনে করতেন নৈতিক ও সুরুচিপূর্ণ সমন্বয়ের আদিরূপ (prototype)।

গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও তাঁদের উত্তরসূরী নিউটন বিশ্বের কার্য-কারণে কোন প্রকার জটিলতা দেখতেন না। তাঁদের মতে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অতি সরল নিয়মে এবং বিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অন্যের উপরে নির্ভর করছে বলে বিশ্বকে একটি যান্ত্রিক রূপ (mechanical form) দিয়েছে; বিশ্ব যেন একটি বিরাট অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন যন্ত্র; একটি যান্ত্রিক সত্তায় সর্বত্র একই সুষ্ঠু ও সমন্বয়পূর্ণ নিয়মে কাজ ঘটে যাচ্ছে। এই বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক মতবাদে ও গাণিতিক সূত্রে বিশ্বকে বাস্তব রূপে সাধারণে বুঝতে পারল; মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের অধিবিদ্যাগত মতবাদে বিশ্বকে দুর্বোধ্য ও প্রহেলিকাময় বলে সাধারণ মানুষ বিবেচনা করত। কিন্তু এই বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও প্রহেলিকা ছিল না। এই বিজ্ঞানীদের অবদান বিজ্ঞান জগতে মহামূল্য সম্পদ। তাঁদের মতবাদে বিশ্বের এই যান্ত্রিক রূপের ধারণা দৃঢ়রূপে চলে এসেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। যদিও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এই ধারণার পরিবর্তন হল, তবুও তাঁদের মহামূল্য বৈজ্ঞানিক কাজের ভিত্তিতেই বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। নিউটন মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "If I have seen farther than others, it is by standing on the shoulders of giants"—অর্থাৎ "আমি যদি অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি দেখতে সমর্থ হয়ে থাকি, তবে সেটি সম্ভবপর হয়েছে বিরাট প্রতিভাবান মানুষদের স্কন্ধে আরোহণ করে।" এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁর ও সমকালীন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর সব যুক্তিবাদী পণ্ডিতেরা তাঁদের অন্তরে সুশৃঙ্খল কার্য-কারণ দ্বারা সম্পাদিত ঘটনাবলীসম্বলিত সরল ও বাস্তব বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা তাঁদের যুক্তিতে ও বিচারবোধে প্রচলিত ধর্মের অনুশাসনের সব কিছু মানতে রাজী না হলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণামত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। স্পিনোজার বিষয়টি কিছুটা বিশদভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে

আইনস্টাইনের ধারণা বুঝবার জন্যে। দেকার্তেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতেন, কিন্তু মানুষের আকারধারী ঈশ্বরে নয়। তিনি প্রাচীন বিশ্বাসকে যুক্তি ও বিচার দিয়ে যাচাই না করে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না বলে ধর্মযাজকেরা অসন্তুষ্ট হওয়ার তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্স ছেড়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। কয়েক বছর গভীর চিন্তার পর 'Discourse on Method' ও 'Meditation', নামে দুটি বই লেখেন। তাঁর মতবাদ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে মিলত না বলে ধর্মযাজকদের সড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে হল্যাণ্ড ত্যাগ করে সুইডেনে যেতে হয়। কয়েক মাস পরেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

কেপ্‌লার ও গ্যালিলিও দু-জনেরই সমগ্র চিন্তাতে ছিল বিজ্ঞানের সাধনা। তাঁরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা কখনও বলেন নি। কেপ্‌লারের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না এবং তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের। ধর্মের অনুশাসন সব অনুমোদন না করলেও তিনি জোর গলায় তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির কথা প্রচার করেন নি। এইখানেই ছিল তাঁর সমসাময়িক গ্যালিলিওর সঙ্গে প্রভেদ। আইনস্টাইন কেপ্‌লারের সম্বন্ধে বলেছেন, "কেপ্‌লার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ প্রটেস্ট্যাণ্ট। কিন্তু ধর্মের সব অনুশাসনই যে মেনে নিতে হবে, একথা তিনি স্বীকার করতেন না এবং এই অস্বীকার করবার কথা গোপনও রাখেন নি। এইজন্যে ধর্মযাজকেরা তাঁকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে মধ্যপন্থী বলে মনে করতেন।"

কিন্তু গ্যালিলিও ছিলেন তেজী স্বভাবের। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা জোর দিয়ে প্রচার করতেন। কোপার্নিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক মতবাদ ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে। গ্যালিলিও তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মযাজকদের কাছে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রচার করবার জন্যে 1621 খ্রীষ্টাব্দে রোমে যান। সেখানে তিনি ধর্মযাজকদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আইনস্টাইন যদিও গ্যালিলিওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য ধর্মযাজকদের কাছে যাওয়াকে তিনি বিবেচনাহীন ও ridiculously Quixotic বলে উল্লেখ করেছেন। আইনস্টাইনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সত্য যা—তা একদিন নিজের গুণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ও লোক তা গ্রহণ করবে।

নিউটন শেষ বয়সে বিজ্ঞানের চিন্তা না করে ধর্মের দিকে মন দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর বিশ্বকে যন্ত্র রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বের সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদি সমস্ত বস্তুকে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে তাঁর ইচ্ছামত গাণিতিক সূত্র দিয়ে বিশ্বকে চালিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট এই গাণিতিক যন্ত্ররূপ বিশ্বকে ইচ্ছে করলে ভিন্ন গাণিতিক সূত্র দিয়ে চালাতে পারেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বকে চালু রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অদলবদল করেন। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের (Westminister Abbey) ধর্মযাজক (Chaplin) নাস্তিক্যের বিরুদ্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে মনস্থ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিবার জন্যে নিউটনকে বললেন। নিউটন উত্তরে বললেন যে, সমস্ত গ্রহকে সূর্যের চারদিকে চিরন্তন কালের জন্যে আবর্তনের উদ্দেশ্যে সঠিক কক্ষপথে বসিয়ে ঈশ্বরই গ্রহগুলিকে প্রাথমিক বল (initial impulse) দিয়ে সম্মুখে ঠেলে দেন। নিউটন বিশ্বাস করতেন না যে, মানুষ প্রকৃতির আকস্মিক সৃষ্টি (accidental product)। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ খুবই প্রখর হল। যুক্তিবাদী মনীষীরা তাঁদের পূর্ববর্তী শতাব্দীর দেকার্তে, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা বলতেন যে, ঐসব অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মতবাদ স্পষ্ট নয়, সেগুলি প্রহেলিকাময় এবং তাঁরা জোর দিয়ে খোলাখুলি ভাবে নিরীশ্বরবাদ (atheism) প্রচার করতে পারেন নি।' They could not say spade a spade—তাঁরা কোদালকে কোদাল বলতে পারেন নি, অর্থাৎ ঐসব দার্শনিক তাঁদের যুক্তিতে যদি জেনেও থাকেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা প্রকাশ করতে ভয় পেয়ে হেঁয়ালির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এই জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশো, ভলতেয়ারের মত পণ্ডিতেরা স্পিনোজার মত পণ্ডিতদের মতবাদকে বলতেন তথাকথিত ঈশ্বরতত্ত্বীয় ও ধর্মসংক্রান্ত, যেগুলি নাস্তিক্যের ছদ্মবেশে প্রকাশিত। স্পিনোজা সম্বন্ধে ভলতেয়ারের ব্যঙ্গ করে লেখা দুটি পঙ্‌ক্তি কুজ্‌নেৎসভ্‌ তাঁর লেখা আইনস্টাইনের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এখানে সেই দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল ঃ

"Pardon me" he whispered in [God's] ear,
"But, between us, I think you don't exist"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তি ও বিচারবোধ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল। পূর্ববর্তী শতাব্দীর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক দার্শনিক চিন্তা—এই বিপরীত চিন্তাধারার মিশ্রণকে পরিহার করে কার্যে বিচারবুদ্ধির পরিচয়—এই সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা হল। মনীষীরা হলেন ঘোর জড়বাদী (materialistic) এবং বিজ্ঞানে যুক্তি ও বিচারবোধ প্রয়োগে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সমস্যার সঠিক ও চরম (ultimate) সমাধান করা হতে লাগল।

এই শতাব্দীতে অর্থাৎ নিউটনের এক শত বছর পরে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ল্যাপলাস (Laplace) তাঁর বিখ্যাত নীহারিকাসংক্রান্ত কল্পনা (Nebular Hypothesis) 1796 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে এটিকে বলা যেতে পারে গাগনিক বস্তুগুলির, বিশেষ করে সৌরজগতের, সৃষ্টির কারণের ব্যাখ্যার প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্মত প্রচেষ্টা। তিনি বললেন যে, পরিক্রমণরত নীহারিকাবিশেষের চূর্ণন ও সঙ্কোচনের ফলে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই মতবাদ বিজ্ঞানজগতে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তখন ফ্রান্সে নেপোলিয়ঁ সম্রাট। তিনি একদিন ল্যাপলাসকে জিজ্ঞেস করলেন যে, বিশ্বের সৃষ্টি যদি ধূলিকণা ও গ্যাসের পরমাণু থেকে নৈসর্গিক উপায়ে হয়, তবে এই সৃষ্টির কারণে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ কোথায়? বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন, "সম্রাট, ঐরূপ ঈশ্বরের কল্পনার আমার কোন প্রয়োজন নেই।" এর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে প্লেটোর (Plato) মত প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের উন্নত মতবাদের কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের সৃষ্টিসংক্রান্ত মতবাদ এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় 400 বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন, "আগুন, জল, মাটি এবং বায়ু এই সমস্তই প্রকৃতিতে কারোর কোন কৌশল বা দক্ষতা ছাড়াই আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়ে বিরাজ করছে। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাগুলি সমস্তই সৃষ্ট হয়েছে এই সব জড় পদার্থগুলি থেকে। এই সৃষ্টি কারোর মনের কল্পনা বা কোন ঈশ্বরের অথবা কোন কৌশল বা দক্ষতার দ্বারা হয় নি, হয়েছে সম্পূর্ণ নৈসর্গিক উপায়ে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, বিগত দুই শতাব্দীর

পণ্ডিতদের কাছে বিশ্বের ঘটনাবলীর কারণ যত সহজ বলে মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা, প্রকৃতির রহস্যের আবরণ যতই উন্মোচিত হতে লাগল, ততই বিজ্ঞানীরা জটিলতার সম্মুখীন হতে লাগলেন। তাঁরা গণিতের সাহায্যে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিশ্বকে ভালভাবে জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্যালিলিও ও নিউটন কর্তৃক প্রবর্তিত বিশ্বের যান্ত্রিক রূপের ভিত্তি দৃঢ়তর হল কয়েকটি কারণে, যেমন ফ্রেনেল কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোর তরঙ্গ রূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক সূত্রে সমস্ত বিকীর্ণ শক্তিকে (radiated energy) বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ (electromagnetic waves) রূপে ব্যাখ্যা করা এবং কিছু পরে হার্ৎজ্ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই তরঙ্গগুলি প্রমাণ করা। এতে বিশ্বের সর্বত্র এবং সমস্ত বস্তুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত অদৃশ্য মাধ্যম ঈথারের অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বিশ্বকে মনে করা হল অদৃশ্য অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত একটি বিরাট পাত্র বা আধার, যার ভিতরে তারকা ও অন্যান্য সব গাগনিক বস্তুগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং একটি জেলীভর্তি বাটিতে যেমন কম্পন সৃষ্টি হয়, তেমনি করে আলো তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিরাট অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন যন্ত্ররূপী বিশ্বে সমস্ত ঘটনা সুনির্দিষ্ট কারণে ঘটে যাচ্ছে। যদিও এই সনাতন নিয়মাবলীভিত্তিক যন্ত্ররূপী বিশ্বের ধারণা এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু শেষের দিকে মাইকেলসনের বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলে ও বিকীর্ণ শক্তি সংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিজ্ঞানীদের মনে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চলে আসা বিশ্বের ধারণা বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠল।

বিংশ শতাব্দীর উদয়ক্ষণে প্লাঙ্কের কণা-বাদ আবিষ্কারে বিকীর্ণ শক্তির সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু সনাতন নিয়মভিত্তিক পদার্থবিদ্যায় প্রচণ্ড আলোড়ন এল। বিশ্বের যান্ত্রিক রূপের ভিত টলে গেল। বিজ্ঞান সাধনা সাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হল। তরুণ বিজ্ঞানীরা সনাতন নিয়মাবলীতে তাঁদের সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে না পেয়ে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার সাহায্য নিলেন এবং তাতে তাঁদের ঈপ্সিত ফল পেতে লাগলেন। পদার্থবিদ্যায় সনাতন নিয়মাবলী কোণঠাসা হয়ে থাকল, এতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা অর্থাৎ পরিসংখ্যান (statistics)। বর্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর

দ্বিতীয় ভাগে পদার্থবিদ্যাবিদেরা তাঁদের গবেষণায় সনাতন নিয়মাবলীর সেরূপ কোন সাহায্য নেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ও আবিষ্কারে প্রাকৃতিক সত্যের জটিলতা যে অসীম, সে বিষয়টির ধারণা আইনস্টাইনের চিন্তাধারায় ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ তাঁর কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে এই উপলব্ধিতে তিনি যুক্তিবাদের বা বিচারবোধের মহিমার দুটি রূপের সম্মুখীন হলেন। এই দুটি হল : (1) reason has achieved exact and ultimate knowledge of nature—অর্থাৎ, একমাত্র বিচারবোধের দ্বারাই প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মতামত। (2) reason infinitely approaches the true picture of nature—অর্থাৎ প্রকৃতির সঠিক রূপের ধারণা বিচারবোধের দ্বারা না পাওয়া গেলেও এতে সঠিক রূপের ধারণার অসীম নৈকট্যে পৌঁছান যায়।

আইনস্টাইন যুক্তিবাদের এই দ্বিতীয় রূপটিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইজন্যেই স্পিনোজার ভাবধারার প্রভাব তাঁর উপরে যথেষ্ট ছিল। একের পর এক রহস্যের ও জটিলতার সমাধানের দ্বারাই তিনি বিশ্বকে বুঝতে চাইতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সব রহস্যের সমাধানেই বিশ্বের সহজ, সুষ্ঠু সমন্বয়ের ও শাশ্বত প্রকাশের উপলব্ধি করা যাবে। প্রাকৃতিক সত্যের নিয়মাবলী অত জটিল হলেও, তারা বিশৃঙ্খল নয়, তারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্বদ্ধ রীতি মেনে চলে এবং এই জন্যেই এই বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে।

আইন্স্টাইনের বিশ্বের ঘটনাবলীতে causality বা কার্যকারণের উপর এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কণা-বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানীদের মতবাদ অস্বীকার না করলেও, এই বিজ্ঞানীরা যে সঠিক সমাধান খুঁজে পান নি, এই ধারণা তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। নীল্‌স্ বোরের (Niels Bohr) অনেক চেষ্টাতেও আইনস্টাইন কিছুতেই এই সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত না হওয়ায় তরুণ বিজ্ঞানীরা দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁদের মনোভাব আইনস্টাইন জানতেন। 1949 সালে সত্তর বছর বয়সে তিনি তাঁর বন্ধু ও কণা-বলবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক্স বর্ন্‌কে (Max Born) একটি

চিঠিতে লিখেছিলেন, "……আমি বুঝতে পারি যে, কেন আপনারা আমাকে পুরনো পাপী বলে মনে করেন। কিন্তু আমার পথে নিঃসঙ্গ পথিক হয়ে চলায় আমার যে মনের ধারণা, তা আপনারা বুঝতে পারবেন না……।" এখানে পুরনো পাপী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন—যাঁরা সনাতন নিয়মাবলী আঁকড়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কণা-বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানীরা তাঁর এই একাকীত্ব দেখে ধারণা করলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময় তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হত তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে এখন মনে করা হতে লাগল পথ হারিয়ে ফেলা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে চলতে অসমর্থ একজন বিজ্ঞানীর অসমর্থতা।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর নীল্‌স বোর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, ……পদার্থবিদ্যার প্রতিটি ধাপ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নূতন আর এক ধাপ আবিষ্কার করবার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন ত্রুটিবিচ্যুতি, যা দূর করে পদার্থ-বিদ্যাকে উন্নত করবার জন্যে বিজ্ঞানীদের নূতন উদ্যমে কাজ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। প্রতিটি ধাপে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই মনীষীর বিরুদ্ধ ও অর্থপূর্ণ সমালোচনা না থাকলে কণা-বলবিদ্যার অগ্রগতি অনেক মন্থর হত।"

এই শতাব্দীর আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর সমকালীন অন্যান্য বিজ্ঞানীর চিন্তাধারার পার্থক্য কিছুটা বোঝাবার জন্যে এই সব উল্লেখ করা হল।

8

উচ্চস্তরে পদার্থবিদ্যা (physics) ও অধিবিদ্যা (metaphysics), যাকে বলা যেতে পারে সৃষ্টি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র—এই দুইয়ের ভিতরে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। প্রাচীনকাল থেকে পর্যবেক্ষক ও প্রাকৃতিক সত্য (reality)—এই দুইয়ের কি সম্বন্ধ, মনের বা চিন্তার (subject) ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর (object)—এর কোন্‌টা সত্য, এই সব নিয়ে প্রচুর তর্ক হয়েছে। তেইশ শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, "মিষ্টতা এবং তিক্ততা,

শীতলতা এবং উষ্ণতা, সমস্ত রঙ, এ সবের অস্তিত্ব আমাদের মনে, বাস্তবে নয়; যার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে, তা হচ্ছে মৌলিক কণিকা, পরমাণু ইত্যাদি এবং এগুলির মহাশূন্যে গতি।"

দার্শনিক জন লক্ (John Locke) বস্তুর সত্য রূপ বলতে গিয়ে বলেছেন যে বস্তুর দুটি গুণ আছে, একটি মৌলিক বা মুখ্য (primary), আর একটি হল গৌণ (secondary)। তিনি মনে করতেন যে, বস্তুর আকার, গতি, কাঠিন্য এবং সমস্ত জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য হল মুখ্য বা সত্য, যা বস্তুর নিজস্ব; আর গৌণ হল রঙ, শব্দ, স্বাদ, ঘ্রাণ ইত্যাদি যেগুলি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

আবার কেউ বললেন যে, শুধু আলো, তাপ, রঙ বা এই ধরণের সব কিছু নয়, গতি, আকার, ব্যাপকতাও কেবলমাত্র প্রতীয়মান সত্য, সেগুলিরও কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। যেমন আমরা একটি গল্ফ বলকে দেখি সাদা, তেমনি স্পর্শ দিয়ে বুঝি এটি গোল, মসৃণ এবং ছোট—আমাদের ইন্দ্রিয়-নিরপক্ষে এই গুণগুলির অস্তিত্বের কোন বাস্তব সত্য নেই।

এইভাবে কিছু সংখ্যক দার্শনিক একটি চমকপ্রদ মতে উপনীত হলেন যে, যেহেতু প্রতিটি বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টি এবং গুণের অস্তিত্ব মানুষের মনে, সেইহেতু বস্তু, শক্তি, পরমাণু ইত্যাদি দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই, আছে শুধু আমাদের চেতনায়, মানুষের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ কতকগুলি প্রচলিত ধারণায়। জড়বাদের কঠিন সমালোচক ভাববাদী দার্শনিক বার্কলে (Berkeley) বলেছেন, "সব স্বর্গীয় ঐকতান সঙ্গীত, পৃথিবীর যাবতীয় আসবাবপত্র, যত কিছু সামগ্রী দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত, সে সব কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই যদি মন না থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার মন দিয়ে এ সবের উপলব্ধি করলাম, কিংবা আমার মনে অথবা অন্য কারোর মনে বিদ্যমান থাকল, এই সব বস্তুর হয় আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই, অথবা বিদ্যমান আছে শুধু কোন শাশ্বত আত্মায় বা পরমাত্মায়।"

যদিও যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা ভাববাদী দার্শনিকদের এই সব কথার কোন মূল্য দিতেন না, কিন্তু কোন কোন যুক্তিবাদী দার্শনিক বিশ্বের সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিশ্বাস করতেন। যুক্তিবাদী দেকার্তের মতে মন ও বস্তুর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস

করতেন, বস্তুর অস্তিত্ব মহাকাশে আর মনের অস্তিত্ব চিন্তায়। এর থেকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্বজগতের সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, একটি জগৎ, যা মন বা চেতনায় উপলব্ধ এবং অপরটি বস্তুর।

আইনস্টাইনও দেকার্তের মত বিশ্বজগতের দুটি রূপ বিশ্বাস করতেন। একটি রূপে বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণভাবে মানুষের চেতনায় উপলব্ধ, আর অপর বিশ্বজগৎ মানবচেতনা-নিরপেক্ষ, পরম ও অপরিহার্য রূপে বিদ্যমান। প্রথম রূপটি, যাকে বলা যেতে পারে 'merely personal world', সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে, মানুষের চেতনায় উপলব্ধ জগতের সত্য বিজ্ঞানীদের অনুমান-নির্ভর বলে এই সত্য একেবারে চরম খাঁটি হতে পারে না, সময় সময় সত্যের পরিবর্তন হয়। প্রত্যক্ষবাদীদের ধারণা এই জগৎ সম্বন্ধেই। কিন্তু দ্বিতীয় রূপের জগতে, যাকে তিনি বলতেন 'objective, extra-personal world', সত্য শাশ্বত, এ সত্যের কোনদিন পরিবর্তন হয় না।

তিনি বার্কলের মতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদকে (positivism) সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। প্রত্যক্ষবাদ মতাবলম্বী দার্শনিকদের ধারণা যে, প্রাকৃতিক ঘটনা যা ঘটে যাচ্ছে, তাই দেখে বিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এ ছাড়া তাঁদের আর করবার কিছুই নেই।

আইনস্টাইন বলতেন যে, এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল বিশ্বের অস্তিত্বের ও বাস্তব সত্যের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে হয় না, হয় বিশুদ্ধ চিন্তায়। প্রকৃতির ঘটনাবলীকে উপলব্ধি করতে হলে এগুলির ধারণা ও নিয়মাবলীর আবিষ্কারের জন্যে প্রয়োজন বিশুদ্ধ গণিতের, যার সূত্র পাওয়া যায় চিন্তার গভীরতায়। সেই উপলব্ধিকে অভিজ্ঞতার দ্বারা, পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত করতে হয়। তা হলে বোঝা যাবে যে, জ্ঞান শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারাই হয় না। চিন্তার দ্বারা বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করতে পারে। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল আইনস্টাইনের গভীর চিন্তায় আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ। আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্বের যে রূপের ধারণা আমরা পাই, তা প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এইরূপ ধারণা পাওয়া যায় প্লেটোর (Plato, খ্রী: পূর্ব 427-367) এক

উক্তিতে। তিনি বলেছেন, "যদি আমরা কোন কিছুকে পরমরূপে জানতে চাই, তবে আমাদের নিজেদেরকে শরীরের ইন্দ্রিয়াদি থেকে মুক্ত করে মনের চোখ বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাস্তব সত্যকে দেখতে হবে।"

1905 সালে Annalen der Physik পত্রিকায় আইনস্টাইনের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হল। বিশদ আলোচনা শেষের অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(1) **ব্রাউনীয় বিচলন** (Brownian Movement)

1827 সালে রবার্ট ব্রাউন নামে একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী (botanist) লক্ষ্য করলেন যে, জলের ভিতরে কতকগুলি ফুলের রেণু রাখলে সেগুলি এক বিশেষ ধরণের গতিতে নড়াচড়া করতে থাকে। রেণুগুলির এই বিচলনকে ব্রাউনের নামানুযায়ী ব্রাউনীয় বিচলন বলা হয়। বিজ্ঞানীরা এর সঠিক কারণ বুঝতে পারলেন না। আইনস্টাইন তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলি (thermodynamical laws) প্রয়োগ করে রেণুগুলির এই বিচলনের ব্যাখ্যা করলেন। সমস্যার সমাধান হল। তাঁর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানী পের্যাঁ (Perrin) 1909 সালে অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণে সক্ষম হলেন।

(2) **আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব** (Photo-Electric Effect)

বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে লক্ষ্য করছিলেন যে, বেগুনী কিংবা তার কাছাকাছি রঙের আলো কোন কোন ধাতুর পাতের বা প্লেটের উপর পড়লে সেই পাত বা প্লেট থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা কিছুতেই এই ব্যাপারটির কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশ্য প্রতিটি বস্তুতে অণুগুলি যে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে ও এলোমেলোভাবে নড়াচড়া করতে থাকে (random movements), তা জানা ছিল। অণুগুলির এইরূপ বিচলনে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে হয়ত বা দুই একটি ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ধাতুর পাতের উপর আলোর আপাতনে ইলেকট্রনের ছিটকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে অণুগুলির ঠোকাঠুকির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

1905 সালে আইনস্টাইন এই ব্যাপারটির একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি এর জন্যে 1900 সালে প্লাঙ্ক (Planck) কর্তৃক আবিষ্কৃত কণাবাদের (Quantum Theory) সাহায্য নিলেন।

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গে শক্তির বন্টন পদার্থবিদ্যায় একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্লাঙ্ক তাঁর আবিষ্কৃত বিকিরণ তত্ত্বের (Radiation Theory) দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করেন। এতে তিনি যে বিষয়টি কল্পনা করেছিলেন, তা সনাতন পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে ছিল। এই কল্পনাটি হল যে, কোন বিকীর্ণ শক্তি কোন উৎস থেকে নির্গত (emitted) কিংবা কোন বস্তুর দ্বারা শোষিত (absorbed) হবার সময় অবিরাম ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে, ঝাঁক ঝাঁক ক্ষুদ্রতম শক্তির মোড়কে (swarm of minutest energy packages) বা কণার (quantum) আকারে। এই শক্তি-কণা হল ঐ বিকীর্ণ শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ, যেমন একটি ইলেকট্রন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। এই কণাতে শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপরে। দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, কণাতে শক্তির পরিমাণও তত বেশী হবে। যদি আলোর শক্তি-কণার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, তবে লাল রঙের আলোর কণার চেয়ে বেগনী রঙের আলোর কণাতে শক্তির পরিমাণ বেশী, কারণ দৃশ্যমান তরঙ্গগুলির মধ্যে বেগনী রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। এই হল সংক্ষেপে প্লাঙ্কের কণাবাদ।

1905 সালে ছাব্বিশ বয়সের যুবক আইনস্টাইন তাঁর আলোক-বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারটির ব্যাখ্যার সাহায্যে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন যে, আলোর মত বিকীর্ণ শক্তি শুধু উৎস থেকে নির্গমনের কিংবা কোন কিছুতে শোষিত হবার সময়েই বিচ্ছিন্নভাবে বা কণারূপে হয় না; নির্গমন ও শোষণ এই দুটি অবস্থার অন্তর্বর্তী কালেও, অর্থাৎ মহাশূন্যে বা মহাকাশে প্রবাহের সময়েও কণারূপে প্রবাহিত হয়।

আমরা যদি জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসি, তবে তাপ ও আলো এই দুটি শক্তির কণা পাই। তাপশক্তির তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্যের চেয়ে বৃহত্তর বলে এই কণায় শক্তির পরিমাণ আলোর কণার শক্তির পরিমাণের চেয়ে কম। তাপশক্তির অগণিত কণা আমাদের দেহের চামড়ার উপরে অনবরত আঘাত করায় আমরা শরীরে গরম অনুভব করি। আলোর কণাগুলি আমাদের চোখের রেটিনাতে আঘাত করে আলোর অনুভূতি জাগায়। সূর্য থেকে সব রকমের শক্তি-কণাই নির্গত হচ্ছে।

আইনস্টাইন তাঁর ব্যাখ্যায় বললেন যে, আলোর আপাতনে ধাতুর পাত

থেকে ইলেকট্রনের নির্গমনের কারণ এই যে, আলোর শক্তি তরঙ্গ আকার নয়, কণা বা কণিকার আকারে এসে ধাতুটির উপরে আঘাত করছে। এই শক্তির কোন একটি কণিকা ধাতুর পাতটির উপরিভাগের কোন পরমাণুর কেন্দ্রীন থেকে বাইরের কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনের উপর আঘাত করলে ফল হবে দুটি বিলিয়ার্ড বলের ঠোকাঠুকির মত। আলোর কণিকাটিতে শক্তির পরিমাণ যদি যথোপযুক্ত হয়, তবে ইলেকট্রনটি ধাতুর পাতটি থেকে একটি নির্দিষ্ট বেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে। আলোর কণিকায় শক্তির পরিমাণ যতই বেশী হবে, ততই নির্গত ইলেকট্রনটির বেগ বেশী হবে। সেইজন্য সবুজ আলোর কণিকার আঘাতে নির্গত ইলেকট্রনের বেগের চেয়ে বেগনী আলোর কণিকার আঘাতে নির্গত ইলেকট্রনের বেগের মান অধিকতর হবে। আলো যত উজ্জ্বল হবে, তার রশ্মির ভিতরে কণিকার সংখ্যা তত বেশী হবে, ফলে ধাতুর পাত থেকে অধিকতর সংখ্যায় ইলেকট্রন নির্গত হবে।

কয়েক বছর পরে আলোর তথা সমস্ত বিকীর্ণ শক্তির কণিকাকে ফোটন আখ্যা দেওয়া হয়। এভাবে আইনস্টাইন নিউটনের আলোর কণিকাবাদকে কিছুটা সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে আলোর তথা সব বিকীর্ণ শক্তিরই দ্বৈত রূপ (dual form) জানা গেল। কখনও আলোকে বিবেচনা করতে হবে তরঙ্গরূপে, আবার কখনও কণারূপে। প্লাঙ্কের কণাবাদও সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

(3) **বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ** (Special Theory of Relativity)

বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা এডিংটন (Eddington) আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব, অভিনবত্ব ও প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিই প্রথম 1919 খ্রীস্টাব্দে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের বোদ্ধা বা সমঝদার সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন এডিংটনের এক সহকর্মী তাঁকে বললেন, "প্রফেসর এডিংটন, বর্তমানে পৃথিবীতে যে তিনজন মাত্র বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদ প্রকৃত উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আপনি তাঁদের ভিতরে একজন।"

এই কথাতে এডিংটনের মুখে বেদনার ও চিন্তার ছাপ পড়তে দেখে সহকর্মীটি বললেন, "প্রফেসর এডিংটন, আপনি অত বিহ্বল হচ্ছেন কেন? আপনি অতি বিনয়ী।"

এডিংটন বললেন, "না, আমি বিহ্বল হই নি। আমি শুধু ভাবছি যে, তৃতীয় ব্যক্তিটি কে।"

এই কাহিনীতে আপেক্ষিকতাবাদের জটিলতার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

1933 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন আমেরিকার প্রিন্সটনে (Princeton) বসবাস-কালীন একটি অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তখন যথার্থ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করলেন যে, এই তত্ত্বের অর্থ যে ঠিক কি, তা বোঝা যায় নি। তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল এবং এমন কি ওয়াশিংটনে কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন বক্তা একবার এই বিষয়ে বলে-ছিলেন যে, সেই সময় পৃথিবীর মোটে বার জন পণ্ডিতের আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।

আইনস্টাইন কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন যে, বাইরে থেকে এই তত্ত্বের জটিলতা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তা লোকে আন্তরিকভাবে বুঝতে চান না বলে। কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কোন পদার্থবিদ্যার ছাত্রের যদি প্রকৃতই জ্ঞান-লাভের উৎসাহ থাকে, সে অনায়াসেই তাঁর তত্ত্বের গূঢ় অর্থ বুঝতে পারবে।

বিজ্ঞান জানে না এমন ছাত্রেরা এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তার কাছে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে, তিনি কৌতুক করে বলতেন, "যখন তোমাদের কেউ একজন খুব সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপে মগ্ন থাক, তখন জান না সময় কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে, এক ঘণ্টাকে মনে হয় এক মিনিট। কিন্তু কেউ যদি গরম স্টোভে আঙুল রাখ, তবে এক মিনিটকে মনে হবে এক ঘণ্টা। এই হল আপেক্ষিকতা।"

আবার হয়ত বলতেন, "তোমরা ট্রেনে চেপে যখন যাও, তখন লাইনের কাছে গাছ কিংবা টেলিগ্রাফের পোস্টকে ছুটে চলে যেতে দেখ। তোমাদের মনে হবে যে, তোমরা স্থির হয়ে বসে আছ আর গাছ বা পোস্ট ছুটে চলেছে। কিন্তু লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখবে ট্রেনটি ছুটে চলেছে গাছ বা পোস্ট পেরিয়ে। এই হল আপেক্ষিকতা।"

বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলতেন যে, এই বিশ্বে কোন বস্তুই স্থিরভাবে নেই। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু—প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, তারা ইত্যাদি নিয়তই গতিতে আছে বলে প্রতি মুহূর্তে বস্তুগুলির

একের আপেক্ষিকে অপরের স্থান পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এজন্যে এই বিশ্বে গাগনিক বস্তুগুলির কোন ধ্রুব (fixed) বা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি কেউ বলতে পারবে না, এদের অবস্থিতি বের করতে হবে অন্যদের আপেক্ষিকে।

আবার হয়ত তিনি বোর্ডে একটি নক্শা এঁকে বলতেন, "মনে কর এটি একটি বোমারু বিমান এবং এটি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে উড়ে যাচ্ছে। আরও মনে কর বিমানটির যে স্থানে নীচে নিক্ষেপ করার জন্যে বোমাটিকে রাখা হয়, সেখানে একটি 100 ফুট লম্বা একটি স্বচ্ছ ও আলোকভেদ্য নল নীচের দিকে খাড়া বা উল্লম্বভাবে (vertically) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মনে কর যে, এক ব্যক্তি সেই নলের মুখের কাছে বসে একটি কালো মারবেল সেই নলের ভিতরে ছেড়ে দিয়ে মারবেলটির পড়া লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হবে যে, মারবেলটি বিমানটির ঠিক লম্বভাবে (perpendicularly) পড়ছে। কেমন, ঠিক কিনা?"

ছাত্রেরা মাথা নেড়ে সায় দিত।

তারপর আইনস্টাইন বলতেন, "মাটির উপরে দাঁড়িয়ে কোন একজন পর্যবেক্ষক বলবেন, বিমানের পর্যবেক্ষক ভুল কথা বলছেন। মারবেলটি ঠিক খাড়াভাবে নীচে পড়ছে না।' যেহেতু বিমানটি ঐ দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকটির ডান দিক থেকে বাঁ দিকে উড়ে যাচ্ছে, সেহেতু তাঁর কাছে মনে হবে মারবেলটি কোণাকুণিভাবে বা তির্যকভাবে (slanting) পড়ছে। কেমন, ঠিক কি না?"

ছাত্রেরা এতেও সায় দিলে, অধ্যাপক বলতেন, "উভয় পর্যবেক্ষকই পরস্পরের আপেক্ষিক গতিশীল বিভিন্ন মাধ্যমে অবস্থানহেতু তাঁদের নিজের নিজের দিক থেকে ঠিক কথা বলছেন, এই হল আপেক্ষিকতা।"

এই বিশ্বে পরম (absolute) বলে কিছু নেই। একই ব্যাপার বিভিন্ন মাধ্যমের দর্শকদের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের পরম সত্য জানা সম্বন্ধে আইনস্টাইন বিজ্ঞান জানেন না এইরূপ বন্ধুদেরকে কিংবা দর্শন-প্রার্থীদেরকে প্রায়ই বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁশের (Anatole France) লেখা গল্প বলতেন। গল্পটি এইরূপ:

একজন সৎ ব্যক্তি বহু বছর ধরে পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরছেন সত্যের

অন্বেষণে। তিনি মোটামুটি সত্যে সন্তুষ্ট নন, তিনি জানতে চান জীবন, মৃত্যু, ভাল, মন্দ ইত্যাদি সব কিছুর পরম সত্য (absolute truth)। কিন্তু কিছুতেই তিনি সেটি পাচ্ছেন না। অবশেষে তাঁর এই সাধনা দেখে একজন দেবদূত দয়াপরবশ হয়ে সাধু ব্যক্তিটিকে নিয়ে গেলেন পৃথিবীর মাটির তলায় একটি গোপন স্থানে। সেখানে ব্যক্তিটি এক অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। অদৃষ্টপূর্ব একটি অতি বিশালকায় চাকায় প্রতিটি অরে (spoke of the wheel) দু-হাত দিয়ে দৃঢ় করে ধরে বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতির ও নানা বর্ণের নর ও নারী ঝুলছেন। দেবদূত ও ঐ সাধু ব্যক্তিকে দেখে প্রতিটি মানুষ চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমি, শুধু একমাত্র আমিই, সত্য কথা বলছি, অন্যেরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে। পরম সত্য শুধু আমারই জানা, অন্যেরা যা জানে, তা ভুল।"

এসব শুনে সাধু ব্যক্তিটি ঘাবড়ে গিয়ে দেবদূতকে বললেন, "যদি এদের ভিতরে শুধু একজন সত্য কথা বলে, তবে বাকী সবার কথা ভুল! এ কী ব্যাপার? তা হলে কার জানা আছে সেই পরম সত্য?"

দেবদূত একটু হেসে বললেন, "কেউই প্রকৃত সত্য জানে না।" সাধু ব্যক্তিটি সভয়ে বললেন, "তার মানে আপনি বলছেন যে, পরম সত্য কিছু নেই?"

দেবদূত উত্তর দিলেন, "কার জানা আছে? যদি কারোর বিশ্বাস থাকে—আচ্ছা শোনো।"

এই বলে তিনি চাকার হাতলটি ধরে প্রাণপণ শক্তিতে চাকাটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। চাকাটি প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ঘুরতে লাগল। চাকাটি থেকে প্রথম প্রথম বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি আলাদা আলাদা ভাবে শোনা যেতে লাগল, "আমি সত্য কথা বলছি, অন্য সবার কথা ভুল। ওদের কথা শুনো না। আমিই শুধু জানি পরম সত্য কি।"

তারপর চাকাটির ঘূর্ণন বেগ যত বাড়তে লাগল, সাধু ব্যক্তিটির কাছে সমস্ত ঘূর্ণায়মান মানুষের মুখ ও চাকার অর সব এক হয়ে মিশে যেতে লাগল। সবশেষে ঘূর্ণন বেগ দ্রুততম হলে হঠাৎ চাকাসমেত সব কিছু একাকার হয়ে মনে হতে লাগল তার থেকে জ্যোতির আভা বেরুচ্ছে এবং শুধু মাত্র একটি শব্দ শোনা যেতে লাগল এবং সেটি হল 'সত্য'।

সাধু ব্যক্তিটি অভিভূত হয়ে দেবদূতকে সকৃতজ্ঞভাবে বললেন, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। পরম সত্য তাহলে আছে! আমি সেটি এখন জানতে পেরেছি।"

মৃদু হাস্যে দেবদূত বললেন, "তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, আছে—তবে আছে।"

সাধু ব্যক্তিটি পুনর্বার ঘাবড়ে গিয়ে সভয়ে বললেন, "কিন্তু এখন যা দেখছি ও শুনছি, তাই কি পরম সত্য নয়? পরম সত্যের জ্যোতির্ময় বলয় দেখা যাচ্ছে।"

দেবদূত উত্তরে বললেন, "হবেও বা। অন্ততপক্ষে তার নিকটতম যতখানি আসা যায়, আমরা এসেছি।"

আপেক্ষিকতাবাদকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে আইনস্টাইন যে কয়টি প্রণালীকে উপযুক্ত বলে মনে করতেন, উপরিউক্ত উপায়টি ছিল তার একটি, কারণ এটিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক—এই দুই চিন্তাধারার ভিতরে সুন্দর মিল ছিল। তিনি বলতেন, "প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি আসতে হলে একমাত্র পথ হবে যে, যদি প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে এটিকে চান এবং যদি তিনি মনে করেন যে, তিনি তাঁর সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তবে সরবে সেই প্রাপ্তির ঘোষণা করা। সত্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে চাকার প্রতিটি ঘূর্ণনে আমরা সত্যের কিছুটা কাছাকাছি এগিয়ে যেতে পারব।"

আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির প্রেরণা কি করে পেলেন এবং এই মতবাদটি কি—সে সম্বন্ধে নীচে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

'আরাউ' পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, সেখানে পাঠ্যাবস্থায় আইনস্টাইনের মনে আলোর কতকগুলি গুণ বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। এই গুণগুলি উদ্ভূত হয়েছিল প্রধানতঃ দুটি বিষয় থেকে। প্রথমটি হল ম্যাক্সওয়েলের মতবাদে আলো ও অন্যান্য বিকীর্ণ শক্তিকে সেকেণ্ডে 300, 000 কিঃ মিঃ বেগে চলন্ত বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গরূপে বিবেচনা করা ও দ্বিতীয়টি হল মাইকেলসন-মর্লে'র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঈথারের কোন অস্তিত্ব না পাওয়া। বিজ্ঞানীরা এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার কারণ হল—যদি ঈথার বলে কোন মাধ্যম বিশ্বে পরিব্যাপ্ত না থাকে, তবে ঈথারকে ভিত্তি করে আলো, বিদ্যুৎ ও চুম্বক সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া

গিয়েছিল, সে সব মিথ্যা হয়ে যায়, আর মিথ্যা হয়ে যায় গ্যালিলিও ও নিউটনের দ্বারা কল্পিত বিশ্বের যান্ত্রিক রূপ। আবার যদি মাইকেলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঈথারের অস্তিত্ব অস্বীকার না করা যায়, তবে পৃথিবীর আবর্তন বেগ মিথ্যা হয়ে যায়, যার অর্থ হল—পৃথিবী স্থির এবং কোপার্নিকাসের মতবাদ ভুল।

মাইকেলসনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আলোর বেগের মানের যে অপরির্তনীয়তা (constancy) দেখা গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে ফিৎজেরাল্ড, লোরেন্ৎস ও পোয়াঁকারে কিছু কিছু মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলির দ্বারা সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে সেরূপ সুস্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া যায় না। আইনস্টাইন 1905 সালে সব বিষয় বিবেচনা করে যে সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ সৃষ্টি করলেন, সেটিই হল বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদ। এই মতবাদ বিজ্ঞান-জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল।

আইনস্টাইন এই মতবাদে নিউটনের মহাকাশ ও সময় সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন করলেন। নিউটন মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব (physical reality) স্বীকার করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, বস্তু থাকুক বা না থাকুক, মহাকাশ থাকবেই, মহাকাশ অনন্ত,অনন্যগত অর্থাৎ পরনির্ভরশীল নয় (independent), এবং স্থিতিশীল (stationary)। তাঁর সময়ে পৃথিবীর জটিল গতির বিষয়ে সেরূপ কিছু জানা ছিল না। বিশ্বের যতটুকু জানা গিয়েছিল, তাথেকে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, এই সদাচঞ্চল বিশ্বে আপেক্ষিক বেগ (relative motion) ও পরম বেগের (absolute motion) পার্থক্য জানা খুবই কঠিন। তিনি বলেছিলেন, “In the remote regions of the fixed stars or perhaps far beyond them, there may be some body absolutely at rest”. অর্থাৎ “মহাকাশের স্থির তারকাদের সুদূর অঞ্চলে কিংবা সম্ভবতঃ তার চেয়েও দূরে কোন বস্তু হয়ত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল অবস্থায় আছে” এবং এই পরম স্থির বস্তুটির সাপেক্ষে কোন চলন্ত বস্তুর পরম বেগ বের করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এইরূপ স্থির বস্তু যদি না থাকে, তবে নিশ্চল মহাকাশকেই অটল সম্পর্ক-নির্ধারক রূপে (fixed frame of reference) ব্যবহার করে ঘূর্ণায়মান গাগনিক বস্তুগুলির পরম বেগ বের করা যেতে পারে।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কোন সচল বস্তুর, ধরা যাক একটি মোটর গাড়ীর, বেগ বের করতে হলে আমরা কোন একটি স্থির বস্তু থেকে গাড়ীটি এক সেকেণ্ডে, কি এক ঘণ্টায় কতটা দূরে যেতে পারে, তাই জেনে নিয়ে বলি যে, গাড়ীটির বেগ সেকেণ্ডে, কি ঘণ্টায় কত। এখানে আমরা পৃথিবীকে স্থির বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী সেকেণ্ড 30 কিঃমিঃ বেগে সচল। সুতরাং মোটর গাড়ীটির পরম বেগ জানা যায় না।

নিউটনের পরবর্তী দুই শতাব্দীতে তাঁর মহাকাশ সম্বন্ধে ধারণা ও বিশ্বের যান্ত্রিক রূপের ধারণা প্রচলিত ছিল। এই ধারণা আরও সমর্থিত হল আলোর তরঙ্গ-রূপের প্রবর্তনে। পদার্থবিদ্যাবিদেরা মহাকাশকে কল্পনা করলেন একটি বস্তুপূর্ণ পাত্র হিসেবে, যে পাত্রে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ঈথার। এই পাত্রের ঈথারে তারকা ইত্যাদি গাগনিক বস্তুগুলি সঞ্চরণ করছে এবং আলো এই ঈথারে তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হচ্ছে।

সময় সম্বন্ধেও নিউটনের অনুরূপ ধারণা ছিল। তাঁর ধারণাতে ছিল যে, সময় অনন্ত, অনন্যগত ও বিশ্বের যে কোন বস্তুতে সময়ের গতি অভিন্ন (invariant)। তাঁর মতে, যদি সম্পূর্ণরূপে একই গঠনের ও নিখুঁতভাবে সময় নির্দেশক কতকগুলি ঘড়ি তৈরি করে বিভিন্ন বেগে চলন্ত কতকগুলি গাগনিক বস্তুতে রাখা যায়, তবে যে-কোন মুহূর্তে ঘড়িগুলিকে একসঙ্গে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি ঘড়িতে নির্দেশনা এক (same), অর্থাৎ সময়ের গতি অবিচল।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, নিউটনের মহাকাশ ও সময়ের ধারণা ঠিক নয়। বস্তু ছাড়া মহাকাশের অস্তিত্বই নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। তেমনি ঘটনা (event) থেকেই সময়ের ধারণা পাওরা যায়। বিশ্বে বস্তু ও ঘটনা ঘটিত না হলে সময় বলে কিছুই নেই। বিভিন্ন বেগে সচল বস্তুতে সময়ের গতি বিভিন্ন।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত মতে মহাকাশ ও সময় এই দুটির প্রত্যেকটি শুধু যে অনন্যগত বা পরনির্ভরশীল—তাই নয়, মহাকাশ ও সময় অবিচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত, একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যায় না। এই বিশ্ব হল মহাকাশ-সময়-সন্ততি (space-time

continuum) ; সমস্ত বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে মহাকাশে ও সময়ে এবং এই দুটি অবিভাজ্য। সময়ের সব পরিমাপ প্রকৃতপক্ষে মহাকাশে পরিমাপ এবং বিপরীতভাবে মহাকাশে সব পরিমাপ সময়ের পরিমাপের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ এই বিশ্বকে জানি তিন-মাত্রার (three-dimensional) বলে। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্ব হল চার-মাত্রার। এই বিশ্বে কোন একটি বিন্দু বা বস্তুর অবস্থান বোঝাতে হলে অক্ষাংশ (latitude), দ্রাঘিমা (longitude) ও উচ্চতা (altitude)—এই সাধারণ তিন মাত্রা ছাড়াও চতুর্থ মাত্রা হবে সময়।

আইনস্টাইন বললেন যে, মাইকেলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পৃথিবীতে আলোর বেগের মান যখন ধ্রুবক (constant) বলে দেখা গিয়েছে, তখন ধরে নিতে হবে যে, বিশ্বে যে-কোন বস্তুতে আলোর বেগ অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র একই মানের। ঈথারের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। অপরিবর্তনীয় (invariant) যেটি, সেটি সময় নয়, সেটি হল আলোর বেগ। আলোর বেগই হল বিশ্বে সর্বোচ্চ। অন্য কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান কখনই হতে পারে না। বিশ্বে পরম বলে কিছুই নেই—সব আপেক্ষিক।

আইনস্টাইন গ্যালিলিও কর্তৃক প্রবর্তিত আপেক্ষিকতাবাদকে ব্যাপকতর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্যালিলিও বলেছিলেন যে, বলবিদ্যার নিয়মাবলী (mechanical laws) কোন একটি মাধ্যমে অকাট্য (valid) বলে প্রমাণিত হলে, এই মাধ্যমের সাপেক্ষে সমবেগে (uniform velocity) চলন্ত অন্য সব মাধ্যমেই এই নিয়মাবলী অকাট্য হবে। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বলেন যে, শুধুমাত্র বলবিদ্যার নিয়মাবলীই নয়, পদার্থ-বিদ্যার সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল কোন একটি মাধ্যমে অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে, সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে সমবেগে চলন্ত সব মাধ্যমেই এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য হবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে—কোন চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য তার গতির দিকে সঙ্কুচিত হয়. পৃথিবীর সাপেক্ষে কোন চলন্ত মাধ্যমে সময় অপেক্ষাকৃত ধীরে চলে, কোন চলন্ত বস্তুর ভর বেড়ে যায়।

এই মতবাদে আমরা জানতে পারি আইনস্টাইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তটি। সেটি হল ভর ও শক্তির তুল্যতা (equivalence of mass

and energy), অর্থাৎ ভরই শক্তি কিংবা শক্তিই ভর। এটি তিনি একটি ছোট সূত্র দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেটি হল $E=m\times c^2$, যেখানে m হল কোন বস্তুর ভর, c হল আলোর বেগ, এবং E হল শক্তি। বর্তমান পারমাণবিক যুগে এই সুত্রটির গুরুত্ব যে কতখানি, তা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। এক গ্র্যাম ভরের কোন বস্তুকে যদি শক্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর হয়, তবে শক্তির পরিমাণ হবে 9×10^{20} আর্গস, যা হল আড়াই কোটি বৈদ্যুতিক কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককের সমান।

আইনস্টাইন 1906 খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রিয় বন্ধুদ্বয় হাবিখ্‌ৎ (Habicht) ও সোলোভিনকে (Solovine) চিঠিতে জানালেন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির কথা। এই সব প্রবন্ধেই তিনি লিখেছিলেন ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব, আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব ও আলোর কণিকারূপ, এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত বস্তুর ভর ও শক্তির তুল্যতা (equivalence of mass and energy)। এই সব প্রবন্ধ Annalen der Physik পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে যখন তিনি তাঁর নিজস্ব কপিগুলির জন্যে আগ্রহভাবে অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় হাবিখ্‌তের (Habicht) নিকট থেকে অনেক দিন কোন চিঠি না পেয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা ও বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার কথা। এই চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে সেই রঙ্গরসের আভাস পাওয়া যায়। বন্ধুর কাছ থেকে অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে তিনি তাঁকে সম্বোধন করছেন একটি শিলীভূত তিমিমাছ ও নীরস জারিত আত্মার একটি টুক্‌রো বলে। তিনি সত্তর ভাগ ক্রোধ ও ত্রিশ ভাগ করুণা মিশ্রিত কোন একটি কিছু বন্ধুর মাথায় ছুঁড়ে মারবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিতেই শেষের দিকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি লেখক হিসেবে তাঁর প্রাপ্য কপিগুলির জন্যে অপেক্ষা করছেন।

হাবিখ্‌ৎ 1905 খ্রীস্টাব্দে বার্ণ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন একটি চাকরী নিয়ে। কিন্তু সেখানে যে-কোন কারণেই হোক তিনি সুখী ছিলেন না। আইনস্টাইন সেটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রিয় বন্ধুর কিছুটা উপকার করবার জন্যে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে কয়েক মাস পরে একখানা চিঠিতে

লিখেছিলেন যে, তিনি পেটেন্ট অফিসের কর্তা হলারকে অনুরোধ করে হাবিখ্‌ৎকে পেটেন্ট অফিসে একটি চাকরী পাইয়ে দিতে পারেন। পেটেন্ট অফিসে কাজের বিশেষ চাপ নেই। দৈনিক আট ঘন্টা কাজ, তারপর আট ঘন্টা আলস্যে কাটাবার সময় পাওয়া যায়। এ ছাড়া একটি পুরো রবিবার ছুটি।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর কয়েক মাসের ভিতরেই প্লাঙ্ক (Planck), ভীন (Wien) প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পদার্থ-বিদ্যাবিদ্‌ উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের মতে আইনস্টাইনের চিন্তাধারা পদার্থবিদ্যায় নূতন যুগ ও বিপ্লব আনছে। কিন্তু এসত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্ম-জীবনের উন্নতির কথা একবারও চিন্তা করেন নি। তিনি চিন্তা করেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু হাবিখ্‌তের কথা। যখন তাঁর জীবনে যশ, খ্যাতির সূত্রপাত হতে আরম্ভ করেছে, তখন তিনি তাঁর পেটেন্ট অফিসের সামান্য কাজ নিয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট—আট ঘন্টা অফিসের কাজ আর আহার-নিদ্রা ছাড়া বাকী আট ঘন্টা অবসর বিনোদন, যা ব্যয় করছিলেন বিজ্ঞানের সাধনায়। আইনস্টাইনের চরিত্রের এইটি বিশেষত্ব। সম্মান, যশ, খ্যাতি, অর্থ ইত্যাদি যা মানুষের কাম্য, তার জন্যে তিনি জীবনে কোনদিন লালায়িত হন নি। তিনি এইসব বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন—যা পেয়েছেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি পরে যখন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন—কেউ তা উল্লেখ করলে তিনি লজ্জিত হতেন। তাঁর নাম পৃথিবীর বহুলোক জানে ও বহুলোকে তাঁকে চেনে—একথা তিনি বিশ্বাস করতে চাইতেন না। এই অসাধারণ মানুষটি নিজেকে অতি সাধারণ মনে করতেন।

আইনস্টাইনের সহায়তায় 'The Evolution of Physics' নামক বিখ্যাত পুস্তকটির লেখক ইনফেল্ড (Infeld) তাঁর স্মৃতিকথায় কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ইনফেল্ড সুযোগ পেয়েছিলেন বেশ কিছুদিন প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের অধীনে পদার্থবিদ্যায় তত্ত্বীয় গবেষণা করবার। তিনি ও আইনস্টাইন একদিন 'Life of Emile Zola' ছবিটি একটি সিনেমা গৃহে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরা টিকিট কিনে লোকভর্তি ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ছবিটি শুরু হতে তখনও 15 মিনিট দেরী ছিল। আইন-স্টাইন অতক্ষণ বসে না থেকে কিছুক্ষণ বেড়াতে যেতে চাইলেন। বাইরে এসে

ইনফেল্ড দ্বাররক্ষককে বললেন যে, তাঁরা কয়েক মিনিট পরেই ফিরবেন। কিন্তু আইনস্টাইন চিন্তিত মুখে ও আন্তরিকভাবে দ্বাররক্ষককে বললেন, "আমাদের কাছে ত এখন আর টিকিট নেই। তুমি কি আমাদেরকে চিনতে পারবে?" ইনফেল্ড লিখেছেন, "দ্বাররক্ষকটি ভাবল যে, আমরা ঠাট্টা করছি এবং সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, প্রফেসর আইনস্টাইন, আমি চিনব'।"

ইনফেল্ড লিখেছেন যে, প্রিন্সটনে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রায়ই কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে হেঁটে বেড়াতে যেতেন। তিনি লক্ষ্য করতেন যে, রাস্তায় প্রায় প্রতিটি লোকই বিস্মিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাঁরা জনাকীর্ণ রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে কিংবা নির্জন গলি দিয়ে হাঁটতেন। একদিন তাঁরা যখন হাঁটছেন, একটি গাড়ী তাঁদের সামনে এসে থামল এবং একজন আধা-বয়সী মহিলা গাড়ী থেকে একটি ক্যামেরা হাতে নিয়ে লজ্জিত ও উত্তেজিত ভাবে আইনস্টাইনের সামনে এসে বললেন, "প্রফেসর আইনস্টাইন, আপনি দয়া করে আমাকে আপনার একটি ফোটো তুলতে কি অনুমতি দেবেন?" আইনস্টাইন "হাঁ, নিশ্চয়ই" বলে স্থিরভাবে দু-এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে আবার বৈজ্ঞানিক বিষয়টি আলোচনা করতে করতে হাঁটা শুরু করলেন। ইনফেল্ড লিখেছেন যে, ঐ ঘটনার স্মৃতি আর আইনস্টাইনের মনে রইল না।

আইনস্টাইনের চিকিৎসক গুস্তাভ বাকি (Gustav Bucky) লিখেছেন যে, আইনস্টাইনের অন্তর ছিল মানুষের প্রতি দরদ ও ভালবাসার সুধারসে পূর্ণ। সেজন্যে আইনস্টাইনকে ভালভাবে জানতেন এইরূপ বহু লোকের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, এই মানুষটির ভিতরে কোন্‌টি মহত্তর—তাঁর মস্তিষ্ক, যা দিয়ে বিশ্বের গঠন আবিষ্কার করেছেন, না তাঁর অন্তর—যা মানুষের দুঃখে বিগলিত হয় ও প্রতিটি সামাজিক অবিচারে সাড়া না দিয়ে পারে না। বাকি লিখেছেন যে, বহু চিত্রশিল্পী আসতেন আইনস্টাইনের প্রতিকৃতি আঁকতে। আইনস্টাইন নিজের প্রতিকৃতি আঁকার জন্যে বসে থাকতে খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু কোন চিত্রশিল্পী যদি বলতেন যে, আইনস্টাইনের ছবি আঁকলে সেই শিল্পীর কিছু আর্থিক সাহায্য হয়, তবে বিনা প্রতিবাদে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন ঐ গরীব শিল্পীকে তাঁর ছবি আঁকার সুযোগ দেবার জন্যে।

এখানে আইনস্টাইনের আর একটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। সেটি হল তাঁর নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা। বিজ্ঞানী হিসাবে যখন তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিজ্ঞান জগতে তাঁর কাজ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হচ্ছে, সেই সময় 1909 খ্রীস্টাব্দে তিনি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় 350তম বার্ষিকীতে তাঁকে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। ঐ বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের অনেকে বলেছেন যে, আমন্ত্রিত সূচীশিল্পদ্বারা পরিশোভিত কোট (embroidered frock coat) পরিহিত ফরাসী পণ্ডিতদের, মধ্যযুগীয় লম্বা ঢিলে কোট পরিহিত ইংরেজ পণ্ডিতদের এবং পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত বিভিন্ন চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ পরিহিত দুই শত জন পণ্ডিতদের মধ্যে আইনস্টাইনের তৃণনির্মিত টুপি ও অতি-সাধারণ সুট একমাত্র স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল দৃশ্য ছিল।

ইনফেল্ড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আমি যখন প্রিন্সটনে প্রথম দিন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, তিনি খুব খুশী হয়ে শুরু করলেন তাঁর একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) সম্বন্ধে কাজের কথা। কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞানী লেভি-চিভিতা (Levi-Civita) সেই ঘরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু আইনস্টাইনকে আমার সঙ্গে কথাবার্তায় রত দেখে সেই ঘর থেকে চলে যাবার চেষ্টা করলে আইনস্টাইন তাঁকে থাকতে বলে আমার সঙ্গে যতটুকু আলোচনা হয়েছিল, তা পুনরায় বললেন এবং কিছুক্ষণের ভিতরে গাণিতিক সূত্র সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন হলেন। ঘরে একটি ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্কগুলি লিখে আলোচনাকালে আইনস্টাইনকে কয়েক সেকেণ্ড পর পরই তাঁর থলের মত ঢলঢলে (baggy) প্যান্টকে টেনে টেনে তুলতে দেখবার দৃশ্যটি আমি কোন দিন ভুলব না। দৃশ্যটি যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি হাস্যোদ্রেককর। আমি অতি কষ্টে উচ্চৈঃস্বরের হাসি থেকে নিবৃত্ত হলাম এবং মনে মনে নিজেকে বলতে লাগলাম, "তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করছ এবং তুমি হাসতে চাও, কারণ তাঁর পরিচ্ছদে পারিপাট্য নেই, তিনি ইস্ত্রীবিহীন ঢলঢলে প্যান্টের সঙ্গে গ্যালিস (suspender) ব্যবহার করেন নি বলে।"

আইনস্টাইনের প্যান্টের সঙ্গে গ্যালিস ব্যবহার না করা কৌতুহলোদ্দীপক

হতে পারে, কিন্তু কখনও তা উপহাসাস্পদ (ridiculous) নয় ; এটি একটি প্রখর চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান জীবনের অভিব্যক্তি। ঐরূপ মনীষীর জীবনে বাহ্যিক আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন হয় না।

একবার ইনফেল্ডের পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আইনস্টাইন কেন অত লম্বা চুল রাখেন, কেন একটি অদ্ভুত চামড়ার জ্যাকেট পরেন, কেন মোজা পরেন না, কেন গ্যালিস কিংবা কলার ব্যবহার করেন না। ইনফেল্ড বলেছিলেন, "উত্তর অতি সহজ এবং এটি অনুমান করা যায় তাঁর বহির্জগৎ থেকে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়ে একান্তে থাকবার বাসনা থেকে। প্রয়োজনবোধকে ন্যূনতম করে তাঁর জীবনযাপনের স্বাধীনতাকে বাড়াবার জন্যে। লম্বা চুল রাখলে নাপিতের প্রয়োজন অতি কম হয়। মোজা ছাড়া জুতো ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। মোজা থাকলেই তা রিপুর প্রয়োজন, পরিষ্কার করার প্রয়োজন। একটি চামড়ার জ্যাকেট ব্যবহার করলে বহু বছর আর কোন কোটের প্রয়োজন হয় না। গ্যালিস, রাত্রিবাসের জামা ও পাজামা অনাবশ্যক। আইনস্টাইন ন্যূনতম প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান করেছেন, এর চেয়ে আর কিছু কমানো যায় না।"

একবার আইনস্টাইন সস্ত্রীক লণ্ডনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তাঁরা লর্ড হলডেনের (Haldane) অতিথি হয়েছিলেন। বিরাট প্রাসাদের যে ঘরে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রকাণ্ড ঘরটি তাঁদের বার্লিনের গোটা বাড়ী থেকে বড় ছিল। এই বিরাট সুসজ্জিত ঘরে আইনস্টাইন অস্বস্তি বোধ করছিলেন এবং সেটি আরও বেড়ে গেল যখন একজন চাপরাসীকে তাঁদের তত্ত্বাবধানের জন্যে রাখা হল। চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ পরিহিত চাপরাসীকে দেখে তিনি তাঁর পত্নীকে ফিস ফিস করে বললেন, "এলসা, আমরা যদি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই, ওরা কি বাধা দেবে?" তাঁদের শোবার ঘরটিও ছিল অতি বৃহৎ ও জানালাগুলি মোটা দামী পরদা দিয়ে ঘেরা। পরদিন খুব ভোরে আইনস্টাইন উঠে পরদাগুলি সরাবার জন্যে বৃথাই টানাটানি করছিলেন। আওয়াজ শুনে এলসা হেসে বললেন, "আলবারতল, তুমি চাপরাসীকে ডাক নি কেন?" আইনস্টাইন বললেন, "না, না, চাপরাসীকে দেখলে আমার ভয় করে।" তখন তাঁরা দু-জন অনেক চেষ্টার পর পরদাগুলি তুলতে পারলেন।

এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করা হল আইনস্টাইনের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের উদাহরণস্বরূপ। তিনি "The World As I See It" পুস্তকে লিখেছেন, "প্রতিদিন শতবার আমি স্মরণ করি যে, আমার অন্তর ও বাহির দুই জীবনই অপর জীবিত কি মৃত লোকেদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এবং আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি, যতটা পেয়েছি ও এখনও পাচ্ছি, সেই পরিমাণ দান করতে। আমি সরল জীবনযাপনের খুবই পক্ষপাতী। প্রায়ই এই চিন্তা আমাকে দুঃখিত করে যে, অন্য লোকেদের পরিশ্রমের অনাবশ্যক পরিমাণ আমি আত্মসাৎ করছি। আমার দৃঢ় ধারণা যে, প্রত্যেকের পক্ষে সরল জীবনযাপন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই উপকারী।"

তখনকার দিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু অনেকে, যেমন মাখ, আবার এই তত্ত্বের কোন আমল দিলেন না। নের্ণস্টের (Nernst) মত অত বড় পদার্থবিদ্যাবিদ্ ও রসায়নবিদ্ বললেন যে,আইনস্টাইনের ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব আপেক্ষিকতাবাদের চেয়ে বেশী উঁচু দরের। তাঁর মতে আপেক্ষিকতাবাদ ঠিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, বরং দার্শনিক মতবাদ। লেনার্ড আইনস্টাইনের তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এর একমাত্র কারণ যে, লেনার্ড ছিলেন খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী জার্মান এবং আইনস্টাইন ছিলেন জার্মান ইহুদী। বহু বছর লেনার্ড আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রবন্ধ লিখেছেন। এমন কি 1921 খ্রীস্টাব্দে যখন আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হল, লেনার্ড কালবিলম্ব না করে সুইডিস অ্যাকাডেমির নিকট একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আইনস্টাইনের নিজের খ্যাতির প্রতি উদাসীনতা। যে সময় তিনি পদার্থবিদ্যায় নূতন যুগের সৃষ্টি করতে চলেছেন, সেই সময়ে অনেক সন্ধ্যাকাল কাটিয়েছেন বেহালা বাজিয়ে একটি কুইনটেটে (quintet)। কুইনটেট হল পাঁচটি বাদ্যযন্ত্রের উপযোগী যৌথ সঙ্গীত। তিনি ছাড়া অপর চারজন ছিলেন উকিল, গণিতের শিক্ষক, দপ্তরী ও জেলের দ্বাররক্ষক। কিন্তু এই চারজনের কেউ জানতেন না যে, তাদের বেহালাবাদক সঙ্গীটি পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব নিয়ে এসেছেন।

সত্যানুসন্ধানী আইনস্টাইন চিরজীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন প্রাকৃতিক সত্যকে জানতে, যশ খ্যাতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে। ব্যক্তিত্ব পূজা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গভীর ভক্তি প্রদর্শন, যাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তিপূজা-

বাদ (personality cult), এ সব তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁর একটি চিঠি থেকে এই মনোভাব বেশ বোঝা যায়। 1955 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বার্লিনে বিজ্ঞানীরা আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের পঞ্চাশতম বার্ষিকী বা সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব করতে মনস্থ করে এই মতাবাদের আবিষ্কারক আইনস্টাইনকে অনুরোধ জানালেন বার্লিনে আসবার জন্যে। তিনি উত্তরে লিখলেন, "বার্ধক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আমি অবশ্যই বলব যে, আমি এজন্যে দুঃখিত নই, কারণ ব্যক্তিপূজাবাদ জাতীয় সব কিছুকেই আমি সব সময়ই অত্যন্ত অপছন্দ করি।"

দিনে দিনে আইনস্টাইনের নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বার্ণ সহরের অধিবাসীরা ক্রমশঃ জানত পারলেন যে, তাঁদের সহরের পেটেণ্ট অফিসের এক কর্মচারী আইনস্টাইন বিজ্ঞানে নবযুগের সৃষ্টি করতে চলেছেন। যদিও বিজ্ঞানে উৎসাহী কতিপয় লোক চেষ্টা করতে লাগলেন আপেক্ষিকতাবাদ বুঝতে, কিন্তু বেশীর ভাগ জনসাধারণই এই জটিল তত্ত্বের শুধু নামই শুনলেন, এই তত্ত্বের বিষয় কি, তা বুঝবার মত তাদের অত জ্ঞানও ছিল না, আগ্রহ ছিল না। একবার বার্ণে এক সভায় আইনস্টাইনকে আহ্বান করা হল তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে। তিনি যখন তাঁর বক্তৃতার মাঝে বললেন, "আমার বিশ্বাস যে, আপনারা এই মতবাদকে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন," তখন শ্রোতাদের বেশীর ভাগই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন এবং প্রায় মিনিট পাঁচেক এই হাসির রোল চলল, কারণ অনেকে এই মতবাদকে উদ্ভট ও আজগুবি মনে করেছিলেন। আইনস্টাইন শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আজ আপনারা হাসছেন। কিন্তু আমার মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হলে জার্মানরা দাবী করবে যে, আমি একজন জার্মান এবং সুইসরা বলবে যে, আমি একজন সুইস নাগরিক। কিন্তু যদি এটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তবে সুইসরা বলবে যে, আমি একজন জার্মান এবং জার্মানরা বলবে যে, আমি একজন ইহুদী।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আইনস্টাইন যে সব বিষয় বলে গিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটিই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি দুঃখের ঘটনা ঘটতে লাগল। তাঁর কাকা জ্যাকব মারা গেলেন। তাঁর বাবার স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে লাগল।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল মিলেভার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া। পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। মিলেভা মনের স্থিরতা হারিয়ে ফেললেন, খুবই খিট্‌খিটে মেজাজের হয়ে উঠলেন এবং স্নায়বিক অবসাদ রোগে আক্রান্ত হলেন। আইনস্টাইনের অতি সাধারণভাবে জীবন-যাত্রা, হাস্য উদ্রেককর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা ও তাঁর অন্যমনস্কতা ক্রমশঃ অধিকতরভাবে মিলেভার বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এর কিছুটা কারণ আছে। আইনস্টাইনের চাকরীর প্রথম কয়েকটি বছরে যখন তিনি অখ্যাত এবং অর্থের দিক দিয়ে তাঁর খুবই অসচ্ছল অবস্থা, মিলেভা তখন মানিয়ে চলছিলেন এবং প্রকৃত সহচরীরূপে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি নজর রেখেছিলেন। কিন্তু যখন বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন মিলেভার মনে পড়তে লাগল নিজের শিক্ষা জীবনের কথা ও বিয়ের আগের নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। মিলেভা মাঝে মাঝেই আইনস্টাইনকে বলতে লাগলেন আইনস্টাইনের জন্যে তাঁর নিজের ত্যাগ স্বীকারের কথা এবং নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ থেকে বঞ্চিত হবার কথা। এর জন্যে আইনস্টাইন মনে খুবই বেদনা বোধ করতেন। তাঁদের দু-জনের ভিতরে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে গেল, যার ফলে কয়েক বছর পরে 1919 খ্রীস্টাব্দে তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ করলেন।

মিলেভার সঙ্গে আইনস্টাইনের বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও, আইনস্টাইন মিলেভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মিলেভার মনোভাব তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁদের বিয়ের প্রথম কয়েক বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিলেভা মনের বল হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই নোবেল পুরস্কার পাবার পর, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এল্‌সার অনুমতি নিয়ে তিনি মিলেভাকে ঐ পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ পাঠিয়ে দেন, বাকী অর্ধেক অর্থ তিনি দান করেন। মিলেভা তখন তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে প্রাগে শিক্ষকতার কাজ করছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কণাবাদ আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পদার্থবিদ্যায় একজন বিরাট প্রতিভাশালীর আবির্ভাব হয়েছে, যা কোন একটি শতাব্দীতে কেবলমাত্র একবারই হতে পারে। কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্থির করলেন যে, আইনস্টাইনের মত এত বড়

বিজ্ঞানীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত, কারণ তাহলে ছাত্রেরা খুবই উপকৃত হবে। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ আইনস্টাইনকে দেবার জন্যে প্রস্তাব করা হল। কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কাউকে সরাসরি অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাবে না। তাঁকে কিছুদিন Assistant Professor বা সহকারী অধ্যাপকের পদের সমতুল্য Privatdozent-এর পদে কাজ করতে হবে। আইনস্টাইনকে বার্ণের বিশ্ববিদ্যালয়ে Privatdozent-এর পদ দেওয়া হল। এই পদের কাজ হল ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়গুলির বহির্ভূত কোন বিষয়ে শিক্ষকতা করা, যা হল প্রধানতঃ নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। এর জন্যে তাঁকে পেটেন্ট অফিসের কাজ ছাড়তে হল না। বাড়তি সময়ে শিক্ষকতার কাজ করতে লাগলেন।

1909 খ্রীস্টাব্দে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদটি খালি হল। আইনস্টাইন এই পদের প্রার্থী হলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের সহপাঠী ফ্রেডরিক আডলার উইনটেরথারে (Winterthur) কিছুদিন শিক্ষকতার পর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করছিলেন ও শিক্ষকতায় তাঁর বেশ সুনামও হয়েছিল। তাছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক (Social democratic) পার্টির সদস্য। আডলারও ঐ পার্টির সদস্য ছিলেন। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ পদটি খালি হলে তাঁরা আডলারকেই ঐ পদের সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী বলে স্থির করলেন। কিন্তু আডলার বললেন যে, গবেষক হিসেবে আইনস্টাইনের যোগ্যতার কাছে তাঁর নিজের যোগ্যতার তুলনাই হতে পারে না এবং আইনস্টাইনের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে নিলে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক উপকৃত হবে এবং সম্মানও বেড়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ তখন আডলারকে অধ্যাপকের পদ দিয়ে, আইনস্টাইনকে 'extraordinary' অধ্যাপকের পদ দিলেন। এই পদটি পুরা অধ্যাপকের (Full Professor) পদের নীচে। বন্ধু আডলার কর্তৃপক্ষের কাছে ঐরূপ সুপারিশ করেছেন বলে আইনস্টাইন খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই আডলার সহপাঠী আইনস্টাইনের মেধা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে আডলার ছিলেন মাখের শিষ্য, যার জন্যে তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে মেনে নিতে পারেন নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুরিখ ও প্রাগ

1

1909 খ্রীস্টাব্দে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে আইনস্টাইন বার্ণের কাজ ছেড়ে দিয়ে জুরিখ চলে এলেন। কিন্তু মাইনের দিক দিয়ে সেরূপ লাভবান হলেন না, বরং বার্ণে সব মিলিয়ে মাসে যে অর্থ উপার্জন করছিলেন, জুরিখে তার চেয়ে কমই পেতে লাগলেন। তা ছাড়া জুরিখ বার্ণের চেয়ে অধিকতর ব্যয়বহুল জায়গা। এজন্যে মিলেভার পক্ষে সংসারের খরচ চালানো কষ্টকর হল। তিনি খরচ মিটাবার জন্য বাড়ীতে কয়েকজন ছাত্রকে রাখলেন, যাদের কাছ থেকে থাকা ও খাওয়ার জন্যে অর্থ নিতেন (paying guest)।

জুরিখে এসে আইনস্টাইন অনেক পুরনো বন্ধু, বিশেষ করে মার্সেল গ্রসমানকে পেয়ে খুবই খুশী হলেন। কলেজে ছাত্রজীবনে গ্রসমান প্রতিটি ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতার বিষয়গুলি সযত্নে লিখে রাখতেন আর আইনস্টাইন সেগুলি পরীক্ষার আগে পড়ে পাশ করতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আইনস্টাইন কয়েকজন অধ্যাপকের বক্তৃতা পছন্দ করতেন না বলে তাঁদের ক্লাসে অনুপস্থিত থেকে লাইব্রেরীতে কি নিজের ঘরে বসে নিজের পছন্দমত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের লেখা বই পড়তে ভালবাসতেন।

1909-1910 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের অধ্যাপনার বিষয় হল বলবিদ্যা (mechanics), তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) এবং তাপের গতিতত্ত্ব (kinetic theory of heat)। 1910-1911 খ্রীস্টাব্দে বিষয় হল বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান (electricity), চুম্বক-বিজ্ঞান (magnetism) এবং কতকগুলি বাছাই করা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার (theoretical physics) বিষয়।

প্রথম থেকেই ছাত্রদের মনে তিনি অভিনবত্বের সঞ্চার করেছিলেন। ছাত্রেরা বুঝতে পেরেছিল যে, এই জীর্ণ ও বেশীর ভাগ দিনই ইস্ত্রীবিহীন পোষাকপরা অধ্যাপকটি, যাঁর প্যাণ্টের পায়ের দিক বেশ খাটো এবং পকেটে একটি লোহার ঘড়ির শিকল, অন্যান্য অধ্যাপকদের থেকে একেবারে আলাদা

জাতের, যাকে বলা যেতে পারে যে, অন্য চারজনের মত নয়—একেবারে পঞ্চম। তাঁর পড়াবার ভঙ্গীটিও ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, যার জন্যে সহজেই ছাত্রদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। এক টুকরা কাগজে তাঁর দিনের বক্তৃতার বিষয়ের মুখ্য কয়েকটি কথা (main points) লিখে নিয়ে এসে বক্তৃতা শুরু করতেন ; মনে হত যেন বক্তৃতাটি তাঁর মস্তিষ্ক থেকে ফোয়ারার মত প্রবাহিত হয়ে আসছে।

হ্যান্স ট্যানার (Hans Tanner) 1909 থেকে 1911 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আইন-স্টাইনের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য কোন কোন কায়দাদুরস্ত ও সুন্দর রচনাশৈলীসম্পন্ন অধ্যাপকদের বক্তৃতা হয়ত আমাদেরকে মুগ্ধ করত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র ও এই সব অধ্যাপকদের ভিতরে ব্যবধানের কথা ভেবে আমাদের মনকে পীড়িত করত। কিন্তু আইনস্টাইন ছিলেন আমাদের নিজের মানুষ। তাঁর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে আমাদের মাঝে মাঝে মনে হত হয়ত আমরা মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলব। তাঁর বক্তৃতাগুলি এত সহজে কিন্তু দৃঢ়ভাবে আমাদের মনে গেঁথে যেত যে, মনে হত আমরা নিজেরাও এই বক্তৃতা দিতে পারতাম।"

আইনস্টাইনের সরল ও আন্তরিক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে ট্যানার বলেছেন, "তাঁর বক্তৃতায় কোন জায়গায় যদি কখনও বুঝতে কষ্ট হত, আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেই কথা বলে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিতে কোনপ্রকারে কুণ্ঠিত হতাম না, এমনকি মাঝে মাঝে বোকার মত প্রশ্ন করতাম। অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারের কথা আমাদের কল্পনা করতেও ভয় হত। আইন-স্টাইনের সঙ্গে ছাত্রদের সর্বপ্রকার লৌকিকতা বর্জিত মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক আরও বেড়ে গেল এই ব্যাপারে যে, তিনি অবসর সময়েও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাকতেন। এই সময়ে হয়ত কখনও কখনও কোন ছাত্রের কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কোন বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। আবার কখনও হয়ত সাপ্তাহিক সান্ধ্য পদার্থবিদ্যার আলোচনা ক্লাসের পরে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমরা কে কে তাঁর সঙ্গে কাফেতে যেতে ইচ্ছা করি। আমরা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সেখানে গেলে চা কিংবা কফি পান করতে করতে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক নানা বিষয়ে আলোচনা হত।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কলেজের ছাত্রজীবনের পুরনো বন্ধুদেরকে পেয়ে আইনস্টাইন খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি ও ফ্রেডরিক আডলার একই বাড়ীতে ভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকতেন। মাঝে মাঝেই আডলারের সঙ্গে দেখা হত এবং কখনও কখনও দু-জনে নির্জনে বসে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন হয়ে যেতেন এবং কখনও হয়ত তর্কবিতর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন ; কারণ আডলার মাখের দার্শনিক মতবাদের অনুগামী ছিলেন বলে বিশ্বের বাস্তব অস্তিত্বে (objective reality of the world) দৃঢ়বিশ্বাসী আইনস্টাইনের মতের সঙ্গে তাঁর মত মিলত না। আডলার আপেক্ষিকতাবাদও মেনে নেন নি।

2

1905 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—যথা, (1) ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব; (2) ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট বা আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব এবং (3) বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ—প্রকাশিত হবার পর তখনকার বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই প্রথম দুটির খুবই প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের জটিলতা ও উদ্ভটত্বের জন্যে প্রথম প্রথম কোন বিজ্ঞানী সেরূপ আমল দেন নি। কিন্তু আইনস্টাইন তাতে কিছুমাত্র দমেন নি। কোন বিজ্ঞানী তাঁর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এলে, যেমন আডলারের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর মতবাদের তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করতেন। তিনি নিজে থেকে কখনও কারোর কাছে তাঁর তত্ত্বের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বলতে যান নি। তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বই ছিল এই যে, তিনি জেনেছেন প্রকৃতির এক সত্যকে, যার জন্যে তিনি নিজে তৃপ্ত, অন্য কেউ সেটি গ্রহণ করল কি না, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সত্যের আলো সবার মনে একদিন উদ্ভাসিত হবেই হবে।

এইখানেই তাঁর সঙ্গে গ্যালিলিওর তফাৎ। সত্যানুসন্ধানী গ্যালিলিওর প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। গ্যালিলিওর আবিষ্কার তাঁকে খুবই অভিভূত করেছিল। কিন্তু গ্যালিলিওর নিজের মতবাদের—মূলতঃ যেটি হল কোপার্নিকাসের তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রসারের জন্যে—প্রচার করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হওয়াকে আইনস্টাইন কখনও অনুমোদন করেন নি।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, গ্যালিলিও 1621 খ্রীস্টাব্দে রোমে গিয়ে-

ছিলেন ধর্মযাজকদের কাছে তাঁর মত প্রচারের জন্যে, যার ফলে তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করে লিখে দিতে বাধ্য হতে হয় যে, তাঁর তথ্যাদি সব ভুল এবং পরে তাঁকে গ্রামে গিয়ে বাকী জীবন অন্ধ হয়ে ও দুঃখকষ্টে কাল কাটিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। এ বিষয়টি পূর্বে এক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের এক বন্ধুকে লেখা একটি চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"তিনি যে একজন অত্যুৎসাহী সত্যানুসন্ধানী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পক্ষে এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে, যারা নিজেদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানতে চায় না ও ভাসা-ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, তাদের মনোযোগকে একটি নূতন আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে একজন জ্ঞানী ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ অযথা এইরূপ বহু ক্লেশ ও বাধা অতিক্রম করবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন। অযথা তিনি সিংহের গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ধর্মাযাজকদের ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তর্ক করে তাঁর মতবাদ বোঝাবার জন্যে রোমে এসেছিলেন। যা হোক, আমি কখনও আমার আপেক্ষিকতা মতবাদের সত্যতা প্রচারের জন্যে ঐরূপ কোন ব্যাপার করব না। বিশ্বের সত্যকে আমার চেয়ে অনেক প্রবলতর মনে করি, যার জন্যে একটি তরবারি নিয়ে তাকে রক্ষা করতে যাওয়ার মত বোকামীকে আমি বাতুলতা বলে মনে করি।"

1905 খ্রীস্টাব্দের পরে আইনস্টাইনের চিন্তায় এই লক্ষ্য ছিল যে, কেমন করে আপেক্ষিকতাবাদকে বিশেষ (special) পর্যায় থেকে সাধারণ (general) পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত পূর্ণতায় এবং সামঞ্জস্য ও সুষ্ঠু সামঞ্জস্যে গভীর বিশ্বাস থাকবার জন্যে তাঁর চিত্তে এই ভাবটি প্রবল হল—যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা একটি বিশেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আমরা তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে জেনেছি যে, পদার্থবিদ্যার সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা অথবা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একটি নিখুঁতভাবে জাড্যগুণসম্পন্ন (perfectly inertial system) মাধ্যমে অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে এই মাধ্যমের আপেক্ষিকে সমবেগে চলন্ত অন্য সব অনুরূপ মাধ্যমগুলিতেও অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।

শুধু সমবেগে চলন্ত মাধ্যমগুলির বেলায় হবে, কিন্তু যে কোন বেগে—সম হোক, অসম হোক, ত্বরণযুক্ত বেগে হোক, তার মানে সর্বপ্রকার বেগে চলন্ত মাধ্যমে কেন হবে না—এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, সব রকম মাধ্যমেই এই যুক্তি খাটবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে জুরিখে এসেও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁর লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে—"প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করার জন্যে সমস্ত তথাকথিত জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যম তুল্য—বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর (1905) পর আমার মনে প্রশ্ন ওঠে যে, খুব কম করে বলতে গেলেও মাধ্যমসমূহের অধিকতর তুল্যতা স্বাভাবিক ভাবে আসতে পারে কিনা।"

পরম বেগ বলে যখন কিছু নেই, সব বেগই আপেক্ষিক, তাহলে কি ত্বরণের বেলায় (acceleration), যা হল প্রতি সেকেণ্ডে বেগের বৃদ্ধি, পরম সংজ্ঞা আরোপিত হতে পারে?

1908 থেকে 1911 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বকে পরিবর্তন করে মহাকর্ষের একটি যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব আশা করা যাবে শুধু মাত্র আপেক্ষিকতা মতবাদের সম্প্রসারণের দ্বারা অর্থাৎ 'বিশেষ' থেকে 'বিশ্বজনীন' পর্যায়ে উন্নীতকরণের দ্বারা।

একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে তাঁর প্রথম সাফল্য অর্জিত হল। এই তথ্যটি গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখের সময় থেকে, অর্থাৎ প্রায় তিন-শ' বছর ধরে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল, কিন্তু তাঁরা এই তথ্যটিকে প্রকৃতিতে একটি আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন নি। আইনস্টাইন এই আপাতঃ সাধারণ তথ্যটির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং এটিই হল তার আপেক্ষিকতাবাদকে বিশ্বজনীন পর্যায়ে উন্নীতকরণের মূল ভিত্তি। এই তথ্যটি হল যে, প্রতিটি বস্তুর দুটি ভর আছে, একটি হল জাড্যজনিত ভর বা inertial mass ও অপরটি হল মহাকর্ষীয় ভর বা gravitational mass। এই দুটি ভরই সমান। এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকের শেষের দিকে 'আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ' অধ্যায়ের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পরিচ্ছেদে।

এখানে বলা যেতে পারে যে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হবার পরে বিজ্ঞানীরা একে উদ্ভট ও পাগলামী বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল কোন কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে চমৎকৃত হতে লাগলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ মিন্‌কভস্কি এই মতবাদের গাণিতিক রূপ দিলেন।

এখন আইনস্টাইনের পারিবারিক জীবনের কথায় আসা যাক। 1910 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের দ্বিতীয় ছেলে এডোয়ার্ডের (Edward) জন্ম হয়। এডোয়ার্ড দেখতে অনেকটা তার বাবার মত, সেরূপ দেহের গঠন ও বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। পরবর্তী কালে তিনিও বাবার মত সঙ্গীতপ্রিয় হন।

দ্বিতীয় ছেলের জন্মের পর আর্থিক অসচ্ছলতা আরও বেড়ে গেল। মিলেভা সংসার চালাবার জন্যে খুবই পরিশ্রম করতে লাগলেন, যার জন্যে তাঁর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়ে গেল। সামান্য কারণে তিনি আইনস্টাইনকে দোষারোপ করতেন। আইনস্টাইন মনে মনে ভাবতেন যে, অর্থের অসচ্ছলতা দূর করতে তিনি আর কি করতে পারেন। পোষাক-পরিচ্ছদে, আহারে কিংবা যে কোন বিষয়ে তাঁর কোনদিন কোন সখ বা বিলাসিতা ছিল না। এখন তাও যতটা না করলে নয়, সেই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত করলেন। নাপিত, দরজী ইত্যাদির খরচ কমিয়ে দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মিলেভাকে বিয়ে করা তাঁর খুব ভুল হয়েছে। কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ল। মিলেভা ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও ভবিষ্যতে উচ্চাকাঙ্খাভিলাষিণী রমণী। তাঁর দারিদ্র্য ও স্বভাবের কথা মিলেভা ভালভাবেই জানতেন এবং তা সত্ত্বেও মিলেভা বেশ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হওয়াতে তিনি ভেবেছিলেন যে, মিলেভা হয়ত তাঁর ভালমন্দ সব মিলিয়ে তাঁকে ভালবেসে তাঁদের দাম্পত্যজীবন সুখের করতে চেষ্টা করবেন। তিনিও তরুণ বয়সের মোহে সব দিক ভাল করে যাচাই করতে পারেন নি। এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর মত দরিদ্রের সংসারে অনভিজ্ঞ লোকের স্ত্রী হয়ে মিলেভার মনের সব বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছে বলে মিলেভা মনের স্থৈর্য ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এই সব কথা ভেবে আইনস্টাইনের মন অনুতাপ ও করুণায় ভরে যেত।

1910 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে য়ুরোপের সবচেয়ে পুরনো ও প্রসিদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ খালি হল। এই পদের প্রার্থী হয়ে আইনস্টাইন দরখাস্ত পাঠালেন। শ্লোভাক দেশগুলি তখন অস্ট্রিয়ার অধীনে। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী-দার্শনিক এর্নস্ট মাখ, যাঁর কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। মাখের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়, বিশেষ করে নিউটনের মহাকাশ, সময় ইত্যাদির কঠোর সমালোচনায়, আইনস্টাইন ছাত্র-জীবন থেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এর জন্যেই নিউটনীয় তত্ত্বসমূহ গভীর ভাবে অধ্যয়নের পরে সেগুলির সংশোধনের জন্যে আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করবার প্রেরণা পান। সেই সময়কার তাঁর প্রবন্ধগুলিতে মাখের প্রভাব উপলব্ধি করা যেত। কিন্তু আইনস্টাইন ছিলেন মাখের দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, কারণ মাখ এদিক দিয়ে ছিলেন পজিটিভিজম বা প্রত্যক্ষবাদ মতাবলম্বী, অর্থাৎ কোন বস্তু দ্রষ্টব্য না হলে তার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। তাঁর মত ছিল যে, পরমাণুতত্ত্ব পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত না হয়ে হবে অধিবিদ্যার (metaphysics) অন্তর্গত। আইনস্টাইন মাখের এই ধারণার প্রতিবাদ করেন এবং অণু, পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তিতে ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। পরে পেরাঁ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অণু, পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব গবেষণাগারে প্রমাণ করেন।

মাখ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদ ত্যাগ করবার পরেও এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাখের মতবাদ খুবই সুদৃঢ় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মকর্তারা আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নূতনত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যাহোক, এই অধ্যাপকের পদে আইনস্টাইনকে নিয়োগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সেই সময়কার কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মত গ্রহণ করেন। এঁদের একজন ছিলেন প্লাঙ্ক। আইনস্টাইন সম্বন্ধে তিনি ও নের্ণষ্ট একবার বলেছিলেন যে, পদার্থবিদ্যা জগতে একজন অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে সে সময়ে প্লাঙ্কের ধারণা হয়েছিল যে, এই মতবাদ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আইনস্টাইন 1805 খ্রীস্টাব্দে কোন কোন ধাতুর উপরে আলোর আপতনে ইলেকট্রনের নির্গমনের ব্যাখ্যায় 1900 খ্রীস্টাব্দে প্লাঙ্কের আবিষ্কৃত কণাবাদের সাহায্য নিয়ে এই কণাবাদকে বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু

প্লাঙ্ক নিজে তাঁর এই বৈপ্লবিক মতবাদকে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কঠোর সমালোচনার জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আইনস্টাইন এই কণাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হওয়াতে প্লাঙ্ক আইনস্টাইনের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন।

প্লাঙ্ক প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের চিঠির উত্তরে লিখলেন, "যদি আইনস্টাইনের মতবাদ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়, যা আমি অবশ্যই হবে বলে বিশ্বাস করি, তবে আইনস্টাইন হবেন এই বিংশ শতাব্দীর কোপার্নিকাস।" এতে তিনি এই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোপার্নিকাস যেমন দু' হাজার বছর ধরে প্রচলিত টলেমি তত্ত্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে বিজ্ঞান জগতে এই নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন, আইনস্টাইনও সেইরূপ করবেন। অর্থাৎ গ্যালিলিও, নিউটনের যুগ থেকে যে চিন্তাধারা বিজ্ঞান জগতে প্রচলিত হয়ে এসেছে, সেই চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং আইন-স্টাইন কোপার্নিকাসের মত এক নতুন পথের সন্ধান দেবেন। প্লাঙ্কের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যদিও এই অধ্যাপকের পদটির জন্যে অন্য আর একজন প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মনোভাব বুঝতে পেরে সক্রোধে তাঁর দরখাস্ত প্রত্যাহার করে নিলেন এই বলে যে, কর্তৃপক্ষ আসল মেধার যাচাই না করে নূতনত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন। সুতরাং এই পদটির জন্যে দ্বিতীয় আর কোন প্রার্থী না থাকাতে 1911 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আইনস্টাইনকেই এই পদের জন্য নিয়োগ করা হল। তাঁকে নিয়োগপত্রটি পাঠিয়ে অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে বলা হল।

এই নিয়োগপত্রটি পাবার কিছুদিন পূর্বে আইনস্টাইন তাঁর মার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। মা লিখেছেন,"...তোমার বাবার শরীর খুবই খারাপ। তিনি খুবই দুর্বল ও রোগা হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখে ভয়ানক অরুচি, কিছুই প্রায় খেতে চান না। আমার বয়স হয়েছে বলে সেরূপ সেবা শুশ্রূষা ও রান্না করতে পারি না। তোমার কাকা রুডল্‌ফের মেয়ে এলসার কথা মনে আছে ত? সে আর তুমি প্রায় সমবয়সী। বাল্যকালে তোমরা খেলার সঙ্গী ছিলে। সে তখন তোমার বেহালা বাজনা মুগ্ধ হয়ে শুনত। তাকে এখন আমাদের বাড়ীতে আনিয়েছি। সে দেখতে খুব সুন্দরী হয়েছে। সে

আমাকে বলে যে, তুমি একদিন একজন বিখ্যাত বেহালা বাদক হবে। এলসা তোমার বাবাকে খুব যত্ন করে, রান্না করে খাওয়ায়। সে তোমার বাবার খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছে। তুমি যদি পার, অতি সত্বর তোমার বাবাকে একবার দেখে যেও। তিনি হয়ত আর বেশী দিন বাঁচবেন না।"

কিন্তু জুরিখের সংসার উঠিয়ে অবিলম্বে প্রাগে যেতে হবে বলে আইনস্টাইন মিলানে তাঁর বাবাকে দেখতে যেতে এবং মার চিঠিরও উত্তর দিতে পারলেন না। মিলেভা তাঁর পুরনো সংসার ভেঙ্গে, বিশেষ করে পুরনো ও অতিপরিচিত জুরিখ ছেড়ে, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক অপরিচিত জায়গায় যেতে চাইছিলেন না। আইনস্টাইনেরও সুইৎসারল্যাণ্ড, বিশেষ করে জুরিখ ছেড়ে যেতে খুব ইচ্ছা ছিল না। কারণ সুইৎসারল্যাণ্ডেই তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ও সঙ্গীতের আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটেছে। কিন্তু পুরা অধ্যাপকের বেতন ও স্বাধীনভাবে কাজ করার বিষয় চিন্তা করে আইনস্টাইন সপরিবারে প্রাগে গিয়ে নূতন কাজে যোগ দিলেন।

এখানে আইনস্টাইনের অতি বড় কৃতিত্বের কথার কিছুটা উল্লেখ করব। 1900 খ্রীস্টাব্দে তাঁর পাঠ্যজীবন শেষ করে, 1902 খ্রীস্টাব্দে বার্ণের পেটেন্ট অফিসে সামান্য চাকরীতে যোগ দিয়ে কাজ করতে করতে কোন গবেষণাগারে গবেষণা না করে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে 1905 খ্রীস্টাব্দে তিনটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যার দুটি হল বহুদিনকার বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান ও তৃতীয়টি হল যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক মতবাদ, তারপর মাত্র ছয় বছরের ভিতরে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে 1911 খ্রীস্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তি—খুবই গৌরবের কথা। এটি সম্ভবপর হয়েছে সাধারণ জগৎ ("merely" personal world) থেকে নিমেষে মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ অথচ বাস্তবে বিদ্যমান জগতের (objective "extra" personal world) চিন্তায় তাঁর মনকে নিমগ্ন করতে পারার ক্ষমতা থেকে।

তারপর তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ 1911 খ্রীস্টাব্দেই প্রথমে সলভে কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে ব্রুসেলসে (Brussels) গেলেন। এখানে সলভে কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছুটা বলা প্রয়োজন।

বেলজিয়ানবাসী আর্নেষ্ট সলভে (Ernest Solvay) ছিলেন একজন ভাল

ইঞ্জিনীয়ার এবং ধনী ব্যবসায়ী। যদিও তাঁর বিজ্ঞানে সেরূপ প্রতিভা ছিল না, কিন্তু তিনি বিজ্ঞান-চর্চায় একজন বড় উৎসাহী ছিলেন। প্রসিদ্ধ জার্মান পদার্থবিদ্যাবিদ্ ও রসায়নবিদ্ ওয়ালটার নের্নষ্টের সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ-পরিচয় ছিল। সলভে একবার নের্নষ্টের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করবার পরে দু-জনে স্থির করলেন যে, তৎকালীন প্রতিভাবান পদার্থবিদ্যাবিদ্‌দের আমন্ত্রণ করে ব্রুসেলসে একটি আলোচনা সভা করবেন। সেই সভার বিষয়সূচী হবে বৈজ্ঞানিক সমস্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে পরস্পরের মত বিনিময়, যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে সেগুলির যথাযথ আলোচনা করে সঠিক সমাধান নির্ণয় করা। এই আলোচনা সভা 1911 খ্রীস্টাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ও পরে আরও কয়েকবার হয়েছে।

এই প্রথম সভার জন্যে যে সব বিজ্ঞানী আমন্ত্রিত হবেন, নের্নষ্ট তার একটি তালিকা তৈরি করলেন এবং সলভে ঐ আলোচনা সভার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। এই ব্যয়ভারের ভিতরে থাকবে বিজ্ঞানীদের আসা-যাওয়া এবং ব্রুসেলসে থাকার খরচ এবং প্রত্যেককে উপহার হিসাবে 1000 ফ্রাঁ মুদ্রা প্রদান।

এই প্রথম সভায় আমন্ত্রিত হন ইংল্যাণ্ড থেকে রাদারফোর্ড (Rutherford); ফরাসী দেশ থেকে মাদাম কুরী (Madame Curie), পোঁয়াকারে (Poincare), পেরাঁ (Perrin), লাঁজভাঁ (Langevin); জার্মানী থেকে প্লাঙ্ক (Planck) ও নের্নষ্ট (Nernst), হল্যাণ্ড থেকে লোরেন্‌ৎস (Lorentz); অস্ট্রিয়া থেকে আইনস্টাইন ও হ্যাজেনোয়েরল (Hasenöhrl)। এই সভায় বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে খুবই তর্ক-বিতর্ক হয়। পরে আইনস্টাইন তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন যে, এই সভায় আপেক্ষিকতাবাদের সারমর্ম কেউই বুঝতে পারেন নি। তা হলেও এই সভাটি আইনস্টাইনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে লোরেন্‌ৎসের সঙ্গে আলোচনা। তিনি লোরেন্‌ৎসের উচ্চ প্রশংসা করে বন্ধুকে লেখেন।

প্রাগে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী একজন অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে যোগ দিবার সময়ে আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। সেই সময় এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একটি বিশেষ ধরনের পোষাক পরতে হত। পোষাকটি ছিল—পালকে সজ্জিত একটি ত্রিকোণবিশিষ্ট টুপি, সোনার পাতে

সুসজ্জিত একটি কোট ও প্যান্ট, একটি মোটা কালো কাপড়ের তৈরী গরম ওভারকোট ও একটি তরবারি।

আইনস্টাইনকেও এগুলিকে কিনে পরে আনুগত্যের শপথ নিতে হল। তাঁর বড় ছেলে হান্স তখন প্রায় সাত বছরের বালক ও ছোট ছেলে এডোয়ার্ড প্রায় দেড় বছরের শিশু। তারা দুজনেই বাবাকে এই রাজার মত জাঁকজমক পোষাকে সুসজ্জিত দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল। বছরখানেক পরে যখন আইনস্টাইন জুরিখে পুরা অধ্যাপকের পদ পেয়ে প্রাগ থেকে জুরিখে ফিরে যান, ছেলেদের অনুরোধে সেই যাত্রাদলের রাজার পোষাক পরে তাঁকে কিছুক্ষণ পায়চারী করতে হয়েছিল। এই পোষাকটি আইনস্টাইন আসবার সময় ফিলিপ ফ্র্যাঙ্ককে (Philip Frank) দিয়ে আসেন। আইনস্টাইনের জায়গায় ফ্রাঙ্ক ঐ অধ্যাপকের পদটি পান। ফ্র্যাঙ্ক যদিও মাখের (Mach) দার্শনিক মত-বাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের অনুগামী ছিলেন, তবুও আইনস্টাইনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বহু বার বহু জায়গায় আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক বিজ্ঞান ও নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে আইনস্টাইনের একটি জীবনী লেখেন। তিনি লিখেছেন যে, আইনস্টাইনের ঐ পোষাকের মধ্যে কোটটি ফ্র্যাঙ্কের স্ত্রী রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসা এক কসাক সেনানায়ককে দান করেন। পোষাকটির বাকী অংশগুলি, অর্থাৎ টুপি প্যান্ট, ওভারকোট ও তর-বারি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত ছিল। 1939 খ্রীস্টাব্দে নাৎসীরা যখন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে, তখন বোধ হয় কোন নাৎসী সৈন্য তরবারি-টিকে লুট করে নিয়ে যায়।

5

প্রাগ সহরটি ইতালি বা সুইৎসারল্যাণ্ডের সহরগুলি থেকে ভিন্ন ধরণের। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয় আইনস্টাইন এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও পাহাড়-ঘেরা অতি মনোরম সহরটিকে ভালবেসে ফেললেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী তিনি প্রথম প্রথম সামাজিকতা রক্ষা করবার জন্যে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামান্য কয়েকজনের বাড়ী ছাড়া অন্য সব বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

আইনস্টাইনের সরল, মধুর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার, তাঁর হৃদয়ের

আন্তরিকতা এবং নির্দোষ কৌতুকপ্রিয়তা যেমন কয়েকজনকে অন্তরঙ্গ বন্ধু করল, তেমনি আবার কয়েকজনের বিরাগভাজনের কারণ হল। এর কারণ প্রাগে তখন সরকারী আদবকায়দার ও আন্তরিকতাহীন লৌকিকতার খুবই প্রচলন ছিল। অধ্যাপকদের পোষাকে, ব্যবহারে, চালচলনে একটি গর্বিত আভিজাত্যের কদর ছিল। যাঁরা এইসব পছন্দ করতেন, তাঁরা আইনস্টাইনের অতি সাধারণ পোষাকে ও প্রাণখোলা কথাবার্তায় পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ও আভিজাত্যের অভাব দেখে মর্মাহত হলেন এবং তাঁর বিরূপ সমালোচনা করতে লাগলেন। শুধু অল্প কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বজায় থাকল। এরূপ একজন হলেন প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ মরিস ভিনটারনিৎস (Maurice Vinternitz)। এই অধ্যাপকের গৃহে মাঝে মাঝে গিয়ে তিনি সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। ভিনটারনিৎসের ছেলেমেয়েদেরকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন ও তাদের পরম বন্ধু হলেন। কখনও কখনও তিনি বেহালা নিয়ে যেতেন। ভিনটারনিৎসের বাড়ীতে তাঁর এক আত্মীয়া সঙ্গীতের শিক্ষিকা ছিলেন। সেই মহিলাটি পিয়ানো বাজাতেন ও আইনস্টাইন বেহালা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

আইনস্টাইন বেড়াতে খুবই ভালবাসতেন। প্রাগের সুন্দর সুন্দর বাগান, মনোরম পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চল ও নদীর ধার তাঁর মনকে খুবই আকৃষ্ট করত। তিনি প্রায়ই এইসব জায়গায় হেঁটে বেড়াতেন। য়ুরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের মূলে বড় অবদান ছিল প্রাগ অঞ্চলের লোকদের শিক্ষাদীক্ষা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। আইনস্টাইন সেইসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর গির্জায় দেখতে গেলেন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা টাইকো ব্রাহের (Tycho Brahe) সমাধি। জ্যোতির্বিদ্যায় টাইকো ব্রাহের অবদান প্রচুর। 1572 খ্রীস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন ক্যাসিয়োপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জে (Constellation Cassiopeia) অবস্থিত একটি তারকার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, যাকে বলা হয় সুপারনোভা (supernova)। এই প্রতিক্রিয়াটি হল—কোন অজ্ঞাত কারণে একটি তারকা থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে তারকাটির ভিতর থেকে তার সব শক্তি উৎপাদনকারী দাহ্য পদার্থ বাইরে বেরিয়ে যায়, যার দরুন তারকাটিকে কয়েক দিন অতি উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় ও তারপরে তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ শক্তিহীন, জ্যোতিহীন নগণ্য পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐ দাহ্য পদার্থগুলি

তারকাটির চতুর্দিকে গ্যাসীয় (nebula) অবস্থায় থাকে এবং লক্ষ লক্ষ বছর পরে এর থেকে জন্ম হয় আর একটি তারকার। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় দৃষ্ট সুপারনোভা। একজন চীনদেশীয় জ্যোতির্বেত্তার দ্বারা প্রথমটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল 1054 খ্রীস্টাব্দে, তা ছিল বৃষরাশির অন্তর্গত একটি তারকার সুপারনোভা।

এই প্রাগেই টাইকো ব্রাহে তাঁর দৃষ্ট ও লিপিবদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যার মূল্যবান তথ্যাদি অপর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা কেপ্‌লারকে দান করে যান। কেপ্‌লারের তত্ত্বগুলিই হল নিউটনীয় গাগনিক বলবিদ্যার মূল ভিত্তি।

প্রাগ তখন সঙ্গীতের জন্যে বিখ্যাত ছিল। সেখানকার ঐকতানবাদন (orchestra) য়ুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেখানকার নানা ধর্মের গির্জায় গির্জায় বিখ্যাত সুরকারদের রচনা থেকে সুমধুর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাদ্য সঙ্গীত বাজানো হত। সঙ্গীতপ্রিয় আইনস্টাইন মাঝে মাঝেই সেই সব সঙ্গীত শুনতে যেতেন।

প্রাগে এসেই আইনস্টাইন তাঁর মাকে একটি চিঠিতে তাঁর পুরা অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির কথা জানান। মা উত্তরে লেখেন যে, তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। যা হোক, তিনি ছেলের উচ্চপদ লাভে গর্বিতা।

প্রাগে আইনস্টাইনের অধ্যাপনার বিষয়ের বেশীর ভাল ছিল নিউটনের তত্ত্বসমূহ। তিনি তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে নিউটনের মহাকাশ ও সময়ের ধারণার পরিবর্তন সাধন করেন। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব তাঁর কাছে খুবই বিসদৃশ মনে হত। কারণ এটিতে বলা হয়েছে যে, দুটি বস্তু মহাকাশে যে কোন দূরত্ব থেকে, সে দূরত্ব লক্ষ লক্ষ, কি কোটি কোটি কিলোমিটার হতে পারে, পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কোন যোগাযোগ নেই, কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, দুটি বস্তু দূর থেকে একে অন্যকে যুগপৎভাবে একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করবে। অবশ্য গ্রহগুলির কি উপগ্রহগুলির আবর্তনের পূর্ণ তথ্য নিউটনের গাণিতিক সূত্র দিয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু আইনস্টাইনের মনে দৃঢ় ধারণা হল যে, এই যে গ্রহ বা উপগ্রহগুলির আবর্তন, তার কারণ আকর্ষণ নয়, এটি হচ্ছে মহাকাশের একটি জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে। এই জ্যামিতি ইউক্লিডিয় (Euclid) নয়, রীমানীয় (Riemann)।

তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

6

প্রায় বছরখানেক পরে জুরিখের পলিটেকনিকে, যেখান থেকে আইনস্টাইন পাশ করেছিলেন, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদটি খালি হল। সেখানকার কর্মকর্তারা এই পদটি নেবার জন্যে আইনস্টাইনকে অনুরোধ জানালেন। আইনস্টাইন প্রাগের কাজটি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন তাঁর পুরনো জুরিখে তাঁরই পাঠ্যাবস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরা অধ্যাপকের পদ নিয়ে। মিলেভাও জুরিখে ফিরে আসতে পেরে খুশী হলেন।

আইনস্টাইনের পুরনো বন্ধুরা তাঁকে আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে এবং তাঁর উচ্চ পদপ্রাপ্তিতে খুবই আনন্দিত হলেন। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক রূপ দেবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করছিলেন। এবার গ্রসম্যানের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এখানে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মূলতঃ দুটি বিষয়, যার একটি হল বস্তুর জাড্যজনিত ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের তুল্যতা (equivalence of inertial and gravitational masses) এবং অপরটি হল মহাকাশের বক্রতা বা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রাগে আসবার পূর্বেই প্রথমটির দ্বারা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে উল্লেখিত পরস্পরের আপেক্ষিকে চলন্ত মাধ্যমগুলির যে-কোন বেগ সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্যার সমাধান করেন। দ্বিতীয় বিষয়টির প্রকৃত গাণিতিক রূপ কি ভাবে দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তা শুরু করলেন।

বিশ্ব অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় একটি প্রাসাদের মত—যেখানে অনন্যগত মহাকাশ ও অনন্যগত সময়ের মধ্যে আছে অনন্যগত বস্তু—এই প্রচলিত ধারণা তাঁর কাছে মনে হয় ভুল, বরং বাস্তব সত্য ঠিক এর বিপরীত। এই যে আকারশূন্য মহাকাশ-সময়-সন্ততি, এটি নমনীয়, যেখানে বস্তু সেখানেই নুয়ে যাবে, যেখানে গতি সেখানেই সন্ততি বিকৃত হবে।

আইনস্টাইন গ্রসমানের সহযোগিতায় 1912 থেকে 1914 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর চিন্তাধারায় কিছুটা ভুল হয়েছে, সেজন্যে সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে না। এর জন্যে তাঁকে অযথা দুটি বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। যা হোক, 1915 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি সঠিক উপায় খুঁজে পেলেন এবং রীমানীয় বক্রতার সহায়তা নিয়ে আপেক্ষিকতাবাদকে গাণিতিক রূপ দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনাবলীরও প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে শেষের অধ্যায়ে সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদ পরিচ্ছেদে।

1913 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আইনস্টাইন ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত একটি বিজ্ঞান সভায় যোগদান করেন। তখনও তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমস্যার সমাধান হয় নি। তা হলেও তাঁর এই মতবাদ সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিলেন। তিনি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে বর্ণিত 'আকর্ষণের' জায়গায় মহাকর্ষকে (gravitation) একটি ক্ষেত্রের ধারণার (conception of a field) রূপ দেন। এই মহাকাশ-সময়-সন্ততিতে প্রতিটি বস্তু তার চারপাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে—যেমন একটি চুম্বক তার চারপাশে মহাকাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র রচনা করে। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের জন্যে তার চারপাশে মহাকাশে বক্রতা বা বিকৃতিবিশিষ্ট একটি ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই বস্তুর ভর কিংবা ঘনত্ব যত বেশী হবে—ক্ষেত্রের বিকৃতিও ততই বেশী হবে। সূর্য মহাকাশে একটি ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। এই ক্ষেত্রে অবস্থিত গ্রহগুলি প্রত্যেকটি একটি সহজতম পথ ধরে আবর্তন করছে। উপগ্রহগুলির বেলাতেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

7

1914 খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাস কয়েক আগে একদিন প্লাঙ্ক ও নের্নস্ট বার্লিন থেকে জুরিখে আইনস্টাইনের কাছে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন তাঁকে বার্লিনে কাজে যোগ দিতে অনুরোধ জানাবার জন্যে।

প্রথম প্রস্তাবটি হল বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে (Academy of Science) একটি পুরা অধ্যাপকের পদ। এই শিক্ষায়তনটি সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যের সংখ্যা,

পাণ্ডিত্যে যাঁরা বিখ্যাত এইরূপ মাত্র 90 জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান নয়—গবেষণা করা।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে আইনস্টাইন তাঁর ইচ্ছামত যে-কোন কয়েকটি বিষয়ে যতগুলি ইচ্ছা বক্তৃতা দেবেন এবং অধিকাংশ সময়ে গবেষণায় রত থাকবেন। প্লাঙ্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছাত্রদের পড়াবার চেয়ে আইনস্টাইন গবেষণার কাজ বেশী পছন্দ করবেন, কারণ তিনি তখন কঠোর পরিশ্রম করছেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে পূর্ণ রূপ দেবার জন্যে।

তৃতীয় প্রস্তাবে কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউটে (Kaiser Wilhelm Institute) একটি উচ্চ পদ প্রদান। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল কতকগুলি বিষয়ে গবেষণার কেন্দ্র। সেখানে তখন পর্যন্ত পদার্থবিদ্যায় গবেষণার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্লাঙ্ক বললেন যে, এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হওয়া মাত্র আইনস্টাইন তার পরিচালকের পদটি পাবেন। যতদিন পর্যন্ত না এটি হয়, ততদিন আইনস্টাইন অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন।

এখানে একটু ভূমিকার প্রয়োজন। এই শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যাণ্ড বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অন্যান্য অনেক দেশ থেকে উন্নত ছিল। বিবিধ শিল্পে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগে ইংল্যাণ্ড ক্রমশঃই অধিকতর উন্নতিশীল হয়ে উঠেছিল। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলের অবদান ছিল এতে যথেষ্ট। অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিখ্যাত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদেরকে বেশী বেতন দিয়ে রাখা হত এই শর্তে যে, তাঁদের গবেষণার ফল শুধু সেই সেই প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রয়োগ করা হবে। আমেরিকাতেও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে এরূপ গবেষণাগার ছিল।

জার্মান সরকার মনস্থ করলেন এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়তে এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বেশী বেতনে নিয়োজিত করে ইংল্যাণ্ডকে সম্মানের দিক থেকে পশ্চাতে ফেলতে। জার্মান সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলমের (Kaiser Wilhelm II) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর নামানুসারে কাইজার ভিল-হেলম প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হল। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরকে উপাধি দেওয়া হল সেনেটর (Senator)। তাঁদেরকে অতি সুন্দর গাউন পরবার অধিকার দেওয়া হল। মাঝে মাঝে সম্রাট তাঁর সঙ্গে প্রাতঃরাশ আহার করবার জন্যে তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানাতেন।

এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যে বিজ্ঞানী নিয়োজিত করবার ভার পড়ল তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদ্বয় ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও ওয়ালটার নের্নস্টের উপরে। এই দুই বিজ্ঞানীই তরুণ আইনস্টাইনের প্রতিভা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে একজন অসামান্য প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর মতবাদ বহুদিন বিজ্ঞান জগৎকে পথ দেখাবে। এই দুই বিজ্ঞানীকে জার্মান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মান্য করতেন। সম্রাটও এঁদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম আইনস্টাইন সম্বন্ধেও শুনেছিলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আইনস্টাইনকে বার্লিনে এনে ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্য করতে। প্লাঙ্ক ও নের্নস্টও তাই চাইছিলেন। সেজন্যে তাঁরা জুরিখে এসেছিলেন আইনস্টাইনের কাছে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে।

আলোচনাকালে নের্নস্ট আইনস্টাইনকে জানালেন যে, তখনকার দিনে যে কয়েকজন অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই আছেন বার্লিনে। সুতরাং আইনস্টাইন সেই সব বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা পাবেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে পূর্ণ রূপ দিতে।

উল্লিখিত প্রস্তাব তিনটির যে কোন একটি প্রস্তাব—কোন একজন অধিক বয়স্ক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পদার্থবিদ্যাবিদের পক্ষে অতি লোভনীয় ছিল। বিশেষ সম্মান ও বেতন ছাড়াও নিজের ইচ্ছামত কাজ করবার এতবড় সুযোগ আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আইনস্টাইনের মনে পড়ল মিউনিখের বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের কথা, মনে পড়ল জার্মান জাতির রণ-উন্মাদনার কথা, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কথা, যে জন্যে তিনি জার্মান নাগরিকত্ব ছেড়েছিলেন। জুরিখের সুন্দর ও শান্ত পরিবেশ ও সহজ আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা ছেড়ে জার্মানীর উদ্ধত, সংগ্রামপ্রিয় ও বড়লোকদের তোষামোদকারী সহকারী কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে যেতে একটু সঙ্কোচ ও দ্বিধা বোধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর মনের কিছুটা আভাস দিলেন। তাছাড়া তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, কখনও সুইস নাগরিকত্ব তিনি ছাড়বেন না। যদি বার্লিনের কর্মকর্তারা এতে রাজী থাকেন, তবে তিনি প্রস্তাবগুলি ভেবে দেখবেন।

প্লাঙ্ক বার্লিনের জীবনযাত্রার বিষয়ে আইনস্টাইনকে অভয় দিয়ে বললেন

যে, সেখানে তাঁর কোন প্রকার অসুবিধা হবে না, তাঁর সুখ-সুবিধার জন্যে সকল যত্ন নেওয়া হবে, যাতে তিনি সসম্মানে সেখানে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন কাটাতে পারেন। তবে নাগরিকত্বের ব্যাপারটি কর্মকর্তাদের জানাতে হবে তাঁদের এবং পরোক্ষভাবে সম্রাটেরও সম্মতির জন্যে। বিজ্ঞানীদ্বয় আইন-স্টাইনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বার্লিনে ফিরে গেলেন।

আইনস্টাইন গৃহে ফিরে মিলেভাকে এই কথা জানাবামাত্র মিলেভা ক্রুদ্ধা হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন যে, কেন আইনস্টাইন বার্লিনে যাবার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নি। যে জার্মান জাতির বর্বরতার ও অত্যাচারের কিছু না কিছু আইনস্টাইনকে ছাত্রজীবনে এবং তাঁর বাবা কাকাকে সহ্য করতে হয়েছে, সেই জার্মানীতে গিয়ে বসবাসের কথা আইনস্টাইন কি করে তাঁকে বলছেন। জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা সার্বিয়ার কিছু অংশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, সার্বিয়ার লোকেদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে ও তখনও পর্যন্ত সার্বিয়ার উপরে নানা অজুহাতে জুলুম করছে। মিলেভা সার্বিয়ার মেয়ে, সেজন্য জীবনে কখনও জার্মানীতে যাবেন না। তারপর সবচেয়ে বড় কথা হল যে, জার্মানীতে আইন অনুযায়ী সব ছেলেদেরকে আঠার বছর বয়স হলেই সামরিক শিক্ষা নিতেই হবে এবং যে-কোন সময়ে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে। এই ব্যাপারটির জন্যেই মিলেভা তাঁর দুই ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে কখনও সেখানে যাবেন না। তিনি আরও বলতে লাগলেন যে, আইনস্টাইন তাঁর জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করেছেন, এখন তাঁর ছেলেদের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন—এজন্য তিনি আইনস্টাইনকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আইনস্টাইন যদি মোহে পড়ে বার্লিনে যেতে চান, তবে একলাই যাবেন। মিলেভা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে জুরিখেই থাকবেন, তাতে তাঁর যতই দুঃখকষ্ট হোক না কেন। তিনি অনেক সহ্য করেছেন। তিনি আইনস্টাইনকে স্পষ্ট বলে দিলেন যে, আইনস্টাইন বার্লিনে গেলে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন।

আইনস্টাইনও এভাবে দাম্পত্য জীবন যাপনের চেয়ে মিলেভার ইচ্ছামত প্রয়োজন হলে বিবাহ-বিচ্ছেদেই রাজী হলেন।

এদিকে বার্লিনে যেহেতু সম্রাট জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি চান জার্মানীর সম্মানের জন্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদেরকে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদেরকে অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে বার্লিনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োজিত করতে এবং

যেহেতু আইনস্টাইন তখন বিজ্ঞান জগতে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সেহেতু অ্যাকাডেমীর কর্মকর্তারা আইনস্টাইনের এই অসম্ভব দাবী মেনে নিলেন।

প্লাঙ্ক আবার জুরিখে এসে আইনস্টাইনকে ঐ সম্মতির কথা জানিয়ে তাঁকে বার্লিনে যাবার জন্যে আবার অনুরোধ জানালেন এবং সেখানে তাঁর থাকবার সুবন্দোবস্ত ও সুখসুবিধার বিষয়ে আশ্বাস দিলেন। আইনস্টাইন যেতে রাজী হলেন।

এখানে একটি কথা বলা যেতে পারে। বার্লিনে যাবার কয়েক মাস পরেই যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, আইনস্টাইন বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, মিলেভাই ঠিক বলেছিলেন। বোধ হয় জুরিখের শান্ত জীবনের কথা মনে পড়েছিল। আর বোধ হয় খুবই অস্বস্তি ও মানসিক অশান্তি বোধ করেছিলেন প্লাঙ্ক—তাঁর আইনস্টাইনকে অভয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দের ও নিরাপদের আশ্বাস দিয়ে বার্লিনে আনবার কথা, হিটলারের আমলে আইনস্টাইনের প্রতি যথেচ্ছ অসম্মান ও অসৌজন্য প্রকাশ এবং প্রাণনাশের চেষ্টা, আইনস্টাইনের 1933 খ্রীষ্টাব্দে প্রায় কপর্দকশূন্য ভাবে জার্মানী পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করে।

সৌম্য, শান্ত, মিষ্টভাষী, বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও কণা-বাদের আবিষ্কারক প্লাঙ্ক নিজে অষ্ট্রিয়ান হয়েও জীবনের শেষের বেশ কয়েক বছর হিটলারের বর্বরতা ও অত্যাচারের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা না থাকায়, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং মানসিক হাসপাতালে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু বছর কাটিয়ে 1949 খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বার্লিন

1

আইনস্টাইন একাই জুরিখ থেকে বার্লিনে এলেন। মিলেভা তাঁর জিদ বজায় রাখলেন। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে জুরিখেই রয়ে গেলেন। আইনস্টাইন যাবার সময়ে বললেন যে, মাঝে মাঝে তিনি তাঁদেরকে দেখতে জুরিখে আসবেন। কিন্তু মিলেভা বললেন যে, আইনস্টাইন আসতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রাখা আর সম্ভবপর নয়। তিনি যথাসম্ভব সত্বর সুযোগমত বিবাহ বিচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি দেবেন।

বার্লিনে এসে আইনস্টাইন অধ্যাপনায় ও বিজ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। তিনি সপ্তাহে একবার করে বিজ্ঞানের আলোচনা-চক্র (seminar) শুরু করলেন এবং তিনি যতদিন জার্মানীতে ছিলেন ততদিন এটি চালু রেখেছিলেন। এই আলোচনা-চক্রে যাঁরা নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন, তাঁরা সবাই আইনস্টাইনের বন্ধু হলেন। এঁদের মধ্যে নের্নষ্ট ও প্লাঙ্ক ছাড়াও ছিলেন ম্যাক্স ফন লাওয়ে (Max Von Laue), গুস্তাভ হার্টজ (Gustav Hertz), জেমস ফ্র্যাঙ্ক (James Franck), স্রডিঙ্গার (Schrödinger), যিনি এই সময়ে ছিলেন তরুণ যুবক এবং বছর দশেক পরে তরঙ্গ বলবিদ্যা আবিষ্কারের জন্যে বিখ্যাত হন, আর আসতেন মাঝে মাঝে লীজে মাইটনার (Lise Meitner), যিনি 1939 খ্রীষ্টাব্দে অটো হানের গবেষণালব্ধ নিউট্রন কণিকার দ্বারা ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের সঠিক ব্যাখ্যা করে পৃথিবীখ্যাতা হন।

এই সব বিজ্ঞানীর কাছে আইনস্টাইনের স্মৃতি ছিল অতি মধুর। এই মানুষটির গভীর জ্ঞানে, অন্তরঙ্গ ব্যবহারে এবং আলোচনাকালে অতি সহজেই অন্যান্যদের বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করায় তাঁর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আইনস্টাইন এই সব বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর কার্যোপলক্ষে যে সব শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা-সভা হত এবং যাতে অ্যাকাডেমিসিয়ান হিসাবে তাঁর যোগ দেবার কথা, তিনি সেগুলিতে বড় একটা যোগ দিতে চাইতেন না, কারণ তিনি লক্ষ্য

করেছিলেন যে, এই সব আলোচনাতে বেশীর ভাগ যোগদানকারীরা বিজ্ঞানের আলোচনার চেয়ে অন্যান্য বিষয়গুলিতে আলোচনা করতে উৎসাহী ছিলেন। আইনস্টাইন এই সব আলোচনাতে যোগ দিলে মাঝে মাঝে কৌতুক করে দু-একটি কথা বলতেন, তাতে বেশীর ভাগ সদস্যদের গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন হত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের অহঙ্কার ও পদমর্যাদা বজায় রাখতে তাঁরা চেষ্টা করতেন।

আইনস্টাইন এই পদমর্যাদার অহঙ্কার বজায় রাখাকে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে করতেন। এই বিষয়ে তিনি বার্লিনে আসবার কিছুদিন পরে তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন, "আমি যা ভেবেছিলাম, জীবনযাত্রা এখানে অত খারাপ নয়। শুধু যে বিষয়টি আমার মনের সমতা ও শান্তি নষ্ট করে, সেটি হল—আমাকে বিরক্তিকর কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন করতে হয়, যেমন আমার নিজের খুসীমত পোষাক না পরে এমন সব পোষাক পরতে হয়, যাতে কেউ না মনে করেন যে, আমি সমাজের নিকৃষ্ট স্তর থেকে এসেছি। এই বাহ্যাড়ম্বরকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

বার্লিনে এসে তিনি উপরিউক্ত বিজ্ঞানী বন্ধুদেরকে পেয়ে খুসী ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করেননি যে, তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন বিজ্ঞানীও কিছু কিছু আছেন, পরে সেটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 1916 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর গভীর চিন্তা ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমস্যাদি মীমাংসা করে তাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা, যেমন ত্বরান্বিত বেগের আপেক্ষিকতা, মহাকাশের জ্যামিতিক গঠনের উপর মহাকর্ষ এবং মহাকাশের ঘটনাবলীর নির্ভরতা।

আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞানীরা তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। 1911 খ্রীস্টাব্দে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত সলভে বিজ্ঞান সভায় আলোচনাতে তিনি তা বুঝতে পেরে তাঁর এক বন্ধুকে এবিষয়ে চিঠিতে লিখেছিলেন। বার্লিনে এসে তিনি 1905 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বে বর্ণিত দুটি বস্তুর ভিতরে আকর্ষণের ধারণার বদলে বস্তুর অবস্থানহেতু মহাকাশের জ্যামিতিক গঠনের জন্যে মহাকর্ষের কারণের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিজ্ঞানীদেরকে বললেন যে, যদি তাঁর মতবাদে

তাঁদের বিশ্বাস না হয়, তবে তাঁর মতবাদের যাথার্থ্য বাস্তবে যাচাই করা যেতে পারে।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের এক কল্পনাতে বলেছেন যে, শক্তির ভর আছে, সেজন্যে আলোর ভর আছে। ধরা যাক, আলো কোন একটি অতি ভারী বস্তুর সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ঐ ভারী বস্তুটির চারপাশে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্যে আলোর রশ্মিটি ঐ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যাবার জন্যে বস্তুটির দিকে গড়িয়ে যাবে ; অর্থাৎ বস্তুটির দিকে বেঁকে যাবে, যেমন একটি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হবার পর পৃথিবীর দিকে বেঁকে এসে কিছু দূরে গিয়ে পৃথিবীর উপরে পড়ে। অবশ্য আলোর রশ্মির ভর এতই কম যে, সেটির পৃথিবীর দিকে বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ অত্যন্ত কম হবে বলে কোন কিছুর দ্বারা তার পরিমাপ করা যাবে না। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ভর অনেক বেশী বলে, কোন আলোকরশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে গেলে রশ্মিটির বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ পৃথিবীর দিকে বেঁকে যাওয়ার পরিমাণের চেয়ে বহু গুণ অধিক হবে। সুতরাং সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসা কোন তারকার আলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে, আর সেটি করতে হবে কোন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়, যেহেতু তখন সূর্যের উজ্জ্বলতা চাঁদের ছায়ায় ঢেকে গেলে তারকাটির অবস্থান, অর্থাৎ তারকাটি থেকে আসা ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটিকে ফটোগ্রাফী প্লেটে ধরতে সুবিধা হবে। তারপর কয়েক মাস পরে সূর্য আগের জায়গা থেকে অনেকখানি সরে গেলে, তারকাটির থেকে আলো আবার ফটোগ্রাফী প্লেটে ধরলে বোঝা যাবে যে, প্রথমবার তারকাটির আলো সূর্যের দিকে বেঁকে গিয়েছিল। এই বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ তাঁর গণিতের সূত্র থেকে পাওয়া মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদেরকে বললেন যে, 1914 খ্রীস্টাব্দে অগাষ্ট মাসে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে এবং সেটি গোচরীভূত হবে রাশিয়া থেকে। সুতরাং যদি একদল বিজ্ঞানীকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতিসমেত রাশিয়ায় পাঠান যায়, তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে তাঁর মতবাদের বাস্তব সত্যতা বিজ্ঞানীরা যাচাই করতে পারবেন। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম আইনস্টানের প্রতিভাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। আইনস্টাইনের বক্তব্যটি তাঁর কানে এল। তিনি ভাবলেন যে, আইনস্টাইনের মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হলে জার্মানির সম্মান

পৃথিবীর দরবারে অনেক উঁচু হবে। সুতরাং সম্রাটের ইচ্ছানুসারে জার্মানি থেকে একটি বৈজ্ঞানিক দল রাশিয়াতে পাঠান স্থির হল। উপযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা ইত্যাদি কেনা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দলটি রাশিয়াতে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 1914 খ্রীস্টাব্দের 28শে জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অস্ট্রিয়া ঐ তারিখে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করাতেই এই যুদ্ধ শুরু হয়। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেওয়াতে এবং রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রী (Triple-Entete) ছিল বলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ত্রি-শক্তির জোট (Triple Alliance) অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়া জার্মান বৈজ্ঞানিক দলকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কারারুদ্ধ করল। এইভাবে আইনস্টাইনের মতবাদের সত্যতা যাচাইয়ের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

2

আইনস্টাইন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, উৎকট স্বদেশভক্তি ও দেশজয়ের জন্যে যুদ্ধের উন্মত্ততাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এই সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কিছুটা আভাস তাঁর 'শৈশব ও কৈশোর' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'জগৎকে আমি যেমনটি দেখি' ('The World as I See It') থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, "চারজন চারজন করে শ্রেণীবদ্ধ প্রতিটি ফৌজের স্নায়ুপীড়ক ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে একজন লোক কুচকাওয়াজ করে যেতে আনন্দ পায় শুনলেই তার প্রতি আমার ঘৃণা হয়। ভুল করে তাকে একটি বড় মগজ দেওয়া হয়েছে ; একটি মেরুদণ্ডই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সভ্যতার এই দূষিত অংশ যথাসম্ভব সত্বর দূর করে দেওয়া উচিত। স্বদেশভক্তির নামে এই যে ফরমাসী বীরত্ব, অর্থহীন হিংসা এবং সব রকমের মারাত্মক নিবুদ্ধিতা—এই সবকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। যুদ্ধকে আমি অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নীচ বলে মনে করি। এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্যুবরণকে আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কিন্তু এত সত্ত্বেও মানুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা এত উঁচু যে, আমার বিশ্বাস যদি বিদ্যালয় ও ছাপাখানার দ্বারা প্রচারিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যে বিভিন্ন জাতির সৎ বুদ্ধি নষ্ট না হত, তবে এই শয়তানী প্রবৃত্তি অনেক দিন পূর্বেই দূর হয়ে যেত।"

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ জার্মান জাতির অহমিকা ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এই প্রসঙ্গে জার্মান জাতি সম্বন্ধে কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

নেপোলিয়েঁা কর্তৃক য়ুরোপের ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া বাদে প্রায় সব দেশ জয় করার পূর্বে জার্মানি প্রায় 300টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সুবিধের জন্যে নেপোলিয়েঁা সেগুলিকে মোট 39টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্যে পরিণত করে 'কনফেডারেশন অফ দি রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলেন।

ইতালিও ঐরূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডি (Gariboldi), ম্যাৎসিনি (Mazzini), ক্যাভুর (Cavour) প্রমুখ প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতাদের চেষ্টায় ইতালির ঐক্যসাধন হয়েছিল। এতে পাইড্‌মণ্ট-সার্ভিনিয়ার উদারচেতা রাজা দ্বিতীয় ভিক্তর ইমান্যুয়েল ও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপালিয়েঁার অবদানও কম নয়।

ইতালির ঐ উদাহরণে উত্তর জার্মানির প্রাশিয়া নামক দেশের চেষ্টায় জার্মানির ঐক্যসাধন হয়েছিল। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম (Wilhelm 1) প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানির ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্য 1862 খ্রীস্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অটোফন বিসমার্ককে (Otto Von Bismarck) প্রধান মন্ত্রী করেন। কূটনৈতিক চালে, রণকৌশলে, প্রখর ব্যক্তিত্বে তখনকার দিনে বিসমার্ক একরকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানির ঐক্যসাধন কেবল যুদ্ধের দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নয়, গণতন্ত্রের দ্বারা তো নয়ই। তাঁর ধারণা ছিল যে, জটিল সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারাই সাধিত হতে পারে—বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নয়। সমরশিক্ষা তরুণদের বাধ্যতামূলক বিষয় হল। অল্পদিনের ভিতরে বিসমার্ক জার্মান সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুললেন। তখন জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য ছিল। এই দুটি জাতির ভিতরে তখন মনোমালিন্য ছিল। বিসমার্কের মূল উদ্দেশ্যই হল প্রথমে ডেনমার্কের অন্তর্গত কিছু জার্মান রাজ্য জয় করা, পরে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করে উত্তর জার্মানির ঐক্য ও সর্বশেষে ফ্রান্সকে পরাজিত করে সেই দেশের অন্তর্গত সব দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যকে মুক্ত করে সমগ্র জার্মান রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্য 1864 থেকে

1870 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ছয় বছরে তিনি তিনটি যুদ্ধ করেন। প্রথমটি ডেনমার্কের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়টি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ও তৃতীয়টি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। সব কয়টি যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি বিরাট জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন যে, প্রাশিয়ার রাজাই হবেন সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি শাসনব্যবস্থার সুবিধের জন্যে বুণ্ডেস্‌রাথ (Bundesrath) ও রাইখ্‌স্টাক (Reichstag) নামে দুই পরিষদযুক্ত একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা স্থাপন করলেন। তিনি ঘোরতরভাবে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের বিরোধী ছিলেন। এই ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি দমননীতি প্রয়োগ শুরু করলেন। এটিই কুল্‌টুর কাম্ফ (Kultur Kampf) বলে পরিচিত। রাজনীতিতে প্রখর জ্ঞান থাকার জন্যে তিনি অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেও একরকম বিনা শর্তেই সেই দেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। ইতালি প্রাশিয়াকে সাহায্য করেছিল বলে বিসমার্ক জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়ার ভিতরে ত্রি-শক্তি চুক্তি (Triple Alliance) সম্পাদন করলেন। অবশ্য পরে কিছু ভূখণ্ডের স্বত্ব নিয়ে ইতালির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার মনোমালিন্য হওয়ায় প্রথম যুদ্ধে ইতালি ত্রি-শক্তি চুক্তি মানে নি।

সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় উইলিয়াম সম্রাট বা কাইজার হলেন। তিনিও অত্যন্ত জেদী ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন। ফলে কিছুদিনের ভিতরে শাসননীতি ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে বিসমার্কের মনোমালিন্য হওয়ায় 1890 খ্রীস্টাব্দে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এক অতি সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবাদের প্রকাশ হয়। প্রত্যেক জাতিই নিজ দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত এবং কি উপায়ে অন্যান্য দেশ ও জাতিকে পদানত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়—তার জন্যে বাহ্যিক শান্তির আড়ালে গোপনে সামরিক প্রস্তুতি চলতে লাগল। এই সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ জার্মান জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র রাজনীতিতেই নয়, বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তিবিদ্যা সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এইজন্যে আইনস্টাইন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, শিল্পী, কলাকুশলীদেরকে জার্মানিতে অতি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তাঁর

দুর্দম বাসনা হল ইংল্যাণ্ডের চেয়ে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা ও পূর্ব য়ুরোপের ভিতর দিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে করে বিশাল জার্মান সম্রাজ্য স্থাপন করা। এইজন্যে তিনি পূর্ব য়ুরোপের তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন।

এদিকে অস্ট্রিয়া রাজ্য বিস্তারের লোভে পূর্ব য়ুরোপের রাজ্যসমূহের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করেছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য স্লাভজাতি অধ্যুষিত কিছু কিছু রাজ্য, যেমন সার্বিয়ার কিছু অংশ, বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা, নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়ে তাদের উপরে স্বৈরাচারী শাসন চালাতে লাগল ও সার্বিয়ার স্বাধীন অংশকে ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শন করতে লাগল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার স্বাধীন অংশের উপর প্রথমে অকারণে হামলা করে সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সাহস পেল না, কারণ রাশিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার মৈত্রী ছিল। জার্মানি ও অয়াস্ট্রির মনোভাব ও বলকান রাজ্যগুলি সমস্যার জন্যে য়ুরোপে একটি 'যুদ্ধং দেহি' ভাবের সৃষ্টি হল।

এই সময়ে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্‌জ ফার্ডিনাণ্ড (Archduke Franz Fardinand) বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভাতে পরিভ্রমণকালে সার্বিয়ার জনৈক সন্ত্রাসবাদী আকস্মিকভাবে তাঁকে হত্যা করে। এই ব্যাপারটির জন্যে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে তার কাছে কৈফিয়ৎ চায় এবং মাত্র 48 ঘণ্টার মেয়াদে সার্বিয়াকে কতকগুলি শর্তসম্বলিত এক চরমপত্র দেয়। সার্বিয়া এই শর্তগুলির অনেক কিছুই মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বাকীগুলি মেনে নিলে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে—এজন্যে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। 1914 খ্রীস্টাব্দের 28শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানি ও তুরস্ক যোগ দিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে আর রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যোগ দিল সার্বিয়ার পক্ষে। পরে আমেরিকা এই যুদ্ধে সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয়।

3

আইনস্টাইন বার্লিনে আসবার অল্প কয়েকমাস পর থেকেই বার্লিনে সমর প্রস্তুতির আয়োজন লক্ষ্য করেছিলেন ; সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, গোলা বারুদের শব্দ, কাগজে রণহুঙ্কার প্রভৃতিতে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াতে এই সব রণোন্মাদনা চরমে উঠল। জার্মানিতে যাবার

বিরুদ্ধে মিলেভার কথাগুলি মনে পড়ল। তিনি মনে আঘাত পেলেন যখন দেখলেন বার্লিনের শিক্ষাক্ষেত্রে এই রণোন্মাদনা ও সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমের উন্মত্ততা আরম্ভ হয়েছে। কিছু দিন আগে যে সব শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ও বুদ্ধিমান নাগরিকেরা পৃথিবীর নানা দেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করছিলেন, তাঁরাই হঠাৎ সামরিক সঙ্গীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগলেন এবং রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ধ্বংসের জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। প্রত্যহ যুদ্ধে হাজার হাজার শত্রুদেশীয় লোকদের মৃত্যুসংবাদে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। লেসিং, শীলার, গ্যেটে প্রমুখ প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিকদের রচনাবলীর স্থানে ঘরে ঘরে সমাদর পেতে লাগল জার্মান জাতির প্রশস্তি ও যুদ্ধের প্রচারপত্রসংবলিত পুস্তিকা।

আইনস্টাইন নিজের সরলতা ও আন্তরিক বিজ্ঞানপ্রীতির দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিজ্ঞানসেবীদের দেখতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সাধারণ দৈনন্দিন জগৎ থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত বিজ্ঞান-জগৎ—যেখানে হিংসা নেই, জাতিভেদ নেই, শত্রুমিত্র নেই, ইংরেজ, জার্মানী, ফরাসী বলে কিছু নেই। আন্তরিকভাবে যাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণা করেন, তাঁরা প্রকৃতির রহস্যের বিভিন্ন প্রকাশে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না বলেই সেই রহস্যের উন্মোচনের এবং অজানাকে জানবার আগ্রহে অধীর। এই দিক দিয়ে তাঁরা পরম ধার্মিক।

কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পর বার্লিনে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অষ্ট্‌ওয়াল্ড, লেনার্ড প্রমুখ নামকরা বিজ্ঞানীরা তুমুল আন্দোলন করতে লাগলেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করবার জন্যে, আন্দোলন করতে লাগলেন যে, জার্মানির বিজ্ঞান সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা সামান্য যা কিছু করেছেন, তা জার্মান বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে। তাঁরা আস্ফালন করতে লাগলেন অন্যান্য দেশকে জয় করে জার্মানির পদানত করতে —যেন সেইটি হবে ইতিহাসের প্রসিদ্ধতম ব্যাপার এবং জার্মানির অতি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশস্তির প্রচারপত্রে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা নাম সই করে প্রচার করতে লাগলেন। প্লাঙ্ক ও তাঁর মত উদার চরিত্রের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে অসুবিধায় পড়লেন। তাঁদের সেরূপ মনের জোর ছিল না বলে জার্মান সরকারের ও প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমির অন্যান্য সদস্যদের চটাতে সাহস করলেন না। তাঁরা দুর্বল চিত্ত ও ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্যে সোচ্চারে জার্মানির

শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রচার না করলেও মৃদুভাবে জার্মানির 'ন্যায্য দাবী' সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন এবং প্রচার পুস্তিকাতে নামে সই করলেন। আইনস্টাইন সুইশ নাগরিক ছিলেন ও তাঁর মনোভাব জানা ছিল বলে জার্মানির পক্ষে প্রচারপত্রে নাম সই করাতে কেউ সেরূপ জোর দিলেন না। কিন্তু পরোক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে লেনার্ড, স্টার্ক প্রমুখ প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমির কয়েকজন গোঁড়া খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন বিজ্ঞানী নানারূপ সমালোচনা করতে লাগলেন।

আইনস্টাইন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সহজ ও আন্তরিক সম্বন্ধ রাখতে কুণ্ঠা বোধ করলেন। এসত্ত্বেও তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চরম রূপ দিচ্ছিলেন বলে গভীরভাবে চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মনের গভীর মানবতাবোধের জন্যে কয়েক জন অতি স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা, সংগ্রামপ্রিয় লোকেদের দ্বারা যুদ্ধ চালিয়ে অজস্র নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু কিংবা অসীম দুর্দশার কথা ভেবে তিনি ঘরে বসে স্থির হয়ে বিজ্ঞানের চর্চাতেও শান্তি পাচ্ছিলেন না।

সর্বকালে সর্বদেশেই, এমনকি বার্লিনেও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, উদার চরিত্রের বিপ্লবী মানুষ থাকেন, যুদ্ধের সময়েও ছিলেন। তাঁরা হলেন সম্পূর্ণরূপে শান্তিবাদী। কিন্তু বার্লিনে এই সব মানুষ আড়ালে থেকে গোপনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন, কিন্তু আইনস্টাইনের পরিচিত কেউ এইসব দলের ছিলেন না। যদিও এইসব বিপ্লবীদলের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে অসমর্থ হলেন, কিন্তু তাঁর মতাবলম্বী কয়েকজন মনীষীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মনীষী। রোমাঁ রোলাঁ ছিলেন এইরূপ একজন, আর ছিলেন কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও লেখক।

1915 খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আইনস্টাইন রোমাঁ রোলাঁকে এক চিঠিতে অনুরোধ জানালেন যে, রোলাঁর যুদ্ধবিরোধী সমিতির কোন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। তিনি ঐ চিঠিতে আরও লিখলেন যে, রেনেসাঁসের পরে তিন শতাব্দী ধরে চিন্তাশীল মনীষীদের গভীর সাধনায় য়ুরোপে ধর্মের গোঁড়ামী ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে যে সংস্কৃতি ও

সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সেই ধর্মের গোঁড়ামী এখন আবার দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা রূপে। কিছু কিছু নামকরা বিজ্ঞানী এমন ব্যবহার করেছেন যাতে মনে হয়, যে মস্তিষ্কের চিন্তায় প্রকৃতির রহস্যের কিছু কিছু কারণ উদঘাটন করে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই মস্তিষ্ক এখন আর স্বস্থানে নেই। এইরূপ অনেক বিজ্ঞানীর যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে পশুপ্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়াকে একজন খাঁটী যুক্তিবাদী হিসেবে আইনস্টাইন য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলে বিবেচনা করলেন।

আইনস্টাইন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী ছিলেন বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অহিংসভাবে কেবলমাত্র যুক্তি ও আত্মিক জোরে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর কারাবরণ, দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনকে আইনস্টাইন আদর্শ আন্দোলন বলে বিবেচনা করতেন এবং গভীর আগ্রহে প্রতিটি আন্দোলনের ফলাফল লক্ষ্য করতেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি গান্ধীজীকে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি অনেক প্রবন্ধেগান্ধীজীর আদর্শ ও কর্মধারার কথা লিখেছেন। তিনি এক স্থানে লিখেছেন যে, আমাদের সমসাময়িক যুগে এইরূপ একজন মহান ব্যক্তি আছেন বলে আমরা ধন্য হয়েছি। গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

যুদ্ধের সময় মানুষের, বিশেষ করে তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের, এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি দেখে তাঁর মন খুবই খারাপ হল। তাঁর খুব ইচ্ছে হল ছেলেদেরকে দেখার। এইজন্যে 1915 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে তিনি জুরিখে এলেন। সুইৎজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ দেশ বলে রোমাঁ রোলাঁ সেখানে থেকে তাঁর যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে অনুরোধ জানান হচ্ছিল এই বীভৎস যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে। আইনস্টাইন দেখা করলেন রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে। রোলাঁ তাঁকে বললেন যে, যুদ্ধলিপ্ত সব দেশেই যুদ্ধবিরোধী লোকেদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রোলাঁর কথাবার্তায় ও মতবাদে আইনস্টাইন খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং এই মনীষীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমিতিতে সভ্য হওয়ায় তিনি

নিজেকে ধন্য মনে করলেন। জার্মানিতে এসেও তিনি এই সমিতির বেশ কিছু সদস্যের সন্ধান পেলেন।

4

যুদ্ধ পুরোদমে চলতে লাগল, যুদ্ধের বিভীষিকা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আইনস্টাইনের কাকা, অর্থাৎ হেরম্যানের খুড়তুতো ভাই রুডল্ফ্, যাঁর কথা 'শৈশব ও কৈশোর' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তখন বার্লিনে বাস করছিলেন। তাঁর মেয়ে এলসা তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে দুই মেয়ে ইল্সা ও মারগৎকে নিয়ে বার্লিনে বাবার কাছে ছিলেন। এল্সা হলেন আইনস্টাইনের বাবার দিক থেকে খুড়তুতো বোন, কিন্তু মায়ের দিক থেকে তাঁর আরও নিকট সম্বন্ধ ছিল, কারণ এল্সার মা ছিলেন আইনস্টাইনের মায়ের আপন বোন। স্মরণ থাকতে পারে যে, আইনস্টাইনের বাবা হেরম্যানের মৃত্যুর কিছু পূর্বে আইনস্টাইনের মা কিছুদিনের জন্যে এল্সাকে মিলানে নিয়ে গিয়েছিলেন হেরম্যানের দেখাশুনা করবার জন্যে। হেরম্যানের মৃত্যুর পরে এল্সা মেয়েদেরকে নিয়ে বার্লিনে এলেন বাবার কাছে।

আইনস্টাইন্ একদিন সন্ধ্যাবেলায় এলেন রুডল্ফের বাড়ী। এল্সা আর আইনস্টাইনের দেখা হল বহু বছর পরে। প্রথমে দু-জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তাঁদের স্মৃতিতে ভেসে এল শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলির কথা। নিকট সম্পর্কের সমবয়সী এই দুই ভাইবোন কতদিন এক সঙ্গে খেলা করেছেন যখন রুডল্ফ এল্সাকে নিয়ে আসতেন হেরম্যানের বাড়ীতে। এল্সার মনে পড়ল অ্যালবারতলের কচি, সুন্দর, সরল মুখ ও টানা টানা চোখ দুটির কথা আর তার বেহালা বাজানোর কথা ; আর আজ প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন সেই অ্যালবারতল স্বপ্নমাখা ভাসা ভাসা সেই চোখ দুটি নিয়ে, মুখে সেই সরল মধুর হাসি, মাথাভর্তি লম্বা কোঁকড়ানো এলোমেলো কালো সাদায় মেশানো চুল, এখন পৃথিবীখ্যাত অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি এসে 'অ্যালবারতল' বলে আইনস্টাইনের হাত জড়িয়ে ধরলেন। আইনস্টাইনের মনে পড়ল কৈশোরের ছোট, সুন্দর, এল্সার লাজুক মুখ, এখন দেখলেন এল্সাকে প্রৌঢ়ত্বের প্রায় কাছাকাছি সুশ্রী, সুঠাম দেহধারিণী, মাথায় অনেক চুলে পাক ধরেছে, মুখে সুন্দর ও স্নেহভরা মাতৃত্বের ছাপ। ইল্সা ও মারগৎ আঙ্কল অ্যালবারতলের কথা অনেক শুনেছে। আজ

সেই আঙ্কল অ্যালবারতল এসেছেন তাদের বাড়ীতে। তারা এসে জড়িয়ে ধরল আইনস্টাইনকে। আইনস্টাইন দুই কিশোরী মেয়েকে আদর করলেন। তারা বললে আইনস্টাইনকে রোজ আসতে বেহালা নিয়ে ও বাজনা শোনাতে। কাকা রুডল্‌ফ খুব খুশী হলেন।

তারপর চলল নানারূপ গল্প, হাসি, ঠাট্টা কৌতুক। এল্‌সা লক্ষ্য করলেন যে, কোন একটি মজার কথা উঠতেই ছেলেবেলার মত আইনস্টাইনের সশব্দে হেসে ওঠার অভ্যাসটি তখনও আছে, আর আছে তাঁর স্বপ্নমাখা ও ঈষৎ বিষাদদৃষ্টিতে ভরা দুটি চোখ ছোট ছেলেদের চোখের মত খুশীতে জ্বলজ্বল করে ওঠা। হাস্যকৌতুককে মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করাতে আইনস্টাইন ও এলসা দু-জনেই প্রায় সমান ছিলেন।

এল্‌সা বুঝলেন আইনস্টাইনের নিঃসঙ্গতার কথা, বুঝলেন যে, এই অসহায় ও সরলতায় চির শিশুমনোভাবাপন্ন মানুষটিকে সঙ্গ দেবার, তাঁর দুঃখ ভুলিয়ে দেবার কেউ নেই। তিনি ক্রমশঃ আইনস্টাইন ও মিলেভার সম্পর্কের কথা জেনে নিলেন। বিবাহিত জীবনে এল্‌সাও ছিলেন অসুখী, এল্‌সা আইনস্টাইনের বাবা হেরম্যানের জীবনের শেষ কটি দিনের কথা বললেন। তারপর খাওয়ার শেষে কিছুক্ষণ চলল গল্প, গেটে ও শীলারের লেখা থেকে আবৃত্তি ও পাঠ। আইনস্টাইনের বাড়ী ফিরবার সময় সবাই, বিশেষ করে ইল্‌সা ও মারগৎ বারে বারে তাঁকে তাঁর বেহালা নিয়ে রোজ আসবার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

এভাবে আইনস্টাইন একটি শান্তির নীড় খুঁজে পেলেন। ছেলেবেলায় মিউনিখের তাঁদের বাড়ীর সান্ধ্য-মজলিসগুলির কথা মনে পড়ল। যুদ্ধ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল, একের পরে এক দেশ দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিজয় শকটের তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল, গেল বেলজিয়াম, গেল ফ্রান্স, আর চলল বার্লিনে পৈশাচিক উন্মত্ততা। বন্ধুহীন আইনস্টাইন গভীর পরিশ্রমের পর 1916 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। যখন মনে শান্তির প্রয়োজন মনে করতেন, যেতেন এল্‌সার বাড়ীতে, চলত খাওয়া-দাওয়া। এল্‌সা ছিলেন রান্নায় পারদর্শিনী। খাওয়াদাওয়ার পরে চলত গান, বাজনা, আবৃত্তি।

1916 খ্রীস্টাব্দে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে

যে কঠিন পরিশ্রম আইনস্টাইনকে করতে হয়েছিল, বোধ হয় সেই জন্যে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমন কি তাঁর সেরে ওঠার সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ ছিল। শুধু এল্‌সার অক্লান্ত সেবায় তিনি বেঁচে উঠলেন বলা যেতে পারে। আইনস্টাইনের এই রোগের সময় ম্যাক্স বর্নের স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে এলে আইনস্টাইন তাঁর নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা এত শান্ত ও নির্লিপ্তের মত বলতেন যে, একদিন মিসেস বর্ন্ তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি মরতে ভয় পান কিনা। জবাবে আইনস্টাইন বললেন, "না, মোটেই না, আমি নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এত জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ, সে বিষয়ে জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত নই।"

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর প্রকৃতির ও জীবনের ধারণার সঙ্গে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার খুবই মিল ছিল। বাণীটি হল, "যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই অখণ্ড-স্বরূপকে দেখতে পান, যিনি এই মরজগতে এক অনন্ত জীবন দেখতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানতা-পূর্ণ জগতে সেই এক স্বরূপকে দেখতে পান, তাঁরই শাশ্বত শান্তি, আর কারও নয়।"

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে সচ্চিদানন্দ কথাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি একটি নিবন্ধে লিখেছেন যে, সচ্চিদানন্দ হল সৎ বা সত্য, চিদ বা চিৎশক্তি বা চেতনা ও আনন্দ। বাস্তব জগতে আছে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর সত্যতা, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই জগৎ জড়পিণ্ডের সমষ্টি, জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্ন প্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। কিন্তু এত বিভিন্নতার ভিতরেও অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার ভিতরে আছে শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার অস্তিত্বের কারণ হল প্রকৃতিতে এক অনির্বচনীয় শক্তি, যাকে স্পেন্সর (Spencer) বলেছেন 'Inscrutable Power in Nature'। এই শক্তি থেকেই সমস্ত কিছুই জন্মাচ্ছে, চলছে, নিয়ত উৎপন্ন হচ্ছে ও তাতেই সব বিলীন হচ্ছে। ঐ অনন্ত শক্তির প্রকাশ পায় নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে, আর এই সব ঘটনার প্রত্যেকটিতে আছে সুষ্ঠু কার্য-কারণ সম্বন্ধ। প্রতিটি মানুষ যেমন তার চৈতন্য অনুযায়ী কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তেমনি বিশ্বের সব লীলায় প্রকাশ পাচ্ছে যেন এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, আর এই

চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি, তাকেই বলা হয়েছে চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তির বা চিৎ-এর অবস্থানের জন্যেই জাগতিক শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা আছে বলেই জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ, যাকে বলা হয়েছে আনন্দ। এই তিনে মিলেই সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানতে পারলেই জগৎকে জানা যায়। আইনস্টাইনের চিন্তাধারা থেকে বোঝা যায় যে, এই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল।

এই সময় থেকেই আইনস্টাইন এল্‌সাদের বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। এল্‌সা তাঁর খুবই সেবাযত্ন করতেন। কিছুদিন পরে তাঁরা দু-জনে স্থির করলেন যে, আইনস্টাইন আইনতঃ মিলেভার থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পেলে আইনস্টাইন এল্‌সাকে বিয়ে করবেন। তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা এতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। 1919 খ্রীস্টাব্দে মিলেভার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে আইনস্টাইন এল্‌সাকে বিয়ে করলেন। এতে দু-জনেই খুব সুখী হলেন। আইনস্টাইন 5নং হ্যাবারল্যাণ্ড স্ট্রীটের একটি নয়-কামরাবিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ী ভাড়া করলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী এল্‌সা ও তাঁর দুই সৎমেয়ে ইল্‌সা ও মারগৎকে নিয়ে দ্বিতীয়বার সংসার পাতলেন। আইনস্টাইনের বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা পলিন কয়েক বছর তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে ছিলেন, পরে বার্লিনে আইনস্টাইনের কাছে এসেছিলেন। তার অল্প কিছুকাল পরে 1920 খ্রীস্টাব্দে পলিনের মৃত্যু হয়।

এল্‌সা শুধু সুনিপুণা গৃহিণীই ছিলেন না, মা যেমন শিশুর সব দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে লালনপালন করেন, মমতাময়ী এল্‌সা স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তেমনি এই আত্মভোলা, নিজের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে উদাসীন আইনস্টাইনের সব দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সেবাযত্ন করে গিয়েছেন প্রায় 1934 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন আমেরিকার প্রিন্সটনে (princeton) তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে ভোগবার পরে 1936 খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁদের বার্লিনে বাসকালে কয়েকবার আততায়ীরা আইনস্টাইনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এল্‌সার সতর্ক দৃষ্টির জন্যে প্রত্যেকবারই আততায়ী ধরা পড়ে। প্রিন্সটনে এল্‌সার মৃত্যুর পরে মারগৎ তাঁর সৎপিতার সেবাযত্নের ভার নেন। এইসব ঘটনা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

6

1917 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর 'উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব' (Stimulated Emission Theory) প্রকাশ করেন। আইনস্টাইনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঙ্গে এটিও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে। যাঁরা তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক কাজ সম্বন্ধে কিছু জানতে আগ্রহী, তাঁরা সেই অধ্যায়টি পড়তে পারেন।

এখানে তাঁর এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ করা হচ্ছে। 1897 খ্রীস্টাব্দে টমসন কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে প্রায় দুই হাজারেরও বেশী কাল ধরে বিজ্ঞানে প্রচলিত ধারণা—বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু—তার সমাপ্তি হল। বিজ্ঞানীরা জানলেন যে, পরমাণু বিভাজ্য এবং তার ভিতরে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত ইলেকট্রন। যেহেতু পরমাণু আধান-নিরপেক্ষ (neutral), সেহেতু বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন যে, কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভিতরে যত সংখ্যক ঋণাত্মক ইলেকট্রন আছে, ততগুলি ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত কণিকারও অবস্থিতি আছে। এই ধনাত্মক কণিকা হল প্রোটন।

বিজ্ঞানীরা তখন দুটি বিষয় জানতে আগ্রহী ছিলেন। একটি হল পরমাণুর গঠন ও অপরটি হল—কোন বস্তুকে গরম করতে থাকলে একটি উচ্চ মানের উষ্ণতায় প্রথমে বস্তুটি থেকে লাল রঙের আলো নির্গত হয় এবং উষ্ণতা বাড়াবার সঙ্গে আলোর রঙ ক্রমশঃ কমলা, হল্‌দে হয়ে বেগনীর দিকে যে সরে যায়, তার কারণ।

1897 থেকে 1912 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টমসন, রাদারফোর্ড ও বোরের মতন বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ও চিন্তায় জানা গেল, যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে পরমাণুটির প্রায় সমস্ত ভরের সমান একটি জমাট কঠিন পদার্থ। এটিকে বলা হল কেন্দ্রীন (nucleus)। কেন্দ্রীনটি হল ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত। পরমাণুটির ভিতরে এই কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করছে। একটি পরমাণুর আকার একটি ইলেকট্রনের আকারের চেয়ে প্রায় এক লক্ষ গুণ বড় ও আয়তন প্রায় দশ কোটিরও কোটি গুণ বড়। সুতরাং একটি পরমাণুর অভ্যন্তর অনেকটা আমাদের সৌর জগতের মত, যেখানে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি আবর্তন করছে। তফাৎ হল যে, গ্রহগুলি বিদ্যুতাহিত নয় ও প্রতিটি গ্রহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে

আবর্তন করছে, আর পরমাণুর ভিতরে কেন্দ্রীনটি ও ইলেকট্রনগুলি বিদ্যুতাহিত এবং যে-কোন ইলেকট্রনের বহু সংখ্যক বিভিন্ন শক্তিস্তরের কক্ষপথ আছে। এই কক্ষপথগুলির যেটি কেন্দ্রীন থেকে যত বেশী দূরে অবস্থিত, তার শক্তির মাত্রাও তদনুপাতে উচ্চতর। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বানুযায়ী সূর্য ও যে-কোন গ্রহের মধ্যে আকর্ষণই গ্রহটিকে সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করবার কেন্দ্রাভিগ বল (centripetal force) যোগাচ্ছে।

পরমাণুর ভিতরে কেন্দ্রীনের ও যে-কোন ইলেকট্রনের বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতাধান আছে বলে তাদের ভিতরে একটি আকর্ষণ আছে। যদি ইলেকট্রনটি স্থির থাকত, তবে এই আকর্ষণহেতু সেটি কেন্দ্রীনের টানে তার উপরে গিয়ে পড়ত, যার জন্যে পরমাণুটির ধ্বংসসাধন হত। সেজন্যে বোরের পরমাণু গঠনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন। বোরের কল্পনাতে কোন বস্তুর উষ্ণতা বাড়তে থাকলে বিভিন্ন রঙের আলোর নির্গমনের ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। বোর বললেন যে, কোন একটি কক্ষপথে আবর্তনকালে কোন ইলেকট্রন থেকে কোন শক্তি নির্গত হয় না। এটি ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে জানি যে, কোন দোলন পথে (oscillatory circuit) ইলেকট্রন দ্রুত আবর্তন করতে থাকলে শক্তি বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের আকারে আলোর বেগে ছড়িয়ে যায়। বোর আরও বললেন যে, বাইরে থেকে কোন প্রক্রিয়ার জন্যে একটি পরমাণু শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হলে, পরমাণুটির আভ্যন্তরিক ইলেকট্রন লাফিয়ে তার নিজের কক্ষপথ থেকে যথোপযুক্ত উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কক্ষপথে ওঠে এবং এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে সেই উচ্চতর কক্ষপথটি থেকে নিজের স্বাভাবিক কক্ষপথে কিংবা অন্তর্বর্তী কোন কক্ষপথে নেমে আসে। এই প্রক্রিয়াতে দুটি কক্ষপথের শক্তির মানের পার্থক্যের শক্তির কণিকা বা ফোটন পরমাণুটি থেকে নির্গত হয়। এই ফোটনের কম্পাঙ্ক কিংবা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় প্লাঙ্কের কণা-সূত্রের দ্বারা।

মনে করা যাক যে, এই নির্গত শক্তির ফোটনের কম্পাঙ্ক হল সেকেণ্ডে প্রায় 4×10^{14} অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল 0.000075 সেন্টিমিটার। তাহলে এই ফোটনটি আমাদের চোখে লাল আলোর অনুভূতি জাগাবে। অবশ্য বস্তুটি থেকে মোটে একটি ফোটনই বেরোয় না। যে-কোন বস্তুতে কোটি কোটি

পরমাণু আছে। তবে সব পরমাণু থেকেই যে শক্তি নির্গত হবে, তাও নয়। পরমাণুগুলির দ্বারা শোষিত শক্তির ফোটনের সংখ্যা নির্ভর করবে সম্ভাব্যতার উপরে। কোন পরমাণু যে উত্তেজিত হয়ে উঠলে ইলেকট্রন যথাযোগ্য শক্তির কক্ষপথে লাফিয়ে উঠবে, তারও নিশ্চয়তা নেই, তার মানে অনিশ্চয়তা।

এরূপে কোন পরমাণু পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তাপ পেলে সেটি অধিকতর উত্তেজিত হবে এবং ইলেকট্রন আরও উচ্চতর শক্তির কক্ষপথে লাফিয়ে উঠে আবার নেমে আসবে, যার জন্যে উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ফোটন নির্গত হবে। যদি পরমাণুটি থেকে নির্গত শক্তির ফোটনের কম্পাঙ্কের মান হয় সেকেণ্ডে 6×10^{14}, তবে এটি হবে সবুজ আলোর ফোটন। এরূপ পরমাণু অধিক থেকে অধিকতর শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হতে থাকলে প্রথমে লাল ও পরে অন্যান্য রঙের আলো নির্গত হবে। এরূপ শক্তির ফোটনের নির্গমন বা বিকিরণকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ (spontaneous emission)।

1912 খ্রীস্টাব্দে বোরের এই পরমাণু-গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে বিজ্ঞান জগতে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হল। আইনস্টাইন তখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর পক্ষে এই আপাতবিরোধী সত্য সিদ্ধান্তের যুক্তি না মেনে উপায় ছিল না, কারণ আলোর ফোটনের নির্গমনের ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আইনস্টাইনের 1905 খ্রীস্টাব্দে আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্বে আলোকে কণিকা রূপ দেওয়াকে সমর্থিত হয়েছে। যদিও বোরের এই ব্যাখ্যা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না, তথাপি এর চমৎকারিত্বে আইনস্টাইন মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবনে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "..this appeared to me as a miracle and appears to me as a miracle even to-day. This is the highest form of musicality in the sphere of thought", অর্থাৎ, "এই ব্যাখ্যাটি আমার কাছে তখন অতি বিস্ময়কর ও অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল, এমন কি আজও সেরূপ মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত মানুষের চিন্তাজগতে উচ্চতম শ্রেণীর সঙ্গীতের মাধুর্যের মত।"

1916 খ্রীস্টাব্দে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের পরে তিনি বোরের এই পরমাণুর গঠনের কল্পনা এবং তাঁর নিজের ফোটনের কল্পনার বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেন। ফলে 1917 খ্রীস্টাব্দে 'উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব'

(Stimulated Emission Theory) প্রকাশ করেন। এটিকে বলা যেতে পারে প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্বের নবরূপে প্রতিষ্ঠা। আইনস্টাইন তাঁর এই তত্ত্বে বললেন যে, বোর কর্তৃক প্রদত্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের ব্যাখ্যা হল যে, শক্তির ফোটন পরমাণু কর্তৃক শোষিত হলে পরমাণু থেকে সেই শক্তির ফোটননির্গত হয়, কিন্তু এরূপ বিকিরণ ছাড়াও আর এক প্রকারের বিকিরণ থাকে। সেটি হল উদ্দীপিত বিকিরণ। কোন এক প্রকার ফোটন দ্বারা উত্তেজিত পরমাণুতে যে সব ইলেকট্রন তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তিস্তর থেকে লাফিয়ে উঠে উচ্চতর শক্তিস্তরে অবস্থান করছে, সেই উচ্চস্তরে অবস্থিত উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলির উপর যদি ঠিক একই প্রকারের শক্তির ফোটন বর্ষিত হয়, তবে পূর্বের উত্তেজক ফোটন ও পরের উদ্দীপিত ফোটন, একই পরিমাপের এই দুই ফোটন পরমাণু থেকে একই দিকে নির্গত হবে। এখানেও সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তার প্রশ্ন।

আইনস্টাইন তাঁর নিজের এই তত্ত্বে খুব খুশী ছিলেন না, কারণ পরমাণু থেকে এইরূপ বিকিরণে সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আসে বলে পরিসাংখ্যিক (statistical) নিয়মের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা জানি যে, পরিসাংখ্যিক নিয়মাদি প্রযুক্ত হয় বহু সংখ্যকের উপরে, অল্প সংখ্যকের উপরে নয়। সহজ উদাহরণ হল—একটি মুদ্রা উপরে নিক্ষেপ করে (toss) 'হেড' কি 'টেইল'-এর সংখ্যা নির্ণয় করা। যদি অল্প বার, ধরা যাক চার বার, টস করা যায়, হয়ত 'হেড' প্রতিবারই হবে কিংবা 'টেইল'। কিন্তু যদি 4000 বার করা যায়, তবে একরকম নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, শতকরা 50 বার অর্থাৎ 2000 বার 'হেড' ও 2000 বার 'টেইল' হবে। তার উপর সনাতন নিয়মানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত শক্তির তরঙ্গ-রূপে বিকিরণ ও সব সময়েই এইরূপ অনিশ্চিত কণিকা-রূপে বিকিরণ—এই দুয়ের মধ্যে খাপ খাওয়ানো সম্ভবপর নয়।

আইনস্টাইনের এই উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক দিন শুধু তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রায় 40 বছর পরে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে উৎসাহী হয়ে 1954 খ্রীস্টাব্দে টাউন্‌স্ (Townes) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সর্বপ্রথম 'মেসার' (Maser) সৃষ্টি করলেন। তার কিছুকাল পরে তৈরী হল 'লেসার' (Laser)। এই দুটি নাম এখন প্রায় সকলেই জানেন। সাম্প্রতিক কালে এদের নানাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মেসার হল Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radition—

অর্থাৎ শক্তির উদ্দীপিত বিকিরণ দ্বারা অতি ক্ষুদ্র রেডিও তরঙ্গ বা অণু-তরঙ্গের তীব্রতা বর্ধন আর লেসার হল Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation অর্থাৎ শক্তির উদ্দীপিত বিকিরণ দ্বারা আলোর তীব্রতা বর্ধন।

মাইক্রোওয়েভ বা অণু-তরঙ্গ হল কয়েক সেন্টিমিটারের মত অতি ক্ষুদ্র মাত্রার রেডিও তরঙ্গ। রেডার যন্ত্রে এই তরঙ্গের সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছিল। বর্তমানে এই তরঙ্গ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে। আজকাল তারে বাহিত ট্রাঙ্ক টেলিফোন প্রায় উঠেই যাচ্ছে, তার স্থলে হচ্ছে অণু-তরঙ্গবাহিত টেলিফোন-বার্তা। এই পদ্ধতিতে যে-কোন দুই সহরের মধ্যে অনেক ব্যক্তি টেলিফোনে একই সময়ে কথাবার্তা বলতে পারবেন, যেটি তারে সম্ভব নয়। তারপর কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা সারা পৃথিবীতে টেলিভিসন, রেডিও টেলিফোনি ও টেলিগ্রাফির কর্মসূচী সম্ভবপর হয় এই অণু-তরঙ্গের দ্বারা এবং এতে ব্যবহৃত হয় মেসার যন্ত্র অণু-তরঙ্গের শক্তিবর্ধনের জন্যে।

লেসার আজকাল বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন বিজ্ঞানের গবেষণায়, চিকিৎসায়, জীববিদ্যায়, রেডারযন্ত্রে, শিল্পে, বিশেষ করে অতি সূক্ষ্ম ঢালাই কাজে এবং অস্ত্রাদি তৈরীতে।

7

বার্লিনের কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে আদর্শবাদী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মনে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞান-জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি উচ্চ। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা মনে-প্রাণে বিজ্ঞানের সাধনা করেন, তাঁরা হিংসা, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁদের কাছে শত্রুমিত্র বলে কিছু নেই। কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা সিদ্ধান্ত, সে যাঁর চিন্তা-প্রসূতই হোক না কেন, সেই বিজ্ঞানী ইংরেজ হোন কি জার্মান হোন, শ্বেতকায় হোন কি কৃষ্ণকায় হোন, তাতে কিছুই যায় আসে না; চিন্তালব্ধ প্রয়োজনীয় ফল সব দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে বরণীয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা (Astronomer Royal of England) আর্থার এডিংটন।

1917 খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর সামরিক শক্তি পূর্ণ উদ্যমে ধ্বংসলীলা চালিয়ে

যাচ্ছে। রোজই লণ্ডনের কতক কতক অংশ গোলা ও বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, কত জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংসলীলার মাঝে প্রকৃত বিজ্ঞানী এডিংটনের কাছে মনে হল যুদ্ধে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে জয় করার চেয়ে বিজ্ঞানের সত্য অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞানের সত্যই সবার উপরে। তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই মতবাদ পদার্থবিদ্যায় একটি বড় বিপ্লব ঘটাবে, যার জন্যে পদার্থবিদ্যাবিদ্‌দের চিন্তাধারা নূতন পথে চলবে। 1914 খ্রীস্টাব্দে তারকার আলো সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার কালে সূর্যের দিকে বেঁকে যাবে—আইনস্টাইনের এই ঘোষণার তাৎপর্য এডিংটন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন এটির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে।

এডিংটন অবশেষে একদিন—অল্প যে কয়েকজন প্রকৃত বিজ্ঞানী ধন, মান, প্রাণ সব কিছুর চেয়ে বিজ্ঞানের সাধনাকেই সবার উপরে স্থান দেন, তাঁদেরকে একটি সভায় আহ্বান করলেন আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য কী প্রকারে প্রমাণ করা যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে। গোলা, বারুদ, বিমান আক্রমণের বিপদসূচক সাইরেনের শব্দ উপেক্ষা করে তাঁরা এই সভায় উপস্থিত হলেন। এডিংটন আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললেন, "এই যুগান্তকারী মতবাদের সত্যতা যাচাই হতে পারে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়, কারণ তখন সূর্যের আলো খুবই স্তিমিত হয়ে যাবে। এইরূপ পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে 1919 খ্রীস্টাব্দের 29শে মে। এটি পূর্ণরূপে দেখা যাবে পৃথিবীর দুটি মাত্র স্থান থেকে, একটি পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপসাগরে (Gulf of Guinea) অবস্থিত প্রিন্সাইপ (Principe) দ্বীপে ও অন্যটি উত্তর ব্রেজিলের সোব্রাল (Sobral) নামক স্থানে। এই সূর্যগ্রহণের সময় হায়াড তারকাপুঞ্জের (constellation of the Hyades) আলো সূর্যের খুবই নিকট দিয়ে আসবে। আসুন, আমরা এখন থেকেই উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জাম কিনবার জন্যে একটি সমিতি গঠন করে অর্থ সংগ্রহ করি।"

উপস্থিত সব বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার জন্যে সব বিপদ উপেক্ষা করে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কেউ বিচার করলেন না যে, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে থাকলে ইংল্যাণ্ডের চারিদিকে অবস্থিত জার্মান ইউ-বোট (U-Boats)

অভিযাত্রী দলের জাহাজের কি দশা করতে পারে, কেউ বিচার করে দেখলেন না যে, ইংল্যাণ্ডের এই ঘোর দুর্দিনে কোথা থেকে অর্থ জোগাড় হবে এই বিরাট খরচ মিটাবার জন্যে। এই সব বিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান-জগতের চিন্তাতেই তন্ময়। কারোর মনে একবারও উদয় হল না যে, যাঁর মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে ও এত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে হবে, সেই আইনস্টাইন শত্রুপক্ষীয় জার্মান দেশের অধিবাসী।

অতি উদ্যম সহকারে অর্থ সংগৃহীত হতে লাগল এবং মূল্যবান যন্ত্রাদির ব্যবস্থা হতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে 1918 খ্রীস্টাব্দে জার্মানদের শক্তি দ্রুত ক্ষয় হতে লাগল ও সেই দেশে নানারূপ বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল, যার জন্যে সেই বছরের নভেম্বরে হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানরা পরাজয় স্বীকার করল। দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানি ছেড়ে হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন।

1919 খ্রীস্টাব্দে যথাসময়ে দুটি বিজ্ঞানী দল আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য যাচাই করতে রওনা হলেন। এডিংটনের নেতৃত্বে প্রথম দলটি গেলেন গিনি উপসাগরের প্রিন্সাইপ দ্বীপে ও দ্বিতীয় দলটি গেলেন ব্রেজিলের সোব্রালে। এল সেই 29শে মে তারিখ। সূর্য ঢাকা পড়ল চাঁদের আড়ালে। বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন তারকার আলো ফোটোগ্রাফির প্লেটে ধরতে। গ্রহণ লাগবার সময় প্রিন্সাইপ দ্বীপে মেঘ করেছিল, সেজন্যে এডিংটন খুবই নিরাশ হয়েছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গ্রহণের শেষের দিকে মেঘ সরে যাওয়াতে এডিংটনের পক্ষে তারকার আলোর ফোটো নিতে কোন অসুবিধে হয় নি। দুই দলই লণ্ডনে ফিরে এলেন। তারপর কয়েকমাস বাদে সূর্য যখন পূর্বের স্থান থেকে অনেকটা দূরে চলে গেল, তখন ঐ তারকাপুঞ্জের আলোর ফোটো আবার নেওয়া হল। দ্বিতীয়বার তারকার আলোর রশ্মিগুলি সূর্যের বহু দূর দিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং দু-বারের ফোটো মিলিয়ে বোঝা যাবে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার ফল সত্য কি না। এডিংটন ফোটোগুলি দিনের পর দিন গভীর মনোযোগ দিয়ে বিচার করছিলেন, কারণ এই বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ খুবই কম। বিজ্ঞানীরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন পদার্থবিদ্যায় নূতন যুগের আবির্ভাব হবে কিনা দেখবার জন্য, কারণ কোন বিজ্ঞানীর চিন্তাধারায় বিশ্বের যে সত্য উপলব্ধ হয়েছে, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে এরূপভাবে তিনি আগে কখনো চ্যালেঞ্জ করেন নি।

এডিংটন প্রকাশ্যে তাঁর বিচারের ফলটি ঘোষণা করবার পূর্বে ঐ বছরে সেপ্টেম্বর মাসে লোরেনৎসকে তাঁর ধারণা সম্বন্ধে বলেছিলেন। লোরেনৎস টেলিগ্রাম করে আইনস্টাইনকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আইনস্টাইন তখনি তাঁর মাকে একটি পোস্টকার্ডে লিখলেন, "আজকে একটি সুখবর পাওয়া গিয়েছে। লোরেনৎস টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে, একটি ইংরেজ অভিযাত্রীদল প্রমাণ করতে পেরেছে যে, আলোর রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যায়।"

আইনস্টাইন এই চিঠিতে শুধু তাঁর মাকে খুশী করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে এই অভিযানের ফল সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তিত ছিলেন না, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, এটি সত্য হবেই।

এর কিছুদিন পরে নভেম্বরের কোন এক তারিখে এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত সব বিজ্ঞানী, গণিতশাস্ত্রবিদ্ ও জ্যোতির্বেত্তাদের সামনে এডিংটন তাঁর পরীক্ষার ফল ঘোষণা করলেন। সবাই স্তব্ধ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলেন যে, আইনস্টাইন তাঁর মতবাদে যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে সত্য। তারকার আলো সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসবার সময় সত্যই ঐ মহান বিজ্ঞানীর হিসেব মত বেঁকে গিয়েছে, আর এই অসাধারণ মানুষটি এই হিসেব করেছেন কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে নয়, করেছেন শুধু কাগজ ও পেন্সিলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির কোন অজানা ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হবার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তার পরে সেই ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেন কোন তত্ত্ব বা মতবাদের দ্বারা। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এক বিস্ময়কর মতবাদ, যার দ্বারা তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতিতে এরূপ সব ঘটনা ঘটতেই হবে এবং সত্যই সেগুলির দুটি প্রমাণিত হল—একটি হল যে, আলো বা যে-কোন বিকীর্ণ শক্তির ভর আছে ও অপরটি হল যে, নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বমতে যে ধারণায় দুটি বস্তুর ভিতরে মহাকর্ষজ বলের উদ্ভব হয়. সেটি ঠিক নয়। প্রকৃত বিষয়টি হল যে, কোন বস্তু মহাকাশে তার চারদিকে একটি বিকৃত বা এবড়োখেবড়ো ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং মহাকাশের এই জ্যামিতিক গুণের জন্যেই দুটি বস্তু পরস্পরের দিকে গড়িয়ে যায়।

রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ইলেকট্রন আবিষ্কারক জে. জে. টমসন

বললেন, "আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ মানুষের চিন্তার ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের প্রথম বার্ষিক দিবসে কাগজে কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল, "REVOLUTION IN SCIENCE, NEWTONIAN PRINCIPLES OVERTHROWN". মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারল বিশ্বের প্রকৃত গঠন (Structure of the Universe)।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে যুদ্ধে পরাজয়ের প্রথম বাৎসরিক দিবসে জার্মানদের মনে দুঃখ ও বিষাদের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আইনস্টাইনের এই বিপুল সাফল্যে সমস্ত জার্মান গর্বে ও আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁরা মহাপুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, আইনস্টাইন জার্মান বলে তাঁরা গর্বিত। 1917 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন কিভাবে জার্মান নাগরিকত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে ঘটনা পরে উল্লেখ করা হবে। কাগজের সংবাদদাতারা ছুটে গেলেন 5নং হাবারলাণ্ড স্ট্রীটের বাড়ীতে, গিয়ে দেখলেন যে, মহান বিজ্ঞানী বেহালা বাজাচ্ছেন আর তাঁর স্ত্রী এল্‌সা (তখন দু-জনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে) এবং সৎ মেয়ে ইল্‌সা ও মারগৎ বাজনা শুনছেন। যখন অভিযানের ফোটোর কপিগুলি তাঁকে দেখানো হল, তিনি দেখে বললেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর ফোটো হয়েছে"। 1919 খ্রীস্টাব্দের এরপরের সব ঘটনা, 1917 খ্রীস্টাব্দের বাকী কিছু ঘটনার উল্লেখের পরে, উল্লেখিত হবে।

1917 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের কলেজের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডরিক আডলার অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট টুর্খ্‌কে (Count Turckh) হত্যা করলেন এক সুসজ্জিত হোটেলে নৈশভোজের সময়। বিচারের সময় তিনি স্বীকার করলেন যে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী মানুষ নিহত হচ্ছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ অসীম দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে, সেই যুদ্ধের সূচনার মূলে ছিল এই কুচক্রী প্রধান মন্ত্রী। আডলার ছিলেন ঘোর যুদ্ধ-বিরোধী। তিনি বাল্যকালে বাবা ও মাকে বিজয়ী জার্মান সৈন্যদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে দেখেছেন। তিনি বিশ্বের শান্তিভঙ্গকারী এই কুচক্রী প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করেছেন। তিনি এর জন্যে যে-কোন দণ্ড নিতে প্রস্তুত। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু কোন কারণে সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম অনুকম্পাবশতঃ আডলারের দ্বিতীয়বার বিচারের হুকুম দিলে তাঁকে যাবজ্জীবন অর্থাৎ 18 বছরের জন্যে

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দ্বিতীয় বিচারের কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, এই প্রসিদ্ধ অধ্যাপক যখন হত্যা করেন, তখন তিনি মনের দিক দিয়ে প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আডলারের কারাবাস থেকে মুক্তি লাভ হলে হিটলার তাঁকে ইহুদী বলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (concentration camp) পাঠিয়ে দেন। এরূপ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদীর পরিণতি সবাই জানেন।

কিন্তু আর্থার বেথার্ডের লেখা আইনস্টাইনের জীবনীতে এই কারণটি উল্লেখিত আছে। সেটি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

1917 খ্রীস্টাব্দে শীতকালে এক গভীর রাত্রিতে একজন আলুথালু পোষাকপরিহিত, ক্লান্ত ও অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অপরিচিত ব্যক্তি আইনস্টাইনের বাড়ীর দরজা ধাক্কা দিতে থাকলে এল্‌সা দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ঘরে ঢুকে করুণস্বরে বললেন যে, তিনি ফ্রেডরিক আডলারের ভগ্নিপতি। তিনি এসেছেন অধ্যাপক আইনস্টাইনের কাছে আডলারকে বাঁচাবার চেষ্টা করবার জন্যে, কারণ আডলার অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার অপরাধে ও সেই অপরাধ স্বীকার করবার জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আর দশদিন পরেই সেই দণ্ডের আদেশ পালন করা হবে। আডলারের মত শান্ত, উদারপ্রকৃতি ও পরোপকারী মানুষ এরূপ হত্যাকাণ্ড করতে পারেন—আইনস্টাইন তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ঐ ব্যক্তি তখন বললেন যে, তাঁরা আডলারের কাছে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন, যেমন উইন্টেরথারে দু-মাসের জন্যে আইনস্টাইনকে শিক্ষকতা করবার সুযোগ দান, মিলেভার মত উচ্চাভিলাষিণী ও জেদী মেয়েকে বিয়ে না করবার জন্যে আইনস্টাইনকে অনুরোধ ও জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিজের বদলে আইনস্টাইনকে নিয়োগ করতে কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ। এই সব শুনে আইনস্টাইনের আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি সব বিশ্বাস করলেন ও আডলারের বিপদের সংবাদে খুবই বিচলিত হলেন। তখন আডলারের ভগ্নিপতি আইনস্টাইনকে বললেন যে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম আইনস্টাইনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। সুতরাং আইনস্টাইন যদি বন্ধুকে বাঁচাতে চান তবে তিনি যেন কালবিলম্ব না করে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে বন্ধুর প্রাণভিক্ষা চান।

আডলার আইনস্টাইনের শুধু পরম বন্ধুই নন, তিনি আইনস্টাইনের যে

উপকার করেছিলেন সে জন্যে আইনস্টাইন তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন ও নিজেকে ঋণী বোধ করতেন। এই ঘটনা শুনে তিনি গভীর চিন্তার পর সম্রাটের কাছে যাওয়াই স্থির করলেন। তিনি নিজের জন্যে কোনদিন কারোর কাছে কোন সাহায্য চান নি, কিন্তু ফ্রেডারিককে বাঁচাতেই হবে যে-কোন শর্তেই হোক।

আইনস্টাইন পরদিন ভোরেই সম্রাটের কাছে গিয়ে ফ্রেডারিকের মত কৃতী অধ্যাপকের ও মহৎ চরিত্রের মানুষের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মানসিক স্থৈর্য ও সাম্য হারিয়ে হত্যা করবার অজুহাতে পুনর্বিচারে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ জানালেন। কাইজার সুযোগ পেয়ে আইনস্টাইনের অনুরোধে রাজী হলেন একটি শর্তে যে, আইনস্টাইনকে জার্মান নাগরিক হতে হবে। বন্ধুর জন্য আইনস্টাইন তাতে স্বীকৃত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কাইজার আডলারের পুনর্বিচারের আদেশ দিলে যা হল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

1917 খ্রীস্টাব্দে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দরুণ নানারূপ অভূতপূর্ব কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় বিজ্ঞানীরা চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন : কার জন্যে তাঁরা কাজ করছেন, যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার প্রতি তাঁদের করণীয় কি এবং মানুষের ভবিষ্যতের ছবি কি প্রকারের হবে?

এখানে বলা যেতে পারে যে, রাশিয়াতে জারের প্রতি জনসাধারণের মন আগে থেকেই বিরূপ ছিল। এই যুদ্ধ চলাকালে 1917 খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদচ্যুত করে হত্যা করার পর রুশ জাতীয় সভা বা 'ডুমা' একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। মেনশেভিক অর্থাৎ সোশিয়্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির সংখ্যালঘুদলের নেতা কেরেন্স্কির নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রলেটারিয়েট বা সাধারণ মেহনতী মানুষের সরকার গঠনের জন্য বলশেভিক দলের নেতা লেনিনের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে মেনশেভিক দলের পরাজয় হওয়ায় 1917 খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বলশেভিক দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন।

আইনস্টাইন কার্ল মার্কসের 'সাম্যবাদ' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সব ব্যাপারের খবর রাখতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাশিয়ার এই অক্টোবরের বিপ্লব পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মনে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন সাধন করবে। তিনি লেনিনের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "He is such a man who completely sacrificed himself and devoted all his energies to the realisation of social justice··· Men of his type are the guardians and restorers of the conscience of mankind."—অর্থাৎ, "লেনিন এমন এক মানুষ যিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্যে···। তাঁর মত মানুষেরাই মানবজাতির অভিভাবক ও বিবেকবুদ্ধির জাগরণকারী।"

9

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই, এমন কি যাঁরা বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) সম্বন্ধে কাজ করেন নি এরূপ অনেক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরও আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মাখ্ এই মতবাদকে আমলই দেন নি, যার জন্যে তাঁর অনুগামী ফ্রেডারিক আডলারের মত বিজ্ঞানীরা এই মতবাদের বিরোধী ছিলেন। নের্ণস্টও একবার বলেছিলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ প্রকৃতপক্ষে পদার্থবিদ্যার চেয়ে দর্শনশাস্ত্রের বিষয় হওয়া উচিত। 1911 খ্রীস্টাব্দে সলভে (Solvay) বিজ্ঞান সভায় আমন্ত্রিত বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী পল লাঁজভ্যাঁ (Paul Langevin) একবার বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে মোট বার জন বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। এমন কি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি টমসন স্বয়ং বলেছিলেন, "I have to confess that no one has yet succeeded in stating in clear language what the theory of Einstein is. Many scientists are themselves forced to admit their inability to express simply the actual meaning of the theory"—অর্থাৎ "আমি স্বীকার করছি যে, এখনও পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই মতবাদ যে কি, তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন নি। এই মতবাদের আসল অর্থ যে কি, সরলভাবে সেটি প্রকাশ করতে পারার অক্ষমতা অনেক বিজ্ঞানীকেই স্বীকার করতে হয়েছে।"

এই মতবাদ বোঝার অক্ষমতার জন্যে এটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ

করে অনেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। সবচেয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা যে বিষয়টি সম্বন্ধে হত, সেটি হল—বস্তুর অবস্থিতির জন্যে মহাকাশ নুইয়ে বা বেঁকে যাওয়া—যার জন্যে বিশ্বকে বলা হয়েছে অনন্ত নয়, বিশ্বের অন্ত আছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় (finite but unbounded)।

কিন্তু 1919 খ্রীস্টাব্দের 7ই নভেম্বর যখন এডিংটনের অভিযানের ফল ঘোষণায় আইনস্টাইনের মতবাদের সত্যতা পৃথিবীর সর্বদেশের কাগজে কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল, তখন পৃথিবীময় আইনস্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যে সব বিজ্ঞানী এই মতবাদ বিশ্বাস করছিলেন না, তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আর সাধারণ মানুষ বুঝল যে, আইনস্টাইন নামে একজন বিজ্ঞানী কোন যন্ত্র দিয়ে বিশ্বের কোন ঘটনা ঘটতে বা কোন বিষয়বস্তু না দেখে, শুধু কাগজে পেন্সিলে অঙ্ক কষে বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রকৃতির একটি ঘটনা দেখে। সবাই এ ব্যাপারে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদের, সবার মুখে শুধু কয়েকটি কথা—'মহাকাশের বক্রতা,' 'মহাকাশ অনন্ত নয়,' 'আলোক রশ্মির বেঁকে যাওয়া'।

5 নং হাবারলাণ্ড স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়ীটিতে প্রতি দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে দর্শনপ্রার্থী আসতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী, ছাত্রছাত্রী, কাগজের সংবাদদাতা, সাময়িক পত্রিকার লেখক, ছিলেন ফোটোগ্রাফার যাঁরা ক্লিক্, ক্লিক্ করে সমস্ত দিন ধরে কেবল ফোটো তুলেই চলেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রতিকৃতি আঁকিয়ে, উদ্ভট ধারণার বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উদ্ভাবনেচ্ছুক ব্যক্তি, আর বেশীর ভাগই এমন সব ব্যক্তি যাঁদের কাজই হল প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সন্ধানে ঘোরা এবং নৈশভোজে তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বন্ধুদের কাছে বাহবা নেওয়া এই কথা প্রকাশ করে যে, এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁদের বন্ধু।

কোন কোন দর্শনপ্রার্থী যখন জানতে চাইলেন যে, আইনস্টাইনের গবেষণাগারটি কোথায় ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই বা কোথায়, তখন তিনি তাঁর মাথাটি দেখিয়ে বললেন যে, সেটি তাঁর গবেষণাগার এবং তাঁর কলমটি দেখিয়ে বললেন যে, সেটি তাঁর যন্ত্রপাতি।

অজস্র টেলিগ্রাম, চিঠি সমস্ত জার্মানি, য়ুরোপের সব দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং আফ্রিকা থেকে আসতে থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ আসতে থাকে।

আইনস্টাইন ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। তাঁর স্বভাব ছিল নিজেকে জাহির না করে আড়ালে রাখা। দর্শনপ্রার্থীদের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এই সব দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় কমাবার জন্যে এল্‌সা স্থির করলেন শহরের বাড়ী ছেড়ে শহর থেকে দূরে বাড়ী ভাড়া নেওয়া। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর শহর থেকে 20 মাইল দূরে কাপুতে (Caputh) হ্রদের তীরে একটি সুন্দর বাড়ী ভাড়া করে সেখানে উঠে গেলেন।

এতে দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা সামান্য কিছু কমলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লম্বা সারিতে অপেক্ষমান দর্শনপ্রার্থীর অভাব হল না। কাপুতের বাড়ীর সুন্দর বাগানটিকে এল্‌সা রোজ যত্নের সঙ্গে দেখাশুনা করতেন। দর্শন-প্রার্থীরা সেই বাগানের সুন্দর গাছগুলিকে পায়ে দলে আসতে লাগলেন, কেউ কেউ জানালার সার্সীতে টোকা দিতে আরম্ভ করলেন। এল্‌সা তখন স্বামীকে একটু সুস্থিরে থাকতে দেবার জন্যে দৃঢ়চিত্তে সেইসব লোকদের হটাতে লাগলেন।

এর ফলে দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় কমান গেলেও ডাকপিয়নদের আটকান গেল না। দৈনিক অজস্র চিঠি আসতে লাগল পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে নানা ভাষায় নানা বিষয়ে। বিজ্ঞানী, কূটনীতিবিদ, জননেতা, শ্রমিক, বেকার ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ইত্যাদি নানা স্তরের লোকদের কাছ থেকে চিঠি আসতে লাগল। অনেক চিঠিতে থাকত চাকরীর জন্যে অনুনয়, কোন কোন চিঠিতে যন্ত্র উদ্ভাবক জানিয়েছেন তাঁদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের কথা, আবার অনেক বাপ মা জানিয়েছেন যে তাঁদের ছেলেদের নামকরণ করেছেন 'অ্যালবার্ট' বলে। একজন চুরোট ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে, তাঁর কারখানায় প্রস্তুত নূতন চুরোটের নাম দেওয়া হয়েছে 'রিলেটিভিটি'। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়েও অনেক চিঠি আসত। আইনস্টাইন এইরূপ বিজ্ঞান বিষয়ক চিঠিগুলি পেয়ে আনন্দিত হতেন এবং সেগুলির যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। এমনি একটি চিঠি এসেছিল তাঁর কাছে 1924 খ্রীস্টাব্দে ঢাকা শহরের এক তরুণ

অধ্যাপকের কাছ থেকে। তিনি হলেন ভারতের পরলোকগত জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং এই চিঠির বিষয়টি নিয়েই সৃষ্টি হল পদার্থ-বিদ্যায় প্রসিদ্ধ বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান। এই বিষয়ে পরে উল্লেখ করা হবে।

আইনস্টাইন যখন জার্মানি ছেড়ে প্রিন্সটনে বাস করেছেন, তখনও চিঠির সংখ্যা সেরূপ কিছু কমে নি। সেই সময়ে একটি কিশোরী তাঁকে লিখেছিল, "আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে যে, আপনি রূপকথার মানুষ, না সত্যই আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ।"

যা হোক, কাপুতের বাড়ীতে এল্‌সার দৈনিক কাজের মধ্যে প্রধান কাজ ছিল চিঠিপত্র বাছাই করা। কতক কতক চিঠির উত্তর তিনি নিজেই দিতেন, প্রয়োজনীয় চিঠিগুলিকে আইনস্টাইনকে দিতেন ও বাকীগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব হত না। এইরূপ বাছাই করা সত্ত্বেও আইনস্টাইনের পাঠকক্ষের টেবিলে স্তূপাকারে চিঠি জমতে লাগল। এই সব চিঠি তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হত। এই সময়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, "ডাক-পিয়ন আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। তার হাত থেকে আমার পালাবার উপায় নেই।"

আর একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি যে, আমি নরকে অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছি আর আমাদের ডাকপিয়ন শয়তানরূপে আমাকে চীৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে—কেন আমি পূর্বের চিঠিগুলির উত্তর দিই নি।"

এই সময়ে তাঁর মা পীড়িতা হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁর জন্যে চিন্তা, তার উপরে আবার 'অবাঞ্ছনীয় যশের' জন্যে অজস্র উদ্দেশ্যহীন সভা-সমিতি। কিছুদিন পরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়।

আইনস্টাইন শহরে পড়াতে যেতেন। বিকেলে বাড়ীতে ফিরে সুযোগ পেলে হ্রদে নৌকা চড়ে ঘুরতেন। এটিই ছিল তাঁর সখের বিষয়। পাল তোলা নৌকায় বেড়াতে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন।

10

এল্‌সার সমস্ত মনপ্রাণ পড়ে থাকত কি করে তাঁর প্রিয় অ্যালবারতলকে সুখে ও আনন্দে রাখা যায়। তাঁর মনে হত যেন আইনস্টাইন খুশী মেজাজেই আছেন, কিন্তু সময় সময় তাঁকে চিন্তিত মনে হত। অনেকেরই মতে এই সময় থেকেই আইনস্টাইনের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, কণাবাদের আবির্ভাবে বিজ্ঞানে যে সব বিষয়—যেমন বোরের পারমাণবিক গঠনের ব্যাখ্যা—পদার্থ-বিদ্যায় আবির্ভূত হবে, তার জন্যে এতদিনকার সনাতন নিয়মভিত্তিক পদার্থ-বিদ্যার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আর তার অর্থ হল যে, প্রকৃতির ঘটনাবলীতে আর কেউ সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা খুঁজবেন না, তাদের জায়গায় আসবে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা—যেমনটি হয়েছে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত উদ্দীপক বিকিরণ তত্ত্বে। এই বিষয়ে তাঁর মনের কথা বোরকে বলেছিলেন যখন বোর 1920 খ্রীস্টাব্দে তাঁর বাড়ীতে প্রথম দেখা করতে আসেন। বোর ছিলেন অ্যাডভেঞ্চারার (adventurer) প্রকৃতির বিজ্ঞানী। তিনি সনাতন নিয়মা-বলীর ধারকাছ দিয়েও যেতেন না। তিনি আনন্দ পেতেন প্রকৃতির ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্যে নূতন নূতন পথ খুঁজতে, যার জন্যে আইনস্টাইনের 1905 খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব তাঁর খুব ভাল লেগেছিল কারণ এতে আইনস্টাইন আলোর সম্পূর্ণ এক নূতন রূপ অর্থাৎ কণিকা রূপ দিয়েছিলেন।

এই দুই মনীষীর আলোচনাকালে বোর যখন কার্য-কারণ সম্বন্ধের বদলে সম্ভাব্যতার উপর জোর দিলেন, আইনস্টাইন বলেছিলেন, "তা হলে এখানেই পদার্থবিদ্যার শেষ।" তার মানে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সনাতন নিয়ম ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে এতদিনকার গড়ে ওঠা পদার্থবিদ্যার শেষ। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার উক্তির সত্যতা বোঝা যায় যখন 1924 খ্রীস্টাব্দে লুই দ্য ব্রগ্‌লির পদার্থের তরঙ্গ (waves of matter) নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর থেকে দ্রুত পদার্থবিদ্যায় অভিনব ও অচিন্তনীয় তথ্যাদি আবির্ভূত হতে থাকে।

আর্থার বেথার্ড তাঁর বইতে 1920 খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার জন্যে এল্‌সার মনে হয়েছিল যে, আইনস্টাইন আরও গম্ভীর ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সবচেয়ে বেশী যা এল্‌সার মনে হয়েছিল, সেটি হল—আইনস্টাইন তখন থেকে যেন বিজ্ঞানের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে

রাজনীতি, সমাজনীতি, বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা করতে লাগলেন এবং নানারূপ প্রবন্ধাদি লিখতে লাগলেন। ঘটনাটি নিচে উল্লেখ করা হল।

11

একদিন একজন তরুণ বিজ্ঞানী নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে আইনস্টাইনের দর্শনপ্রার্থী হলে, এলসা তাঁকে কিছুটা সময় দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। যুবকটি যেন অনুমোদিত সময়ের বেশী না থাকেন, তার জন্যে এল্‌সা তাঁর ঘড়িতে সময় দেখছিলেন। কারণ অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীর ভিড় জমে গিয়েছিল। হঠাৎ এল্‌সা শুনতে পেলেন আইনস্টাইন চীৎকার করে বলছেন, "বেরিয়ে যাও, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।" এল্‌সা জীবনে কোন দিন আইনস্টাইনকে রেগে চীৎকার করতে শোনেননি। কি এমন ব্যাপার হল, যার জন্যে আইনস্টাইন মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। এল্‌সা সেই সময়ে ফুলগাছের আগাছার জঙ্গল খুরপী দিয়ে কাটছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ খুরপী ফেলে দিয়ে দৌড়ে যেতেই দেখলেন যে, আইনস্টাইন ও যুবকটি ঘরের পিছনের রাস্তা দিয়ে বাগানের দিকে আসছেন আর আইনস্টাইন সমানে চীৎকার করছেন, "আমার সঙ্গে তর্ক কর না। আমাকে বুঝাতে চেষ্টা কর না, কি হতে পারে আর কি না হতে পারে। আমি তোমাকে বলছি যে, কেউ আমার সূত্রটি ব্যবহার করে বিস্ফোরক দ্রব্য বানাতে পারবে না। এটি হতেই পারে না।"

বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যুবকটি হাত নেড়ে তাঁকে কি বোঝাতে চেষ্টা করছেন, যার কিছু অংশ শোনা গেল,—"আমি আপনার 'ভরই শক্তি' সূত্রটির ব্যবহারিক (practical) দিকটার কথা বলছি। আপনি দয়া করে আমার বক্তব্যটি শুনুন, আপনার সূত্র $E=m\times c^2$ থেকে আমার কল্পিত বিষয়টি বাস্তবে পরিণত হতে পারে।"

আইনস্টাইন তখন রাগে কাঁপছিলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন, "না, তা হবে না। কেউ পরমাণু থেকে শক্তিকে মুক্ত করতে পারবে না; আমার মতবাদে এটিকে বিশুদ্ধ তত্ত্বীয়ভাবে ব্যবহার করেছি"।

এল্‌সা ছুটে এসে আইনস্টাইনকে ধরলেন, জানতে চাইলেন ব্যাপারটি কি হয়েছে। অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আইনস্টাইনকে রাগে কাঁপতে দেখে এল্‌সা যুবকটিকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। আইনস্টাইনের ঐরূপ ক্রোধ দেখে হতভম্ব যুবকটি আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

আইনস্টাইন বললেন, "যুবকটি আমার সাহায্য চায় একটি বোমা তৈরি করতে, যা সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করবে আর জার্মানি হবে শক্তিতে অদ্বিতীয়।"

এলসা অপেক্ষমান দর্শনপ্রার্থীদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে আইনস্টাইনকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেলেন।

আইনস্টাইন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তালব্ধ ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, যা তিনি কখনও কল্পনাও করেন নি। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হলে তিনি যুবকটির যুক্তি বিবেচনা করে দেখলেন যে, হয়ত বা বস্তু থেকে শক্তিকে মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে এবং তা হবে এমন প্রচণ্ড শক্তি যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এল্‌সা তাঁর স্বামীকে খুব ভালভাবেই বুঝতেন। তিনি দেখলেন যে, আইনস্টাইন তাঁর মনের শান্তি বেশ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছেন।

ভাগ্যের পরিহাসে পঁচিশ বছর পরে পরমাণু বোমায় হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর খবর পেয়ে আইনস্টাইন গভীর শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক মাস তাঁর এই গভীর দুঃখ ছিল যে, তিনিই হয়ত এজন্যে দায়ী। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে পারতাম, তবে আর বিজ্ঞানচর্চা নয়, হতাম মিস্ত্রী বা ছুতার।"

12

1920 খ্রীস্টাব্দের সূচনাতেই আইনস্টাইনের খ্যাতি তখনকার দিনের জীবিত যে কোন বিজ্ঞানীর খ্যাতির চেয়ে অনেক বেশী হল। 1919 খ্রীস্টাব্দে এডিংটনের অভিযানে আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনের খ্যাতি পৃথিবীময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়বার কারণ সম্বন্ধে লিওপোল্ড ইনফেল্ড তাঁর "Quest" নামক আত্মজীবনীতে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন। তার থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে—"এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি হল ঠিক বিশ্বযুদ্ধের শেষ হবার সঙ্গেই। পৃথিবীর মানুষের মন এই

নারকীয় যুদ্ধে ঘৃণা, মৃত্যু, অত্যাচার, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির বীভৎসতা দেখে এই বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ইত্যাদি ধারণা হারিয়ে ফেলেছিল, মন হয়েছিল অত্যন্ত তিক্ত ও দুঃখবাদী। প্রত্যেকেই যুদ্ধের বীভৎসতা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছিল আর শান্তির নূতন যুগের আবির্ভাবের জন্যে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ছিল; তাই বাস্তব জগতের বাইরে কল্পনার জগতে মন বিচরণ করত। এই সময়েই সূর্যগ্রহণ, তারকার আলোর বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনাবলীতে বিজ্ঞানের নূতন যুগের সূচনা হওয়ায় মানুষ এই সব চিন্তায় বাস্তব দুঃখকষ্টের সংসারের কথা কিছুক্ষণ ভুলে থাকত। এইসব যেন অলৌকিক ব্যাপার। সেজন্যেই দ্রুত আইনস্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, সাধারণ মানুষ তাঁর মতবাদের তাৎপর্য বুঝুক কি নাই বুঝুক।"

মানুষ বুঝতে পারল যে, বিজ্ঞান-জগৎ হল আসলে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ও যুদ্ধের ঊর্ধ্বে। ইনফেল্ড লিখছেন, "আইনস্টাইনের এই দ্রুত খ্যাতিলাভের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, একজন জার্মান বিজ্ঞানীর মতবাদ ইংরেজ জ্যোতির্বেত্তারা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। এতে মানুষ মনে শান্তিলাভ করল যে, বিজ্ঞানে শত্রুমিত্র নেই এবং মানুষের মনে আশা হল শান্তির নূতন যুগের আবির্ভাবের। আমার মনে হয় যে, মানুষের মনে শান্তিলাভের জন্যে তীব্র আগ্রহ ও ব্যাকুলতাই আইনস্টাইনের খ্যাতিকে এত দ্রুত ছড়িয়ে দিল।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সময় য়ুরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' খুব সমাদৃত হয়েছিল, কারণ এই কাব্যগ্রন্থে মানুষ তার শোক ও নৈরাশ্যপূর্ণ মনে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে আপেক্ষিকতাবাদের বিষয় নিয়ে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু কোন প্রবন্ধে জার্মানির নাম উল্লেখ থাকত না। আইনস্টাইনকে বলা হত সুইশ নাগরিক। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, যদি এডিংটনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অন্যরূপ হত, তবে জনসাধারণ তদনুসারে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় 1919 খ্রীস্টাব্দের 29শে নভেম্বর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তার থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে "Here is yet another application of the principle of relativity for the deliberation of the

reader : to-day I am described in Germany as a 'German savant' and in England as a 'Swiss Jew'. Should it ever be my fate to be represented by a 'bete noire', I should, on the contrary, become a 'Swiss Jew' for the Germans and a 'German Savant' for the English"—অর্থাৎ, "পাঠকদের কাছে আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি : আজ জার্মানিতে আমাকে অভিহিত করা হয় 'জার্মান পণ্ডিত' বলে, ইংল্যাণ্ডে 'সুইশ ইহুদী' বলে। কিন্তু যদি আমার ভাগ্যে ফলাফল অনুরূপ হত, তবে পরিচয় উল্টে যেত, আমি জার্মানিতে অভিহিত হতাম 'সুইশ ইহুদী' বলে, আর ইংল্যাণ্ডে 'জার্মান পণ্ডিত' বলে।"

আইনস্টাইনের যশ ও খ্যাতি অত বেশী হতে দেখে জার্মানিতে শীঘ্রই তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার বিজ্ঞানীর অভাব হল না। আইনস্টাইন ইহুদী ও যুদ্ধের সময় জার্মানির কোন যুক্তিকে অনুমোদন করেন নি। এগুলিই প্রধানতঃ ক্রোধের কারণ। ক্রোধে ও হিংসায় লেনার্ড, ওয়েল্যাণ্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের মতবাদ ও তত্ত্বকে বলতে লাগলেন "Jewish Mathematics" অর্থাৎ "ইহুদীর গণিত"। তাঁরা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ও প্রচার করতে লাগলেন যে, সাধারণ স্তরের এই ইহুদী বিজ্ঞানীর কোন মৌলিক সৃজনীশক্তি নেই এবং সেহেতু তিনি কোন যশের ভাগী হতে পারেন না। এই লোকটির বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সবই পূর্বের বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীদের কাজ থেকে সংগৃহীত।

13

ইহুদী সম্প্রদায় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সম্প্রদায়। পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন ও আফ্রিকার ঈজিপ্টের কিছু কিছু জায়গায় তাদের আদিম বসতি ছিল। যীশু খ্রীস্ট নিজে ইহুদী ছিলেন। তিনি খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করলেন, যার জন্যে রাজার আদেশে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তারপর নানা কারণে ইহুদী জাতির লোকদের নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে যেতে হয়। তারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ল। বহু শতাব্দী তাদের নিজেদের দেশ বলে কিছুই রইল না। এই জাতির ভিতরে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের অবদানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য বিষয় সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

এই জাতির লোকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হবার জন্যে প্রায় সব দেশেই জ্ঞানের দিক দিয়ে, ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বহু ইহুদী প্রচুর বিত্তের অধিকারী।

কিন্তু কোন দেশকে, বিশেষ করে জার্মানির মত য়ুরোপীয় দেশকে, তারা নিজের বলে মনে করতে পারতেন না। কারণ সেই দেশের অধিবাসীরা তাদেরকে খুব সুনজরে দেখত না। সেজন্য কোন স্থানে ইহুদীরা নিজেদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারতেন না এবং এই সম্প্রদায়ের বালকবালিকাদের নিজেদের সংস্কৃতি মতে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করা কঠিন হত। প্রায়ই এই সম্প্রদায়ের লোকেদের উপর সেই সেই দেশের অধিবাসীরা ও এমনকি সরকার নানারূপ অত্যাচার চালাত, যার ফলে ইহুদী সম্প্রদায়ের জ্ঞানীগুণীদেরকেও স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হতে হত।

য়ুরোপ ও আমেরিকার ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরা অনেকদিন ধরে মনে করছিলেন একটি স্থানে নিজেদের দেশ সৃষ্টি করে একটি ইহুদী জাতি গড়ে তুলবেন। এ নিয়ে কিছুটা আন্দোলনও চলছিল।

1948 খ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইনের এক ভাগে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মূল আছে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ইহুদী রসায়নবিদ্ ডঃ ওয়াইজম্যানের (Weizmann) বিরাট স্বার্থত্যাগ।

1916 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সঙ্কটজনক কাল, ইংলণ্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব। তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরির ভার নেবার জন্য তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ডঃ ওয়াইজম্যানকে ডেকে বললেন, "প্রফেসর ওয়াইজম্যান, আপনাকে এই কৃত্রিম অ্যাসিটোনের তৈরি করবার ভার গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করেছে আপনার সফলতার উপর। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।" দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ডঃ ওয়াইজম্যান সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন অ্যাসিটোন।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি সবিনয়ে সমস্ত প্রকার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "কিছু নয়, একটি মাত্র বাঞ্ছা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র।" লয়েড জর্জ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলফারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আদেশ

দিলেন। বিভিন্ন দেশের ইহুদীরা ডঃ ওয়াইজম্যানের এই স্বার্থত্যাগের কথা মনে রেখেছিলেন।

যুদ্ধের শেষে তুরস্কের পরাজয়ের পরে প্যালেস্টাইন ও কতকগুলি জায়গাকে তুরস্কের শাসন থেকে মুক্ত করা হল। প্যারিসের সন্ধির শর্তানুসারে বৃটিশ সরকারকে অধিকার দেওয়া হল প্যালেস্টাইনকে শাসন করবার; অর্থাৎ প্যালেস্টাইন হল বৃটিশের অধীন, যাকে বলে ম্যাণ্ডেট (mandate) রাজ্য। তখন পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বহু ইহুদী আসতে লাগলেন প্যালেস্টাইনে নিজেদের দেশ গড়বার জন্যে। তারা সেখানে আরবদের কাছ থেকে জমি কিনে বসবাস শুরু করলেন। ক্রমে প্যালেস্টাইন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ হল ইহুদীদের এবং অপর ভাগটি থাকল আরবদের। ইহুদীদের ভাগটির নাম হল ইজরায়েল।

এই সময় থেকে আইনস্টাইন অনেক প্রবন্ধে ইহুদীদের দুর্দশার বিষয়ে লিখেছেন। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেদের উপর অত্যাচার অতি দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। ইহুদী ও অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের উপর এই শোচনীয় অত্যাচারের ফলে একটি উদ্বাস্তু দল তৈরি হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের অবদানে নানা দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাঁদেরও অনেককে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হয়েছে।"

তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "শুধু আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি দরদ, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার এবং তাদেরকে সাহায্য করবার আগ্রহ মানব-জাতিকে স্থায়িত্ব ও প্রতিটি মানুষের মনে নিরাপত্তার বোধ জাগাতে পারে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের যাঁরা নিজেদের জন্যে একটি স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলা হত জাইয়নিষ্ট (Zionist)। এঁরা ডঃ ওয়াইজম্যানকে নেতা হবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি আইনস্টাইনের মত জানতে পেরে 1920 খ্রীস্টাব্দে একদিন বার্লিনে এলেন এই বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে। ওয়াইজম্যান আইনস্টাইনকে অনুরোধ করলেন প্যালেস্টাইনের উন্নতির জন্যে, বিশেষ করে ইহুদীদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে উন্নত বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি যেন সাহায্য করেন। আইনস্টাইন সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে রাজী হলেন। এই অর্থ সংগ্রহের জন্যে ওয়াইজম্যান আইনস্টাইনকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে সফরে যাবার অনুরোধ করলেন, কারণ সেখানে বহু ক্রোড়পতি ইহুদী বসবাস করেন। ঠিক হল যে, য়ুরোপের কয়েকটি দেশ সফরের পরে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1948 খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইহুদীরা ডঃ ওয়াইজম্যানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করলেন।

14

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু দেশ থেকে আইনস্টাইনকে অনুরোধ জানান হচ্ছিল যথাসত্বর সেই সব দেশে যাবার জন্যে। আইনস্টাইনও মনে করেছিলেন যে, বিজ্ঞানে নানারূপ প্রতিক্রিয়া ও মতভেদকে দূর করতে হলে শুধু গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে চলবে না কিংবা বিজ্ঞানের পত্রিকায় প্রবন্ধনিবন্ধাদি লিখেও প্রভেদ দূর করা যাবে না। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে একই মতের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে ও আলাপে পদার্থবিদ্যার তত্ত্বে ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করে একটি বিশ্বজনীন সামঞ্জস্যে উপনীত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি সুন্দর কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে—"যে সব আদর্শ আমার চলার পথকে আলোকিত করছে এবং সব সময়েই জীবনের সমস্যাকে আনন্দের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সাহস জুগিয়েছে, সেগুলি হল পরোপকারিতা, সৌন্দর্য ও সত্য। সমান মতের মানুষের সঙ্গে সখ্য, বাস্তব জগতের চিন্তা এবং শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চিরন্তন না পাওয়ার বিষয়ের কিছুটা পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা ও চেষ্টা—এগুলি ব্যতীত জীবন আমার কাছে শূন্য মনে হত।"

আইনস্টাইন দম্পতি 1920 খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে গেলেন হল্যাণ্ড। সেখানে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Leyden) কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্যে আইনস্টাইন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতার বিষয় হল 'ঈথার ও আপেক্ষিকতাবাদ'। সভাগৃহের মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ভর্তি প্রায় দেড় হাজার শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষোৎফুল্লভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী, ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য সবাই, যাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের কিছু না বুঝলেও এই অসাধারণ মানুষটিকে দেখতে এসেছেন। আইনস্টাইন জীবনে তাঁর এই প্রথম বক্তৃতা শুনতে প্রচুর শ্রোতাকে দেখে অভিভূত হলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে শ্রোতৃবর্গ নিজ নিজ

আসনে বসে পড়লেন। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল এবং তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ঘরভর্তি লোকের মুখ নয়, কেবল মাত্র দুটি ছাত্রের মুখ। তাঁর মনে পড়ল জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথম ক্লাসে বক্তৃতা দিবার দিনটির কথা। সে দিন মাত্র দুটি ছাত্র তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছিল এবং নিয়মানুসারে তাঁর বেতন নির্ভর করবার কথা ছিল ছাত্রের সংখ্যার উপরে।

লাইডেনের এই বক্তৃতাটিতে তিনি ঈথারের কল্পনার ক্রমবিকাশের কথা বললেন। তিনি বললেন, "প্রাকৃতিক সত্যের একটি একীভূত ও পূর্ণ ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন হল—একটি মাধ্যমের, যাকে বলা হল ঈথার। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতবাদে যে সনাতন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, তার মূল ভিত্তিই হল প্রকৃতিতে বস্তুগুলির ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বল। এখন যে দুই বস্তু সংলগ্ন না থেকে তফাতে আছে এমনকি বহু দূরে অবস্থিত আছে, সেগুলির ভিতরে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের জন্যে একটি কাল্পনিক মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারপর গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হল আলোর ও অন্যান্য বিকিরিত শক্তির বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গরূপ, যার অর্থই হল যে, একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করা। বিজ্ঞানের মতে কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে-কোন রূপের বস্তুর গুণসম্পন্ন একটি মাধ্যম ব্যতীত কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে না।"

"কিন্তু যখন মাইকেলসনের প্রসিদ্ধ পরীক্ষাটিতে ঈথারের অস্তিত্বের কোন প্রকার চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন ঈথারের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করা হল। এই মতবাদের মূল ভিত্তির স্বীকার্য বিষয় হল যে, ঈথারের আপেক্ষিকে কোন বস্তুর গতির কোন বাস্তব সত্য নেই, কারণ প্রকৃতিতে ঈথারের ধারণারূপী কোন মাধ্যমের অস্তিত্বের আভাস বহু সত্ত্বেও পাওয়া গেল না।

"কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এই ঈথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হল। এতে আমি প্রমাণ করেছি যে, বস্তুর অস্তিত্ব মহাকাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। মহাকাশে কোন বস্তু না থাকলে মহাকাশ হত অর্থহীন, অনন্ত মহাশূন্য। কিন্তু প্রতিটি বস্তুর অবস্থিতির জন্যে চারপাশের মহাকাশ নুইয়ে পড়ে এবং তাতে বিকৃতি জন্মে বলে সৃষ্ট হয় একটি ক্ষেত্র।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জ্যামিতিক গুণের (metric property) অস্তিত্ব আছে, আর যেহেতু মহাকাশে এই জ্যামিতিক গুণ বর্তমান, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, মহাকাশ একটি বস্তুগুণ-সম্পন্ন মাধ্যম এবং একেই আমি বলেছি ঈথার। এই ঈথারে সনাতন বিজ্ঞানের গুণাবলী নেই। এই গুণাবলীতে ঈথারকে বলা হত একটি মাধ্যম, যা সর্বব্যাপী এবং প্রতিটি বস্তুর চারপাশে ঘিরে আছে ও ভিতরেও আছে এবং প্রতিটি বস্তুর গতিকে বর্ণনা করা হত এই সদা স্থির মাধ্যমটির আপেক্ষিকে। সুতরাং মহাকাশের এই যে জ্যামিতিক গুণ, তাকেই আমি বলেছি ঈথার। আলো এবং অন্যান্য বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের মত মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গ আকারে আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ার কারণ হল মহাকাশের এই গুণ।"

লাইডেনে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লোরেনৎস বাস করতেন। তিনি ছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আইনস্টাইন তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। আইনস্টাইন দম্পতি লোরেনৎসের গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আর সাক্ষাৎ করলেন আইনস্টাইনের বিশিষ্ট বন্ধু পল এহ্‌রেনফেস্টের (Paul Ehrenfest) সঙ্গে। এহ্‌রেনফেস্ট ও তাঁর স্ত্রী তাতিয়ানার সঙ্গে আইনস্টাইন দম্পতির খুব বন্ধুত্ব হল। 1923 খ্রীস্টাব্দে যখন লোরেনৎস অবসর গ্রহণ করেন, তখন এহ্‌রেনফেস্ট অধ্যাপকের পদটি পান। তিনি আইনস্টাইনকে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত অধ্যাপক না হয়ে বাইরে থেকে এসে মাঝে মাঝে অধ্যাপনার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। আইনস্টাইন সানন্দে রাজী হয়ে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্যে বার্লিন থেকে লাইডেনে যাতায়াত করতেন ও লাইডেনে এহ্‌রেনফেস্টের গৃহে অতিথি হতেন। তিনি সেখানে খুবই আনন্দে সময় কাটাতেন কারণ মিসেস এহ্‌রেনফেস্ট তাঁকে পছন্দমত সুস্বাদু খাবার তৈরি করে দিতেন। আইনস্টাইন বার্লিন থেকে এসে বন্ধুর গৃহে চীৎকার করে বলতে বলতে প্রবেশ করতেন, "একটি বেহালা, একটি শয্যা, একটি ডেস্ক ও একটি চেয়ার—এই ছাড়া একটি মানুষের আর কোন বস্তুর প্রয়োজন আছে?" তাঁর গলার আওয়াজ শুনে বন্ধু দম্পতি খুবই আনন্দিত হতেন।

15

লাইডেন থেকে আইনস্টাইন দম্পতি গেলেন প্রাগে। যুদ্ধের পরে পূর্ব য়ুরোপের মানচিত্রের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া নামে শ্লাভজাতি অধ্যুষিত দুটি নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রাগ হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী। আইনস্টাইন তাঁর প্রিয় জায়গা প্রাগে আবার আসতে পেরে খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁর মনে পড়ল আগের বার প্রাগে অবস্থানকালের কথা, বিশেষ করে ছেলেদের অনুরোধে প্রাগ ছেড়ে জুরিখে যাবার প্রাক্কালে সেই সেনাপতির পোষাক পরে রাস্তায় চলাফেরার কথা।

এখানে তাঁরা ফিলিপ ফ্রাঙ্কের গৃহে অতিথি হলেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, আইনস্টাইন যখন প্রাগের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে চলে যান—ফ্র্যাঙ্ক তখন সেই পদে নিযুক্ত হলেন। ফ্র্যাঙ্ক যদিও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক মাখের অনুগামী ছিলেন, তথাপি আইনস্টাইনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেক স্থানে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিয়ে আইনস্টাইনের জীবনী ও কাজ সম্বন্ধে লিখেছেন।

যুদ্ধের পরে প্রাগে স্থানাভাবে ফ্র্যাঙ্ক দম্পতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে একটি ঘরে বাস করতেন। আইনস্টাইনের সময় এই ঘরটি ছিল তাঁর কার্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের এই ক্ষুদ্র স্থানে থাকবার জন্যে আইনস্টাইনের পক্ষে একটি সুবিধা হল যে, দিনরাত কাগজের সংবাদদাতাদের হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন। আইনস্টাইন ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখলেন, পুরনো দিনের কাফেগুলিতে গেলেন ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন। এতে তিনি যুদ্ধপূর্ব প্রাগ শহরে যখন ছিলেন, তখনকার স্মৃতি তাঁর মনে পড়ল ও যুদ্ধোত্তর এই শহরটির জীবনযাত্রাকে অতি কাছের থেকে লক্ষ্য করলেন।

সন্ধ্যাবেলায় আইনস্টাইন এক জনাকীর্ণ সভাগৃহে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পরে আইনস্টাইন দম্পতিকে দর্শনপ্রার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একে একে সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছিলেন। আইনস্টাইন বিস্মিত নয়নে দেখলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ষোল/সতেরো বছর বয়সের একটি সুন্দর তরুণ ও নয়/দশ বছর বয়সের একটি সুন্দর বালক। তারা

অন্য কেউ নয়, তাঁরই ছেলে হান্স অ্যালবার্ট ও এডোয়ার্ড। আইনস্টাইন ছেলেদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন ও এল্‌সার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ামাত্র এল্‌সা তাদেরকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। তারপর অন্য সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে তাঁরা দুই ছেলেকে নিয়ে একটি কাফেতে গেলেন। এল্‌সা এডোওয়ার্ডকে দেখে বললেন, "অ্যালবারতল, এডোয়ার্ড দেখতে অনেকটা তোমার মত হয়েছে, ওকে দেখলে তোমার ছেলেবেলাকার চেহারার কথা মনে পড়ে।"

খাবার খেতে খেতে হান্স বলল যে, তাদের মা তাদেরকে পাঠিয়েছেন বাবার বক্তৃতা শুনতে। নানারূপ কথাবার্তা হতে লাগল।

এল্‌সা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মা ভাল আছেন তো ?"

বালক এডোয়ার্ড বললে, "খুব ভাল আছেন। তিনি বলেন যে, তিনি নিজেও কাজ এত পছন্দ করেন যে, দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যায়, তা তিনি টেরও পান না।"

এল্‌সা শুধোলেন, "তিনি কি কোন কাজ করেন ?"

হান্স জবাব দিল, "হ্যাঁ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে তিন দিন পড়ান।"

এই শুনে আইনস্টাইন বললেন, "আমি খুবই খুশী হলাম। মিলেভা যে সুখী হয়েছে, তাতে আমি খুবই আনন্দিত।"

16

বিরাট সভাগৃহে বহু লোকের সমাবেশে বাবাকে বক্তৃতা দিতে দেখে ও সবার মুখে বাবার নাম শুনে—কেউ বলছেন, "হের ডঃ আইনস্টাইন," কেউ বলছেন, "প্রফেসর আইনস্টাইন"—এইসব দেখে শুনে বালক এডোয়ার্ড বিস্ময়ে মুগ্ধ। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "বাবা তুমি এত বিখ্যাত কেন ?"

বাবা ছেলেকে একটু আদর করে বললেন, "যখন একটি অন্ধ ছারপোকা একটি গোলকের উপরিভাগ দিয়ে চলে, সে বুঝতে পারে না যে, তার পথটি বাঁকা। আমার সৌভাগ্য আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটি বাঁকা।' '

হান্স বাবাকে বলল যে,সে তার বাবার মত একদিন পদার্থবিদ্যাবিদ হবে। আইনস্টাইন শুনে খুশী হয়ে বললেন যে, তিনি এতে হান্সকে সাহায্য করতে পারেন।

এতে হান্স উত্তর দিল, "আমি তোমার ছেলে বলেই যে আমি সাহায্য নেব, তা নয়। আমি নিজের ক্ষমতাতেই বড় হব, নতুবা নয়।"

আইনস্টাইন তাই শুনে সস্নেহে তাঁর ছেলের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

এডোয়ার্ড বলল যে, সে বড় হলে ডাক্তার হবে।

সেদিন রাত্রিতে প্রাগের সবচেয়ে বড় হোটেলের নাচ ঘরে আইনস্টাইন দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাঁরা হান্স ও এডোয়ার্ড-কেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। উৎসবমুখরিত ঘরে আইনস্টাইনকে কিছু একটা বলবার জন্যে অনুরোধ জানান হলে তিনি বললেন, "এই উৎসবের মাঝখানে কেউ বোধ হয় আমার আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে শুনতে সেরূপ আগ্রহান্বিত নন। আমি বক্তৃতা না দিয়ে আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে বেহালাতে দু-একটি সুর বাজাব। এই বলে তিনি মোৎসার্ট ও বাখের রচনা থেকে বাজালেন। শ্রোতারা শুনে মুগ্ধ হয়ে করতালি দিয়ে প্রশংসা করে তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বাজাতে অনুরোধ জানালেন।

হান্স ও এডোয়ার্ডের কিছু কিছু মনে ছিল যে, তাদের বাবা বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেহালা বাজাতেন, কিন্তু তিনি যে এত উঁচুদরের বাজিয়ে, তা তারা ভাবে নি। তারা খুবই আনন্দিত হল ও বাবার জন্যে গর্ব বোধ করল।

ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তায় আইনস্টাইন ও এল্‌সা বুঝতে পারলেন যে, মিলেভা ছেলেদের মনে তাঁদের সম্বন্ধে কোন প্রকার রাগবিদ্বেষের ধারণা সৃষ্টি করেন নি। এতে আইনস্টাইন মনে স্বস্তি বোধ করলেন।

প্রাগ থেকে আইনস্টাইন দম্পতি গেলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। সেখানে একটি বিরাট কনসার্ট ঘরে প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সামনে তিনি বক্তৃতা দিলেন।

ভিয়েনাতে আইনস্টাইন দম্পতি অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ্যাবিদ্ ফেলিক্স এহ্‌রেন-হাপ্টের (Felix Ehrenhaft) গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। মিসেস এহ্‌রেন-হাপ্ট ছিলেন অস্ট্রিয়ার স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-করা একজন পরিচালিকা। তিনি চেয়েছিলেন যে, আইনস্টাইন বক্তৃতা দেবার সময় উৎকৃষ্ট একটি পোষাক পরে যান। আইনস্টাইন যে দুটি ভাল পোষাক সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলিকে তিনি সেজন্যে সুন্দর করে ইস্ত্রি করিয়ে আনলেন। কিন্তু বক্তৃতার

মঞ্চে দেখা গেল যে, আইনস্টাইন যে পোষাক পরে এসেছেন, তাতে ইস্ত্রির কোন চিহ্ন নেই। বোঝা গেল যে, ইস্ত্রি করা ভাল পোষাক দুটি বাড়ীতেই রয়েছে, সেগুলির কোন একটি পরবার কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছেন।

17

এর পরে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী ডঃ ওয়াইজম্যানের সঙ্গে আইনস্টাইন দম্পতি জাহাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য হল প্যালেস্টাইনে উন্নত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ। নিউ ইয়র্ক বন্দরে পৌঁছানমাত্র বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

জাহাজেই সংবাদদাতারা আইনস্টাইনকে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন, ফোটোগ্রাফাররা ফোটো তুলেই চললেন।

একজন শুধোলেন, "আপনি যে বিজ্ঞানের চিন্তা ছেড়ে মানুষের কল্যাণের জন্যে চিন্তা করছেন, এতে কি বিজ্ঞানের ক্ষতি হচ্ছে না? কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে আপনি এটি ঠিক করছেন না।"

আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, "পৃথিবীর সর্বত্র এখন নানারূপ আন্দোলন হচ্ছে, নানা বিষয়ের জাগরণ হচ্ছে। এই সময়ে আমরা স্বতন্ত্র বা এককভাবে নিজের মতে যদি চলি, তবে সেটি ঠিক হবে না। এখন সময় এসেছে সমস্ত জাতির একত্রিত হয়ে মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধান করবার।"

আর একজন প্রশ্ন করলেন, "ডঃ আইনস্টাইন, আপনি কি পূর্বে জাতীয়তা-বাদের বিরুদ্ধে বলেন নি?"

আইনস্টাইনের আদর্শবাদী মন যুদ্ধের সময় জার্মান জাতীয়তাবাদের ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তিনি তাই জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "যদি আমাদের সহ্যগুণহীন, পরমত-অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণচেতা এবং হিংসাত্মক জাতির সঙ্গে বাস না করতে হত, তবে আমি পুনরায় বলতাম সমস্ত জাতীয়তাবাদ বিসর্জন দিতে।"

একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়টি কি, তা সংক্ষেপে কিছু বলবেন কি?"

আইনস্টাইন বললেন, "আপনি যদি আমার বক্তব্যটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করেন, যদি এটিকে ঠাট্টা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে আমি এই ভাবে আমার মতবাদ বোঝাব। পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, যদি বিশ্বের

সমস্ত বস্তু লোপ পেত, তবে সময় (time) ও মহাকাশ (space) এই দুটি রয়েই যেত। কিন্তু আমার মতবাদে বস্তুই যদি না থাকত, তবে মহাকাশ ও সময় বলে কিছুই থাকত না।" এই বলে একটু হেসে যুবকটিকে আবার বললেন, "আপনি যদি কোন সুন্দরী তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে নিভৃতে বসে প্রেমালাপে মগ্ন থাকেন, তবে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে বুঝতেই পারবেন না, এক ঘণ্টাকে মনে হবে এক সেকেণ্ড। কিন্তু যদি গরম স্টোভে আপনার আঙ্গুল আটকে যায়, তবে এক সেকেণ্ডকে মনে হবে এক ঘণ্টা। এই হল আপেক্ষিকতাবাদ।"

অপর একজন জানতে চাইলেন যে, এটি সত্য কিনা—পৃথিবীর মোট বার জন বিজ্ঞানীর আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আছে।

আইনস্টাইন এটি অস্বীকার করে বললেন, "এই প্রবাদটি এখন মোটেই ঠিক নয়। আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম যুগে বিজ্ঞানী লাঁজভ্যা বলেছিলেন এই কথাটি। কিন্তু আমার ধারণা যে, এখন যে কোন পদার্থবিদ্যাবিদ্ এই মতবাদ পড়ছেন, তিনি নিশ্চয়ই এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। আমার ছাত্রদের তো এই মতবাদ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।"

একজন সাংবাদিক এল্‌সাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এই তত্ত্বটি বুঝতে পেরেছেন?"

এল্‌সা উত্তর দিলেন, "না, না, যদিও অ্যালবারতল কয়েকবার আমাকে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বলেছেন, কিন্তু আমার সুখের জন্যে এর কোন প্রয়োজন বোধ করি না। আমার গণিতশাস্ত্র রান্নাঘরে।"

সেবারে আমেরিকাতে আইনস্টাইন কতকগুলি বক্তৃতা দেন। সেগুলির মধ্যে প্রিন্সটনে যে চারটি দিয়েছিলেন, তা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলিকে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হল। আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য বুঝতে সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

মার্কিন দেশে আইনস্টাইন ও ওয়াইজম্যান ইহুদীদের জন্যে কয়েক লক্ষ ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে জার্মানিতে ফিরবার পথে লণ্ডনে আইনস্টাইন লর্ড হালডেনের আমন্ত্রণে তাঁর গৃহে একদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই রাজ-প্রাসাদের মত বাড়িতে অতি বিরাট শোবার ঘরে তিনি কিরূপ অস্বস্তি বোধ

করেছিলেন ও যে সব রঙচঙে উর্দিপরা খানসামাকে তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্যে মোতায়েন করা হয়েছিল, তাদের দেখে কিরূপ ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়টি পূর্বে বলা হয়েছে।

লণ্ডনে বক্তৃতাতে তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, সেখানকার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় তাঁর মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এইজন্যে জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে আন্তর্জাতিক ভাবে বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

তাঁর এই বক্তৃতাতে সমস্ত ইংরেজ বিজ্ঞান সমাজ খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আইনস্টাইনের উচ্চ আদর্শের ও মনোভাবের প্রশংসা করেছিলেন।

18

আইনস্টাইন দম্পতি 1921 খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে বার্লিনে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন জার্মানীতে রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে উঠছে। আমেরিকা ও অন্যান্য জায়গায় আইনস্টাইনের অত সমাদর বার্লিনে কয়েক-জন জার্মান বিজ্ঞানীর ক্রোধের কারণ হয়েছে। বার্লিনে আসবার কিছুদিন পরে কয়েকজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবক তাঁর কাছে এসে একটি প্রচারপত্রে নাম সই করতে বলে। সেটির উদ্দেশ্য হল জার্মানির জনগণকে গত যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যে আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে উত্তেজিত করা।

আইনস্টাইন দেখলেন যে, ঐ প্রচারপত্রে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকের নাম আছে। তিনি এতে প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আমি এই আন্দোলনে যোগ দেবার চেয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে মৃত্যুবরণকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।" এর পরেই তিনি শান্তিবাদী আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে অধিকতর শক্তি নিয়োজিত করেন।

1918 খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎ জার্মান শক্তির ভেঙে পড়াতে নভেম্বরে পরাজয় স্বীকার করা, প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও ভার্সাই সন্ধির শর্তে জার্মানির প্রতি কিছুটা ন্যায় বিচারের অভাব, যার জন্যে নাৎসী দলের অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতালাভ ইত্যাদির কিছুটা ইতিহাস এখন জানা প্রয়োজন, কারণ এতে আইনস্টাইনের সেই সময়কার মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়।

যদিও 1918 খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মান শক্তির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু অল্প কয়েক মাসের ভিতরে জার্মানির মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক, রুমানিয়া ও অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষের নিকট পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। এই সময়ে জার্মান শক্তিতে দ্রুত ভাঙন ধরল, যার প্রধান কারণ হল রাশিয়াতে সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষকদের বিদ্রোহের ফলে 1917 খ্রীস্টাব্দে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদী বা কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা হস্তগত করা। এখানে বলা যেতে পারে যে, সাম্যবাদের স্রষ্টা কার্ল মার্ক্স্ হলেন একজন জার্মান ইহুদী। সাম্য-বাদের প্রভাব জার্মানিতেও বিস্তৃত হল এবং এর ফলে জার্মানির অভ্যন্তরে রাশিয়ার অনুকরণে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘোরতর আশঙ্কা দেখা দিল। জার্মান নৌবাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দ্রুত অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় জার্মান সরকার যুদ্ধের অবসান স্থির করে পরাজয় স্বীকার করল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন।

জার্মানি গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষিত হল। ফ্রেডারিক ইবার্ট এই গণতান্ত্রিক সরকারের নেতা হলেন। তাঁর সরকার একটি নূতন সংবিধান রচনা করলেন, যাতে সব প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ ভোট দেবার অধিকারী হলেন। একজন প্রেসিডেন্ট ও একটি দ্বি-কক্ষযুক্ত আইনসভার ব্যবস্থা করা হল। ঊর্ধ্বকক্ষের (Upper House) নাম হল 'রাইখ্স্টাট্' (Reichstadt) আর নিম্ন কক্ষের (Lower House) নাম হল 'রাইখ্স্টাগ্' (Reichstag)। ইবার্ট হলেন সর্বপ্রথম জার্মান গণতন্ত্র সরকারের প্রেসিডেন্ট। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতে আইনস্টাইন আনন্দিত হয়েছিলেন।

এই সময়ে জার্মানিতে 'স্পার্টাকাস' নামে এক কম্যুনিষ্ট দল লাইবনেক্ট (Leibnecht) নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করতে লাগল আর উৎপাত শুরু করল হিটলারের নেতৃত্বে গঠিত নাৎসী দল। ইবার্ট সরকার কঠোর হাতে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে দমন করলেন। কিন্তু নাৎসীদের নেতা হিটলারকে কারারুদ্ধ করেও এই দলটির কার্যকলাপ দমন করতে পারলেন না। এই বিষয়টি পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ও ভার্সাই সন্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ইত্যাদি মিত্রপক্ষের সমবেত রাজনীতিজ্ঞগণ জার্মানির সামরিক শক্তিকে,

ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে স্থির করলেন যে, যাতে জার্মানি ভবিষ্যতে আর কোন দিন মাথা তুলতে না পারে। কিন্তু এইখানেই তাঁদের বিচারে বেশ কিছুটা উদারতা এবং ন্যায়ের ও দূরদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন কি শান্তির জন্যে ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা থেকে যে লীগ অব নেশন্‌স (League of Nations) বা জাতিসঙ্ঘের সৃষ্টি হয়, তারও নীতি দিয়ে বিচার করলে জার্মানির প্রতি কিছুটা অন্যায় করা হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। যা হোক, যুদ্ধশেষে হীন বল, অর্থের অভাব, সাময়িকভাবে সার উপত্যকা (Saar Valley), প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল রুহ্‌র (Ruhr) ফ্রান্সের দখলে যাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও সামরিক শক্তিতে নিপুণ, বুদ্ধিমান, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী জার্মান জাতির মানুষেরা রাগে ও অপমানে আবার শক্তি ফিরে পাবার ও পুনরুজ্জীবনের উপায় খুঁজতে ব্যস্ত হল এবং তা পেতে বেশী দেরীও হল না; যার জন্যে মাত্র কুড়ি বছরের ভিতরে 1939 খ্রীস্টাব্দের 1লা সেপ্টেম্বরে জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করল।

আইনস্টাইন ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। "জগৎকে আমি যেমনটি দেখি" নিবন্ধটিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার রাজনৈতিক আদর্শ হল গণতন্ত্র। প্রতিটি মানুষকেই ব্যক্তি হিসাবে মান্য করা উচিত এবং কোন মানুষকেই উপাস্য পাত্রে পরিণত করা উচিত নয়। ভাগ্যের পরিহাসে আমাকে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা ও শ্রদ্ধা পেতে হয়েছে বলে আমার কোন দোষ কিংবা গুণ নেই। এর কারণ হয়তো যে, আমার সামান্য শক্তিতে শুধুমাত্র জানবার গভীর আগ্রহের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র একটি কি দুটি কল্পনা বুঝতে পেরেছি। কোন নেতাকে নির্বাচন করবার জন্যে জনসাধারণকে যেন বাধ্য না করা হয়, তাদের যেন নির্বাচন করবার ক্ষমতা থাকে। আমার মতে যে কোন স্বেচ্ছাচারী ও দমননীতির দ্বারা শাসন পদ্ধতি অচিরেই মর্যাদা হারিয়ে অধঃপতিত হয়, কারণ বল সব সময়েই হীনচরিত্রের লোকদেরকে আকৃষ্ট করে এবং খেয়ালী ও অত্যাচারী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পরে ইতর ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকেরা তাদের উত্তরাধিকারী হয়—আমার বিশ্বাস যে, এই নিয়মের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় না।"

আইনস্টাইনের মনের এই দৃঢ়ভাবের জন্যে হিটলার 1932-33 খ্রীস্টাব্দে

ক্ষমতায় আসীন হলে আইনস্টাইনের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়, যার জন্যে একরকম কপর্দকশূন্য ভাবে জার্মানি ছেড়ে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে হয়। সে কথা যথাসময়ে বলা হবে।

19

আইনস্টাইন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী ছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে শান্তি চাইতেন শুধু একজন বুদ্ধিজীবীর মতবাদের জন্যে নয়, মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণা দেখলে কিংবা শুনলে তাঁর সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মন বেদনার্ত হয়ে উঠত। তিনি এই সব অত্যাচার চিরতরে দূরীভূত করবার জন্যেই শান্তিকামী ছিলেন।

তিনি এই সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, "আমার শান্তিবাদ একটি সহজ প্রবৃত্তিজাত অনুভূতি, এই অনুভূতিতে আমি অভিভূত হই, কারণ মানুষকে হত্যা করা একটি নিদারুণ বিরক্তিকর ব্যাপার। আমার এই অনুভূতি কোন বুদ্ধিবাদ থেকে জন্মায় নি, কিন্তু এর ভিত্তি হল সর্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার প্রতি গভীর বিরূপতা।"

লীগ অব্ নেশন্সের বা জাতিসঙ্ঘের কথা আমরা অবহিত আছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণের, বিশেষভাবে য়ুরোপীয় দেশগুলির অধিবাসীদের চরম দুর্দশা হয়েছিল—ভবিষ্যতে যাতে এইরূপ যুদ্ধ আর না ঘটতে পারে, সেজন্যে সকল জাতিই সচেষ্ট হয়ে উঠল। শান্তির জন্যে এই ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা থেকেই জাতিসঙ্ঘের উৎপত্তি ঘটেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট উইলসনের বিখ্যাত 14 দফা শর্তের সর্বশেষ শর্তটির উপর ভিত্তি করে জাতিসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্যে 1919 খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যগুলিকে আইনস্টাইনের পছন্দ হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে, সব জাতি যদি আন্তরিকভাবে এই শর্তগুলি পালন করতে চেষ্টা করে, তবে পৃথিবীতে শান্তি নিশ্চয়ই আসবে। এই প্রতিষ্ঠানটির একটি বিভাগ হল 'বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার কমিশন' (Commission for intellectual co-operation)। এই কমিশনে যোগদানের জন্য 1922 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানান হল। তিনি সানন্দে রাজী হলেন। কিন্তু কমিশনের কতকগুলি বৈঠকে যোগ দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, সদস্যবৃন্দ

শান্তির চেয়ে নিজেদের স্বার্থের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করছেন এবং যে মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানটি সংগঠিত হয়, তা আন্তরিকভাবে কেউই মানছেন না। বিশেষ করে জার্মানির শিল্পাঞ্চল রুহ্‌র ফরাসীরা অন্যায়ভাবে দখল করে নেওয়াতে জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। প্রতিবাদে 1923 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

মাদাম কুরীর মত আইনস্টাইনের সমমতের অনেক বিজ্ঞানী তাঁকে অনুরোধ করলেন জাতিসঙ্ঘের ভিতর থেকে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার কমিশন গঠন করতে। এই বিষয়টি আইনস্টাইনের মনঃপুত হল। তিনি ভাবলেন যে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীর মনোবৃত্তি দূর করতে একমাত্র বিজ্ঞানই সক্ষম হবে।

তিনি লিখছেন, "সাংস্কৃতিক শিক্ষার বল হিসাবে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য মানুষের মনের উপলব্ধির ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ততর করবে এবং একটি শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি হবে—কারণ এর দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ব্যাপকতর বলে মানুষকে অর্থহীন জাতীয়তাবাদ থেকে কিছুটা দূরে নিতে সক্ষম হবে।"

এইরূপ একটি কমিশন গঠিত হলে আইনস্টাইন, মাদাম কুরী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হয়ে শান্তির জন্যে বিজ্ঞানীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। 1925 খ্রীস্টাব্দে ইতালির মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট সরকার বিজ্ঞানীর স্থলে বিচার বিভাগের একজন মন্ত্রীকে জাতিসঙ্ঘের এই কমিশনের সদস্য করলেন। মাদাম কুরী প্রতিবাদ করে বললেন যে, একজন অবৈজ্ঞানিক মন্ত্রীকে বিজ্ঞানীদের কমিশনে সদস্য করা যেতে পারে না। আইনস্টাইন এছাড়াও আরও বললেন যে, যে সব রাষ্ট্র সরকার পক্ষের কোন কোন অসমীচীন কাজের সমালোচনা করতে পারে না এবং বিপক্ষ দল বরদাস্ত করতে পারে না, সেই সব রাষ্ট্রের (totalitarian state) কোন সদস্য পাঠাবার অধিকার নেই। কিন্তু এতে অনেক সদস্য ভয় পেলেন যে, মুসোলিনি তাহলে জাতিসঙ্ঘ থেকে সরে যেতে পারেন। এর থেকে আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, এইভাবেই শক্তের ভয় প্রদর্শনের ভীতি থেকেই অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বিষয় মেনে নিতে হয়।

আন্তনিনা ভ্যালেন্তিনের লেখা আইনস্টাইনের জীবনী থেকে এই সময়কার

একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। ঘটনাটি কুজনেত্সভ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। একদিন এই কমিশনের সদস্যেরা জেনেভা হ্রদের তীরে একটি রেস্তোরাঁতে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। রেস্তোরাঁর ঐকতান বাজনা জোরে বাজছিল, এমন কি রেস্তোরাঁর ভিড়ের গোলমাল ও প্লেটে কাঁটা চামচের ঠক্ঠক্ আওয়াজ ছাপিয়ে বাজনার শব্দ উঠছিল। সঙ্গীতের মাধুর্যে আইনস্টাইন আকৃষ্ট হলেন। তিনি চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা ও নিজেদের ভিতরে আলোচনা ভুলে গিয়ে মঞ্চে উঠে বেহালাবাদকের কাছ থেকে বেহালাটি নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন। তাঁর মুখের চিন্তার ছাপ অন্তর্হিত হয়ে একটি প্রশান্ত ভাব এল ; ওষ্ঠে মৃদু হাসি, তিনি সব ভুলে গিয়ে বাজাতে লাগলেন ; ভুলে গেলেন যে, তিনি অত বড় বিজ্ঞানী, ভুলে গেলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্বশান্তির জন্যে ক্লান্তিকর আলোচনা করছিলেন, ভুলে গেলেন যে, অত বড় রেস্তোরাঁর সব লোকজন বিস্মিত নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তিনি তন্ময় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে চললেন।

অনেক রাত্রিতে যখন আইনস্টাইনের বন্ধুরা তাঁকে ডেকে সময় সম্বন্ধে বললেন, তিনি বেহালাটি ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে হেসে বিদায় নিলেন।

20

নাৎসী পার্টি গঠন ও হিটলারের ক্ষমতালাভের বিষয়টি উল্লেখ করবার পূর্বে আইনস্টাইনের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ ও অপর কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

1922 খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে আইনস্টাইন লাঁজভ্যাঁ ও নর্দমান প্রমুখ ফরাসী বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণে প্যারিসে বক্তৃতা দিতে যান। সেখানে দিন কয়েক বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বার্লিনে ফিরে এলেন। আইনস্টাইন জার্মানবাসী বলে প্যারিসে এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী কিছুটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন।

জাপান থেকে বহুদিন যাবৎ অনেক অনুরোধ আসতে থাকায় আইনস্টাইন দম্পতি 1922 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে মার্সেল বন্দর থেকে একটি জাপানী জাহাজে জাপান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যাত্রাপথে কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং সাংহাইতে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। সর্বত্র বিরাট জনসাধারণ তাঁকে

বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। আইনস্টাইন ভারতবর্ষে একবারও আসতে পারেন নি।

জাপানে পৌঁছলে আইনস্টাইন দম্পতিকে বিপুল সংবর্ধনা জানান হয়। তিনি সেখানকার অনেক শহরে বক্তৃতা দিলেন। তিনি জাপান দেখে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর বন্ধু সোলোভিনকে এক চিঠিতে লেখেন যে, জাপান অতি সুন্দর। সেখানকার অধিবাসীদের মার্জিত রুচি, প্রতিটি বিষয় জানতে আগ্রহ, সুন্দর শিল্পজ্ঞান এবং প্রখর সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জাপানে থাকাকালীন আইনস্টাইন খবর পান যে, তিনি 'রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স'-এর সদস্য হয়েছেন। রাশিয়ার বিজ্ঞান সভার সদস্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সইকরা চিঠিতে তাঁকে জানান হয়েছে, বিগত পনের বছরের পদার্থবিদ্যায় অসাধারণ সিদ্ধিলাভের বেশীর ভাগ তাঁর নিজস্ব কল্পনার জন্যে সম্ভবপর হয়েছে।

জাপানী বালকবালিকাদের একটি সভায় তিনি তাদেরকে মনে রাখতে বললেন, "বিদ্যালয়ে তোমরা যে জ্ঞান লাভ করছ, তা হল পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং এই আহৃত মূল্যবান সম্পদকে তোমরা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধতর করে তোমাদের বংশধরদের হাতে দিয়ে যাবে ; কারণ এই মরজগতে মানুষ আমরা একদিন মরে যাব, কিন্তু অবিনশ্বর এই জ্ঞানসম্পদ চিরকাল থেকে যাবে।"

জাপানে কয়েক সপ্তাহ থেকে আইনস্টাইন দম্পতি জাপানীদের কাছ থেকে বহু শুভেচ্ছা ও উপহারাদি নিয়ে ইহুদীদের বাসভূমি ইজরায়েলে এলেন। তাঁরা সেখানকার রাজধানী টেল-আভিভে বৃটিশ হাইকমিশনারের গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য কয়েকটি শহরে আইনস্টাইন বক্তৃতা দিলেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, বিরাট জনতা বিপুলভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছে, কারণ ইহুদীদের নিকট আইনস্টাইন এক অমূল্য সম্পদের মত, তাছাড়া তিনি জনসাধারণের কাছে আরও বিখ্যাত হয়েছিলেন 1922 খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তাঁর দূর প্রাচ্যে ভ্রমণকালে—এই সময় সুইডিশ অ্যাকাডেমি ও নোবেল কমিটি ঘোষণা করলেন যে, 1921 খ্রীস্টাব্দের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার আইনস্টাইনকে দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলে নানাস্থানে তিনি তাঁর

বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে মতবাদ ও বিশ্বাস পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলেন।

1923 খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আইনস্টাইন দম্পতি ইজরায়েল থেকে মার্সেল এলেন। সেখান থেকে গেলেন স্পেনে। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য কয়েকটি শহরে বক্তৃতা দেবার পরে তাঁরা বার্লিনে ফিরে এলেন।

বেশ কয়েক বছর পূর্বেই নোবেল পুরস্কার কমিটির সদস্যদের ধারণা হয়েছিল যে, আইনস্টাইন এই পুরস্কারটি পাবার উপযুক্ত। কিন্তু সুইডিশ অ্যাকাডেমির কমিটির সদস্যবৃন্দ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সে সময় পর্যন্ত আপেক্ষিকতাবাদ মেনে নেন নি। তা ছাড়া এই শর্ত ছিল যে, এই পুরস্কার দেওয়া হবে ব্যবহারিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে। সুতরাং সুইডিশ অ্যাকাডেমি ও নোবেল কমিটি রাজনৈতিক কারণে লেনার্ড ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে ভেবে আপেক্ষিকতাবাদের জন্যে ঐ পুরস্কারটি আইনস্টাইনকে দিতে এতদিন ইতস্ততঃ করছিলেন। সুতরাং এখন পুরস্কার দেবার ঘোষণাটি লেখা হল—"এই পুরস্কারটি আইনস্টাইনকে দেওয়া হল তাঁর আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব এবং তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যে।"

1923 খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে নোবেল পুরস্কারটি গ্রহণ করবার জন্যে আইন-স্টাইন সুইডেনে গেলেন। পুরস্কার হিসাবে 50,000 স্টার্লিং নগদ মুদ্রা পেয়ে বার্লিনে এসে তিনি এল্সাকে বললেন যে, সেই অর্থের অর্ধেক তিনি মিলেভাকে দিতে চান। এল্সা সানন্দে সম্মতি জানালেন, আইনস্টাইন মিলে-ভাকে 25,000 স্টার্লিং পাঠাবার সঙ্গে একটি চিঠিতে লিখলেন যে, মিলেভা আইনস্টাইনের আর্থিক দুঃখকষ্টের দিনে আন্তরিক যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, যার মর্ম উপলব্ধি করে এই অর্থ তাঁকে পাঠান হল। পুরস্কারের বাকী অর্ধেক মুদ্রা তিনি নানারূপ জনহিতকর কাজে দান করলেন।

জার্মানিতে ফিরে এসে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণ মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে ও তাতে আকৃষ্ট হতে পারে—সেইভাবে বক্তৃতা দেবার জন্যে পূর্বের চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করতে লাগলেন ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই সব বক্তৃতা বেশ জনপ্রিয় হওয়ায় অনেক লোক শুনতে আসত।

তিনি অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্যে সঙ্গীতানুষ্ঠানাদিতে সক্রিয়-ভাবে যোগ দিতে লাগলেন। কুজনেত্‌সভের বই থেকে একটি কৌতুককর ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল।

একবার মধ্য জার্মানির এক শহরে আইনস্টাইন গেলেন এইরূপ এক অনুষ্ঠানে বেহালা বাজাতে। ঐ অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান একজন অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ সংবাদদাতাকে পাঠিয়েছিল। এই সংবাদদাতাটি তাঁর পাশে উপবিষ্টা একজন ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ রাত্রির অনুষ্ঠানে বেহালাবাদক আইনস্টাইন নামে ব্যক্তিটি কে?"

ভদ্রমহিলা অতি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "সে কি! আপনি জানেন না? ইনি হচ্ছেন সেই বিখ্যাত আইনস্টাইন!"

সংবাদদাতাটি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি," এই বলে তিনি তাঁর মন্তব্য লিখতে লাগলেন।

পরের দিন খবরের কাগজে খবর প্রকাশিত হল, "প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অতি মনোজ্ঞ বেহালা বাদন। তাঁর মধুর বাজনাতে প্রমাণ হল যে, বাজনাতে সত্যই তিনি অদ্বিতীয়।"

এই খবর পড়ে আইনস্টাইনের বাড়ীতে হাসির তুফান ছুটল। সবচেয়ে বেশি হাসলেন আইনস্টাইন নিজে। তিনি কাগজ থেকে খবরটি কেটে নিজের কাছে রেখেছিলেন ও প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বলতেন, "তোমরা মনে কর যে, আমি একজন বিজ্ঞানী, না? তা মোটেই নয়! এই দেখ কাগজে লিখেছে যে, আমি একজন প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক।"

বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ আইনস্টাইনের আবিষ্কার ও মানবপ্রেমের জন্যে তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মাঝে মাঝেই আইনস্টাইনকে ব্রাসেলসে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতেন। আইনস্টাইনও সানন্দে সেখানে গিয়ে দু-এক দিন কাটিয়ে আসতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত তাঁর বেহালা। তিনি রাণীকে বাজনা শোনাতেন। কথিত আছে যে, একবার আইনস্টাইন ব্রাসেলসে গিয়ে যে-কোন কারণেই হোক রাণীর প্রেরিত গাড়ীতে না গিয়ে বেহালাটি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির। রাণী তাই শুনে খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। যতদূর মনে হয়, কারণটি বোধ হয়—রাজ-প্রাসাদের বাড়ীর সোফেয়ার আইনস্টাইনকে চিনত না, সে হয়ত ভেবেছিল যে,

ট্রেন থেকে রাণীর মহামান্য অতিথি যিনি নামবেন, তিনি নিশ্চয়ই সুবেশ-পরিহিত ফিটফাট কোন সৌখীন ভদ্রলোক হবেন। হয়ত সে এইরূপ কোন ভদ্রলোকের প্রতীক্ষায় ছিল ও খোঁজ করছিল। ইস্ত্রিবিহীন ঢলঢলে পোষাক পরা, আলুথালু চুলভর্তি মাথা, বেহালা হাতে কোন লোক যে রাণীর মাননীয় অতিথি হতে পারেন—এটি তার কল্পনার বাইরে ছিল বলে হয়ত সে আইন-স্টাইনকে দেখলেও তাঁর প্রতি কোন মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি, যার ফলে আইনস্টাইন সানন্দে হেঁটেই প্রাসাদে গিয়ে হাজির, কারণ হাঁটতে তিনি খুবই ভালবাসতেন।

21

এবার বিশের-দশকের মাঝামাঝি থেকে পদার্থবিদ্যায় যে বিপ্লব উপস্থিত হল এবং যেটি হবার অনুমান আইনস্টাইন কয়েক বছর আগে থেকেই কর-ছিলেন, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করা হচ্ছে।

1924 খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' পত্রিকাতে লুই দ্য ব্রগলি (Louis de Broglie) নামে এক অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানীর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল। নিবন্ধটির মূল ব্যাপারটি হল বস্তুর তরঙ্গরূপের অস্তিত্ব। তিনি লিখেছেন, যে-কোন বস্তু—সেটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণিকা, কিংবা ইলেকট্রন, যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় বস্তুটি হবে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গগুলির মত এই বস্তু-তরঙ্গগুলিও সম্পূর্ণরূপে শূন্য স্থান দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, যার জন্যে বলা যেতে পারে যে, এগুলি সাধারণ যান্ত্রিক তরঙ্গ (mechanical waves) বা মাধ্যমে উৎপন্ন তরঙ্গ নয়। এই তরঙ্গগুলির সঙ্গে বিদ্যুতাধানের কোন সম্পর্ক নেই। কোন বস্তু বিদ্যুতাহিত হোক বা না হোক, বস্তুটি গতিতে থাকলেই এটির তরঙ্গমালা সৃষ্টি হবে। সেজন্যে এগুলি বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গও নয়। দ্য ব্রগ্‌লি কণাবাদভিত্তিক একটি গাণিতিক সূত্র বের করলেন, যার দ্বারা কোন চলন্ত বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে বস্তুটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা যাবে। বস্তুটির ভর ও বেগের কোন একটি যত বেশী হবে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত ক্ষুদ্র হবে।

দ্য ব্রগ্‌লি তাঁর এই নিবন্ধে আশা পোষণ করলেন যে, বস্তু ও বিকিরণের (অর্থাৎ শক্তির) পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি

করা যাবে যদি ইলেকট্রনকে কণিকারূপে না ভেবে তরঙ্গরূপে ভাবা যায়।

এই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটিতে বিজ্ঞান জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। এমনি সাড়া পড়েছিল 1905 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন যখন আলোর আপতনে ধাতু থেকে ইলেকট্রনের নির্গমনের ব্যাখ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্বে (Photo-Electric Effect) আলোর তরঙ্গরূপের স্থলে কণিকারূপ কল্পনা করেছিলেন এবং পরে আলোর এই দ্বৈত রূপই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু আলো কেন, যে-কোন বিকীর্ণ শক্তি, যেমন গামা রশ্মি, এক্স-রশ্মি ইত্যাদি সব শক্তিরই দুটি রূপ বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ের চিন্তা থেকেই দ্য ব্রগ্‌লি তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করলেন। দুটি বস্তুর ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটি বস্তু ও শক্তির ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটি খুব বোধগম্য নয়। দ্য ব্রগ্‌লি এই ব্যাপারটির পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্যে বস্তুর তরঙ্গরূপ মতবাদ প্রকাশ করলেন।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আইনস্টাইনের আলোর কণিকারূপের ব্যাখ্যা নীল বোরকেও তাঁর প্রসিদ্ধ পরমাণুর গঠনবিষয়ক কল্পনা গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছিল। আইনস্টাইন তাঁর আলোর কণিকারূপের ব্যাখ্যাতে প্লাঙ্কের কণাবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

দ্য ব্রগ্‌লি এই নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কিছুকালের মধ্যেই স্রোয়েডিঙ্গার অনুরূপ একটি গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, যা পদার্থবিদ্যায় তরঙ্গ-বলবিদ্যা (wave mechanics) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এতে তিনি এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, যা দিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনে তরঙ্গরূপ আরোপ করে কণাঘটিত ব্যাপারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মাক্স বর্ন্ পরে এই তরঙ্গ-বলবিদ্যার তরঙ্গগুলিকে সম্ভাব্যতার তরঙ্গ (waves of probability) রূপে প্রকাশ করলেন।

1927 খ্রীস্টাব্দে ডেভিসন (Davison) ও জারমার (Germer) নামে বিজ্ঞানীদ্বয়ের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে ফোটোগ্রাফী প্লেটে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ ধরা পড়ল। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মেপে দেখলেন যে, সেটি দ্য ব্রগ্‌লির সূত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পরে আরও প্রমাণ

পাওয়া গেল যে, শুধু ইলেকট্রনেরই নয়, সমস্ত পরমাণু—এমন কি অণুরও তরঙ্গ-রূপ আছে। এর অর্থ হল যে, এই সচল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর তরঙ্গরূপ আছে।

মাক্সওয়েল বস্তুকে বলেছিলেন, "the imperishable foundation stones of the Universe"—"বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তি প্রস্তর।" তার মানে বস্তুই বিশ্বের আদি উপাদান, যার ক্ষয় নেই। কিন্তু তার প্রায় 60 বছর পরেই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে রহস্যময়ী প্রকৃতির আবরণ আরও কিছুটা উন্মুক্ত হল, যাতে প্রকাশ পেল বস্তুর কঠিনত্ব নেই, বস্তু থেকে তার পদার্থ খসে পড়ল, বস্তু হল তরঙ্গসমষ্টি। বস্তুর সমষ্টি থেকেই আমরা যে বিশ্বের ধারণা পাই, সেই বিশ্বের রূপ দাঁড়াল তরঙ্গরাশি, তার মানে এই বিরাট বিশ্বে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি আলাদা আলাদা আর কিছুই নেই, সবই কেবল একরূপ তরঙ্গের সমষ্টি —এই সব তরঙ্গ কোন মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ শূন্যে (void)।

এই সময়ে পদার্থবিদ্যায় অদ্ভুত ও উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হল, যার প্রথমটি হল বস্তুর বা কণিকার তরঙ্গ (waves of particles) ও দ্বিতীয়টি হল আলোর বা শক্তির কণিকা। আলো বা শক্তিকে 1905 খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কল্পনা করা হত তরঙ্গরূপে। সুতরাং দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে তরঙ্গের কণিকা (particles of waves)। এই দুটি সম্পূর্ণ উল্টো প্রকৃতির ব্যাপারে যে গভীর পার্থক্য প্রতীয়মান হচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক দশক পূর্বে হাইজেনবার্গ ও মাক্স বর্ন্ এই প্রভেদের ভিতরে সেতুবন্ধন করলেন। তাঁরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই ঘটনাগুলিকে অভিনব গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচার করলেন। এই গাণিতিক পদ্ধতি কারোর ইচ্ছানুসারে কণাজনিত ঘটনাবলীর (quantum phenomena) তরঙ্গ আকারের কিংবা কণিকা আকারের নিখুঁত বর্ণনা পেতে সমর্থ হবে।

তাঁরা বললেন যে, কোন পদার্থবিদ্যাবিদের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ইলেকট্রনের গুণাগুণ সম্বন্ধে চিন্তা করবার কোন সার্থকতা নেই। গবেষণাগারে তাঁকে কাজ করতে হয় ইলেকট্রন রশ্মি নিয়ে এবং এক একটি রশ্মিতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রন কণিকা বা তরঙ্গ যে রূপেই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানীকে কাজ করতে হবে বহু সংখ্যক ইলেকট্রন নিয়ে, কখনও একটি বা অল্প কয়েকটি নিয়ে নয়, সেজন্য পরিসংখ্যানের (statistics) ও

সম্ভাব্যতার (probability) নিয়মাবলী মানতে হবে, যা করা হয় গ্যাসের অণুদের ক্ষেত্রে।

আমাদের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ কোন যন্ত্র দিয়ে, সেটি বাস্তবে সম্ভবপর যত উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র হোক না কেন, কোন একটি ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকার অবস্থান ও বেগকে একসঙ্গে নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যাবে না।

আমরা ইলেকট্রনকে অথবা পরমাণুকে অথবা সম্ভাব্যতার তরঙ্গকে যে ভাবে দেখি না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিজেদের পছন্দমত কল্পনা করে নিতে পারি যে, আমরা একটি তরঙ্গপূর্ণ বিশ্বে কিংবা বস্তুপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। কিংবা বিশ্বকে অভিহিত করা যেতে পারে কোন কোন বিজ্ঞানীর দেওয়া নামে "Universe of "wavicles" অর্থাৎ "waves" ও "particles" এর মিশ্রিত নামে। একে বাংলায় বলা যেতে পারে "তরণিকা" অর্থাৎ "তরঙ্গ" ও "কণিকা"-র মিশ্রণ।

এইভাবে কণিকা-জগতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, বিশৃঙ্খলা, এল কার্য-কারণের সম্বন্ধের অভাব। এই কণিকা জগতে (micro-world) কণিকা-গুলির ঘটনাবলীকে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—যেমনটি প্রকাশ করা যায় বাইরের জগতের (macro-world) ঘটনাবলীকে। এই বহির্জগতের ঘটনাবলীতে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার অথবা কার্য-কারণ সম্বন্ধের (causality) অভাব দেখা যায় না।

এই কণিকা-জগতের কণিকাগুলির গতিবিধি সম্পর্কিত কার্যাদি অবলম্বনে গড়ে উঠল পদার্থবিদ্যায় নূতন চিন্তাধারা, যাকে বলা হয় কণা-বলবিদ্যা (quantum mechanics)। পদার্থবিদ্যার এই নূতন অংশটি সৃষ্টি হল বোরের নেতৃত্বে হাইজেনবার্গ, স্রোয়েডিঙ্গার, বর্ন্, ডিরাক ও দ্য ব্রগ্‌লি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দ্বারা।

পদার্থবিদ্যায় কণা-বলবিদ্যার আবির্ভাবে কণিকা-জগতে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার স্থানে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে আইনস্টাইন খুবই বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি এই সব নবীন বিজ্ঞানীদের কাজকে অস্বীকার করলেন না, কিন্তু তাঁর মনে সনাতন নিয়মাবলীভিত্তিক জ্ঞান এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেন যে, কণিকা-জগতের চিন্তাধারায় একটি গলদ রয়ে গিয়েছে,

যার জন্যে প্রকৃত মূল সত্যকে জানা যাচ্ছে না, সত্যকে জানা যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন-ভাবে, উপস্থিত হয়েছে বিশৃঙ্খলা। আসল সত্যকে একদিন জানা যাবেই।

বোর কয়েকবার আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নূতন মতবাদ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করেন এবং আইনস্টাইনকে এই মতবাদে বিশ্বাসী করবার চেষ্টা করেন। এই সব আলোচনাতে নানারূপ তর্কাতর্কি হত। আইনস্টাইন একবার বলেন—'ঈশ্বর পাশা খেলেন না।' 'ঈশ্বর' বলতে আইনস্টাইন বুঝিয়েছেন প্রাকৃতিক সত্যকে। এই সত্যের তত্ত্বগুলি পাশার দান নয় যে, এটি হতে পারে আবার ওটিও হতে পারে, অর্থাৎ পরিসাংখ্যিক নয়, এগুলি ঘটনার সম্ভাব্যতার বিষয় বলে না, বের করে বাস্তব ঘটনাবলীকে।

আইনস্টাইন জীবনের শেষ দীর্ঘ ত্রিশ বছর চেষ্টা করেছেন একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) আবিষ্কার করতে এবং কণাবাদভিত্তিক সব ঘটনাবলীর মূল লুকানো সত্যকে খুঁজে বের করতে। তিনি কণা-বলবিদ্যার কঠিন সমালোচনা করতেন। তাঁর সমালোচনার প্রকৃত অর্থ ছিল কণাবাদ ভিত্তিক মতবাদের একটি সীমা নির্দেশ করা এবং এই সীমার বাইরে অধিকতর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারের সম্ভাবনার ধারণা পোষণ করা। তাঁর সমালোচনাতে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে এই মতবাদের সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞানীরা সেগুলি সংশোধন করে এই নূতন মতবাদকে আরও উন্নতর করতেন।

আইনস্টাইন এই নূতন সৃষ্টিকর্তাদের সঙ্গে কিছুতেই সহযোগিতা করলেন না এবং আমৃত্যু সঙ্গীহীনভাবে জগতে একাকী চললেন দেখে নবীন বিজ্ঞানীরা খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হল যে, আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময় তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হত তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে এখন মনে করা হতে লাগল পথ-হারানো ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে অসমর্থ এক বিজ্ঞানীর বিচ্ছিন্নতা।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে তাঁর উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় বোর বলেছেন, "......পদার্থবিদ্যার প্রতিটি ধাপ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নূতন আর এক ধাপ আবিষ্কারের সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন ত্রুটিবিচ্যুতি, যা দূর করে পদার্থবিদ্যাকে উন্নত করবার জন্যে বিজ্ঞানীদেরকে নূতন উদ্যমে কাজ করতে

প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রতিটি ধাপে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই মনীষীর বিরুদ্ধ ও অর্থপূর্ণ সমালোচনা না থাকলে কণা-বলবিদ্যার অগ্রগতি অনেক মন্থর হত।"

শৈশবকাল থেকেই আইনস্টাইন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ সহ্য করতে পারতেন না। সেই অনুভূতি বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়ে উঠল। হত্যা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা ইত্যাদির উপর তাঁর খুবই বিতৃষ্ণা ছিল বলে তিনি ঘোরতর যুদ্ধ-বিরোধী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ও চেষ্টা করেছিলেন সেই সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। কিন্তু জার্মানির গণতান্ত্রিক সরকারের দুর্বলতার, বিশেষ করে অতিরিক্ত আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু একদল উগ্রপন্থী যুবকের উচ্ছৃঙ্খল ও যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তির জন্যে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক দলগঠনের প্রয়াসে কাগজে কাগজে আবেদন জানালেন, "আমি সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা যেন যুদ্ধের জন্যে কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে কোন প্রকার সাহায্য না দেন। আমার অনুরোধ, তাঁরা তাঁদের সরকারকে এই বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবেন এবং তাঁরা যে এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, দয়া করে সেটি আমাকে জানাবেন।"

আইনস্টাইন পৃথিবীতে শান্তির জন্যে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লেখেন। 1930 খ্রীস্টাব্দে লেখা একটি নিবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"অতীতের মহান ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল পরিমাণে উন্নতি এই নৈতিক স্বীকৃতিকে বর্তমান যুগের সভ্য মানবজাতির বাঁচা মরার সমস্যায় পরিণত করেছে। প্রত্যেকের নৈতিক কর্তব্য হল শান্তির জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করা এবং কোন বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ এই কর্তব্য পরিহার করতে পারেন না।

"প্রত্যেক মানুষের মনে রাখা উচিত যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে কোন জাতির ভাগ্য নির্ভর করে তার জনগণের উপর।"

এই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (non-violent non-

cooperation movement) আইনস্টাইনকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত করেছিল। তিনি মনে প্রাণে শান্তিকামী ছিলেন বলে গান্ধীজীর এই অভূতপূর্ব আন্দোলন তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল এবং গান্ধীজীর প্রতিটি আন্দোলনের বিশদ খবর তিনি রাখতেন। মৃত্যু, কারাবরণ, নানারূপ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সহ্য করেও ভারতীয়েরা গান্ধীজীর প্রেরণায় ও তাঁর নেতৃত্বে বছরের পর বছর এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁর গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তিনি গান্ধীজীর মহত্ব ও চরিত্রের দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। প্রিন্সটনে তাঁর লেখাপড়া করবার ঘরে টেবিলে থাকত গান্ধীজীর ফটো। তাঁর একটি নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধী অদ্বিতীয়। একটি অত্যাচারিত জাতির মুক্তিসংগ্রামের জন্যে তিনি সম্পূর্ণ এক নূতন ও মানবিক বলের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং এই পদ্ধতিটি তিনি যথাসাধ্য শক্তিতে ও পরম বিশ্বস্তভাবে পালন করে চলেছেন। সমস্ত জগতে চিন্তাশীল মানুষদের উপরে তিনি যে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেটি আমাদের বর্তমান কালে পাশবিক বলের আধিক্যের দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করা যায় বলে প্রতীয়মান হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘদিন স্থায়ী, কারণ কূটনীতিবিদ্‌দের বা নেতাদের কাজের ফল স্থায়ী হয় কেবল তখনই, যখন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত উদাহরণ ও শিক্ষণীয় প্রভাবের দ্বারা জনসাধারণের নৈতিক বলকে জাগরিত করে সুদৃঢ় করতে পারেন।

"আমরা ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ যে, ভাগ্যের গুণে আমাদের সমকালে আমরা পেয়েছি এমন জ্যোতির্ময় মানুষটিকে যিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছেও আলোর শিখারূপে প্রজ্বলিত থাকবেন।"

1939 খ্রীস্টাব্দে 2রা অক্টোবর গান্ধীজীর সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে আইনস্টাইন প্রিন্সটন থেকে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, "তিনি তাঁর জাতির নেতা, এর জন্যে বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় নি ; একজন রাজনীতিবিদ্—যাঁর সাফল্য কৌশল বা কোন প্রযুক্তিপদ্ধতির উপর নির্ভর করে নি, করেছে শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তিকে উপলব্ধি করানোতে ; একজন বিজয়ী যোদ্ধা, যিনি সব সময়েই বলপ্রয়োগকে ঘৃণা

করেছেন; এমন মানুষ—যাঁর জ্ঞান ও নম্রতার সঙ্গে ছিল স্থির সঙ্কল্প ও অনমনীয় দৃঢ়তা, যিনি তাঁর জাতির জনসাধারণের উন্নতি ও তাদের মঙ্গল-সাধন করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন; এমন একজন মানুষ যিনি য়ুরোপের বর্বরতার সম্মুখীন হয়েছেন সাধারণ মানুষের আত্মসম্মান বোধ নিয়ে, যার ফলে সব সময়েই উন্নততর বলে প্রমাণিত হয়েছেন।

"খুব সম্ভব ভবিষ্যৎকালের বংশধরগণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, প্রকৃতই রক্তমাংসের দেহে এইরূপ একজন মানুষ এককালে এই পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছেন।"

23

ভারতের প্রতি আইনস্টাইনের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকায় বার্লিনের ভারতীয় ছাত্রদেরকে তিনি বেশ পছন্দ করতেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিতশাস্ত্র বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় আচার্য নিখিলচন্দ্র সেন 1921 খ্রীস্টাব্দ থেকে বছর দুই আইনস্টাইনের ছাত্র ছিলেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্বকে নূতন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে আইনস্টাইন তাঁকে প্রশংসা করেন এবং পরে 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' (Bose-Einstein Statistics) বিজ্ঞান জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

1955 খ্রীস্টাব্দে 18ই এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যু হলে পরের দিন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত এক শোক সভাতে এই দুই কৃতী ব্যক্তি যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন, তার থেকে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হল:

আচার্য বসু বলেছেন, "এই বিরাট মনীষীর ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ যেন কতকটা লটারী খেলার মনোভাব নিয়েই একদিন আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি কোন সামান্য জিনিসকেও অবহেলা করতেন না। অখ্যাতনামা লোকের সেই কাজটি যে তাঁর চোখ এড়ায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিছুদিন বাদে আমি একটি ছোট্ট পোস্টকার্ড পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন—যদিও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজের মতের সঙ্গে অমিল আছে, তবুও তাঁর ধারণা এটি একটি বিশেষ মূল্যবান কাজ হয়েছে এবং তিনি নিজে এর জার্মান অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন।

"তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চেষ্টা করছিলাম গবেষণা কাজের জন্যে য়ুরোপে যাবার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখনও মন স্থির করতে পারেন নি—আমার মত একজন অখ্যাতনামা অল্পবয়স্ক শিক্ষককে বিলাতে পাঠিয়ে টাকা নষ্ট করা সঙ্গত কি না। আইনস্টাইনের সেই ছোট্ট পোস্টকার্ড-খানি আমি তাঁদের দেখালাম। আর তাঁদের মনস্থির হতে বিলম্ব হল না। পোস্টকার্ডখানা দেখিয়েই অতি অল্পদিনের মধ্যে পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি জোগাড় হয়ে গেল। আমার য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেল।

"এই রকমেই আইনস্টাইনের সেই ছোট্ট পোস্টকার্ডখানি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করছিল। য়ুরোপে আমি তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এলাম।

"তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা হত। এত দ্রুত তাঁর চিন্তা করবার শক্তি ছিল যে, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন বজায় রাখাই অনেক সময় শক্ত হত। একটা কথা শোনবার পর মনে হত—কিছু সময় ভেবে নিই; তারপর এর জবাব দেওয়া যাবে। কোন সময় তিনি কোন কথা বললে—তার অর্থ কি, তিনি ঠিক কি বলতে চেয়েছেন—তা বুঝতে আমাদের দু-তিন মাস কেটে যেত। অথচ তাঁর প্রবন্ধাদি পড়লে দেখা যায়, কত প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় তা লেখা। অত্যন্ত অনাড়ম্বর জার্মান গদ্য তিনি লিখতেন। প্লাঙ্ক যে লিখতেন, সেও অতি সুন্দর রচনা, তবে অপেক্ষাকৃত শক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় তা লেখা। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ করা যায়। কিন্তু আইনস্টাইন যা বলতে চেয়েছেন, তা অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন, কোন রকম দ্ব্যর্থব্যঞ্জক অর্থ তার হয় না।

"ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন। কখনও উপস্থিত অধ্যাপকদের সামনে কোন ছাত্র বক্তৃতা দিতে উঠে যদি কোন বিষয়ে আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত, আইনস্টাইন নিজে অনেক সময় সরল ভাষায় তারই বক্তৃতার অংশটুকু বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতেন।

"সকলেই জানেন, আজ পরমাণু শক্তির যে যুগ শুরু হয়েছে, তারও জন্মদাতা আইনস্টাইন। গত মহাযুদ্ধের শেষাশেষি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা তাঁর ছোট্ট একটি চিঠির ফলেই আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার গবেষণা শুরু করে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব যে, আমার পেপার স্বয়ং আইনস্টাইন অনুবাদ করেছেন।"

অধ্যাপক সেন বলেছেন, "আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। 1921 সালে যখন আমি জার্মানি যাই, তখন তিনি কাইজার উইল্‌হেল্‌ম ইনস্টিট্যুটের অধ্যাপক।

"আমরা তাঁকে দেখলাম। সেই মাথার রুক্ষ চুল। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা। একটি ছোট্ট ঘরে বসতেন তিনি, সেই ঘরেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হত। অনেক সময় আমরা দাঁড়িয়েই থাকতাম। তাঁর বক্তৃতা দেবার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। যখন তাঁর ইচ্ছা, তখন তিনি বক্তৃতা দিতেন।

"প্লাঙ্ক যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে প্রথম প্রথম অনেক গোলমেলে ব্যাপার ছিল। প্লাঙ্কের ধারণা ছিল ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনের বাইরে গেলে চলবেনা। যখনই তিনি নূতন করে ভাবতে গেছেন, তখনই ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে—এই চিন্তার শেষে সব গোলমাল হয়ে গেছে। প্লাঙ্কের হিসেবে এমিশনের (নিঃসরণের) সময় এক রকম কোয়ান্টা (কণা) আর অ্যাবজরপসানের (শোষণের) বেলায় আর একরকম প্রভৃতি মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট (আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব) বোঝাতে গিয়ে ওসব ধারণা কেটেকুটে দিয়ে কোয়ান্টাম (কণা)-তত্ত্বের বর্তমান গ্রাহ্য আসল রূপটুকু সকলের সামনে উপস্থিত করলেন।

"জার্মানিতে অনেকে তাঁকে পছন্দ করতনা, এমনকি সুধীমহলেও তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। সেখানকার অলিখিত নিয়ম ছিল, অল্পবয়স্ক কোন লোক অধ্যাপক হতে পারত না। তাঁকে পড়াতে দেওয়া হলেও এক পয়সাও মাইনে সে পাবে না। মানে দাড়ি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারবে না। তাই প্লাঙ্ক, লান্‌স্‌ প্রমুখ জোর করে তাঁকে এনে অধ্যাপক করে দিলেন, —সেই জায়গায় যেখানে হেবার ও প্লাঙ্কের মত লোক অধ্যাপক ছিলেন—তাতে অনেকেই খুশী হয় নি। জার্মানিতে তখন একটু একটু করে গোলমাল শুরু হয়েছে। নাৎসী দলের ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচার শুরু হয়েছে। নাৎসীদের ধারণা ছিল—ইহুদীদের মধ্যে বড় বড় লোক যারা আছে, তাদের খুন করতে

পারলেই ইহুদীদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাবে। আইনস্টাইনের তখন সেই বছরের বক্তৃতা দেবার কথা। খবর পাওয়া গেল নাৎসীরা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রাটেনাউকে (Rathenau) ইহুদী বলে হত্যা করেছে রাস্তার উপর। আইন-স্টাইনকে তখন লাউয়ে (Laue) প্রমুখ বাধা দিলেন বার্লিনে আসতে। নাৎসীরা তাঁকেও হত্যা করতে পারে। তিনি কিছুতেই শুনবেন না, তবু প্রথমবারে তাঁকে আটকান গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তৃতার দিন তিনি কারও কথা শুনলেন না, এসে উপস্থিত হলেন। বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বললেন—"ভবিষ্যতে ভয় পেয়ে কোন কাজ থেকে পিছিয়ে না যাই, এবার থেকে এটাই আমার লক্ষ্য হবে।" বক্তৃতা কিছুক্ষণ চলার পরই উপরে দরজা খোলা ও বন্ধ করার দুম্‌দাম শব্দ শোনা গেল। সকলেই ভীত হয়ে পড়লেন। আইন-স্টাইন একটু হেসে শিস্ দিলেন। ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, নাৎসী ছেলেরা প্রতিবাদ জানিয়ে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। উত্তেজনা তখন অনেক কম, তাই আইনস্টাইনকে হত্যা করে নি তারা।

"পড়াবার সময়ে তিনি সর্বদাই নূতন চিন্তার কথা বলতেন। আমার মনে আছে একদিন বিশেষ একটা বিষয় পড়িয়ে তিনি বললেন—তোমরা এটি লিখে নাও, এটা কোন বইয়ে পাবে না। এই রকম ভাবে নূতন জিনিস, যা কোথাও প্রকাশিত নেই, তাও ছাত্রদের কাছে জমা হয়েছে।

"অনেকে বোধ হয় জানেন, বার্লিনে একটি ভারতীয় সমিতি আছে। আরও অনেকের সঙ্গে আমিও তার একজন প্রতিষ্ঠাতা, সেটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেক বিপ্লবী ছিলেন, পরবর্তী কালে কেউ কেউ কাবুলে এসে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। যাই হোক, সেই ভারতীয় ভবন প্রতিষ্ঠার সময় নামকরা কোন জার্মানকে আমন্ত্রণ জানান হল এবং তিনিও অত্যন্ত বিনয় দেখিয়ে জবাব দিলেন যে, তিনি আসবেন না। জার্মানিতে তখন ভারতীয়দের বেশ আদরযত্নই করত। শেষে আমরা আর কাউকে না ডাকাই স্থির করলাম। সেদিন সেখানে গিয়ে দূর থেকেই দেখি অনেকে ভীড় করে রয়েছে আর তাদের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটি টুপি। এই টুপিটি অধ্যাপক বসুও দেখেছেন, আমিও দেখেছি—আমাদের দশ বছর আগে যারা গেছে, বোধ হয় তারাও দেখেছে। ওটার নামই ছিল—আইনস্টাইন হ্যাট। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখি, আইনস্টাইন বসে। আমরাও তাঁকে পেয়ে বসলাম। না

ডাকতেই তিনি এসেছেন একথা তাঁকে বলে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করতেই তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন—ভারতীয় ছাত্রদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে তিনিই আনন্দিত।

"জীবনে তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ, অশান্তির মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ক্রমাগত তাঁকে বাধ্য হয়ে ঘুরতে হয়েছে। জীবনে সম্মান পেয়েছেন, বিদ্বেষও ভোগ করেছেন। কেউ তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে ঘৃণা করেছে—গ্রেপ্তার করতে চেয়েছে, দেশ থেকে তাড়িয়েছে, কেউ তাঁকে প্যাসিফিস্ট নামের প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট বলেছে। তিনি নিজে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছেন বরাবর।"

ভারতীয় এই দুই মনীষীর বক্তব্য থেকে আইনস্টাইনের চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

24

1929 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের সুবর্ণজয়ন্তী জন্মদিবস অর্থাৎ পঞ্চাশতম জন্ম-দিবস নিকটবর্তী হতে থাকলে বিভিন্ন কাগজের সংবাদদাতা ও ফোটো-গ্রাফারদের ভীড় হতে থাকলে আইনস্টাইন অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার সন্মুখীন হলেন, যেমনটি হয়েছিলেন 1919 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবার পর। কিন্তু এখন তাঁর শরীর সেরূপ সুস্থ ছিল না। একটি অসুখে ভোগার পর কেবল সেরে উঠেছিলেন। অসুখটি কিভাবে হয়েছিল, তার উল্লেখ করা হচ্ছে।

সুইৎজারল্যাণ্ডের ডাভোজ (Davos) নামে শহরটিতে আরোগ্যনিকেতনে অসুস্থ ছাত্রদের রাখা হত। আইনস্টাইন তাঁর মানবতাবোধের জন্যে মাঝে মাঝে বার্লিন থেকে সেখানে গিয়ে অসুস্থ ছাত্রদের দেখাশুনা করতেন ও তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন কিংবা বেহালা বাজিয়ে শুনাতেন। 1927 খ্রীস্টাব্দে এইরূপ একবার দর্শনের কালে তিনি নিজেই রোগী হয়ে পড়লেন।

কিছুকাল পূর্ব থেকে কাপুতের হ্রদে ভারী নৌকোয় দাঁড় টানতে শুরু করায় তাঁর হৃৎপিণ্ড কিছুটা বড় হয় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক তাঁকে বেশী পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছিলেন।

সেইবার ডাভোজে হোটেলে এলে আইনস্টাইন দেখলেন যে, বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক

তাঁর সুটকেশটি বয়ে নিতে এসেছে। মানবতাবোধের জন্যে তিনি দ্বাররক্ষকের হাতে সুটকেশটি দিতে আপত্তি জানিয়ে ডাক্তারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও নিজেই বয়ে উপর তলায় উঠে গেলেন। এই পরিশ্রমে তাঁর হৃৎপিণ্ডের রোগ বেড়ে গেল এবং কিছুদিন তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল।

বার্লিনে ফিরে এলে এল্‌সা তাঁকে নিয়মিতভাবে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখলেন এবং আইনস্টাইন কিছুতেই তাঁর লেখাপড়ার কাজ কমাতে রাজী হলেন না বলে এল্‌সা তাঁর জন্যে হেলেন ডুকাস (Helen Dukas) নামে এক-জন মহিলাকে তাঁর নিজস্ব সচিব (personal secretary) পদে নিযুক্ত করলেন। এই সুদক্ষা সচিবটি আইনস্টাইনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর নানারূপ কাজকর্ম করেছেন, বিশেষ করে 1936 খ্রীস্টাব্দে এল্‌সার মৃত্যুর পর থেকে।

এখন পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক। সংবাদদাতা, ফোটোগ্রাফার ও অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় এল্‌সা হ্রদের তীরে একটি ছোট কুটীরে কিছুদিনের জন্যে উঠে গেলেন। জন্মদিনে শুধুমাত্র পরিবারের স্বজনেরা ছিলেন। তাঁরাই সাধারণ ঘরোয়া ভাবে জন্মদিনের উৎসব করলেন।

বার্লিনের পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিষদের সদস্যরা স্থির করেছিলেন যে, আইনস্টাইনের 1929 খ্রীস্টাব্দের এই বিশেষ জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁকে শহরের বাইরে কোথায়ও একটি বাসগৃহ উপহার দেবেন। কিন্তু কর্মকর্তাগণের কাজের ঢিলেমি ও গাফিলতিতে ব্যাপারটি বেশী দূর এগুচ্ছিল না। শেষে মেয়র তাঁকে নিজের পছন্দমত একটি স্থান বেছে নিতে অনুরোধ জানালেন। এল্‌সা কাপুথে হ্রদের তীরে একটি জায়গা পছন্দ করলেন। তখন জমির মালিক, ঠিকাদার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। কিন্তু পরিষদের ন্যাশানাল সোসিয়ালিস্ট দলের (পরে যা নাৎসী দল হয়েছিল) সদস্যেরা আইনস্টাইনকে কিছু দিতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জানালেন। ফলে তখনকার মত ব্যাপারটি ধামাচাপা হয়ে থাকল। কিন্তু পরে এই নিয়ে কিছুটা গোলমাল শুরু হওয়ায় আইনস্টাইন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মেয়রকে লিখলেন, "প্রিয় মেয়র মহাশয়, মানুষের জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী, তার উপর আবার কর্ম-কর্তাদের কাজকর্ম চলে অতি মন্থর গতিতে। আমার জীবনকাল এতই ক্ষুদ্র যে, তার জন্যে আপনাদের কর্মপদ্ধতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্যে আপনাকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন যেহেতু আমার জন্মদিন পার হয়ে গিয়েছে, সেইজন্যে আমি ঐ দান গ্রহণ করতে অপারক।"

কিন্তু এল্‌সার পছন্দমত ঐ জায়গাটিতে পূর্বেকার কথাবার্তা অনুসারে ইতিমধ্যে ঠিকাদাররা বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দেওয়াতে আইনস্টাইন নিজেই ঐ জমির দাম ও বাড়ি তৈরির খরচ বহন করলেন।

বাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আইনস্টাইন নিজের বাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। ফ্র্যাঙ্ক প্রথমবার যখন এই বাড়িতে এসেছিলেন, তখন এল্‌সা তাঁকে বলেছিলেন, "এইভাবে অযথা আমাদের কোনরূপ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, আমরা হ্রদের তীরে বনের ভিতরে পছন্দমত একটি বাড়ি পেয়েছি। কিন্তু এতে আমাদের সঞ্চিত সব অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছে। এখন আর আমাদের অর্থ নেই, কিন্তু জায়গা ও সম্পত্তি আছে। নিরাপত্তার দিক থেকে এটিরও মূল্য আছে।"

1930 সালের 14 জুলাই বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর কাপুথের বাড়িতে। এই দুই বিরাট মনীষীর কথোপকথনের কিছু বিষয় উত্থাপন করা হচ্ছে। একজন বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আর অপরজন শ্রেষ্ঠ কবি। দু-জনেই রহস্যময়ী প্রকৃতির নানারূপ লীলা প্রকাশে মুগ্ধ।

আলোচনাকালে আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরের অর্থাৎ ঐশী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিনা?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। মানুষের সীমাহীন অস্মিতা বা ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে উপলব্ধি করে। এরূপ কোন বিষয় থাকতে পারে না, যা মানবচেতনায় উপলব্ধ না হয় এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, বিশ্বের সত্যই হল মানব সত্য। বস্তু গঠিত হয় প্রোটন ও ইলেকট্রন দিয়ে। এই কণিকাগুলির পরস্পরের ভিতরে কিছুটা ফাঁক থাকে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও বস্তুকে কঠিন বলে মনে হয়। তেমনি মনুষ্যজাতি গঠিত হয় এক একজন ব্যক্তির দ্বারা, তবুও তাদের মধ্যে মানবসুলভ সম্বন্ধ সমস্ত মনুষ্যজাতিকে একটি সংহতি দিয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এইভাবে মানবের সঙ্গে সংযুক্ত, এটি মানব বিশ্ব।

আইনস্টাইন বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের দু-রকম ধারণার কথা বললেন—

(1) বিশ্বের সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করলে এটি মানুষের চেতনানির্ভর; (2) বাস্তবতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশ্ব মানুষের চেতনানির্ভর নয়।

বিশ্বের সৌন্দর্য ও সত্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে আইনস্টাইন বললেন যে, তিনি স্বীকার করেন সৌন্দর্যের ধারণার অস্তিত্ব মনুষ্যনির্ভর, কারণ কোন একটি জিনিষ সুন্দর, যখন মানুষের চেতনাতে সেটি উপলব্ধ হয়। কিন্তু বিশ্বের সত্যের প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, মানুষ না থাকলে অর্থাৎ সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার কেউ না থাকলে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নেই, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত, কিন্তু বিশ্বের ঘটনাবলীর সত্যতার জন্যে কোন মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন যে, জ্যামিতির পাইথাগোরাসের উপপাদ্যটি (Pythagorus Theorem)—যাতে বলা হয় যে, একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের (hypotenuse) উপর বর্গক্ষেত্রটি ত্রিভুজটির অন্য দুটি বাহুর উপর বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান—এটির সত্যতা মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না।

অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) ও বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) সম্বন্ধে বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি 'বিশ্ব-পরিচয়' নামে একটি বইও লিখেছেন। পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি বিশ্বের মৌলিক কণিকাঘটিত ব্যাপারে নূতন মতবাদের প্রবর্তন হয়েছে, যাকে নবীন বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন কণা বলবিদ্যা (quantum mechanics), সে বিষয়ে কিছু কিছু খবর তিনি রাখতেন। তিনি আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন কণিকা-জগতের (micro-world) ঘটনাবলীতে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণার কথা। এতে আইনস্টাইন এই সব যুক্তির কথা স্বীকার করে বললেন যে, তাতে কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে ঘটনাবলীর কার্য-কারণকে বিদায় দেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন যে, মেঘকে দূর থেকে দেখলে সুন্দর জমাট দেখা যায়, কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করা জলকণারাশি।

তারপর ভারতের ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে দু-জনের মধ্যে নানারূপ আলাপ হয়, দু-জনেরই নিজ নিজ দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকায় সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁরা মতামত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন

যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশিষ্ট সঙ্গীত রচনাকারীদের রচনা কঠোর নিয়মাবদ্ধ বলে গায়কেরা বা বাদকেরা কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করবার অধিকারী নন, ভারতীয় সঙ্গীতে সেরূপ নয়, ভারতীয় সঙ্গীতে গায়কদের বা বাদকদের কিছু কিছু স্বাধীনতা আছে; মূল রচনাকে ভিত্তি করে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা মত কিছু কিছু ব্যতিক্রম করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারেন সঙ্গীতকে মধুরতর করবার জন্যে, কিন্তু এতে তাঁদের বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন। ভারতীয় গানে কথার বা বাণীর কোন মূল্য আছে কিনা—আইনস্টাইনের এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, উত্তর ভারতের গানে কথার সেরূপ মূল্য নেই; সেখানে রাগরাগিণীর প্রাধান্যই বেশী, কেবল কয়েকটি কথাকে ভিত্তি করে রাগরাগিণীকে বিস্তার করা হয়, কিন্তু বাংলাদেশের গানে কথা ও সুরের সমান প্রাধান্য।

ভারতীয় গানে গায়কেরা মূল রচনার বাইরে কোন কথা যোগ করতে পারেন কিনা—আইনস্টাইন তা জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ বাংলদেশের কীর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করে বললেন যে, কীর্তনে গায়কেরা মাঝে মাঝে কথা বাড়িয়ে কীর্তনকে আরও মধুর ও আকৃষ্ট করেন বলে শ্রোতারাও তৃপ্তি-লাভ করেন।

তারপর আইনস্টাইন যখন জানতে চাইলেন যে, ভারতীয় গানের সঙ্গে বাজনা বাজানো হয় কিনা, তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, বাজনা বাজানো হয় ঐকতান (harmony) সৃষ্টির জন্যে নয়, বাজানো হয় তাল ও মাত্রা ঠিক রাখবার জন্যে এবং কণ্ঠস্বরকে একটি অবলম্বন দিয়ে গানকে জোরালো করবার জন্যে।

আইনস্টাইন বললেন যে, পাশ্চাত্য গানের সময় ঐরূপ ঐকতান কখনও কখনও গানের মাধুর্য নষ্ট করে, ঐকতান গানের সুরকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পায়।

রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, গান ও ঐকতান যেন ছবির রেখা ও রঙের মত। শুধুমাত্র রেখাঙ্কন চিত্র অতি চমৎকার হতে পারে; এইরূপ ছবিতে রঙের প্রয়োগে হয়ত কখনও কখনও ছবির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু আবার রঙ ও রেখার সমন্বয়ে মহৎ ছবির সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই উপমাটি আইনস্টাইনের বেশ সুন্দর বলে মনে হয়েছিল।

তিনি রবীন্দ্রনাথকে সে কথা বললেন এবং আরও বললেন যে, আলোচনাতে তিনি বুঝতে পারলেন—ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ। জাপানী সঙ্গীতকেও আইনস্টাইনের এইরূপ মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বললেন যে, পিয়ানো তাঁকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে, কিন্তু বেহালা তিনি অধিকভাবে উপভোগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইরূপ সাক্ষাৎ আলোচনায় আইনস্টাইন খুব প্রীতি লাভ করেছিলেন। এই আলোচনাটি 'আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ—শান্তির স্বপক্ষে এঁদের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই' এই শিরোনামায় The American Hebrew পত্রিকাতে (11 সেপ্টেম্বর, 1931) প্রথম প্রকাশিত হয়। 1931 খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "The Golden Book of Tagore" বইটি প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আইনস্টাইনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

26

1930 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন পাসাডেনার ক্যালিফর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজিতে কতকগুলি বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে সস্ত্রীক সেখানে যাবার পথে নিউ-ইয়র্কে দিন কয়েক থাকেন। এর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি গিয়েছিলেন 1921 খ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের শিক্ষার জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

পূর্বের মত এবারেও বহু সংবাদদাতা জাহাজ বন্দরে নোঙর করবার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজে উঠে আইনস্টাইনকে ঘিরে নানারূপ প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেললেন আর ফোটো উঠতে লাগল অজস্র। কারও জিজ্ঞাস্য —"আপনি কি একটি বাক্যে আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যা করতে পারেন ?" কেউ বা প্রশ্ন করলেন, "আপনার বেহালাটি কোথায় ?" আবার কেউ বা জানতে চাইলেন, "ধর্ম কি শান্তি পেতে সাহায্য করে ?" অন্য আর একজন শুধালেন, "মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?" ইত্যাকার বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে আইনস্টাইনের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। পরের দিন কাগজে কাগজে ফোটোতে দেখা গেল একজন ম্লান, হতবুদ্ধি, অবিন্যস্ত

কাল ও সাদা চুলে ভর্তি মাথা ও কাল ওভারকোট পরিহিত মানুষ ক্যামেরাকে এড়াবার চেষ্টা করছেন।

পাঁচ দিন আইনস্টাইন নিউ ইয়র্কে ছিলেন। প্রতি দিন অজস্র বক্তৃতা দেওয়াতে, অভ্যর্থনা সভায় যোগদানে, দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতে এবং দর্শনীয় স্থানাদি পরিদর্শনে তিনি ব্যস্ত থাকতেন।

এর মধ্যে একদিন আইনস্টাইন দম্পতি গেলেন হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত রিভার সাইড চার্চে। এই গির্জাঘরের প্রবেশপথে আছে সর্বযুগের প্রসিদ্ধতম মনীষীদের মূর্তি বা স্ট্যাচু। এই বিষয়টি এই বইয়ের উপক্রমণিকার প্রারম্ভেই বর্ণিত হয়েছে। ছয়-শ'টি মূর্তির ভিতরে পাঁচ-শ' নিরানব্বইজনই মৃত মনীষীদের আর বাকীটি যে জীবিত মনীষীর—তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাথরের মূর্তিটির সামনে—যেটি বিদ্বজ্জনেরা সর্বসম্মতিক্রমে তৈরি করে সেখানে রেখেছেন তাঁর কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ। সেই মূর্তিটির নীচে লেখা আছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জন্ম 14ই মার্চ, 1879 খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু তখন মৃত্যুর তারিখ লেখা ছিল না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তারিখ লেখা হয়েছে মৃত্যু 18ই এপ্রিল, 1955 খ্রীস্টাব্দ।

মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে আইনস্টাইন গভীর চিন্তায় ও অনুভূতিতে অভিভূত—তাঁর নিজের যশের বিষয় উত্থাপনে তাঁর নিজের প্রতি যে একটি মৃদু ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীর আভাস তাঁর মুখে দেখা যেত, সেটির চিহ্নমাত্রও তাঁর মুখে দেখা গেল না।

পাসাডেনাতেও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি ও বক্তৃতা ছিল। অ্যারিজোনাতে তিনি রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সভ্য হলেন এবং তাদের নানারূপ অনুষ্ঠানে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন। সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁদের জাতীয় পোষাক উপহার দিলেন।

পরে আইনস্টাইন দম্পতি গেলেন মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির দেখতে। এই মানমন্দিরে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি। মিসেস আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন—"অত বড় বিরাট যন্ত্র দিয়ে আপনারা কি করেন?" উত্তর পেলেন, "বিশ্বের গঠনের ধারণা লাভের জন্য।"

এল্‌সা অবাক হয়ে বললেন, "সে কি! আমার স্বামী তো এই কাজটি করেন শুধুমাত্র একটি পেন্সিল ও এক টুকরো কাগজে, সেই কাগজটি হয়তো ব একটি ব্যবহৃত খামের পিছনের অলেখা অংশটি।"

আইনস্টাইন দম্পতি 1931 খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে আমেরিকা থেকে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে, পরের বছরে আবার পাসাডেনাতে আসবেন।

1931 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে আবার তিনি পাসডেনাতে যান। কয়েক মাস সেখানে মিলিকান (Milikan) প্রমুখ বিখ্যাত পদার্থবিদ্যা-বিদ্দের সঙ্গে নানারূপ আলোচনার পরে 1932 খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে বার্লিনে ফিরে এলেন এবং ঐ বছরেই শরৎকালে আবার পাসাডেনাতে যান। তখন জার্মানীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর নিকট খুবই উদ্বেগজনক বলে মনে হল। গণভোটে নাৎসীদল প্রাধান্য লাভ করেছে এবং হিটলার ক্ষমতায় আসীন। হিটলার কম্যুনিস্ট ও ইহুদীদের উপরে যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাচ্ছেন। আইনস্টাইন ইহুদী, তার উপর তাঁকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হতে লাগল। সেজন্যে তিনি নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগলেন এবং তাঁকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে চিঠি আসতে লাগল। তাঁর প্রকৃত শুভাকাঙ্খীরা তাঁর জন্যে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এইবার কাপুথের বাড়ি থেকে পাসাডেনা যাবার সময় আইনস্টাইন এল্‌সাকে বললেন বাড়িটিকে ভাল করে দেখে নিতে, কারণ আর বোধ হয় তাঁদের বার্লিনে ফেরা সম্ভবপর হবে না। তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল।

27

আইনস্টাইনের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় দু-তিন বার, কিন্তু এল্‌সার সতর্ক দৃষ্টির জন্যে প্রতিবারই আততায়ী ধরা পড়ে। হুমকি দেখান হয় বহু বার। এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণই বেশী। বিভিন্ন লেখকের বইতে বিভিন্ন রকমের ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কুজনেত্‌সভের বইতে জেলিগের (Seelig) লেখা একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। জেলিগ আইন-স্টাইনের বন্ধু এহ্‌রেনফেস্টের কাছ থেকে এটি শুনেছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

1925 খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে আইনস্টাইনের লাইপ্‌ৎসিকো আসবার কথা ছিল সকালের ট্রেনে। এহ্‌রেনফেস্ট সময়মত স্টেশনে এলেন। কিন্তু আইনস্টাইন সকালের গাড়িতে এলেন না, এলেন বিকেলের গাড়িতে। তিনি

এহ্‌রেনফেস্টকে বললেন যে, সকালের গাড়িতে আসতে পারলেন না, কারণ তিনি জেলে একটি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক মহিলাটি তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে গিয়েছিল। মহিলাটির কি করে বিশ্বাস হয়েছিল যে, কোন এক আজেফ নামে ব্যক্তি আইনস্টাইন ছদ্মনামে বাস করছে এবং আজেফকে কোন কারণে সে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। আইনস্টাইনের বাড়িতে ঢোকবার মুখে দরজায় মারগৎ মহিলাটিকে দেখে : তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, মহিলাটি ঠিক স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় নেই এবং মহিলাটির উদ্দেশ্যও খারাপ। মারগৎ তখনি পাশের দোকান থেকে মাকে টেলিফোন করে বিষয়টি জানান। এল্‌সা সতর্ক থাকায় উপরে আসামাত্র মহিলাটিকে ধরে পুলিসের হাতে দিয়ে দেন। পরে ব্যাপারটি শুনেই আইনস্টাইন জেলে গিয়ে মহিলাটির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে দেখে মহিলাটি বলে যে, তিনি আজেফ নন, কারণ আজেফের নাক আরও বেশী লম্বা। আইনস্টাইন চেষ্টা করে মহিলাটির মুক্তির বন্দোবস্ত করেন ও তাকে কিছু জিনিসপত্র কিনে দেন।

কুজনেত্‌সভের বইতে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটি তিনি নিয়েছিলেন গারবেডিয়ানের (Garbedian) লেখা থেকে। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

আইনস্টাইনের রাজনৈতিক মতবাদে ও কার্যকলাপে যেমন অনেক প্রকৃত বন্ধু পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর প্রতি ঘোর বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুরও অভাব ছিল না। এইরূপ বিদ্বেষভাবাপন্না এক রাশিয়ান মহিলা আইনস্টাইনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। মহিলাটি রাশিয়ার বিপ্লবের সময় সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্যারিসে বাস করছিল। তার আমেরিকান স্বামী কয়েক বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল। একদিন এই মহিলাটি চুপে চুপে আইনস্টাইনের বাড়িতে প্রবেশ করে। তাব টুপিতে আটকান ছিল একটি বিষমাখানো পিন, যা দিয়ে সে আইনস্টাইনকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। এল্‌সার সতর্ক দৃষ্টি সে এড়াতে পারে নি। এল্‌সা মহিলাটিকে দেখেই তার খারাপ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত্র করেন ও পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। আইনস্টাইন তখন তাঁর ঘরে পড়াশুনা করছিলেন। এল্‌সা এইসব ব্যাপার এত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন যে, আইনস্টাইন তখন তাঁর

প্রাণনাশের চেষ্টার কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি। অনেক পরে তিনি ব্যাপারটি শুনেছিলেন।

28

জার্মানিতে নাৎসীদলের গঠনকারী ও নেতা হিটলারের ক্ষমতা লাভের কথা এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে। অস্ট্রিয়ার একটি দরিদ্র পরিবারে হিটলারের জন্ম। অর্থাভাবে তিনি বিশেষ লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। ভিয়েনাতে সেরূপ অর্থোপার্জনের সুবিধা না হওয়ায় 1912 খ্রীস্টাব্দে তিনি মিউনিখে আসেন। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের গোঁড়ামি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব।

দার্শনিক হেগেলের মতে প্রকৃতিতে একটি বিষয়ের ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেটি হল যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest)। প্রাণিজগতে দুর্বলেরা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নয়তো বা সবল কর্তৃক নিহত হয়। যে সব প্রাণী বেঁচে থাকার উপযুক্ত, তারাই শুধু থাকে। এইভাবে পৃথিবীতে প্রজাতিসমূহ (species) অনেক উন্নততর হয়। হেগেল বিশ্বাস করতেন যে, এই প্রক্রিয়াটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। সবচেয়ে বলীয়ান, সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই জাতি গঠন করবে। হেগেল বলতেন যে, এইরূপ 'অতিমানব' (Superman) হল আর্যেরা : দীর্ঘ দেহধারী, সুন্দর গাত্রবর্ণ ও ঈষৎ লাল কেশের অধিকারী ও নীল নয়নবিশিষ্ট খাঁটি জার্মান অধিবাসিগণ।

হিটলারের মনে এই মতবাদটি দৃঢ়মূল হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জার্মানরা খাঁটি আর্যজাতি। 1914 খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হন ও পরে কর্পোরাল হয়েছিলেন। জার্মানির পরাজয়ে তিনি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হল যে, জার্মানির পরাজয়ের দুটি মূল কারণ—এক, 1918 খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন; দুই, ইহুদীদের জার্মান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অনিচ্ছা। পক্ষান্তরে ইহুদীদের ইংরেজদেরকে অর্থ দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য দান। কম্যুনিস্ট ও ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর তাঁর ঘোর বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মাল।

1919 খ্রীস্টাব্দে হিটলার 'ন্যাশানাল সোশিয়ালিস্ট' বা নাৎসীদল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের অবসানে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ও ভার্সাই সন্ধিতে যে ব্যবস্থা হল, তাতে জার্মানির কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূ'ত হল ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানিকে বিভিন্ন দেশকে প্রতি বছর দিয়ে যেতে হল কয়লা, লোহা, রবার ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ও বহু কোটি ডলার মুদ্রা। মোট কথা, জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে কোন দিন সামরিক শক্তিতে পরিণত হতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখাতে মিত্রপক্ষের রাজনীতিবিদগণের বিচার খুব যুক্তিসঙ্গত হয় নি, বরং কতকটা দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবী উপেক্ষা করে সঙ্কীর্ণ প্রতি-হিংসাপরায়ণতাই প্রকট হয়েছিল।

অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে জার্মানদের দুর্দশার আর সীমা রইল না। ইবার্টের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার নানা সমস্যাসঙ্কুল জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ শুরু করলেন। সার উপত্যকা ও রুহ্‌র অঞ্চল সন্ধির শর্তানুসারে সাময়িকভাবে ফরাসী জাতির অধিকারে যাওয়ায় জার্মান ব্যব-সায়ী ও শিল্পপতিগণ ইবার্টের শাসনের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। এই সব কারণে জার্মানির বেশীর ভাগ অধিবাসী, বিশেষ করে যুবকেরা অপমান ও লাঞ্ছনার গ্লানিতে ক্রুদ্ধ হয়ে চেষ্টায় থাকলেন এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। দেশের জনগণের এই দুর্দশার, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হিটলার সহজেই নিজের দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেন। তারপর ইবার্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কয়েক বছরের ভিতরেই নাৎসী দল জার্মানিতে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে. 1932 খ্রীস্টাব্দে এই দল নির্বাচনে জয়ী হল। হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। তখন হিণ্ডেনবুর্গ ছিলেন প্রেসিডেন্ট। এর অল্পকাল পরেই হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হলে হিটলার স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হলেন, অর্থাৎ চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট, এই দুটি প্রধান পদের সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে একক অধিনায়ক (dictator) হলেন। তাঁর পদবী হল ফুহ্‌রার (Fuehrer) বা সর্বোচ্চ নায়ক।

পূর্ব থেকেই নাৎসীরা শক্তিশালী হতে থাকায় ইহুদীদের উপর নানারূপ উৎপীড়ন শুরু করেছিল, অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন চলছিল, যার জন্যে ইহুদী

সম্প্রদায়ের ভিতরে একটি সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। বহু ইহুদী জার্মানি থেকে চলে যেতে শুরু করেছিলেন। 1922 খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তখনকার জার্মানির গণতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্র ইহুদী মন্ত্রী ওয়ালটার রাটেনাউ (Walter Rathenau) নাৎসীদলের লোকদের দ্বারা নিহত হলেন।

নাৎসী দলকে দ্রুত শক্তিশালী হতে দেখে আইনস্টাইন মনে খুবই অশান্তি ভোগ করতে লাগলেন। তাদের হাতে ইহুদীদের উৎপীড়িত ও নানাভাবে অত্যাচারিত হতে দেখে আইনস্টাইন তীব্র ভাষায় নাৎসী দলের মনোভাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা লিখতে থাকলেন। তাঁর লেখা নানা দেশের কাগজে প্রকাশিত হতে থাকল। এই সব কারণে নাৎসী দলের কাছে তিনি প্রধান শত্রু হয়ে উঠলেন। নানারূপ ভয় প্রদর্শন করে, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেখিয়ে তাঁকে নাৎসীদল থেকে চিঠি লেখা হতে থাকল। আইনস্টাইন এতে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হয়ে সমানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা লিখতে লাগলেন। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যেতে লাগল।

1932 খ্রীস্টাব্দে হিটলার যখন ক্ষমতায় আসীন হলেন, আইনস্টাইন দম্পতি তখন ক্যালিফোর্ণিয়ায়। সেবারই বার্লিন থেকে যাবার সময় আইনস্টাইন এল্‌সাকে বলেছিলেন যে, কাপুথের বাড়িটিকে শেষবারের মত দেখে নিতে, কারণ তাঁদের জার্মানিতে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুবই কম, হয়তো তাঁরা আর ফিরবেনই না।

1933 খ্রীস্টাব্দের শীতকালে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ইহুদী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও গুণী লোকদের বিতাড়ন চরমে উঠল। মাক্স বর্ন্‌ গেলেন ইংল্যাণ্ডে, এডোয়ার্ড টেলর (যাঁকে হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক বলা যেতে পারে), সৎসিলার্ড (Szillard) প্রমুখ নামকরা কয়েকজন বিজ্ঞানী গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইতালিতে অনুরূপ ফ্যাসিস্ট সরকারের স্বৈরাচার নীতির প্রতিবাদে এন্‌রিকো ফের্মি (Enrico Fermi) ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ইতালি ছেড়ে চলে গেলেন। ফের্মি গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনিই প্রথম পারমাণবিক চুল্লি (atomic reactor) আবিষ্কার করেন। এ সব বিষয়ে পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

29

1933 খ্রীস্টাব্দের শীতকালে আইনস্টাইন পাসাডেনা থেকে নিউ ইয়র্কে এলেন ও জার্মান কন্সালের সঙ্গে দেখা করলেন। কন্সাল তাঁকে বললেন যে, তিনি নির্ভয়ে বার্লিনে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন যে, যতদিন নাৎসী দল ক্ষমতায় আসীন থাকবে ততদিন পর্যন্ত তিনি জার্মানিতে ফিরবেন না। সরকারী ভাবে কথাবার্তা শেষ হলে কন্সাল গোপনে তাঁকে বললেন, 'অধ্যাপক মহাশয়, এখন আমরা যেহেতু বেসরকারী ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের মত কথাবার্তা বলছি, আমি আপনাকে কেবলমাত্র এইটুকু বলতে পারি যে, আপনি জার্মানিতে না ফিরবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক কাজই করেছেন।'

ঐ বছরেই মার্চ মাসে আমেরিকা থেকে য়ুরোপে যাবার কিছু পূর্বে তিনি একটি লিখিত ঘোষণা প্রকাশ করেন। এর থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি লিখছেন, "আমি বসবাস করবার স্থান সম্বন্ধে বলছি যে, এমন একটি দেশে আমি থাকতে চাই, যেখানে আইনতঃ প্রত্যেকটি অধিবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিষয়ে সমান অধিকার থাকবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলার অর্থ হল: প্রত্যেকটি অধিবাসীর নিজের রাজনৈতিক মতবাদ বক্তৃতায় ও লেখায় প্রকাশ করবার অধিকার ও অন্য যে-কোন অধিবাসীর মতামতকে তাঁর সহ্য ও শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছার স্বাধীনতা। বর্তমানে জার্মানিতে এই সব স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। ঐ দেশে যাঁরা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্যে অনেক কিছু করেছেন, তাঁদের উপর উৎপীড়ন চালান হচ্ছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীও আছেন।

আইনস্টাইন আমেরিকা থেকে হল্যাণ্ডে আসেন। সেখানে লীডেনে আইনস্টাইন দম্পতি কিছুদিন অধ্যাপক এহ্‌রেনফেস্টের গৃহে অতিথি ছিলেন। আইনস্টাইন শুনতে পেয়েছিলেন যে জার্মানীতে তাঁর বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলছে। হিটলারের মতে বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব, মতবাদ এবং বিশ্বের সত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞানীদের চলতে হবে ডিক্টেটরের বা এক-নায়কের ইচ্ছামত। তিনি ঘোষণা করলেন, "নাৎসী দল বিজ্ঞানের শত্রু নয়, মতবাদের শত্রু।"

লেনার্ড, ষ্টার্ক প্রমুখ প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমীর বিজ্ঞানীগণ তাঁদের

কুহ্‌রারের মতানুযায়ী আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। এই সব খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বিজ্ঞানী নিজেদেরকে খাঁটি আর্য বলে মনে করতেন বলে প্রথম থেকেই ইহুদী আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এসেছেন—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তখন নের্নস্ট, প্লাঙ্ক, লাওয়ে প্রমুখ উদার ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের জন্যে তাঁরা বেশী আস্ফালন করতে পারতেন না। কিন্তু এখন হিটলার এক-নায়ক হওয়াতে তাঁরা কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। লেনার্ড লিখলেন, 'প্রকৃতির বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে ইহুদীদের দ্বারা সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন আইনস্টাইন তাঁর যেন তেন প্রকারের তত্ত্বগুলির দ্বারা। এইসব তত্ত্ব ও মতবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন কতকগুলি প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে নিজের কতকগুলি খামখেয়ালী ধারণা জুড়ে দিয়ে। এই সব মতবাদ এখন ধ্বংস হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একজন ইহুদীর মতবাদের অনুগামী হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।"

শেষের পঙ্‌ক্তিটি লেনার্ড লিখেছেন প্লাঙ্ক, নের্নস্ট, লাউয়ে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ করে।

আইনস্টাইন এই সব শুনে তাঁর অকৃত্রিম শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের জন্যে চিন্তিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমীর সদস্যপদ বাতিল করবার জন্য লেনার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এবং প্লাঙ্কের মত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। তাঁরা যদি আপত্তি করেন, তবে নিগৃহীত হবেন। সেই জন্যে লাইডেন থেকে 1933 খ্রীস্টাব্দের 28শে মার্চ তারিখে তিনি প্রাশিয়ান অ্যাকডেমীর সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র লেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হয়।

নের্নস্ট চেষ্টা করেছিলেন এই পদত্যাগপত্র যাতে গৃহীত না হয়। তিনি বললেন যে, এই বহুদিনকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি—ভলতেয়ার ও তাঁর মত জার্মান নন, এইরূপ কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীদের সদস্য করাতে গৌরব বোধ করত। সেই জন্যে এখনও কেবলমাত্র জার্মান জাতির মনীষীরাই সদস্য হতে পারবেন এইরূপ মনোভাব ঠিক নয়। কিন্তু নাৎসী সরকারের চাপে তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হয় নি।

প্লাঙ্ক একবার হিটলারের সঙ্গে দেখা করে অ্যাকাডেমীতে আর্য নন—এইরূপ মনীষীদের সদস্য রাখবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হিটলার এতে ক্রোধ প্রকাশ করে প্লাঙ্কের অনুরোধ বাতিল করে দেন।

ইহুদীদের ও কম্যুনিস্টদের উপর হিটলারের অত্যাচার সমানে চলতে লাগল। আইনস্টাইনকে জার্মানির প্রথম শ্রেণীর শত্রু বলে ঘোষণা করা হল এবং তাঁর প্রাণনাশের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সকলেই অবগত আছেন যে, জার্মানিতে কয়েক বছরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কয়েক লক্ষ ইহুদীকে হিটলার অমানুষিকভাবে হত্যা করেন।

লাইডেন থেকে অ্যাকাডেমীর সদস্যপদ ত্যাগ করবার পত্র পাঠিয়ে আইনস্টাইন সস্ত্রীক ও তাঁর সচিব হেলেন ডুকাস বেলজিয়ামে এলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ আইনস্টাইনের সব রকমের মতবাদকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন। আইনস্টাইন বেলজিয়ামে এসে সমুদ্রের ধারে লে কক (Le Coq) নামে এক জায়গায় একটি ছোট কুটীর ভাড়া নিলেন। সেখানে বার্লিন থেকে তাঁর সৎমেয়ে মারগৎ এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সেখানে থেকে পালিয়ে আসবার পূর্বে মারগৎ ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কিছু কিছু অংশ লে ককে তাঁর কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মারগতের সেখান থেকে চলে আসবার পরদিনই বার্লিনের পুলিশ আইনস্টাইনের কাপুথের বাড়ির সমস্ত জিনিষপত্র ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে-ছিল এই কারণে যে, এগুলি আইনস্টাইন ফিরে এলে বিক্রী করে অর্থ কম্যুনিস্টদের দেবেন। নাৎসী দল এই মহান বিজ্ঞানীর হস্তলিখিত সব বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কাগজগুলি বার্লিনের 'স্টেট অপেরা হাউসের' সামনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে উল্লাসে নৃত্য করে।

রাণী এলিজাবেথ ও তাঁর সরকার আইনস্টাইনের জীবনরক্ষার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দিনরাত তাঁর বাড়ীতে পাহারাদার থাকত ও তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্যে দেহরক্ষী থাকত। লে ককের সব অধিবাসীদের সরকার থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, কেউ যেন আইনস্টাইনের বাড়ির সন্ধান কাউকে না দেয়।

এল্‌সা সব সময়ই আতঙ্কে থাকতেন এই দুশ্চিন্তায় যে, অ্যালবারতলের

হঠাৎ যেন কোন বিপদ না হয়, হঠাৎ কোন আততায়ী তাঁকে আক্রমণ না করে। এল্‌সা দিনরাত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, কারণ কয়েক দিন মাঝে মাঝে সন্দেহজনক ভাবে অপরিচিত ব্যক্তিদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। একদিন এল্‌সার সঙ্গে দেখা হল হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর (storm trooper) একজন প্রাক্তন সৈনিকের সঙ্গে। লোকটি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে বলল যে, সবাই জানে আইনস্টাইন বিদেশে ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলনের একজন নেতা। সেই জন্যে সে কতকগুলি গোপনীয় দলিলপত্র আইনস্টাইনকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দিতে চায়। এল্‌সা কিছুতেই লোকটির কথাতে রাজী হলেন না। অতঃপর প্রহরী ডাকতে লোকটি দ্রুত চলে যায়।

পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিলিপ ফ্রাঙ্ক বহু জায়গায় আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বিষয়ে একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। ফ্রাঙ্ক লিখেছেন যে, সংবাদ পেয়ে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লে ককে গেলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের বাড়ির সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন হল। অবশেষে হঠাৎ মিসেস আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এল্‌সা ফ্র্যাঙ্ককে তাঁর আতঙ্কের কথা বললেন। আইনস্টাইন বললেন যে, বার্লিন থেকে চলে আসতে তিনি মনের দিক থেকে একটি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। বর্তমান সরকারের নীতিতে তিনি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি আশা করেন যে, এই সরকার বেশী দিন স্থায়ী হবে না।

আন্তনিয়া ভ্যালেন্তিনাও অনেক জায়গায় আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনিও লে ককে এসে আইনস্টাইনের বাড়িতে এলেন। এই সম্বন্ধে কুজনেত্‌সভের বইতে প্রকাশিত একটি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। ভালেন্তিনা লিখছেন যে, আইনস্টাইনের মনে কোনপ্রকার ভয়ের চিহ্ন তিনি দেখতে পান নি। পূর্বের মতই প্রাণখোলা হাসি, কৌতুক করে কথা বলা। ভালেন্তিনা জার্মানিতে প্রকাশিত একটি অ্যালবাম দেখালেন, যাতে ছিল জার্মানির শত্রুদের ফোটো। প্রথম ছবিটিই হল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। ফোটোর পাশে অপরাধের তালিকাতে একটি বিষয় হল আপেক্ষিকতাবাদ, আর ফোটোর নীচে লেখা আছে 'noch ungehangt'—এখনও ফাঁসীতে ঝোলান হয় নি। আইনস্টাইনকে হত্যা করতে পারলে পাঁচ হাজার মুদ্রার

পুরস্কার ঘোষণার কথা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন ব্যঙ্গ করে নিজের মাথায় আঙ্গুল দিয়ে বললেন যে, এই পাকাচুল ভরা মাথাটির জন্যে পাঁচ হাজার মুদ্রা পুরস্কার!

1933 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে প্রিন্সটনের "ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভান্স্‌ড্‌ স্টাডি" নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করবার কাজ পেয়ে আইনস্টাইন সবাইকে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন।

রাজনৈতিক কারণে আইনস্টাইনকে চিরকালের জন্য আমেরিকাতে চলে যেতে হল দেখে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ফরাসী বিজ্ঞানী পল লঁাজভ্যাঁ দুঃখ ও কিছুটা ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন, "ব্যাপারটি হল যেন রোম থেকে পোপের প্রাসাদ নূতন জগতে নিয়ে যাওয়া। পদার্থবিদ্যা জগতের পোপ চলে গেলেন এবং এখন থেকে আমেরিকা হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কেন্দ্র।" তাঁর এই কথা যে কত সত্য হয়েছিল, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন—তাঁরাই তা জানেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রিন্সটন

1

বার্লিনে কাইজার উইল্‌হেলম ইনস্টিট্যুট (Kaiser Wilhelm Institute) স্থাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'জুরিখ ও প্রাগ' পরিচ্ছেদের শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার দ্বারা শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিসাধন করবার জন্যে নিযুক্ত হতেন। এইভাবে সেখানে দ্রুত শিল্পের উন্নতি হচ্ছিল। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারে কোন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হলে সেই প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হত।

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, এইরূপ গবেষণাগারের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতেন অনেক নামকরা বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা।

এই শতাব্দীর বিশের দশকে যখন বিজ্ঞানে নানারূপ নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হতে থাকল, বিশেষ করে য়ুরোপে, যার বেশীর ভাগই হল তত্ত্বমূলক, আমেরিকায় তখন এইরূপ মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন কয়েক জন বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত অনুভব করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক ডঃ ফ্লেক্সনার (Dr. Flexner)। তাঁর ধারণা হল যে, একটি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়তে হবে, যেখানে প্রধান গবেষণার বিষয় হবে উচ্চ গণিতশাস্ত্রভিত্তিক বিজ্ঞান। সেখানে নিযুক্ত হবেন একদল অতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁরা শুধুমাত্র গবেষণায় রত থাকবেন। তাঁরা শিক্ষাদান কিংবা প্রশাসনিক ইত্যাদি অন্য কোন কাজে সময় নষ্ট করবেন না। তাঁরা রত থাকবেন সম্পূর্ণ মৌলিক্ গবেষণার কাজে। এইরূপ বিশিষ্ট গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে তরুণ বিজ্ঞানীরা, যাঁরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে নূতন নূতন জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধতর করে তুলবেন।

যদিও 1929-30 খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অবনতি চলছিল, যা আমেরিকাতেও অনুভূত হয়েছিল, তথাপি ডঃ ফ্লেক্সনার বিদ্যোৎসাহী লুই

ব্যাম্বারজার (Louis Bamberger) ও তাঁর বিধবা বোন মিসেস ফেলিক্স ফল্ডের (Felix Fuld) মত কয়েক জনের সহযোগিতায় বিপুল উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে প্রথমে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের (campus) গণিতশাস্ত্র ভবনে "Fine Hall"-এ তাঁর কল্পনাপ্রসূত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করলেন এবং এটির নাম দিলেন ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাড্‌ভান্স্‌ড স্টাডিজ (Institute for Advanced Studies) অর্থাৎ উন্নত জ্ঞানলাভের প্রতিষ্ঠান। পরে 1940 খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিজের নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হল। এটির দূরত্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধ ঘণ্টার মত হাঁটার পথ।

1930 খ্রীস্টাব্দ থেকে 1933 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আইনস্টাইন বার্লিন থেকে কয়েকবার ক্যালিফোর্নিয়া, পাসাডেনা ইত্যাদি জায়গায় এসেছিলেন, সে কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে। 1932 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে ডঃ ফ্লেক্সনার পাসাডেনার বিশিষ্ট পদার্থবিদ্যাবিদ্ মিলিকানের সঙ্গে প্রিন্সটনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে গিয়েছিলেন। মিলিকান বললেন যে, এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্যে আইনস্টাইনই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, কারণ মিলিকান জানতেন যে, আইনস্টাইন তখন একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের (Unified Field Theory) গাণিতিক রূপ আবিষ্কারের চেষ্টায় রত আছেন। তিনি ফ্লেক্সনারকে পরামর্শ দিলেন আইনস্টাইনের মতামত নিতে, কারণ সৌভাগ্য-বশতঃ আইনস্টাইন তখন ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলেন।

ফ্লেক্সনার প্রথমে আইনস্টাইনের কাছে কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মধুর ব্যবহার ও সহজ প্রাণখোলা কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল।

এর কিছুকাল পরে আইনস্টাইন অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিতে এলে ফ্লেক্সনারও সেই সময় সেখানে ছিলেন। ফ্লেক্সনার এবার আইনস্টাইনকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে এসে কাজ করতে। আইনস্টাইন কতকটা রাজীও হলেন কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, নাৎসীদের যথেচ্ছ অত্যাচারের জন্যে তাঁর আর বেশীদিন বার্লিনে থাকা চলবে না।

1933 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আইনস্টাইন বেলজিয়ামে লে ককে কুটীর ভাড়া

করে বাস করেছিলেন, কারণ প্লাঙ্ক, লাওয়ে প্রমুখ তাঁর শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা তাঁকে বার্লিনে না ফিরতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ফ্লেক্সনার সেই খবর পেয়ে অবিলম্বে তাঁকে প্রিন্সটনে এসে কাজে যোগ দিতে অনুরোধ জানালেন।

আইনস্টাইন এল্‌সা, মারগৎ ও হেলেন ডুকাসকে নিয়ে প্রিন্সটনে চলে এলেন এবং কাজে যোগ দিলেন। এল্‌সার বড় মেয়ে ইল্‌সা তখন প্যারিসে বসবাস করছিলেন।

2

আইনস্টাইনের থাকবার জন্যে প্রথমে একটি অস্থায়ী বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল। পরে তাঁর জন্যে 112নং মারসার স্ট্রীটে (Mercer Street) স্থায়ী বাসগৃহ তৈরী হওয়ায় তিনি সপরিবারে সেখানে উঠে যান এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই বাড়িতে ছিলেন। এই বাড়িটি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

আইনস্টাইনের মূল গবেষণার বিষয় হল একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। এই বিষয়টির কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছুটা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে শেষ অধ্যায়ে। যা হোক, এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে :

পূর্ব কয়েকটি পরিচ্ছেদে আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। তিনি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করলেন। নিউটন তাঁর তত্ত্বে বলেছিলেন যে, বিশ্বে যে-কোন দুটি বস্তু, তারা যেখানে যত দূরেই থাকুক না কেন, পরস্পরকে একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করে ; এই আকর্ষণ হেতুই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তন করছে। আইনস্টাইন তাঁর বিশ্বজনীন বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, বল বা আকর্ষণ বলে কিছু নেই, এই আবর্তন হচ্ছে মহাকাশে সূর্যের অবস্থিতির দরুণ। তার চারিদিকে মহাকাশের কিছু পরিমাণ অংশ নুইয়ে বা বেঁকে, বিকৃত হয়ে একটি এবড়োখেবড়ো ক্ষেত্রের উৎপাদন করেছে, আর সেই ক্ষেত্রের প্রভাবের ভিতরে কোন বস্তু, যেমন একটি গ্রহ থাকলে সেটি ঐ ক্ষেত্রের ভিতরে একটি সহজ পথ ধরে চলতে থাকে এবং সেইটি হল আবর্তনের কক্ষ-পথ। এই বাস্তব সত্যটি 1919 খ্রীস্টাব্দে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বে কোন বস্তু না থাকলে মহাকাশ ও সময় বলে কিছু নেই। আর বস্তুর অস্তিত্বের জন্যই মহাকাশ ও সময়ের অস্তিত্ব। তাও আবার মহাকাশ ও সময় রয়েছে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়—অবিচ্ছিন্ন, অঙ্গাঙ্গী ভাবে। একেই বলা হয় মহাকাশ-সময়-সন্ততি (Space-Time-Continuum)। বস্তুর অস্তিত্বের জন্য এই সন্ততিতে একটি জ্যামিতিক গুণ বর্তায় অর্থাৎ একটি কাঠামোর সৃষ্টি হয়।

আবার আমরা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে জেনেছি যে, কোন বিদ্যুতাধান কোন পথে দোলায়িত হতে থাকলে শূন্যে (void) বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, যেটি তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই বাস্তব সত্যটিও প্রমাণিত হয়েছে, যার ফল হল বেতার যোগাযোগ।

তাহলে দুটি বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে মহাকাশ-সময়-সন্ততির দুটি বিভিন্ন জ্যামিতিক গুণ প্রকাশ পায়। 1816 খ্রীস্টাব্দে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের পর থেকেই তাঁর চিন্তা শুরু হয়েছিল যে, একই সন্ততির কি করে দুটি রূপ হতে পারে। তিনি বলেছেন, মহাকাশের একটি মহাকর্ষীয় ও অপরটি বিদ্যুচ্চৌম্বক—পরস্পরের অনন্যগত এই দুটি গঠন থাকতে পারে—এই কল্পনা তত্ত্বীয় জ্ঞানে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া পারমাণবিক জগতে আরও দুটি ক্ষেত্র আছে। একটি হল পরমাণুর কেন্দ্রীনে ক্ষমতাশালী ক্ষেত্র ও অপরটি হল কেন্দ্রীনের বাইরে একটি দুর্বল ক্ষেত্র।

আইনস্টাইন চেষ্টা করতে লাগলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র—এই দুটি প্রধান ক্ষেত্রকে একীভূত করে একটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করতে এবং পরে পরমাণুর ভিতরের দুটি ক্ষেত্রকেও এক সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করতে। এটাই হল একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব।

আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃতির অসংখ্য লীলার মূলে আছে অল্প কয়েকটি কারণ এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হবে সেই মূল কারণকে আবিষ্কার করা। তিনি বলেছেন, "আসল লক্ষ্য হল যথাসম্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব থেকে যুক্তিপূর্ণ বিচার দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যক অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপারের নিষ্পত্তি সাধন করা।"

এই বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ

করা যাচ্ছে যে, প্রথম ধাপে বিশ্বের অজস্র প্রকার বস্তুর মূল উপাদান দেখা গেল 92টি মৌলিক পদার্থ। এতে বহু সংখ্যাকে কমিয়ে 92টি সংখ্যায় আনা গেল। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই 92টি মৌলিক পদার্থের প্রতিটি ইলেকট্রন ও প্রোটন নামে দুটি (তখন নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় নি) মাত্র মৌলিক কণিকার উপাদানে গঠিত। এই তো গেল বস্তুর বেলা। তারপর বিকীর্ণ শক্তির বেলায় দেখা গেল যে, গামা রশ্মি, এক্সরশ্মি অবলোহিত রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, তাপ ও রেডিও তরঙ্গের সব হল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। অবশেষে বিশ্বের মূল উপাদান এসে দাঁড়াল মাত্র কয়েকটিতে, যথা—মহাকাশ, সময়, বস্তু, শক্তি এবং মহাকর্ষ। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে দেখালেন বস্তুর ও শক্তির তুল্যতা এবং মহাকাশ-সময়-সন্ততির অবিচ্ছিন্নতা। এইভাবে চিন্তা করে 1916 খ্রীস্টাব্দের পর থেকে আইনস্টাইনের প্রচেষ্টা হল চরম সূত্রটি বের করে বিচ্ছিন্ন-ভাবের ব্যাপার-গুলিকে একীভূত করা।

3

প্রিন্সটনের কাজে এক বিষয়ে তিনি বিশেষ খুশী হলেন না। সেটি হল অধ্যাপনার কাজ একেবারে না করা। শুধুমাত্র নিজের গবেষণার কাজে সমস্ত সময় ব্যাপৃত থেকে বেতন নেওয়াকে তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন না। তিনি বিজ্ঞানের গবেষণাকে নিজের অন্তরের বিষয় বলে মনে করতেন। তাঁর সেই অন্তরের প্রিয় বিষয়টি জন্যে অর্থ নিয়ে জীবিকানির্বাহ করাকে তিনি সমীচীন জ্ঞান করতেন না। এই উপলব্ধিটি হয়েছিল স্পিনোজার জীবন দর্শন থেকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন স্পিনোজার ভাবধারায় দীক্ষিত। অত বড় পণ্ডিত স্পিনোজা জীবিকানির্বাহের জন্যে একটি জহুরীর দোকানে হীরে ঘষার কাজ করতেন। প্রথম প্রথম আইনস্টাইন ইচ্ছে করেছিলেন যে, অন্ততঃ অধ্যাপনা করবার সুযোগ যেন তিনি পান, তা হলে বেতন নেওয়াটার জন্যে নিজের বিবেকের কাছে অতটা অপরাধী বলে তাঁর মনে হবে না। পড়ানোর সময়ের অন্তর্বর্তী কালে তিনি গবেষণার কাজে মগ্ন থাকবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাঁকে গবেষণায় রত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা লণ্ডনের উদ্বাস্তু বিজ্ঞানীদের কিভাবে সাহায্য করা যায় ও তাঁদের জন্যে কাজের যোগাড় করা যায়—এই সব আলোচনার জন্যে একটি সভাতে একবার আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ করা হল। তিনি বললেন যে, বিজ্ঞানীদের পক্ষে সমুদ্রের ধারে জাহাজের পথের নিশানা দিবার জন্যে বাতিঘর (lighthouse) আছে, সেখানে কাজ নেওয়াটা বিশেষ উপযুক্ত। এটি কোন পরিহাসের কথা নয়। আইনস্টাইনের কাছে প্রকৃতই মনে হয়েছিল যে, বাতিঘরের নির্জনতা বিজ্ঞানীদের গবেষণার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। আইনস্টাইনের প্রথম চাকরী-জীবনের কথা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবিকার্জনের জন্যে তিনি কেরাণীর চাকরী করতেন বার্নের পেটেণ্ট অফিসে আর সেখানেই তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি আবিষ্কার করেন।

লিওপোল্ড ইনফেল্ড 1936-1938 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের অধীনে গবেষণার কাজ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, সে কথা পূর্বে এক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি 'Quest' নামক আত্মজীবনীতে আইনস্টাইনের বহু বিষয় উল্লেখ করে তাঁর মনের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর বইটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবিকার্জনের জন্যে কাজের বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামত সম্বন্ধে ইনফেল্ড এক জায়গায় লিখেছেন, "তিনি আমাকে অনেক বার বলেছেন যে, তাঁর দৈনিক আহারের খরচ যোগাবার জন্যে নিজের হাতে জুতো তৈরি করার মত কোন কায়িক পরিশ্রম এবং পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজকে তাঁর অন্তরের সখের জিনিস হিসাবে গ্রহণ করাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। পদার্থবিদ্যা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার গবেষণার দ্বারা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করা ঠিক নয়; পদার্থবিদ্যাকে সংসারযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে জীবিকার্জনের জন্যে বাতিঘরে কাজ করা কিংবা জুতো তৈরি করা এইরূপ ধরণের কাজ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।"

4

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ নিয়ে আসবার বহু পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আইনস্টাইনের মনে গভীর বেদনা বোধ হয়েছিল এই দেখে যে,

রাজনৈতিক নেতারা বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে লাগাচ্ছেন। এই বিষয়ে 1920 খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে তাঁর বাড়ীতে একজন তরুণ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের $E=m\times c^2$ সূত্রটিকে ভিত্তি করে পরমাণুর শক্তিকে মুক্ত করে বিশ্বধ্বংসী বোমা বানাবার বিষয়টি উত্থাপন করাতে তাঁর অস্বাভাবিক ক্রোধের কথাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার আবিষ্কারগুলির সাহায্যে মারণাস্ত্র তৈরি করাতে সব রাষ্ট্র ব্যস্ত। এই জন্যে তিনি অনেক দিন ভেবেছেন যে, বিজ্ঞানচিন্তা ছেড়ে দিবেন। প্রকৃত-পক্ষে তাঁর চেষ্টা ও চিন্তার বেশীর ভাগ তিনি প্রয়োগ করেছিলেন মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্যে, কিন্তু বিজ্ঞানের চিন্তা একেবারে ত্যাগ করেন নি বিজ্ঞানের মঙ্গলের দিকটা চিন্তা করে।

আইনস্টাইন প্রিন্সটনে কাজে যোগ দিলে কয়েকজন তরুণ মেধাবী বিজ্ঞানী—কেউ এক বছর, কেউ কম কি বেশী সময়ের জন্যে—তাঁর সহযোগী হিসেবে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। এঁদেরই একজন ছিলেন ইনফেল্ড। ইনফেল্ড লিখছেন, "আমি 1936-1937 খ্রীস্টাব্দে এক বছরের জন্যে স্কলারসিপ পেয়ে আইনস্টাইনের কাছে কাজ করতে আসি। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা এত স্বচ্ছল ছিল না যে, এক বছর আমি প্রিন্সটনে থাকতে পারি। তখন আমি আইনস্টাইনের উপদেশে একটি পদার্থবিদ্যার বই "The Evolution of Physics" লিখি। বইটি লিখবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে অন্তরে গভীর শোক পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি যখনই তাঁর পরামর্শ চেয়েছি, তিনি তা দিয়েছেন। তিনিই বললেন বইটিতে গ্রন্থকার হিসেবে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও দিতে। এতে যথেষ্ট ফললাভ হল। বইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আমার প্রিন্সটনে আরও বেশি দিন থাকতে কোন অসুবিধে হল না।"

5

আইনস্টাইন প্রিন্সটনে এসে প্রথম প্রথম অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা সবাই মেনে নিয়েছেন, কিন্তু কেউই এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি বললেন যে, এই মতবাদের মূল নীতিগুলি দ্বিতীয় বার্ষিকীর পদার্থবিদ্যার প্রকৃত আগ্রহশীল

ছাত্রেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। যদিও ইনস্টিট্যুটের কর্মকর্তারা তাঁকে কোন বক্তৃতা না দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তথাপি তিনি ছাত্রদেরকে বলেছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর মতবাদ কিংবা পদার্থবিদ্যা ও গণিতের যে-কোন বিষয় বুঝতে চায়, বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে আসতে পারে সমস্যাটি বুঝে নিতে। তিনি আরও বললেন যে, সে সময়ে যদি তিনি নিজের গবেষণার কাজে মগ্ন থাকেন, তা হলেও তারা কোন সঙ্কোচ না করে তাঁর কাছে আসতে পারে, কেননা তিনি অনায়াসে নিজের কাজের চিন্তা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে ছাত্রদের সমস্যাগুলি বুঝিয়ে আবার নিজের চিন্তায় ফিরে যেতে পারেন।

প্রতিদিন সকাল বেলায় বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে তিনি ইনস্টিট্যুটের ঘরটিতে যেতেন। প্রথমে সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের গবেষণার কাজের সমস্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তারপর নিজের পাঠ-কক্ষে গিয়ে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের চিন্তায় মগ্ন হতেন।

কিন্তু প্রতিদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব জায়গার লোকদের কাছ থেকে উপদেশ, সাহায্য, প্রবন্ধাদি চেয়ে নানারূপ অনুরোধ আসত। এই সব ব্যক্তিরা হয়ত স্বয়ং আসতেন; আর না হয়তো চিঠিতে অনুরোধ জানাত। এখানে বলা যেতে পারে যে, লোকেরা বুঝুক বা নাই বুঝুক, এই তত্ত্বের যাথার্থ্য আইনস্টাইন যে ভাবে বলেছিলেন—সেই ভাবে নৈসর্গিক ঘটনাতে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন, এটি পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে রূপ-কথার মত মনে হয়েছিল। তারপর যখন সবাই এই মানুষটির শান্তিবাদ, সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি দরদ, নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ইত্যাদি সব শুনতেন, তখন এই মানুষটিকে মনে হত রূপকথার মানুষ। আর সেই মানুষটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে আসাতে বেশীর ভাগ মার্কিনবাসীই উৎফুল্ল ও গর্বিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, রূপকথার এই মানুষটি তাঁদেরই একজন হয়ে তাঁদের দেশবাসী হলেন।

বৃটিশ কলাম্বিয়ার বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীর মনোভাবের সঙ্গে জনসাধারণের মনোভাবের বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। ছাত্রীটি আইনস্টাইনকে একটি চিঠিতে লিখেছিল, "I am writing to you to find out whether you really exist (প্রকৃতই আপনার অস্তিত্ব আছে কিনা, এইটি জানবার জন্যে

আমি আপনাকে এই চিঠিটি লিখছি), অর্থাৎ মেয়েটি আইনস্টাইনের বিষয়ে এত শুনেছে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে কোন রক্তমাংসের মানুষ যে এরূপ হতে পারে, তার সেই সন্দেহ নিরসনের জন্যেই যে চিঠিটি লিখেছিল।

প্রিন্সটনে আইনস্টাইনকে কেন্দ্র করে চারপাশের পরিবেশ প্রকৃতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠল। একদিকে প্রতিদিন স্থানীয় লোকেরা দেখত যে, আইনস্টাইন লম্বা ছায়াঢাকা পথ দিয়ে ইনস্টিট্যুটে যাচ্ছেন, আবার বাড়ি ফিরছেন। আইনস্টাইন প্রায়ই কফি-হাউসে যেতেন। সেখানকার মালিক ও খদ্দেরদের সঙ্গে তিনি অতি সহজভাবে মিশতেন। সবার দেখে দেখে জানা হয়ে গিয়েছিল আইনস্টাইনের অভ্যাস, তিনি কি খেতে ভালবাসেন। প্রতি দিনের জীবনযাপনের দিক থেকে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অপর দিকে জনসাধারণের কাছে তিনি যেন ছিলেন বিংশ শতাব্দীর রূপকথার মানুষ। শুধু তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে জানত স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরা, ছোট ছোট বালক-বালিকারা আর সেই ভাবে জানত সাধারণ স্তরের লোকেরা, যেমন ধোপা, নাপিত, চৌকিদার ইত্যাদি। এই সব অল্পবিত্ত সাধারণ লোকেদের প্রতিদিনকার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি বেহালা নিয়ে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই তাঁর ভালবাসার স্বাদ পেয়ে প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

আইনস্টাইনের বাড়ির কাছেই একটি বাড়িতে একজন বিধবা মহিলা থাকতেন। তাঁর সাত-আট বছরের একটি চঞ্চলা প্রকৃতির মেয়ে ছিল। মেয়েটি একটি বিদ্যালেয়ে পড়ত। ভদ্রমহিলা একদিন লক্ষ্য করলেন যে. মেয়েটি বিদ্যালয় থেকে এসে বিকেলের দিকে মাঝেমাঝে কোথায় যেন যায়। মেয়েকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেলেন না। পরের বার যখন মেয়েটি বাড়ি থেকে চলে গেল, তিনি চুপ করে পিছে পিছে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর মেয়ে আইনস্টাইনের বাড়ির বাগানের দরজা খুলে ভিতরে গেল। তার হাতে ছিল একটি খাতা। তিনি কৌতূহলী হয়ে ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে, আইনস্টাইনকে মেয়েটি খাতা ও পকেট থেকে কি যেন দিল। তিনি খুবই সন্ত্রস্তা হলেন এই ভেবে যে, এই বিরাট মনীষীকে বিরক্ত করতে আসে তাঁর মেয়ে। তিনি গিয়ে

মেয়েকে ধমকালেন ও আইনস্টাইনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। আইনস্টাইন হো হো করে হেসে বললেন, "ও তো আমার বন্ধু, আমাকে রোজ চকোলেট খাওয়ায়, প্রতিদানে আমি ওর বিদ্যালয়ের অঙ্কগুলি কষে দেই। এই দেখুন আমাকে কতগুলি চকোলেট দিয়েছে, আর এই যে খাতায় ওর অঙ্ক। আমার তো খুব মজা লাগে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না আর আমার বন্ধুকে বকাবকি করবেন না।" এর থেকে বোঝা যায় তাঁর শিশুসুলভ স্বভাবের জন্যে, শিশুদের জন্যে তাঁর আন্তরিক ভালবাসা শিশুরা বুঝতে পেরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যেত। শুধু প্রিন্সটনেই নয়, তিনি মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে যেতেন সমুদ্রে স্নান ও বালুর তীরে শুয়ে রৌদ্রসেবন করবার জন্যে। সেখানেও জেলেদের অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাঁর বন্ধু ছিল। সেখানে কেউ তাঁর খোঁজে গেলে, তিনি কোন্ গৃহে অতিথি হয়ে আছেন জানতে চেষ্টা করলে বয়স্কেরা যদি সন্ধান দিতে না পারতেন, তবে যে কোন ছোট ছেলে-মেয়ে বের করে দিত তিনি কোথায় আছেন।

এখন জনসাধারণের কাছ থেকে অনুরোধের বিষয়টিতে ফিরে আসা যাক। মজা এই যে, আইনস্টাইন যতই নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকবার বাসনা পোষণ করতেন, ততই অন্যান্য নামকরা বিজ্ঞানীদের দর্শনপ্রার্থীদের চেয়ে তাঁকে প্রতিদিন অনেক বেশী সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতে হত, তাদের সংস্পর্শে আসতে হত। এটি যে কেবলমাত্র বাইরের অবস্থাগতিকে হয়েছিল, তা নয়, এটিই ছিল আইনস্টাইনের বিশেষত্ব, তাঁর স্বভাব, কিংবা বলা যেতে পারে তাঁর জগৎকে দেখবার দৃষ্টিকোণ। ফলে প্রার্থীরা নিরাশ হতেন না। তাঁরা যা চাইতেন, তাই পেতেন।

এই বিষয়ে ইনফেল্ড লিখছেন, "যদিও কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও পদার্থবিদ্যা আইনস্টাইনের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তিনি বুঝতেন যে, কোন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থীকে তাঁর সাহায্যদান করা খুবই প্রয়োজনীয় এবং সেটি ফলপ্রসূ হবে, সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি সাহায্যদানে কখনও অস্বীকৃত হতেন না। তিনি হাজার হাজার সুপারিশ-পত্র লিখেছেন, শত শত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরামর্শ দান করেছেন। একবার একটি খামখেয়ালী ও খেপাটে গোছের লোকের অভিভাবক আইনস্টাইনকে অনুরোধ জানালেন যে, ঐ লোকটি খেপামী দূর করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে একমাত্র তাঁরই

উপদেশ কার্যকর হবে। সেজন্যে দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাঁর সব কাজ ফেলে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন।

ইনফেল্ড আরও লিখছেন, "দয়ালু, সহানুভূতিশীল, মুখে সদা সুন্দর মৃদু হাসি, সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাওয়া এবং নিজের কাজে ফিরে যেতে একাকী হবার সুযোগের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা—এই হল আইনস্টাইনের চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণ।"

আইনস্টাইনের একাকী হবার বাসনা এই থেকে নয় যে, তাঁর মন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের জন্য উন্মুখ হতে থাকত। এই উপলব্ধি আরও গভীর। তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ নিবন্ধ 'জগৎকে আমি যেমন দেখি" এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমি প্রকৃতই একজন নিঃসঙ্গ পথিক এবং কখনও সর্বান্তঃকরণে নিজেকে আমার দেশের কি আমার গৃহের মানুষ বলে মনে করতে পারি নি, আমার বন্ধুদের, এমন কি আমার নিজের নিকটতম পরিবারবর্গের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি নি, এই সব বন্ধন থেকে আমি কখনও নিজেকে দূরে রাখবার কিংবা নির্জনে থাকবার বাসনাকে হারাই নি—এই অনুভূতি আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

একদিকে একজন একক চিন্তাশীল নির্জনতা অন্বেষণকারী এবং অপরদিকে সমাজের ন্যায়বিচারের জন্যে অত্যুৎসাহী সমর্থক; একদিকে সরল, খোলা মন ও কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অকৃত্রিম আনন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং অপরদিকে নিজের অন্তরের জগতে একাকী থাকবার উদগ্র বাসনা—এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের সুসমন্বয় হয়েছিল আইনস্টাইনের চরিত্রে।

6

প্রিন্সটনে আসবার কিছুকাল পরেই তিনি কয়েকজনের মৃত্যুতে অন্তরে খুবই বেদনা বোধ করেছিলেন। প্রথম হল 1933 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পল এহ্‌রেনফেস্টের আত্মহত্যা। স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েক মাস পূর্বে বেলজিয়ামে লে ককে আসবার পূর্বে তিনি এই বন্ধুর গৃহে দিন কয়েক ছিলেন এবং সেখান থেকেই মার্চ মাসের শেষের দিকে বার্লিনের প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমির সদস্যপদ ত্যাগ করে পত্র দিয়েছিলেন। সেই হল দুই বন্ধুর শেষ দেখা। যদিও আত্মহত্যার কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে এর নিগূঢ়

কারণ মনে হয়েছিল তাঁর বন্ধুর জীবনের শেষ কয়েক বছরে মনের শোচনীয় অসন্তোষ। আইনস্টাইন এই মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন যে, উচ্চগুণ বিশিষ্ট মনীষীরা প্রায়ই এইরূপভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করবেন, এর কারণ হল পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে নূতন ও জটিলতর জীবনধারাকে মেনে নিতে অপারগ হওয়া। নূতন ভাবধারাকে মেনে নিতে না পারলে যে অসহনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার থেকে মুক্তির জন্যে এইভাবে মৃত্যুবরণকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। আইনস্টাইন মনে করেন যে, এটিই হল এহ্‌রেনফেস্টের আত্মহত্যার মূল কারণ। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "একজন বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান সময় সময় জটিল ও বিরোধীভাবের যুক্তি উপস্থিত করে, যে যুক্তি কোন মতেই মেনে নিতে মন চায় না, অথচ কিভাবে যে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে পথও খুঁজে পাওয়া যায় না। গত কয়েক বছরে পদার্থবিদ্যায় এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কেউ যদি চান প্রতিটি বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ পরিষ্কার উত্তর, তাঁকে যদি যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে মন বিশ্বাস করতে চায় না, সেই বিষয় শিখতে ও পড়াতে হয়, তবে অন্তরে সংঘাত আসবেই এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে এই সংঘাতকে মেনে নেওয়া কষ্টকর।"

আইনস্টাইনের নিজের জীবনেও এই সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল। একবার সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যুক্তিপূর্ণ গাণিতিক রূপ দিতে গিয়ে। এই সমস্যাকে তিনি বলেছেন "mathematical tormentation" বা "গাণিতিক যন্ত্রণা।" যা হোক, 1916 খ্রীস্টাব্দে তিনি সেই সমস্যার সুসমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু বিশের দশক থেকে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ সমাধান কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তা ছাড়া কণা-বলবিদ্যার নূতন ভাবধারা গভীর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এহ্‌রেনফেস্টের মানসিক গঠনের মত পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের বিজ্ঞানীরা যেমন সমস্যার সম্বন্ধে দুঃখবাদভাব পোষণ করে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হন, আইনস্টাইন তাঁর আশাবাদী মনে বিশ্বের ঘটনাবলীতে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য ও কার্যকারণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন এবং এই বিশ্বাস জীবনের শেষ ত্রিশ বছরেও অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিথিল হয় নি বলে অন্তর্দ্বন্দ্বকে সহ্য করতে পেরেছিলেন। তিনি এই দীর্ঘকাল সময় প্রাণপণে নিঃসঙ্গভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন বিশ্বাসের

সত্যকে গাণিতিক রূপে প্রকাশ করতে; কখনও মনে হয়েছে হয়তো সমাধান খুঁজে পেয়েছেন আবার কিছু পরেই মনে হয়েছে সদুত্তর পান নি, কিন্তু নিরাশ হন নি। মৃত্যুকালে এই আশাই পোষণ করে গিয়েছেন যে,তাঁর আশা ব্যর্থ হবে না, ভবিষ্যতে কোন বিজ্ঞানী যুক্তিপূর্ণ উপায়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

আইনস্টাইনের বাইরের শান্ত মূর্তি দেখে কখনও মনে হত না যে, তাঁর চিত্তে চিন্তার ঝড় বইছে। অন্তরের গভীর চিন্তার ছাপ বাইরে প্রকাশ পেত না। বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনপথে নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছেন, নিজের মনোমত সঙ্গী যে দু-একজন ছিলেন ক্রমশঃ একে একে বিদায় নিচ্ছেন, এবং অন্যান্য সহকর্মী ও তরুণ বিজ্ঞানীদের বিবেচনায় তাঁর পথ ভুল এবং এই পথে কোন সিদ্ধিলাভ করা যাবে না।

আইনস্টাইনের মনোমত সঙ্গী আর একজন চিরবিদায় নিলেন 1934 খ্রীস্টাব্দের 4ঠা জুলাই। তিনি মাদাম ক্যুরী। মাদাম ক্যুরীর মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আইনস্টাইন লিখলেন—যার থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল—"তাঁর শক্তি, তাঁর পবিত্র সঙ্কল্প, তাঁর কঠোর আত্মসংযম, তাঁর বাস্তবতা, সততায় অটল তাঁর সিদ্ধান্ত—একজন মানুষের ভিতরে এত গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সমাজের সেবিকা বলে মনে করতেন এবং তাঁর প্রগাঢ় বিনয়ে বোঝা যেত যে, তাঁর মধ্যে বিন্দু-মাত্র আত্মপ্রসাদের ভাব নেই। সমাজে অসমতা, পক্ষপাতজনিত অন্যায় স্থায়ীভাবে প্রচলিত থাকার জন্যে তিনি অন্তরে দুঃখ বোধ করতেন।"

আইনস্টাইন মর্মান্তিক শোক পেলেন এল্‌সার মৃত্যুতে, যে এল্‌সা তাঁর শৈশবে ও কৈশরের বোন রূপে খেলার সঙ্গিনী ছিলেন এবং প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রীরূপে জীবনসঙ্গিনী থাকাকালে তাঁকে অসীম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সেবাযত্ন করেছেন, প্রখর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে আগলে রেখে একাধিকবার চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রিন্সটনে আসবার অল্প কিছুকাল পরে ইল্‌সা মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত খবর পেয়েই এল্‌সা মারগৎকে নিয়ে প্যারিসে চলে যান। বড় মেয়ের মৃত্যু স্নেহময়ী মা এল্‌সাকে কঠিন আঘাত হানল। তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর ও জীর্ণাশীর্ণা হয়ে হঠাৎ যেন খুবই বৃদ্ধা ও স্থবিরা

হয়ে গেলেন। একটি পাত্রে মেয়ের দেহভস্মাবশেষ নিয়ে তিনি মারগতের সঙ্গে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রিন্সটনে ফিরে এলেন।

এই সময় আইনস্টাইনের জন্যে 112 নং মারসার স্ট্রীটে স্থায়ী বাড়ি তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এল্‌সা সেই গৃহের আভ্যন্তরিক সজ্জা ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজাবার তদারক করতেন, কিন্তু তাঁর মেয়ের মৃত্যুতে শোকজনিত আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারলেন না। তিনি কঠিন হৃদরোগে ও মূত্রাশয়ের রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এল্‌সার কঠিন রোগহেতু আইনস্টাইন অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করলেন। তিনি বুঝলেন যে, এল্‌সার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে। বাইরের ব্যবহারে আইনস্টাইনের শোক বেশী বোঝা না গেলেও, সবাই বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তরের ব্যথা, যার ছাপ তাঁর দেহে ও মুখে পড়েছিল। তিনি শীর্ণকায় হয়ে গেলেন।

এল্‌সা তাঁর স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে ব্যথিতা ও কিছুটা বিস্মিতা হলেন, কিন্তু তাঁর করবার আর কিছুই ছিল না। সেই সময়ে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখলেন, "আমি কখনও জানতে পারতুম না যে, আমি তাঁর কাছে এতখানি এবং এখন এটি জানতে পেরে আমি খুবই সুখী।"

এতে এল্‌সার স্ত্রী-চরিত্রের একটা দিক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অযাচিতভাবে কোন দিন কোন কিছুর প্রতিদান না চেয়ে স্বামীর মঙ্গলের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর স্বামীর মনে বিজ্ঞান সব মানুষের কল্যাণের চিন্তা কত গভীর। কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির স্থান জীবনপথে নিঃসঙ্গ যাত্রী তাঁর স্বামীর হৃদয়ে নেই– এই ছিল এল্‌সার বদ্ধমূল ধারণা। আইনস্টাইনের কথাবার্তায়, তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধে এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে বারে বারে। সেজন্য এল্‌সা মরণের মুখে এসে আইনস্টাইনের মনে তাঁর জন্যে ভালবাসা যে কত গভীর ছিল, তাই উপলব্ধি করে বিস্মিতা হলেন। মেয়েদের স্বভাবধর্মই হল যে, তাঁরা চান স্বামীর ভালবাসার বহিঃ-প্রকাশ। অন্তরের ভাব মেয়েরা সহজে বুঝতে পারে না। স্ত্রী যখন বুঝতে পারেন তার স্বামীর মনের অপ্রকাশিত অকৃত্রিম গভীর ভালবাসা, তখন অন্তরে আনন্দের অনুভূতি আসবেই ও নিজেকে সুখী মনে হবেই।

1934 খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আইনস্টাইন ক্যানাডার মন্ট্রিয়ালে (Montreal) একটি হ্রদের তীরে একটি সুন্দর বাড়ি ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে

গেলেন যদি বায়ু পরিবর্তনে এল্‌সার কিছু উপকার হয়। বিকেলে রোজ এল্‌সাকে নিয়ে তিনি নৌকায় (yacht) হ্রদের জলে বেড়াতেন। এল্‌সার সেখানে খুব ভাল লাগল। হ্রদের তীরে সুন্দর বাড়ি, চারপাশে বন, নৌকায় বেড়ানো। সবচেয়ে ভাল লাগল যে, এতদিনে তাঁর আলবারতলের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এল্‌সা এই কঠিন রোগ থেকে আর সেরে উঠতে পারলে না, 1936 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হল।

ইনফেল্ড তাঁর বইতে লিখেছেন, "এল্‌সা 112 নং মারসার স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর ঘরে কঠিন রোগে শয্যায় শায়িতা। নীচের তলাটি একটি ছোটখাট হাসপাতাল হয়েছে। আইনস্টাইন উপর তাঁর পাঠ-কক্ষে কাজকর্ম, লেখাপড়া করেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জনের আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় তিনি গভীরভাবে শোকাভিভূত, কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণার কাজ সমান আগ্রহেই করে যাচ্ছেন। এল্‌সার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি ইনস্টিট্যুটের কাজে যোগ দিলেন এবং সমস্ত ক্ষেত্রকে একীকরণের সূত্রান্বেষণে মনোনিবেশ করলেন।"

আইনস্টাইনের জীবন পূর্বের মত চলতে লাগল। শুধু এল্‌সা আর তাঁর প্রতিদিনকার জীবনে নেই। এল্‌সার অভাব অপূরণীয়। সবাই বুঝলেন মনে তিনি কিরূপ আঘাত পেয়েছেন।

প্রতিদিন সবাই দেখত সকাল বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পাশে নানা-রূপ ফল গাছের ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়ে শোকাভিভূত ও চিন্তামগ্ন অতি পরিচিত মানুষটি চলেছেন ইনস্টিট্যুটে। একবার এল্‌সা বলেছিলেন, "আমরা সবাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লে যাই কারণ আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ, আমাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পাওয়া, না-পাওয়া ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি না, কিন্তু আলবারতল শৈশব অবস্থায় যেমনটি ছিল, এখন পূর্ণবয়সেও ঠিক তেমনটি আছে। আমার চোখে কোন পরিবর্তন দেখি না।" কিন্তু এল্‌সা বুঝতে পারলেন না যে, তাঁকে হারিয়ে সেই আলবারতলের মনের দিক দিয়ে কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে, আরও নিজেকে কিরূপ নিঃসঙ্গ বোধ করছেন।

7

এল্‌সা-বিহীন 112 নং মারসার স্ট্রীটেব বাড়িটিতে আইনস্টাইন তাঁর সৎ-মেয়ে মারগৎ ও সচিব হেলেন ডুকাসকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। মারগৎ

তাঁর মার মৃত্যুর পর সৎ-বাবার সেবাযত্নের সব ভার নিলেন। হেলেন ডুকাসও তাঁকে এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। আর ছিল আইনস্টাইনের আদরের টেরিয়ার কুকুর চিকো (Chico)। মাঝে মাঝেই দেখা যেত যে, মনিব রাস্তায় হেঁটে চলেছেন আর চিকো সঙ্গে চলেছে আগে পিছনে ছুটাছুটি করে।

মারসার স্ট্রিটের এই দোতালা বাড়িটি অন্যান্য অধ্যাপকদের বাড়ির মত একই ধরণের, একটির থেকে আর একটির তফাৎ বোঝা যায় না। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত গৃহকর্তাটির জন্যে প্রিন্সটনের 112 নং মারসার স্ট্রিটের বাড়িটিও পৃথিবীর সব শিক্ষিত মহলের কাছে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর সব দেশ থেকে বহু গুণিজন এসেছেন এই বাড়িতে, তাছাড়াও এসেছেন নানা ধরণের অগণিত মানুষ, বেশীর ভাগই হল সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফার। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এই বাড়িটিকে চাক্ষুষ দেখেন নি, কিন্তু এর ফোটো দেখেছেন।

বাড়িটির দরজা পর্যন্ত রাস্তাটির দু-ধারে কাঁটা ঝোপের বেড়া। বাঁ-দিকে একটি কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতালা পর্যন্ত। সিঁড়িটির বরাবর পাশ দিয়ে দেয়াল সবুজ ভুট্টা গাছ দিয়ে সাজানো।

দোতালায় আইনস্টাইনের পাঠ-কক্ষটির জানালার নীচেই সামনে দেখা যায় একটি সুন্দর বাগান। বাগানে এখানে সেখানে আছে নীচে ছায়াকরা কিছু বড় বড় গাছ ঘন ডালপালা ও পাতায় ভর্তি। জানালাটি প্রবেশ দ্বারের উল্টোদিকের দেয়ালে প্রায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাঁ-দিকে ও পিছনের দেয়ালে বইয়ের তাক। জানালায় বাঁ-দিকে ছোট একটি বিশেষ জায়গায় গান্ধীজীর একটি ফোটো। ঘরের ডান দিকের দেয়ালে একটি দরজা ছাদে যাবার জন্যে এবং আর একটি দরজা আইনস্টাইনের শোবার ঘরে যাবার জন্যে। এই দেয়ালে আছে বিখ্যাত চিত্রকর জোসেফ শার্লের আঁকা কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি আর আছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েলের ফোটো।

জানালার কাছে লেখাপড়া করবার জন্যে বড় আকারের একটি ডেস্ক বা টেবিল আর তার পাশে একটি ছোট টেবিলে আছে কতকগুলি পাইপ এবং একটি অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র-বিশেষ, যাকে বলা হয় বুমেরাং (boomerang)।

ঘরে প্রবেশ করবার দরজার কাছে একটি ছোট আকারের গোল টেবিল এবং পাশে একটি আরাম কেদারা। আইনস্টাইনের অভ্যাস ছিল যে, বেশীর ভাগ সময় এটিতে বসে তাঁর হাঁটুর উপরে কাগজ রেখে তাঁর চিন্তায় যা আসত লিখতেন এবং লিখিত কাগজগুলি চারপাশে ছড়িয়ে ফেলতেন।

কিছু পূর্বেই বলেছি যে, প্রায়ই পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রতিদিন এই বাড়ীতে অনেক দর্শনপ্রার্থী আসতেন। 1949 খ্রীস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহ্‌রু প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। তিনি তাঁর মেয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বোন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে নিয়ে 112 নং মারসার স্ট্রীটের বাড়ীতে যান আইনস্টাইনকে শ্রদ্ধা জানাতে। জবাহরলাল নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, উচ্চচিন্তাশীল পণ্ডিত, ঘোর যুক্তিবাদী, ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরে (personal god) ও তথাকথিত প্রচলিত ধর্মে আস্থাহীন, ধর্মের কুসংস্কারের ও সমাজের অবাঞ্ছিত প্রথার বিরোধী। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক। আইনস্টাইনের মতবাদ ছিল একই প্রকার। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। সেজন্যে জবাহরলাল আইনস্টাইনকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। জবাহরলাল পাঠ-কক্ষে যে চেয়ারে বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন, তার ডান দিকের দেয়ালে আছে একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের আঁকা মাঝারি আকারের আইনস্টাইনের প্রতিকৃতি।

1955 খ্রীস্টাব্দে 18ই এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যু হলে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে জবাহরলাল বললেন, "Dr. Einstein was a beacon of light in a world when shadows darkened"—"ছায়ায় ঢেকে যখন পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসত, ডঃ আইনস্টাইন ছিলেন তখন আলোর সঙ্কেতের মত।"

আইনস্টাইন ও জবাহরলালের ধর্মের নামে কুসংস্কারের বিরুদ্ধ মনোভাব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই জনের উইল থেকেও তাঁদের চিন্তাধারার মিল দেখা যায়।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর দিন তাঁর উইল পড়া হল। তিনি প্রথমেই অনুরোধ জানিয়েছেন, "আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যেন কোনরূপ ধর্মীয় আচার বা সরকারী ভাবে কোন অনুষ্ঠান পালন না করা হয়। শুধুমাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া অন্যান্য সবার নিকট থেকে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ও

স্থান গোপন রাখতে হবে।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর দেহ দাহ করার পর চিতাভস্ম নদীতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

জবাহরলালের উইলের প্রথম অনুচ্ছেদটি হল—"আমি আন্তরিকভাবে জানাচ্ছি যে, আমি চাই না যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্যে কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। আমি এই প্রকার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না এবং এমনকি শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্যে এগুলি করলে তা হবে ভণ্ডামী ও আমাদেরকে ও অন্যান্য সবাইকে প্রতারিত করা।" তিনিও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মৃত দেহ দাহ করবার পর চিতাভস্ম গঙ্গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

জবাহরলালকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে আইনস্টাইন খুবই খুশী হয়েছিলেন, গান্ধীজী ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ মানুষ। ভারতের মানুষকে তিনি যে পছন্দ করতেন, সে কথা 'বার্লিন' পরিচ্ছেদে আচার্য নিখিলচন্দ্র সেনের বক্তৃতার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই গান্ধীজীর ভারত 1947 খ্রীস্টাব্দের 15ই অগাস্ট বৃটিশ শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। তারপর কয়েক মাস না যেতেই 1948 খ্রীস্টাব্দের 30শে জানুয়ারী গান্ধীজী নিজের দেশের ও নিজের ধর্মের একজনের গুলিতে নিহত হলেন। স্বাধীন ভারতের প্রিয় নেতা ও গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য জবাহরলালের সঙ্গে আইনস্টাইনের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হল। এছাড়া একই মতবাদের দুই চিন্তাশীল মনীষীর ভিতরে অন্যান্য কিছু কিছু বিষয়েও আলাপ হয়।

8

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রিন্সটনে এসে আইনস্টাইন স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ জনসাধারণ আনন্দিত হয়েছিলেন। সাধারণ স্তরের মানুষদের মনের ভাব একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্মানির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়ার অধিবাসী জোসেফ শার্ল্ (Joseph Scharl) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তাঁর আঁকা কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিত্র আইনস্টাইনের পাঠকক্ষের দেয়ালে শোভাবর্ধন করত। শার্ল্ জাতিতে ইহুদী ছিলেন বলে হিটলার তাঁকে একটি নাৎসী কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। 1938 খ্রীস্টাব্দে শার্ল্ বন্দীশালা থেকে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে চলে যান। সেখানে একদিন সাধারণ স্তরের একজন

অর্ধশিক্ষিত বুড়ো মানুষের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনাকালে আইনস্টাইনের কথা উঠলে বুড়ো মানুষটি আইনস্টাইনের উচ্চপ্রশংসা করতে লাগলেন। তখন শার্ল্ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি কিছুই জানেন না, তবে তাঁকে এত প্রশংসা করছেন কেন?" বুড়ো মানুষটি উত্তর দিলেন, "আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ এবং আমার আপনজন বলতে তেমন কেউ নেই। কিন্তু যখনই আমি অধ্যাপক আইনস্টাইনের কথা স্মরণ করি, তখনি নিজেকে আর একা বলে মনে হয় না।"

আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস করাতে বেশীর ভাগ জনসাধারণ যেমন খুশী হয়েছিলেন, তেমনি কিছু কিছু অধিবাসী আবার অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন এবং আইনস্টাইন যে স্থায়ীভাবে এসে আমেরিকাতে বসবাস করেন—তাঁরা তা চাইছিলেন না। এই সব অধিবাসীরা দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী হল ঘোর কম্যুনিজম আতঙ্কগ্রস্ত, আর অপর শ্রেণী হল ধর্মযাজকেরা।

কম্যুনিস্ট বিরোধী অধিবাসিগণের ধারণায় ছিল যে, আইনস্টাইন একজন কম্যুনিস্ট এবং এইরূপ প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর সাম্যবাদ নীতির প্রভাবে গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এইরূপ অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় মহিলা সমিতি নামে একটি সমিতির সদস্যরা।

তাঁদের দেশে এসে আইনস্টাইনের বসবাস করা তো দূরের কথা, তাঁর বার্লিন থেকে ঘন ঘন তাঁদের দেশে আসাটা এই মহিলারা খুব সুনজরে দেখেন নি। তিনি যখন 1932 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে তৃতীয় বার বার্লিন থেকে প্যাসাডেনা যাবার জন্যে প্রস্তুত, সে সময়ে একটি ঘটনায় তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে কয়েকবার ভ্রমণের সময় তাঁর পাসপোর্ট এবং ভিসা সংক্রান্ত প্রচলিত রীতিগুলি বার্লিনস্থ মার্কিন দূতাবাসের লোকেরাই করে দিতেন, এর জন্য তাঁকে আর কষ্ট করে সেই দপ্তরে যেতে হত না। কিন্তু এইবার রাষ্ট্রদূত কোন কাজে বার্লিনের বাইরে থাকায় কাগজপত্রগুলি একজন কর্মচারীর হাতে এল। তিনি আইনস্টাইনকে রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর আমেরিকা যাবার উদ্দেশ্য কি ও তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কি—এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে আইনস্টাইন অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন যে, পাসপোর্ট ও ভিসা পেতে হলে যদি ঐ সব অবান্তর প্রশ্নের উত্তর

তাঁকে দিতে হয়, তবে তিনি যাওয়া বন্ধ করবেন। এই বলে তিনি দূতাবাসের দপ্তর ছেড়ে চলে গেলেন। বার্লিনের দূতাবাসে এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি গোলমালের সৃষ্টি হল। সমস্ত রাত ধরে বার্লিন ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তা চলল। অবশেষে পরদিন সকালে একজন বিশেষ পত্র-বাহককে দিয়ে আইনস্টাইনের পাসপোর্ট তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পরে জানা গেল যে, আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দূতাবাসের ঐ কর্মচারীর বিশেষ ধারণা ছিল না এবং তাঁর ঐরূপ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আইন-স্টাইনকে ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্নাদি করার মূল কারণ হল বার্লিন দূতাবাসে প্রাপ্ত একটি চিঠির প্রতিলিপি। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববর্ণিত মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছে সেখানকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। তাতে সদস্যেরা আইনস্টাইনের যুক্তরাষ্ট্রে যাবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হল যে, আইনস্টাইন শান্তিবাদী ও কম্যুনিস্ট বলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। আইনস্টাইনের মত মনীষীর বিরুদ্ধে ঐ সব মহিলাদের এই অশিষ্ট আচরণ প্রকাশিত হওয়া মাত্র সেখানে একটি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হল এবং একদিনের ভিতরেই আইনস্টাইন আমেরিকা থেকে অজস্র টেলিগ্রাম পেলেন তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে যে, ঐ কর্মচারীটির নির্বুদ্ধিতাকে ও মহিলা সমিতির চিঠিকে কোন প্রকার গুরুত্ব না দিতে। এল্‌সাও আইনস্টাইনকে সেইভাবে বললেন, নতুবা কর্মচারীটির হয়তো চাকরী যেত।

আইনস্টাইন শেষে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন ও নির্ধারিত দিনে যাত্রা করলেন। কিন্তু যাবার আগে তিনি ঐ দেশপ্রেমিকা মহিলা সমিতিকে একটু ব্যঙ্গের সুরে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যের ঘটনা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে লিখলেন, "মহিলাদের পক্ষ থেকে সমস্ত অগ্রগতিকে অত্যুৎসাহে বর্জন করতে দেখার অভিজ্ঞতা আমার এর পূর্বে হয় নি ; অথবা যদিও বা কিছু হয়ে থাকে, তবে কখনও অধিক সংখ্যকের কাছ থেকে নয়।

"কিন্তু এই সব সতর্কভাবে প্রহরারতা নাগরিকারা কি ঠিক কাজ করেছেন না ? পুরাকালে যেমন ক্ষুধার্ত ক্রীটের মিনোটার (Cretan Minotaur) তৃপ্তি সহকারে কামুক গ্রীক মেয়েদের খেয়ে ফেলেছিল, সেইরূপ ক্ষুধার জ্বালায় তৃপ্তির সঙ্গে যে লোক কড়াপাকে সিদ্ধ পুঁজিপতিদের খায়, এরূপ লোককে কেন তাঁরা সাদরে অভ্যর্থনা করে নেবেন—তাঁর উপর যখন নিজের স্ত্রীর

সঙ্গে অপরিহার্য কলহ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধ পরিহার করবার নীচ মনোবৃত্তি এই লোকটির আছে ? সুতরাং আপনাদের এই সব বুদ্ধিমতী ও দেশপ্রেমিকা মহিলাদের সুনজরে দেখবেন এবং স্মরণ রাখবেন যে, একবার বিশ্বস্ত রাজহংসীদের প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনিতে প্রবল পরাক্রান্ত রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী রক্ষা পেয়েছিল ।"

প্রিন্সটনে এসে মাঝে মাঝেই তিনি ভেবে অবাক হতেন যে, কি করে এ দেশে রটে গেল যে, তিনি কম্যুনিস্ট। কয়েক বছর পরে একবার ইনস্টিটুটের একটি অনুষ্ঠানে সেই মহিলা সমিতির একজন সদস্যার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হওয়ায় তিনি তাঁর নিকট এই বিষয়টি উত্থাপন করেন।

মহিলাটি বললেন, "আপনি 1933 খ্রীস্টাব্দে লিবারেল আর্ট কলেজে একটি বক্তৃতাতে বলেছিলেন যে,বিজ্ঞানে পরম সত্য বলে কিছুনেই, যার থেকে বোঝা যায় যে, দর্শন, রাজনীতিতে কিংবা ধর্মেও পরম সত্য বলে কিছু নেই।"

আইনস্টাইন স্বীকার করে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে যে, আমি ঐরূপ কিছু একটা বলেছিলুম। কিন্তু দয়া করে আরও বলে যান, কারণ আমি বুঝতে অপারগ যে, এর থেকে আপনি কি ধারণা করেন ?"

মহিলাটি ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি তার পরে বললেন যে, আপনার মতে শিক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি সেরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত নয় বলে রাশিয়ার গ্রাম্য কৃষকদের পক্ষে স্বাধীন কর্ম প্রচেষ্টার (free enterprise) রীতির চেয়ে পিতৃসুলভ মনোভাবাপন্ন (paternal) কল্যাণকর সরকারের আদেশানুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা অধিকতর মঙ্গলদায়ক। সংক্ষেপ আপনার মতে রাশিয়াতে কম্যুনিজমের মানে এক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রচলিত রাষ্ট্রে কম্যুনিজমের মানে ভিন্ন।"

এই শুনে আইনস্টাইন কৌতূহলী হয়ে কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "মাদাম, এতেও কি আপনি এখনও মনে করেন যে, এটি কম্যুনিস্টদের পক্ষালম্বন করে বলা হয়েছে ?"

মহিলাটি কিছু বলতে গেলে আইনস্টাইন তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, "মাদাম, আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বলেছি যে আমি, আমার সৎ মেয়ে মারগৎ ও আমার সচিব হেলেন ডুকাস অল্প কিছুদিন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নাগরিক হবার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে সম্মানিত বলে মনে করছি। আমরা এখানকার সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কিছু একটা চক্রান্ত করছি, সে দুশ্চিন্তা ছেড়ে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি বিষয়—এমন কি কোন একটি বিষয় সংক্রান্ত মতও আপেক্ষিক। কিন্তু"—এই বলে তিনি নিকটে সরে এসে ভয়ে চমকিয়ে যাওয়া মহিলাটিকে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, "আমাদের প্রিন্সটনে বসবাস করবার বিষয়টি সম্বন্ধে বলছি যে, আমাদের এখানে খুব ভাল লেগেছে।"

9

ধর্মযাজকরা শুনেছিলেন যে, আইনস্টাইন নাস্তিক, ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাস করেন না। সেইজন্যে তাঁরা তাঁকে লিখলেন, "আপনি কি ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাস করেন?"

আইনস্টাইন উত্তরে লিখলেন, "বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের রূপ ও গুণধারী এবং আমাদের প্রার্থনা শুনতে পান কিংবা আমাদের ক্ষতি করতে পারেন, এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, এবং তথাকথিত প্রচলিত ধর্মেও আমার বিশ্বাস নেই। স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।"

এই স্পিনোজার ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে পূর্বেও কয়েক বার উল্লেখ করা হয়েছে। আইনস্টাইন প্রায়ই বলতেন, "ঈশ্বর এটি করতে পারেন না" কিংবা "ঈশ্বর পাশা খেলেন না"—এগুলি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর বলতে সব সময়ে তিনি মনে করেছেন প্রকৃতির ঘটনার বাস্তব সত্যতা, যে সত্যতা হল সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণতার ও অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।

বেশীর ভাগ লোকেরই, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, বিশ্বাস যে, মানুষের রূপধারী ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এই বিশ্বের তারকা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়পর্বত, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জন্তুজানোয়ার, মানুষ সব তাঁরই সৃষ্টি, তিনি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে বিশ্বকে চালাচ্ছেন। কিন্তু বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয়েছে এই বিশ্বের সৃষ্টির কারণ; বিশ্বের বহু বস্তুর কারণ আজ বিজ্ঞানীদের জানা; প্রায় দু-শ' কোটি বছর পূর্বে কি করে পৃথিবীতে প্রকৃতির নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীর সৃষ্টি হল, তা জানা গেছে, তার পরে ক্রমবিকাশে প্রথম প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে মানুষের সৃষ্টি—ডারউইনের

এই মতবাদ আজ সর্বজনবিদিত, যদিও এই সব বৈজ্ঞানিক মতবাদ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কারণের সঙ্গে মেলে না। প্রকৃতিতে আছে অসীম শক্তি, যার প্রকাশ হচ্ছে এই সব ঘটনার সৃষ্টিতে এবং প্রতিটির সঠিক কারণ জানতে সচেষ্ট আছেন বিজ্ঞানীরা। তাই আইনস্টাইন বলেছেন, "বোধাতীত বিশ্বে অতি উচ্চস্তরের যুক্তিগ্রাহ্য শক্তির অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসই হল আমার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা।"

তাঁর ধর্মের ধারণা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "যে অসীম উচ্চতর শক্তির প্রকাশিত লীলার অতি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, তার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ে ও নম্র প্রশংসায় অভিভূত হওয়াই আমার ধর্ম।"

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত সেবকই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ধার্মিক, কারণ বিশ্বের রহস্যে অভিভূত হওয়া থেকেই ধর্মের অভিজ্ঞতা আসে এবং এটি হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

আইনস্টাইন যত জায়গায় গিয়েছেন, সর্বত্রই লোকেদের প্রশ্ন ছিল—বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্বন্ধ কি ? অন্য কোন বিজ্ঞানী এই প্রশ্নের এতবার সম্মুখীন হন নি। আইনস্টাইন 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' (Science and Religion) বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই সব লেখা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল।

আইনস্টাইন লিখেছেন, "মানবজাতি যে কোন কাজ করেছে কিংবা যে কোন বিষয়ে চিন্তা করেছে, তা নিজেদের প্রয়োজনবোধে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ও দুঃখবেদনা উপশম করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সৃষ্টির মূল অনুভূতি ও ইচ্ছাই হল প্রধান বিষয়।

"তা হলে দেখা যাক ব্যাপক অর্থে কিসের বোধ ও অভাব মানুষকে ধর্মীয় চিন্তায় ও বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করল। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, ধর্মীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টির কারণ বহু প্রকারের আবেগ বা অনুভূতি। এই কারণগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

"মনুষ্যজাতির প্রথম যুগে অর্থাৎ আদিম মানুষের মনে ধর্মের চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে সর্বোপরি ভয় থেকে—ক্ষুধা, বন্য জন্তু, রোগ, মৃত্যু, প্রচণ্ড ঝড়, প্রবল বৃষ্টি, প্লাবন, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এই সব ভয়ই মানুষের মনে উদ্রেক করেছে ধর্মীয় চিন্তা। সেই যুগে মানুষের মস্তিষ্ক অনুন্নত থাকায় এইসব ভীতি উদ্রেককারী বিষয়গুলির কারণ বুঝতে পারত না বলে

মানুষ মনে মনে নিজের মূর্তির অনুরূপ কতকগুলির কল্পিত সত্তার সৃষ্টি করল এবং ধারণা করল যে, এই সব সত্তার ইচ্ছার ও কাজের উপর ভয় উদ্রেককারী বিষয়গুলি নির্ভর করে। এই সত্তাগুলিই হল তাদের কাছে নানাপ্রকার দেবতা। তারা নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করে এবং ত্যাগ ও বলিদানের আয়োজন করে এই দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করত। এই সব আচার অনুষ্ঠান, বলিদান ইত্যাদি ধর্ম বলে প্রচলিত হল এবং বংশ-পরম্পরায় এগুলি মানুষের সমাজে চলে এল। এই হল ভয় থেকে উদ্ভূত ধর্ম। সাধারণ মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্যে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এই পুরোহিতরা হয়ে উঠলেন সমাজের নেতা। তাঁরা ধর্মগ্রন্থ লিখে ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুষ্ঠানের আচরণবিধি লিপিবদ্ধ করলেন ও সমাজে নানারূপ প্রথার সৃষ্টি করলেন।

"সামাজিক আবেগগুলি হল সমাজে ধর্মের মূল দৃঢ় করবার দ্বিতীয় কারণ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বশ্রেণীর মানুষ কোন না কোন অবস্থায় নিজেদেরকে অসহায় মনে করে। তাদের বাবা, মাতা নেতৃস্থানীয় লোকেরা মরণশীল কিংবা ভ্রমপ্রবণ। সেজন্য ঠিক পথে চলতে সাহায্যের জন্যে, ভালবাসার জন্যে, আপদবিপদে রক্ষার জন্যে মানুষ ঈশ্বরের সামাজিক বা নৈতিক ধারণার সৃষ্টি করল। এই হল সকল তত্ত্বাবধানের ঈশ্বর। এই সব মানুষের মতে ঈশ্বর রক্ষা করেন, মীমাংসা করেন, পুরস্কৃত করেন, শাস্তি প্রদান করেন, দুঃখের সময়ে শান্তি প্রদান করেন, বিশ্বের সব সৃষ্টি করেছেন ও করছেন এবং সব ঘটনা ঘটাচ্ছেন। মানুষ ভাবে যে, প্রার্থনা করলে ঈশ্বর খুশী হয়ে সবমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। ঈশ্বর মৃত্যুর পরে আত্মাকে রক্ষা করেন। স্বর্গ ও নরকের ধারণার সৃষ্টি হল। ধর্মযাজকেরা বলেন যে, ধর্মের অনুশাসন না মানলে নরকে যেতে হবে। মৃত্যুর ভয় সবচেয়ে বড় ভয়; মৃত্যুর পরে কি হবে, এই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বিষয়টি ভেবে অধিকাংশ মানুষ অসহায় বোধ করে ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করতে চায়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি ঘোরতর অন্যায় ও অত্যাচার করছে, আবার ঘটা করে গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে ভাবছে, তাদের সব পাপস্খলন হয়ে যাবে।

"আদিম যুগের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ভয়ভিত্তিক এবং সভ্য মানুষদের ধর্মগুলির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত প্রধানতঃ নৈতিক নীতির উপর। এই সব ধর্মীয় কুসংস্কারের

বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই দুই প্রকার ধর্মেই ঈশ্বরের ধারণা হল ব্যক্তিরূপী (anthropomorphic), অর্থাৎ ঈশ্বর হল মানুষের আকারধারী ও মানুষের গুণসম্পন্ন। সাধারণতঃ শুধুমাত্র যে সব ব্যক্তি অতি অসাধারণ গুণসম্পন্ন, যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত এবং যে সব সম্প্রদায়ের মানুষরা শিক্ষায়, ব্যবহারে ও মনের দিক থেকে অনেক উন্নত ও উদার, তাঁরাই ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা থেকে মুক্ত হন।

"তৃতীয় প্রকার ধর্মের অনুভূতি উদ্ভূত হয় বিশ্বের সৃষ্টিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে। কিন্তু যেহেতু এই ধর্মের অনুভূতিতে ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপের ধারণা নেই, সেহেতু যাঁরা এই বৈজ্ঞানিক চিন্তার থেকে দূরে থাকেন, তাঁদেরকে এই ধর্মের ব্যাখ্যা বোঝানো অত্যন্ত কঠিন। তা হলে কি প্রকারে এই ধর্মীয় অনুভূতি লোককে বোঝানো যাবে? আমার মতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব-চেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল এই অনুভূতিকে জাগ্রত করা এবং যাঁরা এই অনুভূতিগ্রাহী, তাঁদের চিত্তে একে সজীব রাখা।

"যে মানুষ বুঝতে পেরেছেন বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রকৃত কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং এই সব সিদ্ধান্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তিনি কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, একটি অলীক সত্তা এই সব ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাঁর উপরিউক্ত প্রথম দুই প্রকার ধর্মের, অর্থাৎ ভয়হেতু ধর্মের ও সামাজিক কি নৈতিক ধর্মের জন্যে কোন প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর পুরস্কার কিংবা শাস্তি দিতে পারেন, এটি তাঁর কাছে ধারণাতীত এই সহজ কারণের জন্যে যে, কোন মানুষ যে সব কাজ করে—সেগুলি করে তার বাইরের ও অন্তরের প্রয়োজনের তাগিদে, সেইজন্যে ঈশ্বরের চোখে ঐ মানুষটি তার কৃত কাজের জন্যে দায়ী হতে পারে না, যেমন দায়ী নয় একটি বল প্রয়োগে কোন জড় পদার্থ এক প্রকার গতির কাজ সম্পন্ন করলে। যাঁরা যুক্তি দিয়ে দেখবেন, তাঁদের কাছে ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপী ধারণার বিরুদ্ধে আর একটি কারণ হল এই যে, যদি এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন, তবে প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্খাও সেই ঈশ্বরের কাজ, অর্থাৎ ঈশ্বর যেভাবে করাচ্ছেন, প্রতিটি মানুষ তাই করছে। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তা হলে ঈশ্বর কি করে কোন মানুষকে তার কাজ কিংবা চিন্তার জন্যে দায়ী করতে পারেন? মানুষ কাজের বিচার করার অর্থ হল ঈশ্বরের নিজের

কাজের বিচার করা। তাহলে যখন বলা হয় যে, কোন মানুষকে তার কৃত কর্মের জন্যে ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন, তার মানে ঈশ্বর নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন। সেটি কি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয়?

"বিজ্ঞান ও ধর্মের ভিতরে সে অসঙ্গতি বা সজ্ঘাত প্রচলিত আছে, তার প্রধান কারণ হল—বিশ্বে যে অসীম শক্তি বিদ্যমান, যা কেউ অস্বীকার করবে না, তাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা। ধর্মীয় নেতারা বা ধর্মযাজকেরা যে বিজ্ঞানসেবীদের প্রতি অত্যাচার করেছেন ও সর্বদাই বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

"মানুষের নৈতিক ব্যবহারের সার্থক ভিত্তি হওয়া উচিত অপরের প্রতি সহানুভূতি, শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ; কোন ধর্মের ভিত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষকে যদি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে মৃত্যুর পরে শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং পুরস্কারের আশা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে মানুষ সত্যই দুর্ভাগা।"

10

আমরা সবাই বিদ্যালয়ে পড়েছি—"Man is a social animal", অর্থাৎ মানুষ একটি সামাজিক জীব। এই বিষয়ে আইনস্টাইন কতকগুলি প্রবন্ধ লিখে সমাজের সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ, সমাজের প্রতি প্রতিটি মানুষের কি কর্তব্য ইত্যাদি সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তা থেকে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হল।

তিনি লিখেছেন; "প্রতিটি মানুষের একই সময় দুইটি সত্তা বিদ্যমান, একটি একক সত্তা ও একটি সামাজিক সত্তা। একক বা ব্যক্তিগত সত্তা হিসেবে সে চেষ্টা করে নিজের ও তার নিকটতম সবার অস্তিত্বকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে, তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে এবং তার সহজাত ক্ষমতাবলীকে উন্নত করতে। আর সামাজিক সত্তা হিসেবে সে চেষ্টা করে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও অন্যান্য সবার স্বীকৃতি ও প্রীতি লাভ করতে, তাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে এবং তাদের কল্যাণ করতে। কিন্তু একজন মানুষ এই দুটি কর্তব্যের সুসমন্বয় করতে

পেরেছে কিনা, তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর :—সে কিরূপ পরিবেশে শৈশব থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে, যে সমাজে সে বড় হয়ে উঠেছে তার গঠনপ্রণালী কি প্রকার, এবং সেই সমাজের ঐতিহ্য কিরূপ। কোন মানুষের কাছে বিমূর্ত ধারণার 'সমাজ' মানে হল তার সমসাময়িক সবার সঙ্গে ও বিগত কালের লোকেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্বন্ধের সমষ্টি। কোন একজন একক মানুষ নিজস্ব গুণানুযায়ী চিন্তা করতে, অনুভব করতে, চেষ্টা করতে ও কাজ করতে সক্ষম; কিন্তু তাকে বৃহত্তর সমাজের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করতে হয়—সে যে খাদ্য গ্রহণ করছে, তা অপরের দ্বারা উৎপন্ন, যে পোষাক পরেছে, তা অপরে তৈরি করেছে, যে গৃহে বাস করছে, তা অপরে নির্মাণ করেছে এবং যে যন্ত্রে কাজ করছে, তাও অপরের সৃষ্ট। সে যে বিদ্যাশিক্ষা করেছে বা জ্ঞানলাভ করেছে, তা অপরের শিক্ষাদানে, এবং যে ভাষাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ভাষাও অপরের দ্বারা সৃষ্ট; অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে তার জীবনধারণ সম্ভবপর হচ্ছে ক্ষুদ্র শব্দ "সমাজ"-এর অন্তর্গত বর্তমানের ও অতীতের বহু মানুষের অধ্যবসায়ের, চেষ্টার ও জ্ঞানের ফল হিসাবে।"

আইনস্টাইন নিজের বিষয়ে বলেছেন, "আমি প্রতিদিন শত শতবার নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে, আমার অন্তর ও বাহির দুটি জীবনই নির্ভর করে জীবিত ও মৃত বহু মানুষের শ্রমের উপর এবং আমাকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে যে, আমি যতটা পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি, ঠিক ততটা পরিমাণেই আমাকেও অপরকে দিতে হবে। আমি অতি সহজ জীবনযাপন করতে চেষ্টা করি এবং প্রায়ই আমি মনে বেদনা পাই এই অনুভূতিতে যে, আমি অন্যের শ্রমলব্ধ ফলের কিছুটা অংশ অপ্রয়োজনীয় ভাবে আত্মসাৎ করছি।"

আইনস্টাইন পুঁজিবাদী সমাজের (capitalist society) বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রবাদের (socialism) পক্ষপাতী ছিলেন। পুঁজিবাদী সমাজে দ্রব্যাদির উৎপাদন থাকে পুঁজিপতিদের হাতে অর্থাৎ এগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ও ভোগের অধিকার ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত বা রাষ্ট্রগত। তিনি তাঁর প্রবন্ধ "কেন সমাজতন্ত্রবাদ?"-এর এক জায়গায় লিখেছেন, "পুঁজিবাদী সমাজের

অর্থনৈতিক অরাজকতা বর্তমান কালে যেভাবে বিদ্যমান, আমার মতে সেটিই হল যত অনিষ্টের মূল।”

এর কতকগুলি কারণ হিসাবে তিনি লিখেছেন, “আমরা দেখতে পাই উৎপাদকদের একটি বড় সম্প্রদায়কে; যার সদস্যেরা পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্যে সদাই চেষ্টা করছে—এই চেষ্টা কোন বলপ্রয়োগের দ্বারা নয়, কিন্তু মোটের উপর আইনসম্মত উপায়েই। সমস্ত প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ বেসরকারী পুঁজিপতিদের হাতে। ফলে দেশের অর্থ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে জমা হয়। এর ব্যবহার উপযুক্ত রূপে হয় না, এমন কি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক সমাজের দ্বারাও নয়। এটি সম্ভব হয় এইজন্যে যে, বিধানসভার সদস্যেরা যে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা মনোনীত হয়, সেগুলি পুঁজিপতিদের থেকে হয় যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য পায়, আর নয়তো অন্য কোন উপায়ে প্রভাবিত হয়। এই পুঁজিপতিরা নিজেদের সর্বপ্রকার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে যথাসম্ভবভাবে নির্বাচক মণ্ডলীদেরকে আইনপ্রণয়নকারী পরিষদ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। এর ফলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে কম সুবিধাপ্রাপ্ত (underprivileged) জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না। তার উপর বর্তমান অবস্থায়, সংবাদপত্র, রেডিও, শিক্ষার বিষয় নির্বাচন ইত্যাদির মূল উৎসগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেসরকারী পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আর এইজন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একজন স্বতন্ত্র নাগরিকের পক্ষে তাঁর রাজনৈতিক অধিকারকে বিচক্ষণভাবে চিন্তা করে প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

“তারপর কলকারখানাগুলিতে ‘কর্মীরা’ কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোন স্বত্ব পায় না—যদিও এই না পাওয়াটা ‘কর্মী’ শব্দটির প্রথাগত ব্যবহারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কারখানার মালিকেরা কর্মীদের কাজ করবার ক্ষমতাকে ক্রয় করবার সুযোগ পায়। কর্মীরা কারখানাতে যন্ত্রের দ্বারা বা অন্য সব উপায়ে যে সব নূতন নূতন মাল উৎপাদন করছে, সেগুলি সব মালিকদের সম্পত্তি। এই পদ্ধতির সবচেয়ে আবশ্যকীয় বিষয়টি হওয়া উচিত প্রকৃত মূল্যের দিক দিয়ে বিচার করে দেখা যে, কোন কর্মী যা উৎপন্ন করছে ও সে এর জন্যে যা বেতন পাচ্ছে, এই দুটির ভিতরে একটি ভাল সম্বন্ধ। কিন্তু

বর্তমান ব্যবস্থায় শ্রমের চুক্তিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই (labour contract "free")। এর ফলে একজন কর্মী তার দ্বারা উৎপন্ন মালের প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে মানানসই ভাবে বেতন পায় না, কিন্তু পায় ঐ কাজের জন্যে প্রতিযোগী কর্মীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে মালিকেরা যা বন্দোবস্ত করে।

"তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতিতে যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তার বৈশিষ্ট্য হল দুটি প্রধান বিষয়। প্রথমতঃ, উৎপন্ন মাল সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মালিকেরা এই সব মালের ব্যবস্থা নিজেদের ইচ্ছামত করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের চুক্তিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য বর্তমানে কর্মীরা দীর্ঘকালব্যাপী বহু ক্লেশ সহ্য করে রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা মালিকদের কাছ থেকে তাদের দাবীর কিছুটা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে শ্রমচুক্তির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

"মাল উৎপন্ন হচ্ছে লাভের জন্যে, ব্যবহারের জন্যে নয়। এরূপ কোন ব্যবস্থা নেই যে, যারা কাজ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক, তারা সবাই কাজ পাবে। ফলে সব সময়েই বহু বেকার লোক থাকে। যে-কোন কর্মী সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকে যে, সে যে-কোন সময় কাজ হারাতে পারে।

"পুঁজিবাদের সবচেয়ে অনিষ্টকর ফল হল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দেওয়া। আমাদের সব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই অমঙ্গল বর্তমান। বেশীর ভাগ ছাত্রের মনে একটি তীব্র প্রতিযোগিতার ভাব জন্মায় এবং তাদের শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হল—কি করে প্রতিযোগিতায় সিদ্ধি লাভ করে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করা যায়। এরা হল সব careerist বা নিজেদের জীবনে উন্নতি করে সুখে ও সম্মানে থাকতে চায়। এদের মন হয় সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। সমাজের দশজনের কথা এদের মনেও আসে না।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সব মহা অনিষ্টকে দূর করবার একমাত্র পথ হল দেশে বা সমাজে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতি, যা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হবে। এইরূপ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সব ব্যবস্থাগুলি, যেমন কলকারখানা হবে সমাজের সম্পত্তি এবং এগুলি ব্যবহৃত হবে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে। একটি সুপরিকল্পিত অর্থনীতি, যা দেশের বা সমাজের

জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী মাল উৎপন্ন করবে, সমস্ত সক্ষম ও কাজে ইচ্ছুক মানুষের ভিতরে ঐ কাজ বন্টন করবে এবং প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর জীবিকানির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শিক্ষার বিষয় এমন হবে যে, প্রতিটি ছাত্র তার সহজাত গুণাবলী উন্নত করা ছাড়াও, সমাজে শুধু নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা না করে, সমাজের অপর পাঁচজনের দায়িত্ব গ্রহণ করার বোধকে বিকশিত করতে পারে।''

11

1939 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের বোন মায়া ও তাঁর স্বামী ইতালির ফ্লোরেন্স শহর থেকে প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের কাছে চলে এলেন। তাঁরা ফ্লোরেন্সে ফ্যাসিস্ত শাসনাধীনে আর থাকতে পারলেন না। মায়ার স্বামী কিছুদিনের জন্যে সুইৎসারল্যাণ্ডে গেলেন। ভাই ও বোনের চেহারায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রিন্সটনের সবার নজরে পড়ল।

প্রিন্সটনে এসে কয়েক বছর পার মায়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, ধীরে ধীরে তাঁর জীবনশক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। 1947 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর বন্ধু সোলোভিনকে লিখলেন, "বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় আমার বোন ভালই আছে, কিন্তু সে তার জীবনপথের শেষ প্রান্তে প্রায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না।''

এর পরের চিঠিগুলিতে আইনস্টাইন জানালেন মায়ার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতির কথা। তিনি বেশীর ভাগ সময়েই বোনের শয্যাপাশে বসে তাঁদের প্রিয় লেখক গ্যেটে (Goethe), শীলার (Schiller) প্রমুখের বই ও অন্যান্য নানাপ্রকার বই পড়ে শোনাতেন। 1951 খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মায়ার মৃত্যু হল।

1947 খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে আইনস্টাইনের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বন্ধু পল লাঁজভ্যাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমমতের বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন এবং সোলোভিনকে লিখলেন, "লাঁজভ্যাঁ আমার একজন অতি পরম বন্ধু, একজন খাঁটি সাধু প্রকৃতির মানুষ ও অতি উচ্চগুণসম্পন্ন ছিলেন।"

এইভাবে আইনস্টাইনের জীবনের প্রায় সকল বন্ধন খসে পড়ল। 112নং

মারসার স্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে রইলেন শুধু মারগৎ ও হেলেন ডুকাস। বিজ্ঞানে সমমতের বন্ধু আর কেউ রইলেন না। অন্যান্য সমকালীন বয়ঃকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা কণা-বলবিদ্যায় বিশ্বাসী বলে তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কণা-বলবিদ্যার অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার জন্যে বিজ্ঞানের সত্যের স্পষ্ট ও সুসামঞ্জস্য ছবিদেখা যাচ্ছিল না বলে আইনস্টাইন যদিও এই সব বিজ্ঞানীদের কাজকে কোনদিন অবহেলা করেন নি, কিন্তু বরাবর কঠিন সমালোচনা করে বলেছেন যে, এঁরা এখনও প্রকৃত সত্যকে জানতে পারছেন না। তিনি আরও গভীরভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের গাণিতিক রূপ বের করবার জন্যে।

যদিও তিনি এই গবেষণার কাজ সফল করে যেতে পারলেন না, কিন্তু এই শতাব্দীর বিশের দশক থেকে মানুষ যা জানতে চেয়েছিল, সেই বিষয়টিকে আইনস্টাইন তাঁর প্রিন্সটনের সমস্ত কাজের ভিতর দিয়ে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন ঃ আইনস্টাইনের উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রকার নরত্বারোপমূলক ধারণা ও অতীন্দ্রিয়বাদমুক্ত বিশ্বের যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব ছবির প্রতিষ্ঠা—প্রকৃতিতে যুক্তির রাজত্ব আবিষ্কার করা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও প্রলয়ঙ্কর পরমাণু বোমা

1. পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশ

1945 খ্রীস্টাব্দের 6ই আগস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সাংঘাতিক দিন বলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন ভোরবেলায় দুটি মার্কিন বি-29 বোমারু বিমান জাপানের হিরোশিমা শহরে 550 মিটার উপরে এসে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি হল শহরটির সমস্ত জায়গা আলোকে ঝসৃসিয়ে কোন উজ্জ্বলতম মধ্যদিনের আলোর চেয়ে বহুগুণ বেশী উজ্জ্বলতর একটি অতি প্রকাণ্ড অত্যুজ্জ্বল ও চোখ অন্ধকার করে দেবার মত আলোর ঝলক, বহু সময় ধরে চলতে থাকা তীব্র কর্ণবিদারক শব্দ, সমস্ত শহরটিকে আলোড়িত করে তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া একটি অচিন্তনীয় প্রবলতম ঝঞ্ঝা এবং একটি অতি দ্রুত বেগে বেড়ে ওঠা আগুনের গোলা, যা পরিণত হল যেন একটি কালো ধোঁয়ার স্তম্ভের উপর অবলম্বিত বিরাট আকারের ছত্রাকের মত ঘন মেঘে এবং যার থেকে অসাধারণ মাত্রায় তীব্র তাপ সমস্ত শহরটিকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করল ; ফলে শহরটির বেশীর ভাগ জায়গায় জনপ্রাণী, ঘরবাড়ি কিছুরই আর অস্তিত্ব রইল না। এটি হল পরমাণু বোমা (atom bomb)। এই ছোট বোমাটির ধ্বংসাত্মক শক্তি 20,000 টন টি. এন. টি. (T. N. T.) বোমার ধ্বংসের শক্তির সমান। টি. এন. টি. বোমা হল যুদ্ধে ব্যবহৃত উচ্চ বিস্ফোরক শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক বোমা।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি মার্কিন রেডিও ঘোষণা করল ঐ দিন বিকালের দিকে। অনুরূপ ঘটনাসম্বলিত জরুরি তারবার্তা পেলেন পরদিন টোকিওস্থ জাপানী সেনাবাহিনীর সহকারী প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিরোশিমার প্রায় 10 মাইল দূরে অবস্থিত সেনাশিবির থেকে। এই তারবার্তায় পরমাণু বোমা বলে কিছুর উল্লেখ ছিল না, উল্লেখ ছিল শুধু একটি নূতন ধরনের বোমার, কারণ জাপানীরা তখন পরমাণু বোমা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

রেডিওর ঐ খবর শুনে স্তম্ভিত ও আত্মগ্লানিতে মর্মাহত হলেন ইংল্যাণ্ডের একটি বন্দী শিবিরে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ অটো হান (Otto Hahn), যিনি সর্বপ্রথম 1938 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে নিউট্রন দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শৃঙ্খল-বিক্রিয়ায় (chain reaction) ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজন (nuclear fission) ঘটিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিহিত শক্তির মুক্তিসাধন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বিজ্ঞান জগতে স্বীকৃতিস্বরূপ 1944 খ্রীস্টাব্দের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন এজন্যে যে, যে প্রচণ্ড ধ্বংসকারী পরমাণু বোমা হাজার হাজার মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করল, সেই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র বিজ্ঞানীরা অবশেষে তৈরী করলেন তাঁরই গবেষণালব্ধ ফলের সাহায্যে। আর বিমূঢ় হলেন সেই বন্দীশিবিরেই লাওয়ে, হাইজেনবার্গ প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট জার্মান পদার্থবিদ্যাবিদ্, যাঁদের প্রায় সবাই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা সত্য সত্যই পরমাণু বোমা বানাতে সক্ষম হয়েছেন, কারণ যদিও অটো হানের গবেষণার ফল এই বোমা প্রস্তুতির মূল কারণ, তথাপি তাঁদের অভিজ্ঞতাতে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আরও অনেক কিছু প্রক্রিয়ার প্রয়োজন এই মারাত্মক বোমা বানাতে। 1945 খ্রীস্টাব্দের 1লা মে হিটলার আত্মহত্যা করলে 7ই মে জার্মানি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবার পর এই সব বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ইংল্যাণ্ডের কোন এক স্থানে সসম্মানে রাখা হয়েছিল—তাঁদের কাছ থেকে জানবার জন্যে—তাঁরা পরমাণু বোমা বানাতে কতটা সাফল্য লাভ করেছিলেন, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তারা জানতে পেরেছিলেন যে, এই সব বিজ্ঞানী পরমাণু বোমা তৈরির কাজে নিযুক্ত।

পরমাণু বোমা তৈরি করা যে সম্ভব, তা বিশ্বাস করে যেতে পারেন নি 1937 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড, যিনি 1911 খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীন আবিষ্কার করেন এবং 1919 খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি মৌলিক পদার্থকে ভিন্ন একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। তিনি একটি স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় (spontaneously radioactive) পদার্থ থেকে নির্গত (আলোর বেগের তুলনীয়) অতি দ্রুতবেগসম্পন্ন আলফা কণিকার

দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এইভাবে আঘাত-কারী কণিকাকে অতি দ্রুত বেগসম্পন্ন করিয়ে হয়তো পরমাণুর কেন্দ্রীনকে রূপান্তরিত (transmutation) করা যাবে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পারমাণবিক শক্তিকে মুক্তি দেওয়া যাবে না।

আর ভাবতে পারেন নি আইনস্টাইন যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে কেবলমাত্র তত্ত্বীয় জ্ঞান হিসাবে যে অনুসিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা কোনদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবার মত সাংঘাতিক মারণাস্ত্র তৈরি করতে প্রযুক্ত হবে। সেই অনুসিদ্ধান্তটির কথা পূর্বে কয়েক বার বলা হয়েছে। সেটি হল ভর আর শক্তির তুল্যতা (equivalence of mass and energy)। তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছিল যে, আলোর বেগই সর্বোচ্চ। কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের কাছকাছি হতে গেলেই বস্তুটির ভর অসম্ভব রকম বেড়ে প্রায় অনন্ত হবে বলে বস্তুটির বেগ আলোর বেগের সমান হতেই পারবে না। এই ভর বৃদ্ধির কারণ হল—গতিশক্তি ভরে রূপান্তরিত হয়। ভর ও শক্তির তুল্যতা তিনি প্রকাশ করলেন একটি অতি সহজ ও ছোট সূত্র দিয়ে, যা এখন পৃথিবীতে সর্বজনবিদিত। সেটি হল $E=mc^2$, অর্থাৎ কোন বস্তুর ভর m-কে আলোর বেগ c-এর বর্গ দিয়ে গুণ করলে তার তুল্য শক্তির ধারণা পাওয়া যায়। আইনস্টাইন কোনদিন চিন্তা করেন নি যে, তাঁর এই ধারণাটি বিজ্ঞানীদেরকে অনুপ্রাণিত করবে—একে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে। এমন কি তিনি সেরূপ খবরই রাখতেন না যে, কোন কোন বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটিয়ে শক্তিকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন। 6ই অগাস্ট হিরোশিমার উপর এবং 7ই অগাস্ট নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর পর এবং জাপানী বিজ্ঞানীরা স্বীকার করাতে যে, সেগুলি সত্যই পরমাণু বোমা, 10ই অগাস্ট জাপান সরকার শান্তি স্থাপনে রাজী হলেন এবং 2রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু অধিবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। প্রিন্সটনের বহু নাগরিক আইনস্টাইনকে 'যুদ্ধের বীর' (Hero of the war) বলে অভিনন্দিত করতে এলে তিনি

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন যে, অগণিত মানুষের হত্যাকারী পরমাণু বোমার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হওয়াতে তিনি দুঃখিত এবং বললেন, "এতে আমার অংশগ্রহণ নিতান্তই পরোক্ষভাবে। প্রকৃতপক্ষে আমি কল্পনাই করতে পারি নি যে, আমার জীবিতকালেই পারমাণবিক শক্তির মুক্তি সাধন সম্ভবপর হবে। আমি শুধু বিশ্বাস করেছিলাম যে, এই মুক্তিসাধন তত্ত্বীয় হিসাবে সম্ভবপর। এটি সম্ভবপর হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারমাণবিক শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার আকস্মিক আবিষ্কারে এবং এটি এমন কিছু সাধারণ বিষয় নয়, যা আমি আগে থেকে বলে দিতে পারতাম।"

1945 খ্রীস্টাব্দের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি দিকে পারমাণবিক শক্তির মুক্তিসাধন সম্ভবপর হলে বিজ্ঞান জগতে, শিল্পে, মানুষের চিন্তাধারায় বিপুল পরিবর্তন এল। সেজন্যে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের, তাঁর বিজ্ঞান জানা থাকুক বা নাই থাকুক, এই বিষয়টির কিছুটা ধারণা থাকা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে সহজ ও সংক্ষেপে এর ইতিহাস বর্ণনা করা হল।

মানব সভ্যতার সূত্রপাত থেকে এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভাগ পর্যন্ত শিল্পে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে মানুষ নিজের ও ঘোড়া, গরু ইত্যাদি জন্তুর শক্তির প্রয়োগ ছাড়াও শক্তি পেয়েছে কিছুটা নৈসর্গিক উপায় থেকে এবং বেশীটা রাসায়নিক বিক্রিয়া (chemical reaction) থেকে। নৈসর্গিক উপায় হল, যেমন বায়ুর বেগে চালিত যন্ত্র, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঝর্ণার জলের কিংবা বাঁধের (dam) মধ্যে অবরুদ্ধ জলের বেগকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী যন্ত্রকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করা। অন্যান্য সব ক্ষেত্রে, যেমন বাষ্পচালিত যন্ত্রে বা ইঞ্জিনে, পেট্রল বা ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে, বোমা ইত্যাদিতে আমরা শক্তি পাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কয়লাকে পোড়ালে তার থেকে যে তাপশক্তি পাওয়া যায়, তার দ্বার জলকে বাষ্পে পরিণত করে নানাপ্রকার যন্ত্র চালিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কোন মৌলিক পদার্থ অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। অংশগ্রহণকারী বস্তুগুলির পরমাণুসমূহ বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয় (regrouped)। ধরুন, এক গ্র্যাম কয়লাকে পুড়িয়ে শক্তি পাওয়া গেল। এক গ্র্যাম কয়লাকে আইনস্টাইনের অনুসিদ্ধান্তমত তার তুল্য শক্তিতে পরিণত করলে, অর্থাৎ

ঐ কয়লার সব পরমাণুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তা পূর্বোক্ত শক্তির চেয়ে বহু কোটি গুণ বেশী।

পরমাণু বোমার গঠন একজন বিজ্ঞানীর দ্বারা হয় নি। বেশ কিছু-সংখ্যক বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে এটি সম্ভবপর হয়েছে। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় রাদারফোর্ডের। এঁর কথা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে যে, কোন একটি পরমাণুকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে তার তুল্য শক্তি পাওয়া এখন সম্ভবপর হয় নি, সম্ভব হয়েছে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনকে কোন কণিকার দ্বারা আঘাত করে বিভাজনের ফলে অন্য দুটি কেন্দ্রীনে পরিণত হওয়ায় মূল কেন্দ্রীনের ভরের সামান্য অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। ব্যাপারটি বুঝতে হলে কেন্দ্রীন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার।

আমরা জানি যে, প্রকৃতিতে স্থায়ী বা প্রায় স্থায়ী মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 92টি। এ ছাড়া আরো 13টি ক্ষণস্থায়ী মৌল গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। 1869 খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত রাসায়নবিদ্ মেণ্ডেলিয়েফের আবিষ্কৃত পর্যায়-সূত্র (periodic law) ও পর্যায়-সারণী (periodic table) বিজ্ঞান জগতে অমূল্য সম্পদ। এই সারণীতে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা অনুযায়ী এমন ভাবে সাজানো যে, এর থেকে কোন পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা, পারমাণবিক ভর, রাসায়নিক গুণাবলী সব জানা যায়। এই সারণীতে প্রথম ঘরে আছে লঘুতম পদার্থ হাইড্রোজেন, যার পারমাণবিক সংখ্যা হল 1 ও ভর সংখ্যা 1 ; তারপর আছে : হিলিয়াম, যার পারমাণবিক সংখ্যা 2 ও ভর সংখ্যা 4, তারপর লিথিয়াম, যার পারমাণবিক সংখ্যা 3 ও ভর সংখ্যা 7,...26নং ঘরে লোহা... 79নং ঘরে সোনা...82 নং ঘরে সীসা...এবং সর্বশেষ 92 নং ঘরে গুরুতম পদার্থ ইউরেনিয়াম।

যে-কোন পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন হয় প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টির দ্বারা। প্রোটনের সংখ্যা হল পারমাণবিক সংখ্যার সমান, অর্থাৎ পর্যায়-সারণীতে যে সংখ্যক ঘরে পদার্থটির স্থান। পরমাণুটির ভর সংখ্যা হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা। ধরা যাক ইউরেনিয়ামের কথা। এটির পারমাণবিক সংখ্যা হল 92 ও ভর সংখ্যা 238। সুতরাং এর কেন্দ্রীনে

প্রোটনের সংখ্যা হল 92টি ও নিউট্রনের সংখ্যা হল 238 থেকে 92 কম, অর্থাৎ 146টি।

1নং পদার্থ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে আছে শুধু একটি প্রোটন ও 2নং পদার্থ হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন, যার জন্যে এর ভর সংখ্যা হল 4। হিলিয়ামের কেন্দ্রীনকে বলা হয় আলফা কণিকা (alpha particle)। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন বা প্রোটন ও আলফা কণিকা পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুবই প্রয়োজনীয়।

সীসার স্থান পর্যায়-সারণীতে 82। এই পর্যন্ত মৌলিক পদার্থগুলিকে বলা যায় স্থায়ী। আর 83নং সংখ্যা থেকে 92 নং সংখ্যা পর্যন্ত পদার্থগুলি প্রকৃতিতে স্থায়ী নয়। এগুলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেজ বিকিরণ হতে থাকে বলে এগুলিকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই সব পদার্থ থেকে বিভিন্ন বেগের আলফা কণিকা, বিটা কণিকা (দ্রুত বেগসম্পন্ন ইলেকট্রন) এবং গামা রশ্মি নির্গত হয়, যার ফলে এই সব পদার্থ অবশেষে সীসাতে পরিণত হয়, যদিও দীর্ঘকাল সময় লাগে। যেমন, ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবন কাল (half-life period) হল 4500 মিলিয়ন অর্থাৎ 450 কোটি বছর। অর্ধজীবন কাল বলতে বোঝা যায় যে, এই সময়ে যে-কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম তার অর্ধেক পরিমাণে এসে দাঁড়ায়।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই থাকবে, অর্থাৎ তার রাসায়নিক গুণাবলীর (chemical properties) কোন পরিবর্তন হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত তার পরমাণুটির কেন্দ্রীনের প্রোটন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। কেন্দ্রীনের নিউট্রনের সংখ্যা কম কি বেশী হলে কিছু যায় আসে না। নিউট্রনের সংখ্যার পরিবর্তন হলে পরমাণুটির শুধুমাত্র ভৌত ধর্ম (physical properties), যেমন ভর, ঘনত্ব—পরিবর্তিত হবে, কিন্তু পর্যায়-সারণীতে পরমাণুটির স্থান ঠিকই থাকবে।

অনেক মৌলিক পদার্থ আছে, যাদের পরমাণুগুলির কেন্দ্রীনে সম-সংখ্যক প্রোটন আছে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। এগুলিকে বলা হয় আইসোটোপ (isotope)। গ্রীক ভাষায় isos মানে সম ও topos মানে স্থান, অর্থাৎ পর্যায়-সারণীতে এই পদার্থগুলি একই ঘরে অবস্থান করে বা সমস্থানিক;

যেমন, হাইড্রোজনের তিনটি আইসোটোপ আছে--(1) প্রচলিত লঘু হাইড্রোজেন, যার কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন এবং যার ভর সংখ্যা 1 ; (2) ডয়টেরিয়াম (deuterium) বা ভারী হাইড্রোজেন, যার কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন এবং ভর সংখ্যা 2 ; (3) ট্রিটিয়াম (Tritium), যার কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন এবং ভর সংখ্যা 3 । তেমনি ধরা যাক ইউরেনিয়ামের কথা। এই মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ সংখ্যা হল 6, যাদের কেন্দ্রীনের নিউট্রনের সংখ্যার উপর বিচার করে ভর সংখ্যা হল 233, 234, 235, 237, 238 এবং 239। ইউরেনিয়ামের 235 ভর সংখ্যা বিশিষ্ট আইসোটোপটি (U^{235}) পারমাণবিক বিক্রিয়ায় (nuclear reaction) সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

কেন্দ্রীনের গঠন সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধু লঘুতম হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন ছাড়া সমস্ত কেন্দ্রীনই গঠিত হয় প্রোটন ও নিউট্রনের জোট বেঁধে। এই কণিকাগুলি কোন এক প্রকার শক্তিতে জমাট বেঁধে থাকে । আমরা জানি যে, প্রোটন ও নিউট্রন এই দুটি কণিকা আয়তনে ও আকারে ঠিক একই প্রকার, ভরও প্রায় সমান। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী, কিন্তু এই পার্থক্য এতই তুচ্ছ যে, দুটির ভরই সমান বলা যেতে পারে। পার্থক্য হল এই যে, প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত আর নিউট্রন হল আধান-নিরপেক্ষ (neutral)। 1932 খ্রীস্টাব্দে চ্যাডউইক (Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করেন।

কোন একটি মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনকে যদি রূপান্তরিত করতে হয়, তবে করতে হবে কোন কণিকা বা অন্য কোন হাল্‌কা কেন্দ্রীনকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করে তার দ্বারা আঘাত করে। সহজলভ্য আঘাতকারী বুলেট হল প্রোটন, ডয়টেরন ও আলফা কণিকা। কিন্তু যেহেতু এই সব কণিকা হল ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত ও যে কেন্দ্রীনটিকে আঘাত করা হবে, সেটিও ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত এবং যেহেতু দুটি সমধর্মী আধানের ভিতরে বিকর্ষণের (repulsion) সৃষ্টি হয়, সেহেতু আঘাতকারী কণিকাটিকে (bombarding particle) ত্বরিত করে অতি উচ্চ বেগসম্পন্ন করতে হবে, যাতে কণিকাটি যথোপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হয়ে কেন্দ্রীনটিকে আঘাত করতে পারে। আজকাল সাইক্লোট্রন (cyclotron), সিনক্রোট্রন (synchrotron),

বিটাট্রন (betatron), কস্‌মোট্রন (cosmotron) ইত্যাদি কতকগুলি বেগবর্ধক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, বন্দুকের গুলির দ্বারা যেমন লক্ষ্যস্থলকে নিশানা করে আঘাত করা যায়, পরমাণুর জগতে এরূপ হবার উপায় নেই, কারণ প্রয়োজনীয় শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা তাই পরোক্ষভাবে নানা উপায় অবলম্বন করে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

এখন দেখা যাক যে, কোন ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীনের সঙ্গে একটি যথোপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের বা আল্‌ফা কণিকার সংঘর্ষে কি হয়। সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্রীনটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে বিভাজন (fission)। এই খণ্ড দুটি হয় মূল পদার্থটির পর্যায়-সারণীর পারমাণবিক সংখ্যার চেয়ে কম পারমাণবিক সংখ্যার পদার্থ, আর এই দুটি সংখ্যার যোগফল হয় মূল কেন্দ্রীনের পারমাণবিক সংখ্যার সমান। কিন্তু দেখা যায় যে, সংঘর্ষের পরে নূতনসৃষ্ট পদার্থগুলির ভরের সমষ্টি সংঘর্ষের পূর্বে পদার্থগুলির সমষ্টির চেয়ে কিছু কম, অর্থাৎ এই বিভাজনের ফলে কিছু ভর কমে গিয়েছে। এই ভরটুকুই আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পরমাণু চূর্ণ করবার জন্যে প্রোটনকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন করবার প্রথম যন্ত্র তৈরি করেন রাদারফোর্ডের ছাত্র ও সহকর্মী কক্‌ক্রোফ্‌ট (Cockcroft) ও ওয়ালটন (Walton) 1931 খ্রীস্টাব্দে। তাঁরা এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন রশ্মিগুচ্ছকে (beam of protons) শক্তিশালী করে লক্ষ্যবস্তু লিথিয়ামকে আঘাত করেন। ফলে আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হয়ে আলোর ঝলক দেখা গেল। একটি লিথিয়াম কেন্দ্রীন, যাকে উল্লেখ করা হয় ${}_3Li^7$ দিয়ে (ডান দিকের উপরের সংখ্যা 7 হল ভর সংখ্যা এবং বাঁ দিকের নীচের সংখ্যা 3 হল পারমাণবিক সংখ্যা), একটি প্রোটনের (${}_1H^1$) সংঘর্ষে পরিণত হল দুটি হিলিয়াম কেন্দ্রীনে (${}_2He^4$)। পারমাণবিক বিক্রিয়াটি হবে নিম্নরূপ :

$${}_3Li^7 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + {}_2He^4$$

এখন হিসেব করে দেখা যাক এই সংঘর্ষের ফলে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া

সম্ভব হল। একটি লিথিয়ামের প্রকৃত ভর হল $7{\cdot}01822 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম, একটি প্রোটনের ভর হল $1{\cdot}000812 \times 1{\cdot}56 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম ও একটি হিলিয়ামের কেন্দ্রীনের ভর হল $4{\cdot}00390 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম।

∴ সংঘর্ষের পূর্বে ভরের সমষ্টি

$$=(7{\cdot}01822+1{\cdot}00812)\times 1{\cdot}66\times 10^{-24} \text{ গ্র্যাম}$$
$$=8{\cdot}02634\times 1{\cdot}66\times 10^{-24} \text{ গ্র্যাম}$$

এবং সংঘর্ষের পরে ভরের সমষ্টি$=2\times 4{\cdot}00390\times 1{\cdot}66\times 10^{-24}$ গ্র্যাম

$$=8{\cdot}00780\times 1{\cdot}66\times 10^{-24} \text{ গ্র্যাম}$$

∴ সংঘর্ষের ফলে ভরের ঘাটতি$=(8{\cdot}02634-8{\cdot}00780)$

$$\times 1{\cdot}66\times 10^{-24} \text{ গ্র্যাম}$$
$$=0{\cdot}0307764\times 10^{-24} \text{ গ্র্যাম}$$

এই ভরটুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হল, যার পরিমাণ পাওয়া যাবে $E=mc^2$ সূত্র দিয়ে। এখানে $c=3\times 10^{10}$ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

∴ শক্তি $E=0{\cdot}0307764\times 10^{-24}\times(3\times 10^{10})^2$ আর্গ

$$=0{\cdot}2769876\times 10^{-4}, \text{ অর্থাৎ প্রায় } 0{\cdot}277\times 10^{-4} \text{ আর্গ।}$$

এইরূপ শক্তিকে সাধারণতঃ মাপা হয় ইলেকট্রন ভোল্ট একক দিয়ে, যাকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ই. ভ.। এক ই.ভ.$=1{\cdot}6\times 10^{-12}$ আর্গ।

$$\therefore\ 0{\cdot}277\times 10^{-4} \text{ আর্গ}=\frac{0{\cdot}277\times 10^{-4}}{1{\cdot}6\times 10^{-12}} \text{ ই. ভ.}$$
$$=17{\cdot}3\times 10^{6} \text{ ই. ভ.}=17{\cdot}3 \text{ মিলিয়ন ই. ভ.}$$

অর্থাৎ প্রায় 1 কোটি 73 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

এই হিসেব থেকে দেখা গেল যে, একটি পরমাণুর বিভাজন থেকেই বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এইভাবে আইনস্টাইনের 1905 খ্রীস্টাব্দের আবিষ্কৃত তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞানীরা তার ব্যবহারিক প্রয়োগে পরমাণু থেকে শক্তি পাবার উপায়ে ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করতে লাগলেন।

নিউট্রন আবিষ্কারের পর পারমাণবিক পদার্থবিদ্যাবিদ্‌দের একটি বড় সুযোগ উপস্থিত হল। নিউট্রন কণিকা হল আধান-নিরপেক্ষ। সুতরাং বিজ্ঞানীরা এই কণিকাকে বুলেট হিসেবে অর্থাৎ আঘাতকারী কণিকা হিসেবে ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন। আধান-নিরপেক্ষ হবার জন্যে নিউট্রন সহজেই

পরমাণুর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে। পরমাণুর ভিতরে কেন্দ্রীনের চারদিকে আবর্তনরত ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত ইলেকট্রনগুলি আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রনের গতিপথকে ব্যাহত করতে পারবে না এবং কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলিও বিকর্ষণ ঘটাতে পারবে না, যার ফলে নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে পারবে, এমনকি ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রনও এই কাজটি করতে পারবে। কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা হল যে, একটি নিউট্রনের দ্বারা কেন্দ্রীনকে আঘাত করার ফলে হয়ত বা ইউরেনিয়ামের মত ভারী পদার্থের কেন্দ্রীন দ্বিখণ্ডিত হলে তার সঙ্গে দুটি নিউট্রনও পাওয়া যাবে। তা যদি পাওয়া যায়, তবে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক পরমাণুর কেন্দ্রীনের বিভাজন হতে থাকবে, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে। এই আশাতে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের ফ্রেডরিক জোলিও এবং তাঁর স্ত্রী আইরিন কুরী (মাদাম কুরীর মেয়ে) ও ইতালির এন্‌রিকো ফের্মি ইউরেনিয়ামের 235 নং আইসোটোপ (যাকে বলা হয় U^{235}) কেন্দ্রীনকে নিউট্রন কণিকা দিয়ে বিভাজন করতে সক্ষম হন, কিন্তু ফল সম্বন্ধে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি এবং তাছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এঁদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1933 খ্রীস্টাব্দে জোলিও কুরী কেন্দ্রীনকে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে খণ্ডিত করে সর্বপ্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় (artificial radioactive) পদার্থ সৃষ্টি করেন, যা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চিকিৎসাতে ব্যবহৃত হয়। এই আবিষ্কারের জন্যে এঁরা দু-জনে মিলিতভাবে 1935 খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রায় অনুরূপ আবিষ্কারের জন্যে ফের্মি 1938 খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অবশেষে 1938 খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বার্লিনের কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনস্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের পরিচালক অটো হান ও তাঁর সহকর্মী স্ট্রাসমান (Strassmann) গবেষণাগারে ইউরেনিয়াম U^{235}-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে প্রায় দুটি খণ্ডে বিভক্ত করতে সক্ষম হলেন। তাঁদের মতে এই দুটি হল বেরিয়াম আইসোটোপ ও ক্রীপটন আইসোটোপ। এই দুটি পদার্থের অবস্থান পর্যায় সারণীতে প্রায় মাঝামাঝি স্থানে। হান তাঁর

গবেষণার ফল সম্বন্ধে খুব নিশ্চয়তা বোধ করেছিলেন না। তিনি তাঁর গবেষণার ফল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাঠিয়ে দিলেন সুইডেনের স্টকহলমে শ্রীমতী লিজে মাইটনারের কাছে তাঁর মূল্যবান অভিমতের জন্যে।

প্রতিভাসম্পন্ন পদার্থবিদ্যাবিদ লিজে মাইট্‌নার দীর্ঘ পঁচিশ বছর বার্লিনে অটো হানের সঙ্গে গবেষণা করতেন। হানের খুব বিশ্বাস ছিল মাইট্‌নারের মতামতের উপরে। মাইট্‌নার ইহুদী বলে নাৎসী দলের আক্রোশ পড়ল তাঁর উপরে। শোনা যেতে লাগল যে, মাইট্‌নার যদি বার্লিন ছেড়ে না যান, তবে তাঁকে বন্দী করা হবে। প্লাঙ্ক ও হান হিটলারের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানালেন যে, মাইট্‌নার খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করছেন বলে তাঁকে যেন নির্ঝঞ্ঝাটে বার্লিনে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু হিটলার রাজী হলেন না। বিশ্বস্ত সূত্রে মাইট্‌নার খবর পেলেন যে, শীঘ্রই তাঁকে বন্দী করা হতে পারে। এই শুনে 1938 খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে প্লাঙ্ক ও হানের মত অতি শুভানুধ্যায়ী অল্প কয়েকজনের সহায়তায় একদিন রাতারাতি গোপনে তিনি বার্লিন ছেড়ে স্টকহলমে চলে গেলেন।

হানের গবেষণায় ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলের সব তথ্যাদি পেয়ে মাইট্‌নার ভাল করে বিচার করে দেখলেন যে, এতদিন ধরে বিজ্ঞানীরা যার জন্যে চেষ্টা করছিলেন, হানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাই পাওয়া গিয়েছে। মাইট্‌নার কোপেনহেগেনে গিয়ে বোরকে এই মূল্যবান তথ্যাদি জানালেন এবং তিনি বোরের গবেষণাগারে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একই ফল পেলেন এবং আরও জানতে পারলেন যে, একটি নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনটি প্রায় সমান দুটি খণ্ডে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও দুটি নিউট্রনের সৃষ্টি হচ্ছে; তার অর্থই হল—ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে দ্বিধা রইল না। এই দুটি নিউট্রন বিভক্ত করবে নূতন দুটি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনকে, যার ফলে সৃষ্টি হবে চারটি নিউট্রনের। এইভাবে মুহূর্তের ভিতর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক বিক্রিয়াতে ইউরেনিয়াম টুক্‌রোটির সব পরমাণুর বিভাজন হবে আর প্রতিটি কেন্দ্রীনের বিভাজনে সৃষ্টি হবে প্রায় 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট। বোর অল্পকাল পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানকার বিজ্ঞানীদেরকে এই বিষয়টি জানালেন। সেখানে ফের্মি, সৃৎসিলার্ড (Szilard) প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা য়ুরোপ থেকে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের স্বৈরাচারে বিরক্ত হয়ে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে এসে গবেষণার কাজ করছিলেন। এই সব বিজ্ঞানীরাও ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ U^{235}-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটালেন।

এত দিন তাঁরা সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা গবেষণায় বুঝতে পারলেন যে, এই ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি একটি বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যাকে বলে সংকট ভর (critical mass), তবে মুহূর্তের মধ্যে ধারাবাহিক বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ হয়ে সব ধ্বংস করে দেবে। ফের্মি চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে এই ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়াকে আয়ত্তে রাখা যায়। তাঁর গবেষণায় 1942 খ্রীস্টাব্দের 2রা ডিসেম্বর আবিষ্কৃত হল পারমাণবিক চুল্লী (atomic reactor), যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকবে, কিন্তু এই বিক্রিয়াকে আয়ত্তে রাখা যাবে। পরমাণুতে নিহিত বিরাট শক্তির মুক্তিসাধন ও ইচ্ছামত কাজে লাগানো সম্ভবপর হল। আরব্যোপন্যাসের আলাদিনের প্রদীপের প্রচণ্ড শক্তিশালী দৈত্য বেরিয়ে এল, কিন্তু তাকে মানুষ বশে রাখবার কৌশল আয়ত্ত করেছে।

2. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিকগণ ঘৃণা ও আক্রোশ বশতঃ জার্মানিকে চিরতরে সামরিক, আর্থিক ইত্যাদি সব বিষয়ে ধ্বংস করবার মনোবৃত্তি নিয়ে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি না করে যদি তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদার প্রকৃতির প্রেসিডেন্ট উইলসনের মানবতা, ন্যায় ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে সন্ধির শর্তাদি করতেন, তবে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকত না, যুদ্ধের পরে ইবার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারই স্থায়ী হত এবং প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার, জাপানিদের দ্বারা পার্ল হার্বার ধ্বংস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণের প্রতিহিংসা জাগ্রত হবার কোন কারণই সৃষ্টি হত না। আর সম্ভাবনা থাকত না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও ইতালি থেকে আগত উদ্বাস্তু বিজ্ঞানীদের অদম্য উৎসাহের সঙ্গে মার্কিন সরকারের সহায়তায় পরমাণু বোমা বানিয়ে হিটলারকে জব্দ করবার। পরমাণু বোমা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সামরিক কর্তারা হিরোশিমা ও নাগাসাকির নির্দোষ হতভাগ্য লক্ষাধিক মানুষকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে পারত না, আর উন্নত রাষ্ট্রগুলির রেষারেষিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবীর জনগণের মনে সদা আতঙ্কের কোন কারণ থাকত না।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ আলোচনা করা যেতে পারে, যেহেতু এই বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতে স্ৎসিলার্ড, ফের্মি, টেলার প্রমুখ পরমাণু-বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন হয়ে আইনস্টাইনকে অনুরোধ করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি চিঠি লিখতে রাজী করান। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটির বিষয় পরে উল্লেখ করা হবে।

'বার্লিন' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিটলারের নাৎসী দল 1932 খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় হিটলার সমস্ত জার্মানির একক অধিনায়ক হলেন ও তাঁর পদবী হল ফ্যুহ্‌রার (Fiiuhrer)। ক্ষমতায় আসীন হয়েই হিটলার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন জার্মানির প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। 1932-33 খ্রীস্টাব্দে আহূত আন্তর্জাতিক অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের সম্মেলনে (Disarmament Conference) ফ্রান্সের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় জার্মান প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। এর পরই হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করলেন। সেইজন্যে তিনি শিল্পোন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। সমগ্র দেশের শাসনভার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে তিনি শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানের, বিশেষ করে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের, গবেষণা প্রভৃতির উন্নয়নে উৎসাহ দিতে লাগলেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হবার সব রকম উপায় তিনি অবলম্বন করলেন। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল, পশম, রবার প্রভৃতি প্রস্তুত করার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কৃত হল। দেশের কাঁচামাল যাতে কোন ভাবে নষ্ট বা অপব্যয়িত না হতে পারে, সেজন্য তিনি কাঁচামালের রেশনিং ব্যবস্থা চালু করলেন। পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে একদিকে যেমন দেশের সামরিক শক্তির বৃদ্ধি করলেন, অপরদিকে তেমনি দেশের বেকার সমস্যা বহু পরিমাণে দূর করতে সক্ষম হলেন। জার্মানির যুবকেরা অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন। সেইজন্যে অল্প কয়েক বছরের ভিতরেই

হিটলারের অভিলাষ পূর্ণ হল। এই দিক দিয়ে হিটলারের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের ভিতরেই সব দিক দিয়ে বিধ্বস্ত জার্মান জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিতে উন্নত করতে তিনি সক্ষম হলেন।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে হিটলার জার্মানির যে সব ভূখণ্ড ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অন্য সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, সেই সব জার্মান জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল আবার জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করতে মনোনিবেশ করলেন। নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি ও জাপানের সঙ্গে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এই সামরিক চুক্তিবদ্ধ তিন শক্তি অক্ষ শক্তিবর্গ (Axis Powers) নামে পরিচিত হল।

হিটলার ক্রমে য়ুরোপের শক্তিবর্গকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললেন এবং অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভূক্ত সুদেতেনল্যাণ্ড প্রভৃতি দখল করে নিলেন। 1938 খ্রীস্টাব্দে মিউনিক চুক্তির দ্বারা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স হিটলার কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড অধিকারে রাজী হয়ে কোন প্রকারে তখনকার মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে আটকে রাখলেন। কিন্তু হিটলার ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রের ভয় ও দুর্বলতা বুঝতে পেরে এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী বলে কিছু দিন পরেই পোল্যাণ্ডের ডানৎসিগ শহরটি দাবী করলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করল। ইতিমধ্যে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে হিটলারের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। তিনি 1939 খ্রীস্টাব্দের 1লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

3. একটি ঐতিহাসিক চিঠি

প্রলয়ঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র 20 বছর পার না হতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সমস্ত বিশ্ববাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সন্ত্রাসের প্রধান কারণ হল হিটলারের ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতা। সবাই হিটলারকে দানব বলে অভিহিত করল। 1938 সালটি শেষ হওয়ার সময় বার্লিনের বিশিষ্ট রাসায়নবিদ্ অটো হান আবিষ্কার করলেন নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজন (nuclear fission)। এর পূর্বে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়

কোন একটি পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনকে অন্যরূপ কেন্দ্রীনে পরিণত করা (transmutation) সম্ভবপর হয়েছে কোন কণিকা দিয়ে আঘাত করে প্রথম কেন্দ্রীনটির থেকে সামান্য টুক্‌রো আলাদা করে ফেলাতে (chipped off). এতে কিছুটা শক্তিও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু হানের গবেষণায় পাওয়া গেল ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে নিউট্রন দিয়ে আঘাতের ফলে প্রায় সমান দুটি বিভক্ত খণ্ড আর এতে প্রচুর পরিমাণে শক্তিও পাওয়া গেল—একটি কেন্দ্রীন বিভাজন থেকে প্রায় 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের মত। এই পারমাণবিক বিক্রিয়াকে বলা হয় কেন্দ্রীনের বিভাজন (nuclear fission)। কয়েক মাসের ভিতরে অন্যান্য দেশের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা ঐ একই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনের বিভাজন করতে সক্ষম হলেন, এবং আরও জানা গেল যে, একটি নিউট্রন দিয়ে বিভাজন প্রক্রিয়াটি করলে দুটি নিউট্রন পাওয়া যায় যার অর্থ হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তির মুক্তির উপায়ের সন্ধান পাওয়া গেল।

ফ্রান্সে জোলিও ক্যুরী এবং মার্কিণ যুক্তিরাষ্ট্রে স্‌ৎসিলার্ড, ফের্মি, টেলার প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী ইউরেনিয়ামের বিভাজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতেন স্‌ৎসিলার্ড ও ফের্মি। 1938 খ্রীস্টাব্দে হিটলারের চেকোশ্লাভাকিয়া অধিকার ও মিউনিক চুক্তির পর সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিটলার শীঘ্রই বড় রকমের যুদ্ধ ঘটাবে। খবর পাওয়া গেল যে, হিটলার নূতন নূতন অস্ত্রসম্ভারে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, বার্লিনে চেষ্টা চলছে পরমাণু-বোমা প্রস্তুতির। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর অভাব সেখানে নেই। অটো হান তো আছেনই। তাছাড়া আছেন হাইসেনবার্গ, ভাইস্যেকার, হাউটারমান্স, লাওয়ে ও আরও কয়েক জন। 1933 খ্রীস্টাব্দে হাউটারম্যান্সই সর্বপ্রথম সূর্য ও অন্যান্য তারকাদের থেকে সব সময়ে তেজ নির্গত হবার কারণের ব্যাখ্যা করেন আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যতা অনুসিদ্ধান্তটির ভিত্তিতে, যা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন। তাঁর ব্যাখ্যাটি হল যে, সূর্যের বা যে কোন তারকার অভ্যন্তরে প্রচণ্ড তাপের জন্যে (উষ্ণতা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেল্‌সিয়াস) কেন্দ্রীয় বিক্রিয়ায়

(thermonuclear reaction) হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনগুলি সংযোজনের (fusion) ফলে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হচ্ছে, ফলে তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে।

তারপর আরও খবর পাওয়া গেল যে, বার্লিনে পারমাণবিক বিক্রিয়া বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে পরমাণু-বোমা প্রস্তুত করবার জন্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে ইউরেনিয়াম রপ্তানী বন্ধ করে দিলেন। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ বার্লিনের বিজ্ঞানীরা যদি পরমাণু-বোমা বানাতে সক্ষম হন, তবে হিটলার সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না।

ফের্মি ও সৎসিলার্ড গবেষণার দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, পরমাণু-বোমা বানানো সম্ভবপর, কিন্তু চাই যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম ও প্রচুর অর্থ। কোন স্বতন্ত্র বিজ্ঞানীর বা বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষে এটি সম্ভবপর নয়। এটি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে। ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় কিছু পরিমাণে ক্যানাডাতে, আর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় আফ্রিকার বেলজিয়াম কঙ্গোতে। সৎসিলার্ড এই বিষয়ে আরও দুই একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করলেন যে, আইনস্টাইনকে অনুরোধ করতে হবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে আর না হয়ত একটি চিঠি লিখতে, কারণ রুজভেল্ট অন্য কারোর কথায় সেরূপ গুরুত্ব নাও দিতে পারেন, আর তাছাড়া বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ আইনস্টাইনকে খুবই শ্রদ্ধা করেন; সুতরাং ইউরেনিয়াম দিতে হয়ত অস্বীকার করবেন না। সৎসিলার্ড বন্ধুদেরকে বললেন বিষয়টি গোপন রাখতে।

এই সিদ্ধান্তের পর সৎসিলার্ড স্থির করলেন প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের কাছে যাবার, কিন্তু গোপনতা অবলম্বনের জন্যে তিনি সরাসরি আইনস্টাইনের কাছে না লিখে, লিখলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজেন ভিগনারের (Eugene Wigner) কাছে। ভিগনার একজন চেকোশ্লোভাকিয়ান পদার্থবিদ্যাবিদ্। তিনি বছর আট-নয় পূর্ব থেকে প্রিন্সটনে অধ্যাপনার কাজ করছেন। ভিগনার আইনস্টাইনকে এই বিষয়টি জানিয়ে রাখলেন।

1939 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন সৎসিলার্ড ও ফের্মি

কলম্বিয়া থেকে প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের বাড়িতে এলেন। তাঁরা আইনস্টাইনকে অটো হানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ও লিজা মাইট্‌নারের গবেষণার ফলাফলের ব্যাখ্যার কথা বললেন। তাঁরা আরও বললেন যে, নিজেদের গবেষণাতে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে নিউট্রন দিয়ে বিভাজনের ফলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। এই কথা শুনে আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, তিনি যে ভয় করছিলেন, অর্থাৎ পরমাণু বোমা তৈরির কথা, তাই সম্ভবপর হতে চলল। তাঁর মনে পড়ল 20 বছর পূর্বে বার্লিনে সেই তরুণ জার্মান বিজ্ঞানীটির কথা—যে আইনস্টাইনের সাহায্য চেয়েছিল পরমাণুর শক্তির মুক্তিসাধন করতে—যাতে অভাবনীয় বিধ্বংসকারী বোমা বানানো যেতে পারে। আর মনে পড়ল 1905 খ্রীস্টাব্দে বার্নের পেটেন্ট অফিসের ডেস্কে তাঁর লেখা কাগজের রাশি, যার একটির ভিতরে ছিল সেই সূত্রটি $E=mc^2$।

আইনস্টাইনকে বিমনা হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে সৎসিলার্ড তাঁকে বললেন, "যতদূর খবর পাওয়া গিয়েছে বার্লিনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে নেই, তাঁরা পরমাণু বোমা প্রস্তুত করবার চেষ্টায় আছেন এবং হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়ামের রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি ও ফের্মি পরমাণু বোমার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছি, কিন্তু এই বোমা বানাতে বহু কোটি ডলার মুদ্রার প্রয়োজন, সেইজন্য আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করতে হবে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরমাণু বোমা বানাতে। এই বিষয়ে আমরা বিজ্ঞানীরা সাহায্য করব, তাছাড়া প্রয়োজন হবে আরও অনেক বিজ্ঞানীর, ইঞ্জিনীয়ারের ও কারিগরের। আপনি দয়া করে যথা সত্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে কিংবা চিঠি লিখে তাঁকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে পরমাণু বোমা প্রস্তুতির একটি প্রকল্প গঠন করে সেটির সার্থক রূপায়ণ করতে অনুরোধ করুন, আর বেলজিয়ামের রাণীর কাছ থেকে ইউরেনিয়াম আমদানীর বন্দোবস্ত করুন।"

আইনস্টাইন শুনে একটু চুপ করে থেকে কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "এতে কি কোন ফল হবে? প্রেসিডেন্ট তো আমাকে চেনেন না।"

বিজ্ঞানীদ্বয় হেসে বললেন, "আপেক্ষিকতাবাদের স্রষ্টাকে পৃথিবীর সব মানুষ, এমন কি প্রেসিডেন্টও চেনেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করেন।"

আইনস্টাইন তবুও চুপ করে আছেন দেখে স্‌ৎসিলার্ড বললেন, "যে হিটলার কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদীকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে, সেই দানব প্রকৃতির হিটলার যদি পরমাণু বোমা পায়, তবে পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। য়ুরোপের পরিস্থিতি এখন এরূপ যে, যে-কোন সময়ে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।"

এই কথাতে কাজ হল। রুজভেল্টের কাছে যে চিঠি লিখতে হবে, তার মূল বিষয়গুলি লিখে আইনস্টাইন স্‌ৎসিলার্ডের হাতে দিলেন। বিজ্ঞানী দু-জন সন্তুষ্ট চিত্তে কলম্বিয়ায় ফিরে গেলেন। তারপর অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে স্‌ৎসিলার্ড আইনস্টাইনের চিঠিটির ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে একটি চিঠি টাইপ করে প্রিন্সটনে গেলেন আইনস্টাইনের সই নেবার জন্য। আইনস্টাইন তাতে সই করে দিলেন। চিঠিটি এইরূপ—

F. D. Roosevelt
President of the United States August 2, 1939
White House
Washington D. C.

মহাশয়,

এনরিকো ফের্মি (Enrico Fermi) ও লিও স্‌ৎসিলার্ড (Leo Szilard), এই দুই বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য আমার হাতে এসেছে। এগুলি থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, অদূর ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম পদার্থটি একটি নূতন ও প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হতে চলেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে প্রশাসনের দিক দিয়ে সত্বর যথোপযুক্ত কার্য গ্রহণ করতে হবে। এই সব চিন্তা করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের হেতু আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করলাম।

গত চার মাসে ফ্রান্সে জোলিও ও আমেরিকাতে ফের্মি ও স্‌ৎসিলার্ডের গবেষণায় এটা সম্ভবপর হয়েছে যে, বৃহৎ পরিমাণে ইউরেনিয়াম ধাতুতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রচণ্ড শক্তি ও নূতন ধরনের রেডিয়ামতুল্য পদার্থ সৃষ্টি করা যাবে। এখন এইরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটি সম্ভব হবে খুব শীঘ্রই।

এই নূতন প্রক্রিয়াতে বোমা প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হবে। যদিও খুব নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবুও আমার অনুমান যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা সৃষ্টি করা যাবে। এইরূপ বোমা একটি জাহাজে নিয়ে গিয়ে কোন বন্দরে সেটির বিস্ফোরণ ঘটালে সমস্ত বন্দরটি ও তার আশপাশের স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোমাগুলি বিমানে বয়ে নেবার পক্ষে হয়তো খুবই ভারী হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট ধরণের আকরিক ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। ক্যানাডাতে ও পূর্বেকার চেকোশ্লাভাকিয়াতে উৎকৃষ্ট প্রকারের এই ধাতু পাওয়া যায়, তবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উৎসস্থল হল বেলজিয়ান কঙ্গো।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক বিভাগ ও আমেরিকাতে যে পদার্থবিদ্যাবিদের দলটি ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়ার বিষয়টিতে গবেষণা করছে, এই দুইয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগের কথা আপনি কাম্য বলে বিবেচনা করতে পারেন।

*   *   *   *

আমি জানতে পেরেছি যে, জার্মান সরকার তাদের অধিকৃত চেকো-শ্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়াম বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মান সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী ফন ডিজস্যাকারের ছেলে বার্লিনের কাইজার উইলহেল্‌ম্‌ ইনস্টিট্যুটে কাজ করায় এত তাড়াতাড়ি এই বিক্রয় বন্ধ করবার উদ্দেশ্য থেকে বোধ হয় ধারণা করা যেতে পারে যে, আমেরিকাতে ইউরেনিয়াম নিয়ে যে কাজটি হচ্ছে, সেখানেও সেই কাজটি হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত
এ. আইনস্টাইন

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে সময় এই চিঠি লেখা হয়েছিল তখন বিজ্ঞানীরা সবে পরমাণু থেকে শক্তির মুক্তিসাধনের উপায়টি খুঁজে পেয়েছেন, পরমাণু বোমা সম্বন্ধে বিশদ তথ্যাদি তখনও তাঁরা জানতে পারেন নি। ইউরেনিয়াম একটি ভারী পদার্থ, সীসের চেয়ে অনেক ভারী। তাঁরা জেনেছিলেন যে, U^{235} নামক ইউরেনিয়াম আইসোটোপটি পারমাণবিক বিক্রিয়া বিষয়টিতে U^{238} আইসোটেপের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর।

প্রকৃতিতে U^{238} আইসোটোপটি পাওয়া যায় শতকরা 99·278 ভাগ আর প্রয়োজনীয় U^{235} আইসোটোপটি পাওয়া যায় মোটে 0·719 ভাগ। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে আকরিক ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হবে যথোপযুক্ত পরিমাণ U^{235} আইসোটোপটি পাবার জন্যে। আর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের জন্যে কতটা ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হবে এবং বোমার আকার, আয়তন, ভর ইত্যাদি কি রকম হবে—এই সব তথ্য তখন জানা ছিল না বলে চিঠিতে লেখা হয়েছিল যে, হয়তো বোমাটি এত ভারী হবে যে, সেটিকে জাহাজে করে বহন করতে হবে, বিমানে নেওয়া যাবে না। কিন্তু পরে বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা জানতে পারলেন U^{235} আইসোটোপের টুকরোর সংকট ভর (critical mass), ভর যার অধিক হলেই পরমাণু বিভাজনে প্রচণ্ড ধ্বংসকারী বোমার আকারে টুক্‌রোটির বিস্ফোরণ ঘটবে। এটি আকারে ও আয়তনে একটি টেনিস বলের চেয়ে খুব বড় নয়।

সৃৎসিলার্ড আইনস্টাইনের সই করা চিঠিটি নিয়ে অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করবার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশিষ্ট বন্ধু ধনবান ও বিদ্বান আলেকজাণ্ডার স্যাক্সের (Alexander Sachs) কাছে গিয়ে সব বিষয় আলোচনার পর চিঠিটি তাঁর হাতে দিলেন। ঠিক হল যে, স্যাক্স স্বয়ং ওয়াশিংটনে গিয়ে রুজভেল্টের হাতে চিঠিটি দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলবেন। স্যাক্স অক্টোবরের মাঝামাঝি রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চিঠিটি দিয়ে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। রুজভেল্ট সামরিক কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কাজ করবার আদেশ দিলেন।

ততদিনে য়ুরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগদান না করলেও মিত্রপক্ষকে নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছিল। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ পরমাণু বোমার বিষয়টি নিয়ে প্রায় বছরখানেক কোন প্রকার মাথা ঘামান নি। তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় ঐটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল বলে অর্থ খরচ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন নি। তারপর য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোরালো হয়ে উঠল, হিটলারের প্রচণ্ড শক্তির সামনে কোন রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারল না। হিটলার পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস অধিকার করে ফ্রান্স আক্রমণ করলেন। মাত্র কয়েক দিনের ভিতরেই তিনি উত্তর

ফ্রান্স অধিকার করে নিলে 1940 খ্রীস্টাব্দের 21শে জুন ফ্রান্সের ক্যাম্পেইন নামক স্থানে এক রেলগাড়ির কামরায় বসে হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। 1918 খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে ঠিক ঐ স্থানে একটি রেলগাড়ির কামরায় বসে ফ্রান্স জার্মান আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। য়ুরোপে বিভীষিকার সৃষ্টি হল। প্রায় সমস্ত য়ুরোপ অক্ষ-শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হবার সম্ভাবনা হল।

মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ এই সব দেখে ও ইংল্যাণ্ড থেকে গোপনীয় সূত্রে জার্মানির পারমাণবিক গবেষণার বিষয়ের খবর পেয়ে আইনস্টাইনের চিঠির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন ও এই বিষয়ে কাজ শুরু করবার জন্যে বিবেচনা করতে লাগলেন।

তারপর এশিয়ায় জাপান তার সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিলাষে চীন, ইন্দোচীন ও অন্যান্য দূর প্রাচ্যের দেশে ত্রাসের সঞ্চার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের এই যুদ্ধ-মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিল। তখন জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূর প্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখবার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাবার সময় অতর্কিতে 1941 খ্রীস্টাব্দের 7ই ডিসেম্বর বিমান আক্রমণ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল বন্দরটি ধ্বংস করে ফেলল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এই সময় থেকেই মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ মনোনিবেশ করলেন পরমাণু বোমা প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে তার সার্থক রূপায়ণের জন্যে। এর জন্যে যা অর্থের প্রয়োজন দিতে স্বীকৃত হলেন। এই পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হল 'ম্যানহাট্টান প্রকল্প' (Manhattan Project)। লস অ্যালামস (Los Alamos) নামে এক জায়গায় গবেষণাগার হল এবং তার পরিচালক (Director) নিযুক্ত হলেন বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার (Robert Openheimer)। স্ৎসিলার্ড উদ্‌যোগী হয়ে আইনস্টাইনকে দিয়ে যে চিঠিটি লেখালেন, তার ফলে সূত্রপাত হল গবেষণার দ্বারা পরমাণুর প্রচণ্ড শক্তিকে বোমারূপে বিস্ফোরণ ঘটাতে। যখন এতে সাফল্য লাভ করা গেল তখন বোঝা গেল যে, এই শক্তি দিয়ে মানুষকে যেমন ধ্বংস করা যায়, তেমনি নানাভাবে রক্ষাও করা যায়। সেইজন্যে আইনস্টাইনের সই করা চিঠিটিকে বলা হয়েছে ঐতিহাসিক চিঠি।

আইনস্টাইন চিঠিটি সই করবার কিছুকাল পর থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন এই ভেবে যে, হয়তো বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমা বানাতে সফল হবেন, কিন্তু এগুলির মালিক হবে সামরিক কর্তৃপক্ষ। কোন রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণায় যে-কোন সামরিক কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরভাবে মানবজাতির ধ্বংস সাধন করবে। এইরূপ মনের অশান্তির জন্যে তিনি 1940 খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনের চিন্তার বিষয়টি বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে, হিটলার পরমাণু বোমা পেলে পৃথিবীর কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে, এই ভয়েই তিনি ঐ চিঠিটি সই করেছিলেন। রুজভেল্ট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ঐ সাংঘাতিক বোমা যদি বিজ্ঞানীরা বানাতে সক্ষম হন, তবে সেগুলি অযথা অসামরিক নিরীহ মানুষকে মারবার জন্য ব্যবহৃত হবে না।

4. পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ও তার পরে

1945 খ্রীস্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি পরমাণুবোমা প্রস্তুতির পর তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পূর্বেই হিটলার 1লা মে মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়বার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করলেন ও 7ই মে জার্মানি পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করল। তখন জাপানের শক্তিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, প্রতিটি রণক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করছে বলে ধারণা করা যাচ্ছিল যে, জাপানও শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করবে।

জার্মানি পরাজয় স্বীকার করলে তার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ইংল্যাণ্ডের একটি বন্দীশিবিরে আটকে রেখে তাঁরা পরমাণু বোমা প্রস্তুতির বিষয়টিতে কতটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার খোঁজ-খবর নেওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল যে, তাঁরা ইচ্ছে করেই এই বিষয়ে অগ্রসর হন নি, কারণ পরমাণু বোমা হাতে পেলে হিটলার মানব-জাতির সমূহ ক্ষতি করতে পারে ভেবে তাঁরা জার্মানির সামরিক কর্তৃপক্ষকে

বরাবর ধাপ্পা দিয়ে এসেছেন যে, তাঁরা যেন খুব চেষ্টা করছেন পরমাণু বোমা বানাতে। তাঁরা হিটলারকে বাইরে থেকেই সম্মান দেখাতেন, কিন্তু মনে মনে জানতেন হিটলারের প্রকৃতি। হিটলারও তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদেরকে পছন্দ করতেন না এবং তাঁদেরকে বিশ্বাসও করতেন না। তিনি বিজ্ঞানীদেরকে বলেছিলেন এক বছরের ভিতরে পরমাণু বোমা বানাতে। কিন্তু যখন এক বছর পার হয়ে গেল এবং বিজ্ঞানীরাও কোন ফল দেখাতে পারলেন না, তখন হিটলার সঞ্চিত সব ইউরেনিয়ামকে যুদ্ধের অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্তে আদেশ দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক চিঠিটি সই করবার পর আইনস্টাইনের দুশ্চিন্তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যখন শুনলেন যে, জার্মানির বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমা তৈরি করেন নি ও মোটেই এই বিষয়ে অগ্রসর হন নি, তখন তাঁর অত্যন্ত মনস্তাপ হল। নিজে মনেপ্রাণে শান্তিবাদী বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু বোমা যখন প্রস্তুত করা সম্ভবপর হল, তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে করতে লাগলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর কোনরূপ বিশ্বাস ছিল না বলে ও 1945 খ্রীস্টাব্দের 12ই এপ্রিল হঠাৎ রুজভেল্টের মৃত্যু হলে মানুষের ধ্বংসের পরিণামের কথা ভেবে তাঁর মনস্তাপ আরও বেড়ে গেল।

আর মনস্তাপ হল বোমা প্রস্তুতির প্রধান উদ্যোক্তা স্ৎসিলার্ডের। এই তরুণ বিজ্ঞান-গবেষকটির হয়তো এই বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ হয়েছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল থেকে। অবশ্য জার্মানিতে বিজ্ঞানীরা এই বোমা তৈরি করে ফেলতে পারেন এই ভয়ও ছিল। পরমাণু বোমা প্রস্তুত করবার জন্যে যেরূপ উদ্‌যোগী হয়ে তিনি আইনস্টাইনকে দিয়ে রুজভেল্টের কাছে চিঠি লিখিয়েছিলেন, জার্মানির পরাজয়ের পর তিনি সেইরূপ উদ্‌যোগী হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন এই বোমার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবার জন্যে। যে বোমাটি তৈরি হয়েছিল, তার ধ্বংসের ক্ষমতার পরিমাণ অঙ্ক কষে দেখে বিজ্ঞানীরা শিউরে উঠেছিলেন। তিনি অনেক বিজ্ঞানীর সইসমেত একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় সেটিকে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

প্রথম পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণের পরীক্ষার দিন ধার্য হল 1945 খ্রীস্টাব্দের 16ই জুলাই। স্থান নির্বাচন করা হল নিউ মেক্সিকোর অ্যাল্‌মোগোর্ড

(Almogordo) নামে জায়গাটির এক জনহীন প্রান্তরে। একটি লোহার স্তম্ভ তৈরি করা হল, যার উপর থেকে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হবে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে (remote control system)। এই বিস্ফোরণের স্থানটি থেকে চারদিকে বহু মাইল পর্যন্ত সমস্ত জায়গার মানুষ, জন্তুজানোয়ার সব কিছুকে সরিয়ে ফেলা হল। দশ মাইল দূরে একটি সুরক্ষিত মঞ্চ তৈরি করা হল। এই মঞ্চ থেকে ম্যানহাট্টান প্রকল্পের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ বিস্ফোরণ পরীক্ষাটির ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবেন বলে ঠিক হল। নির্দিষ্ট দিনে সবাই এলেন। আইনস্টাইনও আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। ঠিক নির্দিষ্ট মুহূর্তে লৌহস্তম্ভটির উপর থেকে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হল।

একটি উজ্জ্বলতম দিনের চেয়েও উজ্জ্বল একটি আলোর ঝলকে সমস্ত জায়গাটি আলোকিত হয়ে উঠল। তিন মাইল দূরের পাহাড়শ্রেণীকে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল। একটি দীর্ঘকালব্যাপী কর্ণবিদারক গর্জনধ্বনি শোনা গেল এবং একটি প্রচণ্ড চাপের ঝটিকার তরঙ্গ বৃত্তাকারে বাইরের দিকে ছুটে গেল। তার পরই অতি ধীরে স্ফীতকায় হয়ে ওঠা একটি নানা রঙবিশিষ্ট মেঘ মাটি থেকে উত্তাল তরঙ্গের মত উপরের দিকে উঠতে লাগল, দেখে মনে হতে লাগল যেন একটি বিশালকায় পশু শীতকালীন নিদ্রাভঙ্গের পর জেগে উঠে নিজেকে বিস্তার করছে। মেঘটি যত উপরে উঠতে লাগল, ততই অধিকতর স্ফীতকায় হয়ে উঠতে লাগল। তারপর ক্রমশঃ রঙগুলি ফ্যাকাশে হয়ে ভয়ঙ্কর রকমের একটি ধূসর বর্ণ ধারণ করল এবং একটি দুরন্ত বায়ু-প্রবাহ উত্তপ্ত হয়ে গলিত পদার্থগুলিকে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বহুক্ষণ বাদে ধোঁয়াটে আবরণ সরে গেলে পর্যবেক্ষকেরা দেখলেন যে, বিস্ফোরণের স্থানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। চারদিকের বিস্তীর্ণ জায়গায় গাছ, ঘরবাড়ি, পাহাড়, কিছুরই অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে বিরাট বাটির ন্যায় আকারযুক্ত গর্ত আর মাইলের পর মাইল কাল পাথরের টুক্‌রো। তত্ত্বমতে ধ্বংসের যে পরিমাণ কল্পনা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী এই ধ্বংসলীলা দেখে সকলে ভয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

আইনস্টাইনই সর্বপ্রথমে বলে উঠলেন, "প্রাক্‌-ঐতিহাসিক যুগের মানুষের দ্বারা আগুন আবিষ্কারের পর আমাদের সমকালীন মানুষেরা বৃহত্তম বৈপ্লবিক শক্তিকে পৃথিবীতে নিয়ে এল।"

ফের্মি ও স্‌ংসলার্ড আইনস্টাইনকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্র কি কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে ?"

সামরিক আধিকারিকদের (military officers) একজন বলে উঠলেন, "যদি আমরা ব্যবহার নাই করব, তবে অযথা করদাতাদের বহু কোটি ডলার মুদ্রা আমরা ব্যয় করলাম কেন, শুধু কি আপনাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য ?"

আইনস্টাইন বললেন, "প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত ছিল যে, যদি এই অস্ত্রটি আমাদের কল্পনামত ধ্বংসাত্মক হয়, তবে এটিকে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে না।"

আধিকারিকটি বললেন, "তিনি কি তাই বিশ্বাস করতেন ?"

আইনস্টাইন বললেন, "হ্যাঁ, শুধুমাত্র যে এটি বিশ্বাস করা তা নয়, তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, অন্য সব পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না।"

আর একজন সামরিক আধিকারিক বললেন, "অন্য সব পদ্ধতি বলতে তিনি কি মনে করেছিলেন ? আরও অধিক সংখ্যক মার্কিনবাসীর জীবননাশ ? আরও অধিক সংখ্যক বিমান ও জাহাজের ধ্বংস ?"

আইনস্টাইন বললেন, "না, তা নয়, তিনি বলেছিলেন যে, যদি এই অস্ত্রটি সত্য সত্যই ভয়ঙ্কর রকমের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির হয়, তবে সাইবেরিয়া কিংবা অ্যালুসীয়ান দ্বীপপুঞ্জের মত বিরাট জনশূন্য স্থানে এর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এর ভয়াবহতা শত্রুকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এইরূপ শর্তাধীনে আমরা বিজ্ঞানীরা এর প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছি।"

দ্বিতীয় আধিকারিকটি ঠাট্টার সুরে বললেন, "তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শত্রুপক্ষকে এই অস্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এর ভয়াবহতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছি এবং অপেক্ষা করছি যে, তারা আমাদের কথায় সাড়া দিল কিনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যুবকেরা প্রাণ দিয়ে যেতে থাকবে। তার চেয়ে কোন সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে হিরোশিমার মত ছোট একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন ও অপ্রয়োজনীয় দ্বীপে একটি বোমার যদি বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, তবে কি অনেক বেশী প্রাণরক্ষা করা সম্ভব নয় ?"

এই শুনে আইনস্টাইন রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আপনি এই কথা বলবার কে যে, অন্য লোকেদের চেয়ে হিরোশিমার লোকেদের জীবন কম কি বেশী মূল্যবান?"

আধিকারিকটি বললেন, "তারা জাপানী বলে আমাদের শত্রু। এটিই কি যথেষ্ট নয়?"

আইনস্টাইন বললেন, "তাঁদের পরিবারবর্গের পক্ষে এটিই কি যথেষ্ট?"

আধিকারিকটি বললেন, "বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষায় তো বুঝলেন যে, ওখানে শোক করবার জন্যে কারোরই অস্তিত্ব থাকবে না।"

আইনস্টাইন রাগে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সারাজীবনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, তিনি সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

তারপর 6ই আগস্ট হিরোশিমার উপর ও 9ই আগস্ট নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্বংসের পরিমাণের কথাও কিছু কিছু লেখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনে (report) নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায়।

প্রায় তিন লক্ষ মনুষ্য অধ্যুষিত হিরোশিমা শহরটির উপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যার হিসেব যা পাওয়া গিয়েছে, তা হল নিহত 78,000 জন এবং আহত 84,000 জন, আর প্রায় 87,000 মনুষ্যঅধ্যুষিত নাগাসাকি শহরটির উপর বোমা বিস্ফোরণে ফলে নিহত 27,000 জন ও আহত 81,000 জন। এ ছাড়া দুটি শহরের বহু হাজার মানুষের কোনই খোঁজখবর পাওয়া যায় নি, তাদের বেশীর ভাগকেই মৃত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিস্ফোরণের সময় থেকে আহত মানুষদের দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রতি দিন মৃত্যু হতে লাগল। মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা (peak mortality) হল চতুর্থ দিনে। তারপর আবার মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা হল তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে। প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে, বিশেষ করে বিস্ফোরণের ফলে নির্গত গামা রশ্মির তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে বহু আহত মানুষের মৃত্যু হতে লাগল বছরের পর বছর ধরে। এই সব মানুষের মৃত্যু হতে লাগল লিউকেমিয়া (রক্ত-ক্যান্সার) রোগে। এই রোগে মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা

হল 1950-52 খ্রীস্টাব্দে। এর থেকে বোঝা যায় ছোট একটি পরমাণু বোমার ভয়াবহ ধ্বংসের ক্ষমতা, যা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে।

আইনস্টাইনের মনস্তাপের ও আত্মগ্লানির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, "আবার যদি নূতন করে জীবন শুরু করা সম্ভবপর হত, তবে বিজ্ঞানের সাধনা না করে হতাম মিস্ত্রী বা ছুতার।"

হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনার পর আন্তেনিনা ভ্যালেন্তিনার সঙ্গে এই বিষয়টির আলোচনাকালে আইনস্টাইন বললেন, "এতে আমার ভূমিকা ছিল একটি ডাক বাক্সের। টাইপ-করা চিঠিটি আমার কাছে আনা হলে আমি তাতে সই করেছিলাম।"

ভ্যালেন্তিনা লিখছেন, "আমরা তাঁর প্রিন্সটনের গৃহের পাঠকক্ষে বসে আলাপ করছিলাম। বড় জানালাটি দিয়ে বাইরের ধূসর রঙের আলো এসে তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত মুখের কোঁচকানো চামড়ার উপরে এসে পড়েছে। চোখের দৃষ্টিতে গভীর ব্যথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললাম, 'তবু আপনিই বোতামটি টিপেছিলেন'। এই কথা শুনে তিনি তাঁর মাথাটি আমার দিক থেকে সরিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন সবুজ বাগানের শেষ প্রান্তে দিগন্তকে আড়াল করে রাখা বড় বড় গাছগুলির মাথার দিকে। তারপর যেন গাছের মাথার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এইভাবে ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই বোতামটি টিপেছিলাম।'

হিরোশিমা ও নাগাসাকির এই মর্মান্তিক ঘটনার মূল কারণ রুজভেল্টের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর নাম সই করা ব্যাপারটি আইনস্টাইনের মনকে গভীর ব্যথায় ব্যথিত করেছিল এবং এই মর্মবেদনা তাঁকে অনেক বছর পর্যন্ত পীড়িত করেছিল। এর উপর সামরিক কর্তৃপক্ষের ছলনাময় ব্যবহারে তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করে আরও ব্যথিত হয়েছিলেন।

মার্কিন সরকারের বিজ্ঞানকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার এবং আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির (aggressive foreign policy) বিরুদ্ধে আইনস্টাইন প্রতিবাদ না করে পারেন নি। তিনি 1950 খ্রীস্টাব্দে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-পরবর্তী কালের পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা করে বললেন, "এই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতিটি বিষয়ের একটি মাত্র লক্ষ্য :

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের চেয়ে সব বিষয়ে সৈন্য পরিচালনার সুবিধার জন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। সম্ভাব্য ক্ষমতাবান ও কার্যকর মিত্রপক্ষকে সামরিক সম্ভার দিয়ে ও আর্থিক সাহায্যে আরও শক্তিশালী করা। আর, দেশের অভ্যন্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া ; যুবকদের সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করা ; গোপনে পুলিশের দ্বারা সমস্ত নাগরিকদের, বিশেষ করে অসামরিক কর্মচারীদের, দেশের প্রতি আনুগত্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তিদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। রেডিও, সংবাদপত্র এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা সূক্ষ্মভাবে প্রচার করা।"

আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত নানাপ্রকার 'আনুগত্যের পরীক্ষার' ঘোর প্রতিবাদ করেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখলেন, "এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য কি? আমি একমাত্র পথ দেখতে পাচ্ছি, যা হল গান্ধীর অসহযোগিতার বৈপ্লবিক নীতি। কোন কমিটির সামনে এইরূপ পরীক্ষার জন্যে হাজির হতে কোন বুদ্ধিজীবীকে ডাকা হলে তিনি এইরূপ পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করবেন, অর্থাৎ তিনি কারাবরণ করবার কিংবা নিজের আর্থিক সর্বনাশের জন্যে প্রস্তুত থাকবেন, সংক্ষেপে, তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের মঙ্গলের চিন্তাকে বিসর্জন দিতে হবে।"

যুদ্ধের ভীতিকে একেবারে লুপ্ত করবার জন্যে তিনি খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। এবিষয়ে তিনি কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন। 1952 খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এমনি একটি নিবন্ধ জাপানের এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা একখানি চিঠিতে স্বাক্ষরদান, পরমাণু বোমা সৃষ্টিতে আমার একমাত্র সহযোগিতা। এই চিঠিতে পরমাণু বোমা নির্মাণের প্রচেষ্টার ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে, এই গবেষণার সাফল্যের মধ্যে মানবজাতির অকল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু জার্মানরা এই একই রকম পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ করতে পারে, এই কথা চিন্তা করে আমি মনেপ্রাণে শান্তিকামী হওয়া সত্ত্বেও এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধ-

কালীন হত্যালীলা সাধারণ হত্যার চেয়ে কোন প্রকারেই ভাল নয়। যতদিন না বিভিন্ন জাতিসমূহ পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আইনের মাধ্যমে তাদের মতবিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে রাজী হচ্ছে, ততদিন যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকতে বাধ্য। অস্ত্রসজ্জার এই উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় সব রকমের নীচ পথই তারা অবলম্বন করবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুদ্ধের মাধ্যমে সামগ্রিক ধ্বংস।

এমনি অবস্থায় মারণাস্ত্র এবং ধ্বংসের নানা কলাকৌশলের উদ্ভাবনকে বাধা দেবার আর কোন আশাই নেই। একমাত্র উপায় যুদ্ধ ও যুদ্ধের ভীতিকে লুপ্ত করে দেওয়া, এই নির্দিষ্ট পথ থেকে কোন ক্রমেই বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। সমাজ সম্বন্ধে সচেতন লোকের কাছে এই যুদ্ধের দাবী কঠোর হলেও অসঙ্গত নয়।

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মহামানব গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, পথের সন্ধান পেলে মানুষ কি মহান ত্যাগ করতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে অজেয় জড়শক্তির চেয়ে অদম্য বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ মানুষের ইচ্ছা যে মহত্তর, ভারতের মুক্তির জন্যে গান্ধীর প্রচেষ্টা তার জীবন্ত স্বাক্ষর।"

এর থেকে বোঝা যায় যে, গান্ধীজীর মত আইনস্টাইনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সত্যানুসন্ধানের অদম্য ইচ্ছাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনার পর কয়েক বছর আইনস্টাইন আত্মধিক্কারে ও মনোবেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর দেহ জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ও কৌতুকভরা কথাও আর শোনা গেল না। সবাই দেখত শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে জীর্ণশীর্ণ মানুষটি ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। এর পূর্বে এই বয়সেও তাঁর চলাফেরায় যৌবনসুলভ একটা সতেজভাব দেখা যেত। যা হোক, ধীরে ধীরে আশাবাদী আইনস্টাইন মন থেকে বিষণ্ণতা দূর করে দিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে হবে যে, পরমাণু-শক্তি শুধু ধ্বংসই করে না, মানুষের অশেষ কল্যাণও করে; আর সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে হবে যে, এই শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে কেউ যেন যথেচ্ছ ব্যবহার না করে আয়ত্তে রাখে। তিনি যেন আবার

নিজেকে ফিরে পেলেন, নূতন করে শক্তিলাভ করলেন। তাঁর চলাফেরায় আবার আগেকার সতেজতা ফিরে এল। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রেরা হঠাৎ একদিন তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে বহু দিন পরে সতেজভঙ্গীতে ক্যাম্পাসের ভিতরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখল, সঙ্গে তাঁর টেরিয়ার ছিকো। ছিকোও প্রভুর মর্জি বুঝে আনন্দে লাফাতে লাফাতে আসছে। ছাত্রেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে আবার পুরনো গানটি গাইতে লাগল। এই গানটি লেখা হয়েছিল যখন আইনস্টাইন প্রথম প্রিন্সটনে আসেন। আর্থার বেখার্ডের বই থেকে গানটি উদ্ধৃত করা হল।

"Oh, the bright boys they all study math—
studee math—
And Albie Einstein points the path—
points the path—
Although he seldom takes the air—
We wish to God he'd cut his hair."

পূর্বের মতই সবার প্রিয় এই মানুষটি কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে ছাত্রদেরকে আঙুল দিয়ে কলা দেখিয়ে জিভ ভেংচে তাঁর তরুণ বন্ধুদেরকে আরও আনন্দিত করে তুললেন।

আইনস্টাইন এই সময়ে লিখলেন, "মানবজাতির ধ্বংসের জন্যে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়ার আবিষ্কার দেশলাই আবিষ্কারের চেয়ে অধিকতর ভীতিপ্রদ নয়।"

তিনি বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানীদের ও চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করলেন পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়টি। তিনি তাঁদেরকে প্রিন্সটনে তাঁর গৃহে মাঝে মাঝে এসে এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমন্ত্রণ জানালেন। কাগজে কাগজে, পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হতে থাকল—

তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনের ব্যবহার গলগণ্ড রোগ
নিরাময় করতে পারে;
নিউট্রন রশ্মি ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের
জন্যে ব্যবহৃত হয়;

পরমাণু শরীরের হাড়ের ক্ষয়
প্রতিরোধ করে ;
পারমাণবিক চুল্লীতে নানারূপ পদার্থের আইসোটোপ
তৈরি হয়, সেগুলি চিকিৎসা ছাড়াও অধিকতর ফসল
ফলাতে সাহায্য করে ;
পারমাণবিক চুল্লীর তাপ-বিদ্যুৎ জন্মানোর কাজে
ব্যবহৃত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ায় পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বানাবার প্রতিযোগিতা দেখে আইনস্টাইন খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করে কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি একটিতে লেখেন, "মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দূর করবার কি কোন পথ আছে? আমাদের সবাইয়ের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আমরা একটি বাইরের শত্রুকে পরাজিত করলেও, যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট মানবতাকে দূর করতে পারি নি। যতদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা মনে রেখে প্রতিটি কাজ করা হবে, ততদিন কখনও স্থায়ী শান্তি পাওয়া যাবেনা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যে চাই সব রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা। প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্মতির প্রয়োজন একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করবার, যার হাতে থাকবে সমস্ত পৃথিবীর প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা। তাহলে পৃথিবীর মানুষের কিছুটা নিরাপত্তার ভাব আসবে। এই সংস্থাকে বলা যেতে পারে 'Supranational Organization' (অধিজাতীয় সংস্থা) অথবা 'Restricted World Government' (সীমিত বিশ্ব সরকার)।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু ও অমরতা

1949 সালের শুরুতে আইনস্টাইন পেটে তীব্র ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকেন, চিকিৎসকেরা নানাভাবে পরীক্ষা করে কিছু স্থির করতে না পেরে ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ করেন। নিশ্চিত হবার জন্যে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেখা গেল যে, চিকিৎসকেরা যা সন্দেহ করেছিলেন তা নয়। তারপর তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগলেন। 14ই মার্চ তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিন এসে গেল। তিনি এই দিনটির বেশীর ভাগ সময় কাটালেন তাঁর বালক-বালিকা বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকারের গল্পে, হাসিঠাট্টাতে।

বহুজনের কাছ থেকে আইনস্টাইন এই জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র পেয়েছিলেন। এই সব অনেক চিঠির উত্তরে তাঁর নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা বোধের আভাস পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বন্ধু সোলোভিনকে চিঠির উত্তরে যা লিখেছিলেন তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল। তিনি লিখেছেন, "তোমার প্রীতিভরা চিঠি আমার মর্মস্পর্শ করেছে। এই বেদনাদায়ক উপলক্ষে অন্য যে অগণিত চিঠি আমি পেয়েছি, সেগুলির সঙ্গে তোমার চিঠির অনেক প্রভেদ। তুমি মনে করেছ যে, আমি আমার জীবনের কার্যাবলীকে স্মরণ করে মনে শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব করি। কিন্তু গভীরভাবে যাচাই করে দেখলে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটি অতটা আনন্দদায়ক ও উজ্জ্বল নয়। এমন কোন ধারণা নেই যে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত হতে পারি। এমন কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে, আমি ঠিক পথে চলেছি। সমকালীন বিজ্ঞানীরা আমাকে প্রচলিত মতবাদের বিরোধী মতাবলম্বী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন এবং তাঁদের অভিমত অনেকটা যেন এই যে, আমার দিন শেষ হলেও আমি বেঁচে রয়েছি।

আইনস্টাইন এই বছরেই ইনস্টিট্যুটের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের সমাধানের জন্যে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করলেন।

এই বছরেই জবাহরলাল নেহরু প্রথমবার আইনস্টাইনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

1952 খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ডঃ ওয়াইজম্যানের মৃত্যু হলে ইজ্‌রায়েলের অধিবাসীরা আইনস্টাইনকে সেখনকার প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইন এই পদ গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে লিখেছিলেন, মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে কোন জ্ঞানই তাঁর নেই, সুতরাং এই পদ গ্রহণে তিনি নিতান্ত অনুপযুক্ত।

1955 খ্রীস্টাব্দে জুরিখ পলিটেকনিকের শতবর্ষ পূর্তির উপলক্ষে একটি বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশ করবার জন্যে আইনস্টাইন কয়েক পাতায় তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লেখেন। এতে তিনি লিখেছেন তাঁর পলিটেকনিকে ভর্তি হবার প্রথম চেষ্টা, আরাউয়ের ক্যাণ্টন বিদ্যালয়ে তাঁর এক বছর অধ্যয়ন এবং ঐ বিদ্যালয়ের স্বাধীন আবহাওয়ার কথা। ঐ বিদ্যালয়েই আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম চিন্তার সূত্রপাতের বিষয়টি লেখেন। এই বিষয়টি হল যে, যদি একজন মানুষ একটি আলোর রশ্মির পিছে সমবেগে ছুটে সেটিকে ধরতে চেষ্টা করে, তাহলে মানুষটির কাছে আলোককে মনে হবে একটি স্থির তরঙ্গ। এই অসঙ্গত ব্যাপারটি (কারণ আলোর তরঙ্গ স্থির হতে পারে না, নিয়ত প্রতি সেকেণ্ডে 300,000 কিলোমিটার বেগে গতিশীল) চিন্তা করতে করতেই 1905 খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ "On the Electrodynamics of Moving Bodies" অর্থাৎ "চলন্ত বস্তুগুলির বৈদ্যুতিক গতিতত্ত্ব সম্বন্ধে" লেখেন, এবং এটিই হল বিশেষ আপক্ষিকতাবাদের সূচনা।

তারপর আইনস্টাইন আত্মজীবনীতে লিখেছেন তাঁর ছাত্রজীবনের কথা এবং গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর মনোভাব। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্সেল গ্রসম্যানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আইনস্টাইন বার্ণের পেটেণ্ট অফিসের কথাও স্মরণ করে লিখেছেন যে, সেখানকার পরিস্থিতি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতার বিষয়টি একটু বিশদভাবে তিন পাতায় লিখেছেন।

তারপর শেষ অনুচ্ছেদে আইনস্টাইন একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের মীমাংসার জন্যে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার কথা লিখে শেষ করেছেন প্রসিদ্ধ লেখক লেসিংয়ের (Lessing) একটি বাক্য দিয়ে। সেটি হল "The search for truth is more precious than its possession"—"সত্যকে পাওয়ার চেয়ে সত্যের অনুসন্ধান অধিকতর মূল্যবান"।

আইনস্টাইনের সত্য হল বাস্তব বিশ্বের সত্য, বিশ্বের যথার্থ রূপ। বিশ্বের সত্যকে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানের মতবাদ যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে, বিগত কালে যে মতবাদকে যথার্থ বলে মনে হয়েছে পরবর্তী কালে তার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে নূতন মতবাদের। এই ভাবেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে। "সত্যের অনুসন্ধান"-এর অর্থই হল যে, পুরনো তত্ত্বকে ভিত্তি করে চিন্তা ও গবেষণাতে সেই পুরনো তত্ত্বের স্থলে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসম্পন্ন নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি। এই হল তত্ত্বগুলির ও তাদের সৃষ্টিকারীদের ভাগ্য।

বিজ্ঞানের চিন্তা আইনস্টাইনের জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাঁর নিজের জীবন ও মৃত্যুর প্রতি মনোভাব বিজ্ঞানের প্রতি মনোভাবের থেকে আলাদা ছিল না। মিসেস বর্নের কাছে 1916 খ্রীস্টাব্দে রোগশয্যায় শুয়ে মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, যা একাধিকবার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি পুনরায় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন' "আমি মরতে ভয় পাই না। নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এত জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ—সে বিষয়ে জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত নই।"

একবার একজন দর্শনপ্রার্থী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার জীবন সফল কিংবা বিফল, আপনার মৃত্যুশয্যায় এই প্রশ্নের কি জবাব দেবেন?"

আইনস্টাইন এই প্রশ্নের বিবেচনাহীনতার প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে এর জবাবে তাঁর স্বভাবসুলভ সরল আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, "এই বিষয়টিতে আমার মৃত্যুশয্যায় কিংবা অন্য যে-কোন সময়ে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত হব না, কারণ আমি প্রকৃতির একটি অতি সামান্য কণিকা মাত্র।"

ইনফেল্ডের সঙ্গে কথোপকথনে একবার আইনস্টাইন বলেছিলেন, "জীবন

একটি রোমাঞ্চকর প্রদর্শনী। আমি এটিকে উপভোগ করি। এটি চমৎকার। কিন্তু যদি আমি জানি যে, আমাকে তিন ঘণ্টা পরেই মরতে হবে, তবে আমার মনের উপর এর প্রভাব অতি তুচ্ছই হবে। আমি চিন্তা করে ঠিক করব ঐ শেষ তিন ঘণ্টা কাটাবার সর্বোত্তম উপায়টি কি, তারপর সময় হলে ধীরে সুস্থে আমার কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে শান্ত মনে শুয়ে পড়ব।"

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আইনস্টাইনের সৎ-মেয়ে মারগৎ কোমরের বাতে অসুস্থা হয়ে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে যান। আইনস্টাইন প্রতি দিন হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতেন। একদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে হাসপাতাল থেকে ফিরবার সময় তাঁরা দু-জনে অনেকটা পথ হেঁটে আসবার সময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করেন। বন্ধুটি বললেন যে, মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি রহস্যময়। আইনস্টাইন বললেন, "এবং মুক্তিও বটে।"

13ই এপ্রিল আইনস্টাইন পেটের ডান পাশে তীব্র ব্যথা বোধ করাতে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করলেন পিত্তকোষের (gall bladder) স্ফীতি। তাঁরা অস্ত্রোপচার করতে চাইলে আইনস্টাইন অসম্মত হলেন। এই হাসপাতালেই মারগৎ ছিলেন। 17ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় মারগৎকে চাকাযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে আইনস্টাইনের শয্যাপাশে আনা হল। তিনি মারগৎকে দেখে খুশী হলেন, তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর শুভ রাত্রি জানালে মারগৎকে নিয়ে যাওয়া হল। মাঝ রাতের কিছু পরে কর্তব্যরতা নার্স লক্ষ্য করলেন যে, আইনস্টাইন তাঁর ঘুমের ভিতর গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। নার্সটি ভীতা হয়ে দৌড়ে দরজার কাছে গেলেন চিকিৎসককে ডাকতে। হঠাৎ আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলেন। নার্সটি জার্মান ভাষা বুঝতেন না বলে দৌড়ে আবার বিছানার কাছে এলেন। তখন রাত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আইনস্টাইন আর জীবিত নেই। মানবপ্রেমিক আইনস্টাইন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরে তাঁর দেহব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায় যে, তাঁর পেটের একটি শিরায় রক্তক্ষরণ হয়েছিল। প্যাথোলজিস্ট ডঃ টমাস হারভে এই ময়না তদন্ত করেন।

আইনস্টাইনকে অনেক লোক জিজ্ঞাসা করতেন যে, তাঁর ল্যাবরেটরী কোথায় ও যন্ত্রপাতি কোথায়। তখন তিনি তাঁর মস্তক দেখিয়ে বলতেন যে,

সেইটি তাঁর ল্যাবরেটরী ও কলমটি দেখিয়ে বলতেন যে, সেটি তাঁর যন্ত্রপাতি। অনেকের অনুরোধে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য তাঁর মস্তিষ্ক রেখে দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ডঃ হারভে আইনস্টাইনের ময়না তদন্ত করবার সময়ে তাঁর মস্তক থেকে মস্তিষ্ক (brain) বের করে ক্যানসাসের উইচিতায় এক ল্যাবরেটরীতে এই মস্তিক রেখেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য। ডাঃ হারভে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলেন নি। কবে এই পরীক্ষা শেষ হবে তার কোন সময়ও নির্দিষ্ট করা হয়নি। একটি পাথরের পাত্রে একটি পরিষ্কার তরল পদার্থে মস্তিষ্কের কিছু কিছু টুকরো ভাসতে দেখা যায়। ১৯৭৮ সনের ২৯শে জুলাই একটি সংবাদ সংস্থার খবরে জানা যায় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে। ডঃ হারভে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এসে মস্তিষ্কটি পরীক্ষা করেছেন।

সমস্ত পৃথিবীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, জ্ঞানের তপস্যা, মানবপ্রেম ও চারিত্রিক মহত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয়ে অপূর্ব মাধুর্যে মহীয়ান আইনস্টাইনের মহাপ্রয়াণ হয়েছে 18ই এপ্রিল ভোর 1টা বেজে 25 মিনিটে প্রিন্সটনের হাসপাতালে। প্রতিটি দেশের রেডিওতে এবং প্রতিটি সংবাদপত্রে সমস্ত মানুষ, বিশেষ করে, সাধারণ স্তরের মানুষ অতি শোকার্ত হৃদয়ে জানতে পারল যে, যে হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল সর্বস্তরের মানুষের প্রতি ভালবাসার সুধারস সেই হৃদয়ের স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

বহু মনীষী এই মহামানবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। নীল্‌স্ বোর, লুই দ্য ব্রগ্‌লি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলচন্দ্র সেন, জবাহরলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন মনীষীর শ্রদ্ধাঞ্জলির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার শোকার্ত হৃদয়ে আইনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, "বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের বিস্তারে দানের পরিমাণ তাঁর চেয়ে আর কারোর অত বেশী নয়। তবুও জ্ঞানরূপ শক্তির অধিকারী অন্য কেউ তাঁর মত অত বিনয়ী ছিলেন না, অন্য কারোর অত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে, জ্ঞানবিহীন শক্তি মারাত্মক। এই পারমাণবিক যুগে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের কাছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন স্বাধীন সমাজে একক ব্যক্তির মহৎ সৃজন ক্ষমতার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।"

প্রিন্সটনে ও যেখানে যেখানে আইনস্টাইন গিয়েছেন, সেখানকার তাঁর

শিশু বন্ধুরা অশ্রু ছলছল নয়নে শুনল যে, তাঁদের ভালবাসবার ও খেলার সঙ্গীটি আর নেই, আর ব্যথায় ভরা হৃদয়ে জানল ঐ সব জায়গার অতি সাধারণ স্তরের মানুষেরা—তাদের আনন্দ দান করবার জন্যে যে মানুষটি ব্যগ্র ছিলেন, তাদের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে থাকতেন যে মানুষটি—তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অমরতা

যতদিন মানবসভ্যতা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন বিরাজমান থাকবে বিজ্ঞান-জগৎ, যে জগতে চলতে থাকবে সত্যানুসন্ধান, আর থাকবে আইন-স্টাইনের নাম। যুগাতীত মহামানব আইনস্টাইন, বিশ্ববন্দিত এই বিজ্ঞানী সর্বকালের চিন্তানায়ক, সমগ্র পৃথিবী তাঁকে যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ নিউটন, বিংশ শতাব্দীর মানুষ আইনস্টাইন, কে জানে, আরো কত শতাব্দী পরে এমন প্রতিভাসম্পন্ন যুগমানব আবার আবির্ভূত হবেন?

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রাউনীয় বিচলন তত্ত্ব

1905 খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' প্রকাশের কিছু পূর্বে আইনস্টাইন অণুর বিচলন (molecular movement) সম্বন্ধে সনাতন তত্ত্বের উপর কতকগুলি প্রবন্ধ 'অ্যানালেন ডের ফিজিক' (Annalen der Physik) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির শেষেরটিতে কোন তরল পদার্থে অবস্থিত দৃশ্যমান আণুবিক্ষণিক বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার বিচলনের ব্যাখ্যা লেখেন। তরল পদার্থে অবস্থিত এই সব ক্ষুদ্র কণিকার বিচলনকে বলা হয় ব্রাউনীয় বিচলন।

1827 খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন নামে একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী জলের ভিতরে রাখা ফুলের পরাগরেণু নিয়ে গবেষণা করবার সময় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একদিন লক্ষ্য করলেন যে, রেণুগুলি একপ্রকার বিশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম গতিতে নড়াচড়া করছে। তিনি প্রথমে ভাবলেন যে, এই অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে নড়াচড়া বোধ হয় পরাগরেণুগুলির একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু তিনি রজন (gamboge) ও অন্যান্য কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র কণিকা নিয়ে পরীক্ষা করে একই ফল দেখতে পেলেন। তিনি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। তিনি এইরূপ নড়াচড়ার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করলেন। তাঁর নামানুসারে এই কণিকাগুলির নড়াচড়াকে বলা হল ব্রাউনীয় বিচলন (Brownian Movement)।

অনেকদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর প্রকৃত কারণ জানতে পারেন নি। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে পেলেন :

> পরাগরেণুগুলির বিচলন সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও দিকশূন্য; একই জায়গায় পাশাপাশি অবস্থিত রেণুগুলির নড়াচড়া বিভিন্ন, কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই, যার থেকে বোঝা যায় যে, জলের কোন প্রকার গতির সঙ্গে এই নড়াচড়ার বা বিচলনের কোন যোগাযোগ নেই; যে পাত্রে জল আছে, সেই পাত্রের ঝাঁকুনির

উপরেও এই বিচলন নির্ভর করে না; রেণুগুলি যত ক্ষুদ্র হবে, নড়াচড়াও ততই বেড়ে যাবে; এই বিচলন নিরন্তরভাবে চিরকাল চলতে পারে।

জলের বা যে-কোন তরল পদার্থের ভিতরে রাখা এই কণিকাগুলির নড়াচড়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, কণিকাগুলি ঐ তরল পদার্থের অণুগুলির বিশৃঙ্খল বিচলনের ইঙ্গিত দেয়। এই ব্যাখ্যাটি সর্বপ্রথম দেন ডেলসক্স (Delsaux) 1877 খ্রীস্টাব্দে। আইনস্টাইন এই ব্যাপারটির একটি পূর্ণ গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন 1905 খ্রীস্টাব্দে। তিনি তাপগতিবিদ্যার নিয়ম (Law of Thermodynamics) দিয়ে এর বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

আমরা জানি যে, যখন একটি কঠিন (solid) বস্তুকে গরম করা যায়, বস্তুটির কণিকাগুলির গতিশক্তি (kinetic energy) বৃদ্ধি পায়। কঠিন বস্তুতে প্রতিটি কণিকা তার চারপাশে অবস্থিত কণিকাগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং এই সব কণিকা অভ্যন্তরের কণিকাটিকে চেপে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। তাপের পরিমাণ বাড়তে থাকলে কতকগুলি কণিকার গতি-শক্তি অতিমাত্রায় উচ্চ হয়, যার ফলে এই কণিকাগুলি তাদের পরিবেষ্টন-কারী কণিকাগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এর ভিতর যে সব কণিকার গতিশক্তি খুবই বেশী হয়েছে, সেগুলি তাদের স্পন্দনে কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়, যেমন একটি রকেটকে চাঁদে পৌঁছতে হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ পেরিয়ে যেতে হবে, যার জন্যে রকেটটির বেগের পরিমাণ হতে হবে 11.2 কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড এবং সূর্যের মহাকর্ষ থেকে পেরিয়ে যেতে হলে অর্থাৎ সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে বেগের পরিমাণ হতে হবে 16.8 কিঃ মিঃ/সে. অথবা পৃথিবীর স্বাভাবিক আবর্তন গতির বেগ 30 কিঃ মিঃ/সে. থেকে যদি হঠাৎ বেড়ে 42 কিঃ মিঃ/সে. হয়ে যায়, তবে গতিশক্তির আধিক্যের জন্যে পৃথিবী একটি অধিবৃত্তাকার পথে (parabola) সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যাবে।

এখন যদি ঐ কঠিন বস্তুটির উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়ানো হতে থাকে, তবে ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যার কণিকা বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে থাকবে এবং অবশেষে যখন বস্তুটির সব কণিকারই এই অবস্থা হবে, তখন বস্তুটি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায়

আসবে। প্রতিটি বস্তুরই তার নিজস্ব একটি উষ্ণতা আছে, যার উপরে বস্তুটি তরল অবস্থায় থাকে, যেমন শূন্য ডিগ্রী সেল্‌সিয়াসের উপরে জল তরল অবস্থায় থাকবে। জল কঠিন হয়ে বরফ হলে তার উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রী বা তার কম হতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি কঠিন অবস্থায় থাকবে, চারপাশের অণুগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্পন্দনরত কণিকাগুলি হয় ইলেকট্রন, আর নয়তো পরমাণু। বস্তুর তরল অবস্থায় ইলেকট্রন কিংবা পরমাণুগুলির স্বতন্ত্র-ভাবে নড়াচড়া করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, কারণ এই সব কণিকা একত্রিত হয়ে অণুতে পরিণত হয় এবং প্রতিটি অণুর তার আভ্যন্তরিক পরমাণু কিংবা ইলেকট্রনগুলিকে বেঁধে রাখার শক্তি তাপ থেকে উৎপন্ন গতিশক্তির চেয়ে অনেক বেশী; সেজন্যই তরল অবস্থায় যে সব কণিকা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, তারা সাধারণতঃ অণু।

তরল পদার্থের অণুগুলি সব সময়েই বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো (random) গতিতে চলাফেরা করতে থাকে। এখনও পর্যন্ত কোন প্রযুক্তি বা কলা-কৌশল আবিষ্কৃত হয় নি, যার দ্বারা এই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা অণুগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এমন কি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও পারা যায় না, কিন্তু পরাগরেণুর মত অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র কণিকা ঐ তরল পদার্থে রাখলে সেগুলি অণুগুলির নড়াচড়ার ইঙ্গিত প্রকাশ করে।

আইনস্টাইনের বিশেষত্বই ছিল যে, তিনি প্রকৃতির মৌলিক প্রক্রিয়া-সমূহের কারণ গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। এই সব তত্ত্ব ছিল সব দিক দিয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও আন্তরপূর্ণতাসম্পন্ন (harmony and internal perfection), পজিটিভিসম বা প্রত্যক্ষবাদের শুধুমাত্র বর্ণনা নয়।

গতিতত্ত্বে (kinetic theory) তাপের উৎপত্তির কারণ হল অণুসমূহের এলোমেলো বিচলন ও পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি। তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) তত্ত্বসমূহ বহু অণুর সমষ্টিগত আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোন একক বা বিশেষ অণুর (individual molecule) কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। এইরূপ কার্যবিধির ব্যাখ্যাতে পরিসাংখ্যিক সম্ভাব্যতার (statistical probability) সাহায্য নিতে হয় এবং

সমষ্টিগত কার্যবিধির সম্ভাব্যতা থেকেই কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়।

এই সম্ভাব্যতার সহজ উদাহরণ বলা যেতে পারে একটি মুদ্রাকে কয়েকবার উপরে নিক্ষেপ করে, যাকে বলা হয় 'টস' (toss) করা, 'হেড' ও 'টেইলের' সংখ্যা নির্ণয় করা। সম্ভাব্যতা সূত্রে আমরা বলতে পারি যে, মুদ্রাটি মাটিতে পড়লে 'হেড' কি 'টেইলের' সংখ্যা হবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। যদি 100 বার টস করা যায়, তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, 'হেড' হবে 50 বার ও 'টেইল' হবে 50 বার। যদি 1000 বার টস করা যায়, 'হেড' হবে 500 বার ও 'টেইল' হবে 500 বার। যদি টসের সংখ্যা বেশী হয়, তবে সম্ভাব্যতার যৌক্তিকতা অধিকতর ভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি টসের সংখ্যা কম হয়, যেমন 4 বার, হয়তো প্রত্যেকবারই 'হেড' কি 'টেইল' হবে। সেইজন্য বৃহৎ সংখ্যার বা macroscopic number-এর উপরে সম্ভাব্যতার যুক্তি উপযুক্ত বলে ধরা যেতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র সংখ্যার বা microscopic number-এর উপরে এই যুক্তি সেরূপ সঠিক ফল দেবে না।

এইরূপ যুক্তি বস্তুর অণুগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কোন বস্তুর অল্পসংখ্যক অণু, ধরা যাক গোটা দশেক, বিবেচনা করলে হয়তো দেখা যাবে যে, প্রতিটি অণুর নড়াচড়া অন্যগুলির নড়াচড়া থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই। বিভিন্ন অণুর নড়াচড়ার পরিমাপ ও সময় বিভিন্ন। সুতরাং এই কয়টি থেকে আমরা কোন সময়েই অণুদের বিচলন বেগের ধারণা পাই না। এদের ক্ষেত্রে তাপগতিবিদ্যার তত্ত্ব প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু বহু সংখ্যক অণুর সমষ্টিগত আচরণ বিবেচনা করলে আমরা সম্ভাব্যতা তত্ত্বের দ্বারা বলতে পারি যে, বেশ অনেকগুলি অণুর বিচলন সব বিষয়েই একই প্রকারের, যা থেকে কোন একটি উষ্ণতায় অণুগুলির বিচলনের একটি মধ্যক সমবেগের (mean uniform velocity) ধারণা করতে পারি। উষ্ণতা বাড়ালে অণুগুলির নড়াচড়াও বেড়ে যাবে বলে মধ্যক বেগ বেড়ে যাবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বহুসংখ্যার ক্ষেত্রে একটি সাম্য ও সুসামঞ্জস্যভাব বিবেচনা করা যেতে পারে—যেটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাতে বিদ্যমান নেই। এই ধারণা আইনস্টাইনের তরুণ বয়স থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ ছিল। এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণার জন্যেই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যার' সৃষ্টিকর্তা

তরুণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একমত না হয়ে 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' (unified field theory) আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন।

আইনস্টাইন 'ব্রাউনীয় বিচলনের' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে, জলের অণুগুলির এলোমেলো ভাবে বিচলনই হল পরাগ রেণুগুলির অবিরাম নড়াচড়ার কারণ। কোন একটি রেণু তার চারপাশের জলের অণুগুলির নড়াচড়ার জন্যে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে। অণুগুলির বিচলন এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল হবার জন্যে পরাগ রেণুটির চারপাশের ধাক্কা অসমান হচ্ছে এবং সেইজন্যেই রেণুটি নড়াচড়া করছে। রেণুটির আয়তনের উপরে এই অসমতা নির্ভর করবে। রেণুট যত বড় হবে, তাকে পরিবেষ্টনকারী জলের অণুসংখ্যা ততই বেশী হবে। সম্ভাব্যতা অনুযায়ী অণুগুলির নড়াচড়ায় একটি মধ্যক সমতা আসবে এবং রেণুটির উপরে চারপাশের ধাক্কায় সমতা বাড়বে বলে রেণুটির নড়াচড়াও কম হবে। কিন্তু রেণুটি যত ছোট হবে, চারপাশের পরিবেষ্টনকারী অণুর সংখ্যা কম হবে বলে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাব তত বেশী হবে এবং রেণুটির উপরে চারপাশের ধাক্কার অসমতা বেড়ে যাবে বলে বিচলন বেশী হবে।

আইনস্টাইন এই পরাগ রেণুগুলির চলন সম্বন্ধে একটি গাণিতিক সূত্রও বের করেন। আইনস্টাইনের এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীরা চমৎকৃত হলেন। 'ব্রাউনীয় বিচলনের' কারণ সম্বন্ধে কারোর দ্বিধা রইল না। নের্নস্টের (Nernst) মত তখনকার দিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তরুণ আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করলেন।

অণু-পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তিতেই আইনস্টাইন 'ব্রাউনীয় বিচলনের তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত দার্শনিক-বিজ্ঞানী মাখ এবং ওস্টওয়াল্ড পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না বলে পরমাণু তত্ত্ব (atomic theory) বিশ্বাস করতেন না। অণু ও পরমাণুর মত দৃশ্যমান নয়, এরূপ বস্তুগুলির গতিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তাঁদের মতে শুধুমাত্র তত্ত্বীয় জ্ঞান এবং এগুলি পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত না হয়ে হবে দর্শনের অধিবিদ্যার (metaphysics) বিষয়।

আইনস্টাইন এই সব বিজ্ঞানীদের উল্লেখ করে বলেছেন, "এই সব পণ্ডিতদের পরমাণু তত্ত্বের প্রতি বিরোধিতার কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যেতে

পারে তাঁদের প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাস। এই মতবাদী পণ্ডিতদের ধারণা যে, বিজ্ঞানীদের পক্ষে প্রকৃতির ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে শুধু বর্ণনা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। এটি কৌতূহলের ব্যাপার যে, এই সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব সত্যের ধারণা দার্শনিক কুসংস্কারে বিকৃত হতে পারে।"

1909 খ্রীস্টাব্দে পের্ঁ্যা (Perrin) আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে গবেষণা করেন। তিনি কতকগুলি রজনের (gamboge) অতি ক্ষুদ্র কণিকা রজনের চেয়ে কিছু কম ঘনত্বের (density) তরল পদার্থে রাখলেন। যেহেতু রজনের ঘনত্ব বেশী, সেই হেতু রজন কণিকাগুলির সাধারণ পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে তলায় পড়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, রজন কণিকাগুলি তলায় না পড়ে কিছু উপরে তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থেকে নড়াচড়া করছে। এটি হচ্ছে এই জন্যে যে, তরল পদার্থটির অণুগুলি সব দিক থেকে রজন কণিকাগুলির উপরে ধাক্কা দিচ্ছে এবং ধাক্কাগুলি অসমান হচ্ছে বলেই রজন কণিকাগুলি নীচে না পড়ে তরল পদার্থটির ভিতরে অবস্থিত থেকে নড়াচড়া করছে। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কণিকাগুলির নড়াচড়ার পরিমাপ করে তরল পদার্থটির অণুগুলির ওজনের একটি ধারণা পেলেন এবং এই আণবিক ওজনের মান অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারা আণবিক ওজনের মানের সঙ্গে মিলে গেল দেখে তরল পদার্থের গতিতত্ত্বের অথবা আইনস্টাইনের 'ব্রাউনীয় বিচলনের' ব্যাখ্যার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না।

দশম পরিচ্ছেদ

আলোক-বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া

আলোর রূপ কি—এই বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ নিউটনের সময় থেকে শুরু হয়েছে। নিউটনের মতে আলো হল বালুর কণিকার চেয়েও অতি সূক্ষ্মতর আণুবীক্ষণিক (microscopic) বস্তুকণিকার (corpuscles) সমষ্টি। আলোর উৎস (source) থেকে বহু সংখ্যক আলোর কণিকা আমাদের চোখে এসে পড়ে বলে আমরা আলো দেখতে পাই। এইসব কণিকা শূন্যস্থান (empty space) দিয়ে সরল রেখায় এসে আমাদের চোখে পড়ে বলে আলোর উৎসটির রূপ ধরা পড়ে। নিউটন কণিকা তত্ত্বের (corpuscular theory) দ্বারা আলোর এক মাধ্যম (medium) থেকে অন্য এক মাধ্যমে আপতন (incidence) হেতু প্রতিফলন (reflection) ও প্রতিসরণ (refraction) এই দুয়েরই ব্যাখ্যা করেন। নিউটন আলোর বিভিন্ন রঙের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, সাদা আলোর ভিতরে সব রঙই আছে অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের কণিকার সমষ্টিগত ফল হল সাদা আলোর কণিকা। এই সাদা আলো একটি ত্রিপার্শ্ব কাচের (prism) ভিতর দিয়ে গেলে বিভিন্ন রঙের কণিকা আলাদা হয়ে যায়।

কিন্তু নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী হুইগেন্স (Huygens) 1678 খ্রীস্টাব্দে বললেন যে, শব্দ যেমন শক্তি, যা তরঙ্গ আকারে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় যায়, তেমনি আলোও হল শক্তি, যা উৎস থেকে নির্গত হয়ে তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য এক স্থানে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ নিউটনের মতবাদ অনুযায়ী বস্তুকণিকার ক্ষেপণের (shooting of material particles) দ্বারা নয়। হুইগেন্স তাঁর আলোর তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়ে প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও বিভিন্ন রঙের কারণের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের প্রবাহের জন্য কোন একটি বস্তুমাধ্যমের প্রয়োজন, সে মাধ্যম কঠিন

(solid), কি তরল (liquid) কিংবা বায়বীয় (gaseous) একটি কিছু হতে হবে, যেহেতু আমরা যাকে শূন্য স্থান বলি সেইরূপ স্থান দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ যেতে পারে না। অথচ আলোর তরঙ্গ সেইরূপ স্থান দিয়ে অনায়াসে পূর্ণ বেগে যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু কোন তরঙ্গের সৃষ্টির ও প্রবাহের জন্যে একটি মাধ্যমের প্রয়োজন, আলো যদি তরঙ্গ হয়, তবে একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। বিশ্বের সর্বত্র আলো বিরাজমান কিন্তু আমাদের জানা কোন বস্তুমাধ্যমের বিশ্বের সকল স্থানে অবস্থিতি গণিতশাস্ত্রমতে অসম্ভব। এই জন্যে হুইগেন্স কল্পনা করলেন এমন একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব, যা বিশ্বে সকল স্থানে এবং সকল বস্তুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই মাধ্যমকে তিনি বললেন ঈথার।

প্রায় 150 বছর ধরে আলোর রূপের মীমাংসা হল না, যদিও বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিতেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ফ্রেনেল (Fresnel) ও ইয়ং (Young) নামে দুই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে, দুটি সরু আলোর রশ্মি উপযুক্ত অবস্থায় মিশলে অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে এবং ফোটোগ্রাফী প্লেটে এইরূপ দুটি রশ্মির মিলনের ফলে যা সৃষ্টি হল, তার উজ্জ্বলতা সব জায়গায় সমান নয় কিন্তু কতকগুলি উজ্জ্বল ও কালো ডোরার (bands) সমষ্টি। দুটি আলো মিলে অন্ধকার সৃষ্টি করবার ব্যাখ্যা কণিকা-তত্ত্বের দ্বারা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তরঙ্গ-তত্ত্বের দ্বারা। কোন তরঙ্গে আমরা দেখতে পাই এক জায়গায় উঁচু বা তরঙ্গশীর্ষ (crest) ও তারপরই নীচু, যাকে বলে তরঙ্গতল (trough)। সর্বতোভাবে সমান দুটি আলোর তরঙ্গের যদি কোথাও শীর্ষের সঙ্গে শীর্ষের (crest to crest) ও তলের সঙ্গে তলের মিলন ঘটে, তবে সেখানে আলো উজ্জ্বলতর হবে। কিন্তু একটির শীর্ষ অন্যটির তলের উপর পড়লে (crest to trough) দুটি মিলে তরঙ্গটির বিলোপ সাধন করবে বলে সেখানে আলোর অভাবহেতু অন্ধকার দেখাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি আলোর তরঙ্গের সংঘর্ষ আলো ও অন্ধকার নক্সার (pattern) সৃষ্টি করতে পারে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় আলোর ইন্‌টারফিয়ারেন্স বা ব্যতিচার (interference of light)।

আর একটি বিষয়ে আলোর তরঙ্গ-তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। আলোর পথে যদি একটি অনচ্ছ (opaque) বস্তু রাখা যায়, তবে বস্তুটির ছায়া পড়ে। একটি

পর্দায় বা ফোটোগ্রাফী প্লেটে ছায়াটি ধরা যেতে পারে। অনচ্ছ বস্তুটি সাধারণ আয়তনের হলে, ছায়াটির ধারগুলি মনে হবে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। এটি হয় সাধারণভাবে বলতে গেলে আলো সরল রেখায় যায় বলে।

এই ব্যাপারটিকে আলোর কণিকা-তত্ত্ব ও তরঙ্গ-তত্ত্ব দুটি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটে যদি আলোর পথে প্রতিবন্ধকটি খুবই ছোট ও সূক্ষ্ম আকারের হয়। এইরূপ বস্তুটির প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন ছায়া পড়বে না। ফোটোগ্রাফী প্লেটে দেখা যাবে একটি অস্পষ্ট ছায়ার চারপাশে পর্যায়ক্রমে (alternately) কতকগুলি উজ্জ্বল ও অন্ধকার বৃত্তাকার ছায়া। এটিতে প্রমাণ হয় যে, আলো প্রতিবন্ধকটির দু-ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে মিশে ঐরূপ আলো ও অন্ধকার ছায়া, পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যতিচার নক্সার সৃষ্টি করেছে। এটি সম্ভব হবে যখন প্রতিবন্ধকটির আয়তন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমরা জানি যে, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, বেগনী আলো থেকে লাল আলো পর্যন্ত হল 0·00004 সেন্টিমিটার থেকে 0·00008 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ থেকে আট ভাগ পর্যন্ত। কোন বাধার ধার ঘেঁষে বেঁকে যাওয়াকে বলে ডিফ্রাকসন (diffraction)। এই ডিফ্রাকসন ব্যাপারটি প্রমাণ করে যে, আলো তরঙ্গ, কারণ আলো যদি কণিকা হয়, তবে সব সময়েই সরল পথে চলবে, বাধার ধার ঘেঁষে বেঁকে যেতে পারবে না।

প্রথম উদাহরণটিতে ছায়াটির ধারগুলি সৃষ্ট হবার কারণ এই যে, আলোর পথে বাধাটি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বহুগুণ বড় বলে দু-পাশ দিয়ে বেঁকে যাওয়া আলোর পরিমাণ ও জোর এতই ক্ষীণ হবে যে, ছায়াটির ধারে ব্যতিচার নক্সাটি দৃষ্টিগোচর হবে না এবং সেইজন্যে ছায়াটির ধার মনে হবে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

আলোর ব্যতিচার ও ডিফ্রাকসনের জন্যে বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে, আলো হল তরঙ্গ। 1865 খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) গণিতের সূত্রে দেখালেন যে, যদি একটি দোলনসৃষ্টিকারী বর্ত্মনীতে (oscillatory circuit) বৈদ্যুতিক আধানকে (electric charge) খুব দ্রুত, যেমন সেকেণ্ডে কয়েক হাজার বা তার চেয়েও অনেক বেশী বার দোলানো যায়, তবে চারপাশের মহাকাশে তরঙ্গিত (undulatory) বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের

(electromagnetic field) সৃষ্টি হবে। এই ক্ষেত্রের যে-কোন স্থানে সম্মিলিতভাবে ও সমকোণে অবস্থিত থাকবে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র এবং এই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক অংশ (components) দুটির দ্বারা গঠিত সমতল ক্ষেত্রের সমকোণের দিকে তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রটির গতি হবে একটি নির্দিষ্ট বেগে। স্পন্দিত আধান (oscillating charge) থেকে শক্তির এই-ভাবে চারদিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে ছড়িয়ে যাওয়া হল তরঙ্গের বিশেষত্ব। এইজন্যে এইগুলিকে বলা হল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ।

যেহেতু ফ্রেনেল প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ গবেষণার দ্বারা আলোর তরঙ্গরূপ প্রমাণ করেছিলেন এবং এই তরঙ্গের বেগ বের করেছিলেন সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল বা 300,000 কি. মি. এবং ম্যাক্সওয়েল তাঁর সূত্রে অঙ্ক কষে বের করে দেখলেন যে, বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের বেগ পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত আলোর বেগের সমান, তাই তিনি বললেন যে, আলো হল চলন্ত বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ। এইভাবে আলো ও বিদ্যুৎকে এক তত্ত্বের দ্বারা যুক্ত করা ম্যাক্সওয়েলের মহাকৃতিত্ব।

বৈদ্যুতিক প্রবাহে প্রতি সেকেণ্ডের কম্পন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ককে যদি বলা হয় 'f' ও এই দোলন থেকে উদ্ভূত তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে বলা হয় 'λ', তবে 'f' ও 'λ'-র গুণফল হবে আলোর বেগের সমান, অর্থাৎ $f \times \lambda = c$, যেখানে 'c' হল আলোর বেগ।

1888 খ্রীস্টাব্দে হার্ট্‌জ্ (Hertz) গবেষণাগারে একটি প্রেরক-যন্ত্রে ম্যাক্সওয়েল বর্ণিত তরঙ্গের সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন এবং 25 ফুট দূরে অবস্থিত একটি গ্রাহক-যন্ত্রে কোন কিছুর দ্বারা সংযোগ ব্যতীতই ঐ তরঙ্গগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন—জন্ম হল আধুনিক বেতার বিজ্ঞানের।

আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস দৃঢ় হল। বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে, শুধু আলোই নয়, সব রকম শক্তি এইরূপ তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। এই শক্তিগুলিকে উচ্চতর মান থেকে নিম্নতর মান অনুযায়ী ও সেই সঙ্গে তাদের আসন্ন (approximate) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্ক লিখে সাজালে হবে :

গামা রশ্মি (gamma rays)—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 5×10^{-10} সেন্টিমিটার ও তার চেয়ে কম, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে 6×10^{19} বার ও তার

অধিক ; এক্স বা রণ্টগ্যেন রশ্মি (X-rays)—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 6×10^{-10} সেঃ মিঃ থেকে 1×10^{-6} সেঃ মিঃ পর্যন্ত, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে 5×10^{19} থেকে সেকেণ্ডে 3×10^{16} বার পর্যন্ত ;

আলট্রাভায়োলেট বা অতি-বেগুনি রশ্মি (ultra-violet rays)—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 1×10^{-5} সেঃ মিঃ থেকে 4×10^{-5} সেঃ মিঃ পর্যন্ত, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে 3×10^{15} বার থেকে সেকেণ্ডে $7{\cdot}5 \times 10^{14}$ বার পর্যন্ত ; দৃশ্যমান আলোক রশ্মি—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4×10^{-5} বা 0·00004 সেঃ মিঃ থেকে 8×10^{-5} বা 0·00008 সেঃ মিঃ পর্যন্ত, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে $7{\cdot}5 \times 10^{14}$ বার থেকে সেকেণ্ডে $3{\cdot}75 \times 10^{14}$ বার পর্যন্ত ; উত্তাপ বা অবলোহিত রশ্মি (heat or infra-red rays)—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·00008 সেঃ মিঃ থেকে 0·04 সেঃ মিঃ পর্যন্ত, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে $3{\cdot}75 \times 10^{14}$ বার থেকে $7{\cdot}5 \times 10^{11}$ বার পর্যন্ত ; রেডিও তরঙ্গ—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·04 সেঃ মিঃ থেকে কয়েক শত মিটার, এমনকি কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত, কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে কয়েক হাজার মেগাসাইকেল (10^6 বার) থেকে কয়েক শত কিলো-সাইকেল (1000 বার) পর্যন্ত।

আলোর ও অন্যান্য শক্তির তরঙ্গ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু বিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে এক সমস্যার সমাধান হলে অপর এক সমস্যার উদ্ভব হয়। এইভাবে সমাধান হতে হতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়। এখন যাকে চরম সত্য বলে মনে হচ্ছে, কিছু বছর পরে হয়তো দেখা যাবে সেটিই চরম নয় কিংবা হয়তো সেই তত্ত্বের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। এই বিষয়ে বিশ্বের দুটি সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আইনস্টাইনের ধারণা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, "মানুষের চেতনায় উপলব্ধ জগতের সত্য বিজ্ঞানীদের অনুমান নির্ভর, যার জন্যে এই সত্য একেবারে চরম ও খাঁটি হতে পারে না, সময় সময় সত্যের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় রূপে যাকে বলা যেতে পারে objective extrapersonal world, সত্য শাশ্বত, এ সত্যের কোনদিন পরিবর্তন হয় না।"

আলোর তরঙ্গ তত্ত্বে দুটি সমস্যা দেখা গেল। একটি হল 1881 খ্রীস্টাব্দে মাইকেলসন-মর্লের অতি বিখ্যাত ইন্‌টারফেরোমিটার (interferometer)

যন্ত্রের দ্বারা ঈথারে আবর্তিত পৃথিবীর বেগের সঠিক মান নির্ণয় করবার প্রয়াসের ফলাফল। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেল, তাতে যদি ঈথার নামে কোন কাল্পনিক মাধ্যম স্বীকার করতে হয়, তবে পৃথিবীর কোন গতি নেই, পৃথিবী স্থির, কোপার্নিকাসের তত্ত্ব ভ্রান্ত ও তাঁর পূর্ব পর্যন্ত যে টলেমি তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, সেই তত্ত্ব পুনরায় মেনে নেওয়া দরকার; আর যদি পৃথিবীর গতি মেনে নিতে হয়, তবে ঈথার বলে কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব নেই। ঈথার না থাকলে তরঙ্গ-তত্ত্বই মিথ্যা হয়ে যায়। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করছে—কোপার্নিকাসের এই তত্ত্ব অবিশ্বাস করা আজকাল কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ঈথারের অস্তিত্ব ও তার জন্যে তরঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হল।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল আলোক-বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া (photo-electric effect)—যার মানে হল যে, আলো লিথিয়াম (lithium), সোডিয়াম (sodium), পটাসিয়াম (potassium), রুবিডিয়াম (rubidium), সীজিয়াম (caesium) ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর উপর পড়লে সেই সব ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আইনস্টাইন এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিবার পূর্বে বিজ্ঞানীরা অনেক বছর নানাভাবে এই ব্যাপারটি পরীক্ষা করে এর সন্তোষজনক কোন কারণ বের করতে পারেন নি।

1872 খ্রীস্টাব্দে স্টোলাটভ (Stolatov) একটি বায়ুশূন্য কাঁচের বোতলে বা ফ্লাস্কে (flask) দুটি ধাতুর প্লেট রেখে, প্লেটগুলি বাইরে থেকে একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করে দিলেন। কিন্তু কোন বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কারেণ্ট পাওয়া গেল না। যখন মার্কারী বা পারদের বাতি (mercury lamp) থেকে আলো একটি প্লেটের উপর ফেলা হল, তখনই বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হল। আলোটি যেই সরিয়ে নেওয়া হল, বিদ্যুৎপ্রবাহও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, কাঁচের ফ্লাস্কের ভিতর প্লেটে আলো ফেললেই বিদ্যুৎবাহী কণার সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনের অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, যেমন হার্ট্‌জ্ (Hertz), লেনার্ড (Lenard), হলবাখ্‌স (Hallwachs), এই ব্যাপারটি নানাভাবে আলোর রশ্মি ও অতি-বেগুনী রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা নির্গত

হয়। এই কণাগুলিই পরে ইলেকট্রন নামে পরিচিত হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করলেন ঃ

কোন কোন ধাতুর উপর আলো পড়লে ইলেকট্রন ঐ সব ধাতুর উপরিভাগের (surface) পরমাণু থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে ; নির্গত ইলেকট্রনগুলির বেগ আলোর উজ্জ্বলতার উপরে নির্ভর করে না ; আলোটি কাছ থেকে ফেললে নির্গত ইলেকট্রনগুলির যে বেগ হয়, আলোটি যদি ক্রমশঃ দূরে নিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ আলোর তীব্রতা বা উজ্জ্বলতা কমে যায়, ইলেকট্রনের বেগের মান হ্রাস পায় না—একই থাকে ; উজ্জ্বলতার উপরে নির্ভর করে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা, তার মানে বিদ্যুৎপ্রবাহের মান। আলো যত উজ্জ্বল হবে, নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাও তত বেশী হবে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ বেশী হবে। নির্গত ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে আলোর রঙের উপরে ; যদি সমসত্ত্ব আলো (homogeneous light) না ফেলে বিভিন্ন রঙের আলো ফেলা যায়, তবে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ বিভিন্ন দেখা যায়— সবুজ আলোতে যে বেগ পাওয়া যায়, বেগুনী আলোতে তার চেয়ে বেশী বেগ পাওয়া যায় ; কোন কোন ধাতুর উপর আলোর বর্ণালীর (spectrum) লালের দিকের রঙের আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয় না, কিন্তু বেগুনী দিকের আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আরও দেখা গেল যে, সাধারণ সব ধাতুর থেকে বেগনীপারের আলো ইলেকট্রন বের করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এই সব ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যদি আলোকে তরঙ্গ ভাবা যায়, তবে একটি তরঙ্গ কেমন করে একটি ধাতব বস্তু থেকে ধাক্কা দিয়ে (knock out) ইলেকট্রন বের করতে পারে, তা বোঝা কঠিন। আর যদি মেনে নেওয়া যায় যে, তরঙ্গের ধাক্কায় ইলেকট্রন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পারে, তবে আলোর তীব্রতা বা উজ্জ্বলতা বাড়ালে ইলেকট্রনের বেগ বাড়ে না কেন? আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর প্লেটটি সারাক্ষণ লাল রঙের দিকের আলোক-তরঙ্গের শক্তি পেতে থাকলেও ইলেকট্রন নির্গত হয় না, কিন্তু বেগনী রঙের দিকের আলো প্লেটটির উপর পড়লেই ইলেকট্রন নির্গত হয় কেন?

এই সব 'কেন'র উত্তর দিলেন আইনস্টাইন 1905 খ্রীস্টাব্দে কণাবাদের (quantum theory) সাহায্যে। এই কণাবাদ আবিষ্কার করেন প্লাঙ্ক

(Planck) 1900 খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে। এই কণাবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (quantum mechanics)। আধুনিক বিজ্ঞান দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার একটি হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও অপরটি হল আপেক্ষিকতাবাদ। ফোটো-ইলেকট্রিক তত্ত্ব বা আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্ব বুঝতে হলে কণাবাদ সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার।

প্রকৃতিতে যে বস্তুটি যত বেশী গ্রহণ করে, সেটি তত বেশী দান করে। এইজন্যে কালোর বেশ আদর বিজ্ঞানীদের কাছে। ঘন কালো বস্তুর উপর আলো পড়লে বস্তুটি সমস্ত আলোই গ্রহণ করে বা শুষে নেয় (absorb), কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। সেজন্যে আমরা বস্তুটিকে কালো দেখি। এই ঘন কালো বস্তুটিকে গরম করলে তা থেকে সব রকম দৈর্ঘ্যের তাপ-তরঙ্গের বিকিরণ (radiation) হবে। একে বলা হয় কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণ (Black body radiation)।

একটি সমস্ত দিকে ঢাকা বাক্সের বাইরের দিকের দেয়ালগুলি যদি সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য হয় এবং বাক্সটির উষ্ণতা (temperature) যদি অপরিবর্তিত (constant) রাখা যায়, তবে এই বাক্সটি নিখুঁত কৃষ্ণ বস্তুর (black body) মত ব্যবহার করবে। কল্পনা করা যাক যে, এইরূপ একটি বাক্সের ভিতরের দিকে দেয়ালগুলি নিখুঁত আয়না দিয়ে ঢাকা, যাতে দেয়ালের কোন জায়গায় একটি আলোর তরঙ্গ পড়লে সেটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত (reflected) হবে, আয়নাগুলি শক্তির সামান্য অংশও শুষে নেবে না। এখন মনে করা যাক যে, এইরূপ একটি বাক্সের ভিতরে একটি আলোর রশ্মি ঢুকিয়ে দিয়ে ঢাকনাটি ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হল। আলোর রশ্মির তরঙ্গগুলি দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিফলিত হতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। ঢাকনাটি যদি বহু বছর পরে খুলে দেওয়া হয়, ঐ আলোর রশ্মিটি পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে শক্তির বণ্টন পরীক্ষা করেছেন। দেখা গিয়েছে যে, কোন একটি উষ্ণতায় সর্বোচ্চ শক্তি বণ্টিত হয় একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে এবং উষ্ণতা যত বাড়ানো যায় শক্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ বণ্টিত হয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গে। সব রকম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের উপর শক্তির বণ্টন বের করা যেতে পারে, এরূপ কোন সন্তোষজনক সূত্র পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিজ্ঞানী ভীনের (Wien) বণ্টন সূত্র দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ অঞ্চলের দিকটাতে (short wave region) শক্তির বণ্টন ভালভাবে পাওয়া যায়, আবার র‍্যালে-জীন্সের (Raleigh-Jeans) সূত্রে শক্তির বণ্টন ভালভাবে পাওয়া যায় দীর্ঘ তরঙ্গগুলির ক্ষেত্রে।

মনে করা যাক যে, পূর্বোল্লেখিত বাক্সে সম-উষ্ণতায় (constant temperature) একটি শক্তির তরঙ্গকে বন্দী করে রাখা হয়েছে—যেমন বলা হয়েছে বন্দী আলোর রশ্মির কথা। তরঙ্গটি বাক্সের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে অসংখ্য দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সৃষ্টি করবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি তারের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেতারের মত কোন তারবাদ্যের একটি তার যদি মাঝখানে ছড় দিয়ে কিংবা আঙুল দিয়ে টেনে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তারটিতে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। মাঝখানে হবে সর্বোচ্চ স্পন্দন-মাত্রা (amplitude) এবং এই স্থানটিকে বলা হয় সুস্পন্দবিন্দু (antinode), আর দুই প্রান্তে যেখানে তারটি আটকানো আছে, সেখানে স্পন্দন শূন্য এবং এই স্থান দুটিকে বলা হয় নিস্পন্দবিন্দু (node)। এই তারটি থেকে যে শব্দ বেরোবে, তাকে বলা হয় মূল সুর (fundamental tone)। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হবে তারটির এক নিস্পন্দবিন্দু থেকে অপর নিস্পন্দবিন্দুটির দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। পরে তারটির ঠিক মাঝখানে আলতোভাবে ধরে তারটিকে যদি ছড় দিয়ে টানা যায়, তবে তিনটি নিস্পন্দবিন্দু হবে, দুটি হবে দুই প্রান্তে ও মাঝখানে একটি। এবার তারটি থেকে যে স্বর বেরোবে, সেটা হবে পূর্বের স্বরের এক অক্টেভ উঁচুতে। এই স্বরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে তারটির দৈর্ঘ্যের সমান। এইভাবে নিস্পন্দবিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়ে অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি করা যেতে পারে। তারের তরঙ্গের নিস্পন্দবিন্দুর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে প্রাথমিক বা মূল তরঙ্গের (fundamental wave) সঙ্গে তারটির আটকানো স্থান থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের মিশ্রণে।

আমাদের পূর্বোল্লেখিত বাক্সে বন্দী শক্তি-তরঙ্গটির অবস্থা হবে একই প্রকার। বাক্সটির চারদিকের দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে মূল তরঙ্গটির সঙ্গে প্রতিফলিত তরঙ্গের, তারপর আরও, আরও, আরও প্রতিফলিত তরঙ্গের মিশ্রণে সংখ্যাতীত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। তা হলে শক্তির বণ্টন হবে কি ভাবে ? তরঙ্গ সংখ্যা যদি গণনাতীত বা অনন্ত হয়, যাকে বলা হয় infinity,

আর শক্তি যদি 'E' হয়, তবে গণিতশাস্ত্রমতে মধ্যক (average) শক্তি হবে $E/\infty=0$, যেখানে '∞' অনন্ত বা infinity বোঝায়। তাহলে শক্তির অবস্থান কোথায়? শক্তি কি দ্রুত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গে যেতে থাকবে, যার শেষ নেই? একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। এক টুক্‌রো কাঠ কি কয়লা জ্বালালে প্রথমে লাল আলো হবে, পরে দ্রুত রঙ হয়ে যাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের, তার মানে কমলা, হলুদে, সবুজ নীল, বেগুনী, তারপর আলোর সীমা ছাড়িয়ে বেগুনীপারের রশ্মি, তারপর এক্স-রশ্মি, ও সর্বশেষে গামা-রশ্মি, এবং যার ফলে প্রাণিজগতের ধ্বংস। কিন্তু তাতো হয় না। বিজ্ঞানীরা জটিল সমস্যায় পড়লেন। এই ব্যাপারটির নাম হল ultraviolet catastrophe বা বেগুনীপারের সর্বনাশ।

প্লাঙ্ক এই বিষয় বহু চিন্তা করে এই সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর সমাধানের সূত্রকে বলা যেতে পারে চমকপ্রদ, অচিন্তনীয় ও দুঃসাহসিক। তিনি বললেন যে, শক্তির বিকিরণ ও দেওয়া-নেওয়া অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে (by jerks), অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবে (discontinuously) বা কণাভাবে এবং কোন তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি মানের চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম মানটিকে বলা যেতে পারে বিকীর্ণ শক্তির কণা বা কোয়াণ্টাম (quantum)। তিনি বললেন যে, শক্তির বণ্টনের ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ (theoretical relation) এবং উত্তপ্ত বস্তুর শক্তির বিকিরণের যে পরীক্ষিত ফল, এই দুটির ভিতরে সামঞ্জস্য পেতে হলে ধরে নিতে হবে যে, এই ন্যূনতম শক্তির পরিমাণ 'E' বের করা যাবে $E=h\times f$ এই সূত্রের দ্বারা, যেখানে 'f' হচ্ছে ঐ শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (frequency) এবং 'h' হচ্ছে একটি অতি ক্ষুদ্র ধ্রুবক সংখ্যা (constant)। এই 'h' কে বলা হয় Planck's constant বা প্লাঙ্কের ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটির মান হল $6{\cdot}624\times10^{-27}$ সেন্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকেণ্ড ইউনিট বা একক। এই অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাটি বর্তমান বিজ্ঞান জগতে একটি অমূল্য সম্পদ। এই কণাবাদের দ্বারা প্লাঙ্ক যে সূত্র বের করেন, তার দ্বারা ক্ষুদ্র, মাঝারী ও দীর্ঘ—সব রকম তরঙ্গের শক্তির বণ্টনের সম্বন্ধে সুফল পাওয়া গেল। এই কণাবাদের ভিত্তিতেই এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

প্লাঙ্কের এই অমূল্য মতবাদ এই শতাব্দীর প্রথম বছরে আবিষ্কৃত হলেও বিজ্ঞানীরা সহজে এটিকে মেনে নিতে চান নি, কারণ শক্তির অখণ্ডতা মেনে না নিলে এতদিনকার প্রচলিত গ্যালিলিও, নিউটনের কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যান্ত্রিক রূপ আর থাকে না। প্লাঙ্কও জোর দিয়ে তাঁর তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে দ্বিধা ও কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। তিনি বললেন যে, বিভিন্ন তরঙ্গে শক্তির বণ্টনের (distribution) জন্যেই তাঁকে এই কল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। এই সময়ে 1905 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন এই কণাবাদের সাহায্যে আলোক-বিদ্যুৎ প্রক্রিয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন, কণাবাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হল।

আইনস্টাইন বললেন যে, আলোর শক্তির তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণার বা কণিকার সমষ্টি (granules of energy)। আলো যখন কোন ধাতুর উপরে পড়ে, তার একটি শক্তিকণিকা ধাতুটির পরমাণুর উপরে ঘা দেয়, যেমন একটি বিলিয়ার্ড বল আর একটি বিলিয়ার্ড বলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। ঐ শক্তিকণিকাটির মান যদি যথোপযুক্ত থাকে, তবে পরমাণুর সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

কোন ধাতুর উপরিভাগের (surface) পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির উপর চারপাশের পরমাণুর বল বা জোর অসম। আমাদের জানা আছে যে, ইলেকট্রনগুলি পরমাণুদের ভিতরে তাদের কেন্দ্রীনের (nucleus) চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তন করছে। কেন্দ্রীন বিভিন্ন কক্ষপথের ইলেকট্রন-গুলিকে বিভিন্ন শক্তিতে আকর্ষণ করছে। কেন্দ্রীন থেকে কক্ষপথ যত দূরে হবে, ইলেকট্রনের উপরে কেন্দ্রীনের জোরও কম হবে। কোন কারণে বাইরে থেকে যদি কোন ধাতু শক্তি পায় এবং ঐ শক্তি যদি উপরিভাগের পরমাণু-গুলির ভিতরে দূরতম কক্ষপথে আবর্তনরত একটি ইলেকট্রনের কেন্দ্রীনের দিকে আকর্ষণের শক্তির চেয়ে বেশী হয়, তবে ঐ ইলেকট্রনটি ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে। বাইরের শক্তির কিছুটা খরচ হবে ইলেকট্রনটিকে মুক্ত করতে এবং বাকীটা খরচ হবে ইলেকট্রনটিকে নির্গমনের বেগ দিতে। কোন ধাতু থেকে একটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে বলে ঐ ধাতুটির ওয়ার্ক-ফাংশন (work-function), এই শক্তি বিভিন্ন ধাতুর বেলায় বিভিন্ন। কোন এক-রঙা (monochromatic) আলোর

কম্পাঙ্ক জানা থাকলে ঐ আলোর কণিকার শক্তি 'E' কণাবাদ অনুযায়ী হবে $E=h\times f$। যে ধাতুর উপরে আলোর কণিকাটি পড়ছে তার ওয়ার্ক-ফাংশনের চেয়ে এই পরিমাণ শক্তি যদি কম হয়, তবে ইলেকট্রনটি বেরিয়ে আসতে পারবে না ; কিন্তু যদি বেশী হয়, তবে ইলেকট্রনটি পরমাণু থেকে মুক্ত হয়ে একটি বেগে নির্গত হবে। আলোর কণিকাটির শক্তি যত বেশী হবে, নির্গত ইলেকট্রনের বেগ তত বেশী হবে।

আমরা জানি যে, আলোর বর্ণালীর লাল রঙ থেকে শুরু করে যত বেগুনী আলোর দিকে যাওয়া যায়, তত কম্পাঙ্ক বাড়বে, তার মানে আলোর কণিকাগুলির শক্তি তত বেশী হবে।

আলোর একটি কণিকা দ্বারা কোন ধাতুর একটি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে নির্গত করার কথা যা উল্লেখ করা হল, ঐ আলোর অজস্র শক্তিকণিকার ক্ষেত্রেও একই ফল হবে। আলোর তীব্রতা নির্ভর করে তার কণিকাগুলির সংখ্যার উপর। ঐ আলোর একটি কণিকা ধাতুটির থেকে একটি ইলেকট্রন মুক্ত করে যে বেগ দিতে পারবে, আলোটির সব কণিকাই ততগুলি ইলেকট্রন মুক্ত করে একই বেগ দিতে পারবে। সেজন্যে আলোর কম্পাঙ্কের উপরে মুক্ত ইলেকট্রনগুলির বেগ নির্ভর করে এবং এই বেগ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না। আলোর তীব্রতা বাড়ালে বৈদ্যুতিক পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়বে, তীব্রতা কমালে বিদ্যুৎপ্রবাহ কমবে। যাঁরা আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (photo-electric cell) ব্যবহার করেছেন, তাঁরা এর তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এই কোষ আজকাল ক্যামেরা, সবাক চিত্র, টেলিভিসন ইত্যাদি বহু শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাল আলো কণিকার শক্তি বেগুনী আলোর কণিকার শক্তির চেয়ে কম। সুতরাং কোন ধাতু থেকে যদি লাল আলোর কণিকা একটি ইলেকট্রন বের করতে পারে, তবে ইলেকট্রনটির বেগ বেগুনী আলোর কণিকার দ্বারা নির্গত ইলেকট্রনের বেগের চেয়ে কম হবে। আবার এমন ধাতু আছে, যার ওয়ার্ক-ফাংশন লাল আলোর কণিকার শক্তির চেয়ে বেশী, কিন্তু হলদে, সবুজ কিংবা বেগুনী আলোর শক্তির চেয়ে কম। তা হলে এই ধাতুর উপর লাল আলো ফেললে কোন ইলেকট্রন বের হবে না, অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত কাঁচের ফ্লাস্কের প্লেটে লাল আলো ফেললে

বৈদ্যুতিক পথে কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যাবে না; কিন্তু হলদে থেকে বেগুনী রঙের কোন আলো ফ্লাস্কের প্লেটটির উপর ফেললে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যাবে।

আইনস্টাইন এই ব্যাপারটির অতি সহজ এক সূত্র বের করলেন। সূত্রটি হল $h\times f=w+\frac{1}{2}mv^2$, যেখানে '$h$' হল প্লাঙ্কের ধ্রুবক, '$f$' হল আলোর কম্পাঙ্ক, 'w' হল ধাতুটির ওয়ার্ক-ফাংশন, 'm' হল ইলেকট্রনের ভর, এবং v হল নির্গত ইলেকট্রনের বেগ। আলোটির একটি কণিকার শক্তি $h\times f$-এর কিছুটা ব্যয় হচ্ছে ইলেকট্রনটিকে মুক্ত করতে—যে শক্তির পরিমাণ হল 'w'—এবং বাকী অংশটি ব্যয় হচ্ছে ইলেকট্রনটিকে গতিশক্তি (kinetic energy) দিতে, যা হল ভর ও বেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেক অর্থাৎ $\frac{1}{2}mv^2$.

একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সীজিয়াম ধাতুটির ওয়ার্ক-ফাংশন হল 1·81 ইলেকট্রন-ভোল্ট, যার মান হল $1{\cdot}81\times1{\cdot}6\times10^{-12}$ আর্গ-সেকেণ্ড। লাল আলোর কণিকার কম্পাঙ্ক ধরা যেতে পারে সেকেণ্ডে $3{\cdot}75\times10^{14}$ বার। প্লাঙ্কের ধ্রুবক 'h' হল $6{\cdot}62\times10^{-27}$ আর্গ-সেকেণ্ড। ইলেকট্রনের ভর 'm' হল $9{\cdot}11\times10^{-28}$ গ্র্যাম।

আইনস্টাইনের সূত্র $h\times f=w+\frac{1}{2}mv^2$.

লাল আলোর কণিকার শক্তি হল $6{\cdot}62\times10^{-27}\times3{\cdot}75\times10^{14}$ $=2{\cdot}48\times10^{-12}$ আর্গ-সেকেণ্ড।

কিন্তু সীজিয়ামের 'w' হল $1{\cdot}81\times1{\cdot}6\times10^{-12}=2{\cdot}89\times12^{-12}$ আর্গ-সেকেণ্ড এবং এই মানটি লাল আলোর কণিকার শক্তির মানের চেয়ে বেশী। সেজন্যে লাল আলো সীজিয়াম ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের করতে পারবে না। কিন্তু বেগুনী আলোর কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে $7{\cdot}5\times10^{14}$ বার, সেজন্যে বেগুনী আলোর কণিকার শক্তি হল $4{\cdot}96\times10^{-12}$ আর্গ-সেকেণ্ড।

সুতরাং $\frac{1}{2}mv^2=4{\cdot}96\times10^{-12}-2{\cdot}89\times10^{-12}$

$$=2{\cdot}07\times10^{-12}$$

$$\therefore\quad v^2=\frac{4{\cdot}14\times10^{-12}}{9{\cdot}11\times10^{-28}}=45{\cdot}44\times10^{14}$$

$\therefore\ v=6{\cdot}74\times10^{7}$ সেন্টিমিটার সেকেণ্ডে, অর্থাৎ আলোর

বেগের প্রায় 500 ভাগের প্রায় একভাগ। তাহলে দেখা গেল যে, সীজিয়াম প্লেটের উপর বেগুনী আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হবে এবং বেগ হবে সেকেণ্ডে $6{\cdot}74 \times 10^7$ সেঃ মিঃ।

আইনস্টাইন বললেন যে, আলোর শক্তি যে শুধু খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্গত (emitted) বা শোষিত (absorbed) হয়—তা নয়, নির্গমন ও শোষণ—এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী কালে অর্থাৎ আলোর প্রবাহমান অবস্থাতেও আলো খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন (discrete) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য টুক্‌রোর সমষ্টি। তিনি কয়েক বছর পরে এই টুক্‌রোগুলির নাম দিলেন ফোটন (photon)। তাঁর ফোটন সিদ্ধান্ত ও প্লাঙ্কের কণাবাদের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "বীয়ার পাঁইট বোতলে (1 পাঁইট $= \frac{1}{8}$ গ্যালন) বিক্রীত হলেও এর থেকে বোঝা যায় না যে, বীয়ার অবিভাজ্য টুক্‌রোর সমষ্টি।" প্লাঙ্ক তাঁর কণাবাদে বলেছেন যে, শক্তি নির্গত ও শোষিত হয় খণ্ড খণ্ড ভাবে, কিন্তু প্রবহমান অবস্থায় শক্তির রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণার কথা তিনি বলেন নি। আইনস্টাইন সেই কথাটাই বলেছেন।

তাহলে এইসব আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেলাম যে, সব রকম বিকীর্ণ শক্তিই—তাপ, আলো, এক্স-রশ্মি ইত্যাদি—মহাকাশে (space) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য টুক্‌রোর সমষ্টিগতভাবে (shower of photons) প্রবাহিত হয়। আমরা যখন আগুনের ধারে বসি, তখন যে উত্তাপ অনুভব করি, সেটি হল আমাদের দেহের চামড়ায় আগুনের উৎস থেকে বিকীর্ণ তাপের বহু সংখ্যক ফোটনের আঘাতের ফলস্বরূপ। সেইরূপ কোন আলোর উৎস থেকে বহু সংখ্যক ঝাঁকে ঝাঁকে ফোটন আমাদের চোখে এসে আঘাত দেয় বলে আমরা আলো দেখি। উদাহরণস্বরূপ একটি 60 ওয়াট বাতির কথা ধরা যাক। এটি থেকে যে আলো নির্গত হচ্ছে তার কম্পাঙ্ক ধরা যাক সেকেণ্ডে 6×10^{14} বার। তাহলে কণাবাদ অনুযায়ী এই আলোর ফোটনের শক্তি 'E' হবে :

$$E = h \times f = 6{\cdot}624 \times 10^{-27} \times 6 \times 10^{14} \text{ আর্গ-সেকেণ্ড}$$
$$= 40 \times 10^{-13} \text{ আর্গ-সেকেণ্ডে}$$
$$= \frac{40 \times 10^{-13}}{10^7} \text{ ওয়াট-সেকেণ্ড (জুল—Joule)}$$
$$= 40 \times 10^{-20} \text{ ওয়াট-সেকেণ্ড}$$

সুতরাং 60 ওয়াট বাতি থেকে প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত ফোটনের পরিমাণ= $\frac{60}{40\times10^{-20}}=15\times10^{19}$ অর্থাৎ 15 লক্ষ কোটি কোটি আলোর টুক্‌রো বা ফোটন প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের চোখে এসে পড়ছে অতি দ্রুত গতিতে। এই আলোকে আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে দেখি কারণ এত বিরাট সংখ্যক কণিকা দ্রুত গতিতে আসার জন্যে আলোকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে বুঝতে পারি না—যেমন ফিল্মে বিচ্ছিন্ন অবস্থার টুক্‌রো ছবিগুলি দ্রুত চালনা করবার জন্যে সিনেমার পর্দায় আমরা ছবির অবিচ্ছিন্ন ভাব দেখি।

তা হলে দেখা গেল যে, আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি আর ফোটন হল শক্তির মূল কণা। আইনস্টাইন নিউটনের আলোর কণিকাবাদ কিছু সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। নিউটন বলেছিলেন বস্তুর কণিকা (corpuscles) আর আইনস্টাইন বললেন শক্তির কণিকা। এই কণিকা বা ফোটনগুলি বিভিন্ন শক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

সুইডিস অ্যাকাডেমি কমিটি বেশ কিছুদিন হল ভাবছিলেন যে, আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পাবার উপযুক্ত। কিন্তু কিছু বাধা ছিল বলে এই বিষয়টি কার্যকর করা যাচ্ছিল না। লেনার্ডের মত খ্যাতনামা ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ও অন্য কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদকে মেনে নেন নি ও এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তারপর নোবেল কমিটির সাধারণ নিয়মমত এই পুরস্কার দেওয়া হয় সেই সব বিজ্ঞানীদের, যাঁদের বিশিষ্ট আবিষ্কারের ব্যবহারিক প্রয়োগে মানবজাতির উন্নতি সাধিত হতে পারে। যা হোক, 1921 খ্রীস্টাব্দে কমিটি আইনস্টাইনকে এই পুরস্কার দেওয়া স্থির করে ঘোষণা করলেন, "এই পুরস্কার আইনস্টাইনকে দেওয়া হল তাঁর আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্বের ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের জন্যে।"

আইনস্টাইন ইহুদি বলে জার্মান খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বিজ্ঞানী লেনার্ড বরাবর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন এবং তাঁকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছেন। নোবেল কমিটির এই ঘোষণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লেনার্ড নোবেল কমিটির কাছে এর বিরুদ্ধে একটি কড়া চিঠি পাঠান।

আলোর রূপ সম্বন্ধে এই আলোচনাতে জানা গেল যে, নিউটনের যুগ

থেকে সমস্যা ছিল যে, আলো ঝাঁক ঝাঁক কঠিন কণিকার সমষ্টি অথবা তরঙ্গ। তারপর গত শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ফ্রেনেল ও ইয়ং-এর গবেষণায় প্রমাণ হল যে, আলো তরঙ্গ। আবার এই শতাব্দীর প্রথমভাগে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী জানা গেল আলোর দ্বৈত রূপ, একটি হল তরঙ্গ রূপ এবং অপরটি শক্তির কণিকা বা ফোটন রূপ। তরঙ্গ রূপকে মানতে হবে ব্যতিচার বা আলো আলোতে মিলে অন্ধকার সৃষ্টি ও ডিফ্রাকসন বা আলোর পথে কোন বাধার ধার ঘেঁষে বেঁকে যাওয়া, এই ব্যাপার দুটির জন্যে এবং ফোটন রূপকে মানতে হবে আলোর কোন ধাতুর উপর আপতনহেতু ইলেকট্রনের নির্গমনের জন্যে। আলোর বেলায় যা প্রযোজ্য, অন্যান্য সব বিকীর্ণ শক্তির বেলাতেও সেই রূপ প্রযোজ্য।

রেডিও, তাপ, আলো ইত্যাদি সব বিকীর্ণ শক্তিকে (radiated energy) কি রূপে প্রকাশ করা হবে, তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। 1924 খ্রীস্টাব্দে লুই দ্য ব্রগলী (Louis de Broglie) নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী একটি প্রবন্ধে লিখলেন যে, পদার্থের তরঙ্গ আছে (waves of matter) এবং একটি সূত্র প্রকাশ করলেন, যা দিয়ে কোন বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে, সেই বস্তুটির তরঙ্গরূপের দৈর্ঘ্য বের করা যাবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়ে উঠল কোয়াণ্টাম-মেকানিক্স। কয়েক বছর পরে গবেষণাগারে ডেভিসন (Davission) ও জারমার (Germer) কর্তৃক আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ। ইলেকট্রনকে এতদিন জানা ছিল কণিকারূপে। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ের গবেষণায় ফোটোগ্রাফী প্লেটে ইলেকট্রনকে দেখা গেল তরঙ্গরূপে, যার দৈর্ঘ্য দেখা গেল—দ্য ব্রগ্‌লীর সূত্র দিয়ে অঙ্ক কষে বের করলে যা হয় তাই।

কিন্তু এই সব তরঙ্গ সব ক্ষেত্রে কোন যন্ত্রে বা প্রণালীতে ধরা বা লক্ষ্য করা সম্ভবপর নয় তাদের অতি হ্রস্ব তরঙ্গের জন্যে। এখনও পর্যন্ত গবেষণাগারে এক্স-রে-র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, যা প্রায় 10^{-8} সেঃ মিঃ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে একটি পরমাণুর ব্যাসের সমান, সেটি লক্ষ্য করা সম্ভবপর হয়েছে। এর চেয়ে হ্রস্বতর তরঙ্গকে, যেমন গামাশক্তির, ধরা বা লক্ষ্য করা সম্ভবপর নয়। কণিকাগুলির ভরবেগ (momentum) অর্থাৎ ভর ও বেগের গুণফল, বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কণিকাগুলির তরঙ্গরূপের দৈর্ঘ্য দ্রুত হ্রস্ব হতে থাকে এবং একটি সীমা ছাড়িয়ে

গেলে কোন যন্ত্রে ধরা সম্ভবপর হয় না, তখন সেগুলি কণিকা বা ফোটন রূপেই প্রকট হয়। সেইজন্য বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গরূপী শক্তিগুলির কোন একটি সীমা পর্যন্ত তরঙ্গরূপেই প্রাধান্য থাকে এবং সেগুলি থেকে সহজেই ব্যতিচার, ডিফ্রাকসন ইত্যাদি তরঙ্গের বিশেষ গুণগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু যে সব শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষুদ্র হয়ে যায়, সেগুলি ফোটন রূপেই কাজ করে, যেমন ধাতুর থেকে ইলেকট্রন ধাক্কা দিয়ে বের করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রেডিও শক্তিকে সব সময় তরঙ্গরূপে অভিহিত করা হয়, এর ফোটনরূপ কখনো প্রকট হয় না। কারণ রেডিও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি অনেক বেশী। আবার গামা শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র, যা প্রায় 10^{-10} সে: মি: ও তার চেয়েও কম, সেজন্যে গামাশক্তিকে ফোটন নামেই অভিহিত করা হয়। আলোর ক্ষেত্রে কখনও বলা হয় তরঙ্গ, আবার কখনও বলা হয় ফোটন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1923 খ্রীস্টাব্দে কম্পটন (Compton) গবেষণাগারে ফোটোগ্রাফী প্লেটে দেখাতে সমর্থ হলেন পরমাণুর উপর এক্স-রশ্মির সংঘর্ষহেতু ইলেকট্রনের ছিট্‌কে বেরিয়ে যাওয়া ও ঐ এক্স-রশ্মির অপেক্ষাকৃত কম শক্তিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া—ঠিক যেমনটি হয় দুটি বিলিয়ার্ড বলের সঙ্ঘর্ষে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় কম্পটন এফেক্ট। এই কম্পটন এফেক্ট ও অনুরূপ কয়েকটি পরীক্ষার ফলে কোন সন্দেহ থাকে না শক্তির ফোটন রূপের অস্তিত্বের এবং কম্পাঙ্কের উপর ফোটনের শক্তির নির্ভরতা সম্বন্ধে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ
(Special Theory of Relativity)

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে যে দুটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ আবিষ্কৃত হয়, সেই দুটিই হল বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যার মূল স্তম্ভ। একটি হল 1900 সালে প্লাঙ্ক কর্তৃক আবিষ্কৃত কণাবাদ, যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশের দশকে কণা-বলবিদ্যা ও অপরটি হল 1905 সালে আইনস্টাইন কর্তৃক আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ। কণাবাদ বিষয়টি 'দশম তত্ত্ব' পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে 'বার্ন' পরিচ্ছেদে। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল অ্যারিস্টটলের এক তত্ত্ব যে, বিভিন্ন ওজনের বস্তু একই সময়ে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাটির উপরে এসে পড়বে। এর বিরুদ্ধ সমালোচনা গ্যালিলিও করেন। গ্যালিলিও পতনশীল বস্তুর তত্ত্বের (Galileo's law for falling bodies) বিষয়টি 'বার্ণ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। এই তত্ত্বে জানা যায় যে, বিভিন্ন ওজনের বস্তু একই সময়ে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে একই সময়ে মাটির উপরে এসে পড়বে। তিনি পিসার হেলানো মিনারের (leaning tower of Pisa) উপর থেকে বিভিন্ন ওজনের বস্তু একই সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে তাঁর তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন। বলবিদ্যার (mechanics) এইরূপ যে-কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে অতিশয় প্রয়োজন নির্ভুল সময় দিতে পারে এরূপ একটি সময়জ্ঞাপক যন্ত্র বা ঘড়ি, নির্ভুলভাবে দূরত্ব মাপবার জন্যে একটি স্কেল বা মাপকাঠি যেটি কোন প্রকারে নমনীয় (flexible) হলে চলবে না এবং যেটি পৃথিবীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকবে অর্থাৎ পৃথিবীর আপেক্ষিকে সেটির কোন প্রকার গতি বা নড়াচড়া থাকবে না, এবং দূরত্ব জানতে হবে কোন একটি নির্দিষ্ট, অনমনীয় ও দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন একটি কাঠামো থেকে যেমন পূর্ববর্ণিত পরীক্ষায় ধরা হয়েছে পিসার মিনারকে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পৃথিবী স্থির নয় এবং আমরা পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরছি। এইজন্যে গ্যালিলিওর পরীক্ষাটি যদি খুব সযত্নে এবং নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে চেষ্টা করা যায়, তবে তত্ত্ব ও ফলে কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা যাবে; কারণ যেগুলির সাহায্যে পরীক্ষাটি করা হচ্ছে সেগুলিকে পৃথিবীর মত চলন্ত বস্তুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর বাইরে গিয়ে কোন স্থির জায়গায় কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভবপর নয়।

যা হোক, আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে প্রয়োজন একটি অবিচল (constant) ও প্রকৃত স্থির বা ধ্রুব একটি কাঠামোর (frame)। আমাদের পর্যবেক্ষণীয় ফল ও তথ্যাদি সম্পর্কিত হবে এই কাঠামোটির সঙ্গে। এইরূপ সম্পর্ক নির্ধারণের কাঠামোকে বলা হয় co-ordinate system (সংক্ষেপে C S), যাকে বাংলাতে বলা যেতে পারে স্থানাঙ্ক নির্ধারক।

বিজ্ঞানে প্রথম আপেক্ষিক তত্ত্বটি হল গ্যালিলিওর। এটি হল বলবিদ্যা সংক্রান্ত। তিনি বলেছেন, "If the laws of mechanics are valid in one C S, then they are valid in any other C S moving uniformly relative to the first"—"যদি বলবিদ্যার তত্ত্বগুলি কোন একটি স্থানাঙ্ক নির্ধারকে গ্রাহ্য (valid) বলে প্রমাণিত হয়, তবে এই নির্ধারকের সাপেক্ষে সমবেগে চলন্ত (moving with uniform velocity) যে-কোন নির্ধারকেই এই সব তত্ত্ব গ্রাহ্য হবে।"

সব স্থানাঙ্ক নির্ধারক বা মাধ্যমই কি উপযুক্ত বলে ধরে নিতে হবে? মনে করা যাক যে, একটি ট্রেন বা জাহাজ পৃথিবীর আপেক্ষিকে চলছে। পৃথিবীকে মনে করা যেতে পারে একটি 'ভাল' বা 'উপযুক্ত' মাধ্যম। তা হলে ট্রেন কি জাহাজ এই সব চলন্ত মাধ্যমকে কি 'উপযুক্ত' বলে ধরা হবে—অর্থাৎ, বলবিদ্যার তত্ত্বগুলি কি এই সব মাধ্যমে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে? উত্তর হবে সব ক্ষেত্রে নয়। যদি ট্রেনটির কি জাহাজটির গতি সম্পূর্ণভাবে মসৃণ ও সরল রেখায় হয়, তবে এই সব মাধ্যমকে 'ভাল' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি এগুলিতে সম্পাদন করলে পৃথিবীতে পরীক্ষিত ফল লাভ করা যাবে। কিন্তু ট্রেনটি যদি হঠাৎ থেমে যায়, কি

একটি বাঁক ঘোরে, কি হঠাৎ তার বেগ ত্বরান্বিত হয়, কিংবা স্থির সমুদ্রে হঠাৎ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তবে বিপর্যয় হবে, জিনিষপত্র উপর থেকে নীচে পড়বে. যাত্রীরা আছাড় খাবে অর্থাৎ চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা হবে। এই সব ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পূর্ণ 'অনুপযুক্ত' বলে মনে করা হবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি পরস্পরের আপেক্ষিকে অসম বেগে চলন্ত (moving non-uniformly) মাধ্যমে বলবিদ্যার তত্ত্বগুলি যদি একটিতে অকাট্য হয়, তবে অপরটিতে হবে না। যে সব 'উপযুক্ত' মাধ্যমে এই তত্ত্বগুলি অকাট্য, অর্থাৎ বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একই ফল পাওয়া যায়, সেই সব মাধ্যমগুলিকে বলা হয় 'inertial system'। Inertia বলতে আমরা বুঝি প্রতিরোধ শক্তিহীনতা বা জাড্য, অর্থাৎ যে সহজাত গুণের জন্যে বস্তু বাধা না পেলে, হয় স্থিতাবস্থায় থাকে, আর না হয়ত একমুখে অবিচল বেগে চলতে থাকে। নিখুঁতভাবে এই গুণসম্পন্ন কোন মাধ্যম বা 'perfect inertial system' যেখানে বাইরের কোন শক্তির প্রভাব একেবারে শূন্য, এরূপ মাধ্যম পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে প্রায় 19 মাইল বা 30 কিঃ মিঃ বেগে আবর্তন করছে এবং নিজের অক্ষের চারদিকে ঘণ্টায় প্রায় 1000 মাইল বা 1600 কিঃ মিঃ বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। এইজন্যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে বেশী 'উপযুক্ত' মাধ্যম। কিন্তু সূর্যেরও ছায়াপথের (Milky way galaxy) কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তনের বেগ আছে। সেজন্যে সূর্যকেও কিংবা বিশ্বের কোন বস্তুকেই এই আদর্শ গুণযুক্ত মাধ্যমরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে না। এই জন্যেই সনাতন পদার্থবিদ্যায় (Classical Physics) খাঁটি অবিচল বেগ বলে কিছু নেই।

যা হোক, আমরা ধরে নিতে পারি যে, পৃথিবীতে সংলগ্ন কোন মাধ্যম কিংবা পৃথিবীর আপেক্ষিক সরলরেখায় ও সমবেগে চলন্ত কোন মাধ্যম হল একটি 'উপযুক্ত' মাধ্যম, যেখানে বলবিদ্যার পরীক্ষার ফলগুলি সুযুক্তিপূর্ণ ও অকাট্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 'সময়ের' (time) জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। পুরাকাল থেকে গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 'সময়কে' মনে করা হত 'absolute' বা পরম, অনন্যগত বা পরনির্ভরশীল নয় (independent)। বিশ্বে যে-কোন স্থানে,

যে-কোন বেগে চলন্ত মাধ্যমে সময়ের গতি অভিন্ন, সময় 'invariant' বা সময়ের মান যে-কোন মুহূর্তে সর্বত্র এক ও অভিন্ন।

মনে করা যাক যে, এক ব্যক্তি একটি মস্ত বড় জাহাজের ডেকে ঘণ্টায় 3 কিঃ মিঃ সমবেগে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার এই বেগ হল জাহাজের আপেক্ষিকে, অথবা বলা যেতে পারে জাহাজে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এক স্থানাঙ্ক নির্ধারকের আপেক্ষিকে। যদি জাহাজের গতিবেগ ঘণ্টায় 30 কিঃ মিঃ হয়, তবে তীরে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষক বলবেন যে, লোকটির বেগ ঘণ্টায় 33 কিঃ মিঃ যদি লোকটি জাহাজের গতির দিকে হাঁটে, আর না হয়ত ঘণ্টায় 27 কিঃ মিঃ যদি সে জাহাজের গতির উল্টোদিকে হাঁটে। তা হলে দুটি মাধ্যম পরস্পর পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে চলন্ত অবস্থায় থাকলে, কোন একটিতে একটি চলন্ত বেগ, কি কোন স্থানে অবস্থানের স্থানাঙ্ক সেই মাধ্যমটি থেকে অপরটিতে রূপান্তরিত করা যায়, যদি মাধ্যম দুটির আপেক্ষিক বেগ জানা থাকে। এই রূপান্তর তত্ত্বগুলিকে বলা হয় গ্যালিলিও রূপান্তর তত্ত্ব অথবা মেকানিক্যাল বা সনাতন রূপান্তর (classical transformation) তত্ত্ব।

যদি কোন পুকুরের স্থির জলে একটি ঢিল ফেলা যায়, কিংবা কোন একটি কাঠি নিয়মিতভাবে কাঁপানো যায়, জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং নিক্ষিপ্ত ঢিলের শক্তি বা কম্পনরত কাঠিটির শক্তি তরঙ্গ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু জলের কণাগুলি এগিয়ে যায় না। নিজেদের জায়গায় ওঠানামা করতে থাকে। কণাগুলি তাদের শক্তি পাশের কণাগুলিকে দেয়, সেই কণাগুলি আবার তাদের পাশের কণাগুলিকে—এইভাবে কণাগুলি কম্পনরত অবস্থায় শক্তি স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠায়। যে বেগে শক্তি ছড়িয়ে যেতে থাকে, তাকে তরঙ্গ বেগ বলা হয়। তরঙ্গ দুই রকমের হতে পারে। যেখানে কণাগুলি তরঙ্গগতির দিকের লম্বভাবে (perpendicularly) দুলতে থাকে, সেই সব তরঙ্গকে বলা হয় transverse wave বা তির্যক তরঙ্গ, যেমন পূর্ববর্ণিত জলের তরঙ্গ, কিংবা সেতার, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তারে তরঙ্গ। আবার দ্বিতীয় প্রকার তরঙ্গে কণাগুলি তরঙ্গগতির দৈর্ঘ্যের দিকে (longitudinal) দুলতে থাকে। সেই সব তরঙ্গকে বলা হয় longitudinal wave বা দৈর্ঘ্য বরাবর তরঙ্গ। বাতাসে শব্দ-তরঙ্গ হল এইরূপ তরঙ্গ। শব্দ-তরঙ্গের বেগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন মানের

হয়। বাতাসে তরঙ্গ বেগের মান সেকেণ্ডে প্রায় 400 গজ বা 360 মিটার। কিন্তু আলোর তরঙ্গ হল transverse wave বা তির্যক তরঙ্গ, যার বেগ সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল বা 300,000 কিঃ মিঃ। এখানে বলা যেতে পারে যে, ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুযায়ী আলো হল বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গ আকারে গতির ফল। গতি না হলে আলো হতে পারে না।

আইনস্টাইনের মনে বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই এই সব তরঙ্গ সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছিল। এইগুলির বিষয়ে চিন্তার থেকেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি। এইরূপ কতকগুলি সমস্যার এখানে উল্লেখ করা হল।

কল্পনা করা যাক যে, সমুদ্রে একটি চলন্ত জাহাজের বেগ সমুদ্রের উপর জলের তরঙ্গবেগের সমান। তাহলে জাহাজের আপেক্ষিকে, অর্থাৎ সংলগ্ন একটি স্থানাঙ্ক নির্ধারকের আপেক্ষিকে ডেকের কোন পর্যবেক্ষকের কাছে তরঙ্গগুলিকে মনে হবে গতিহীন। সমুদ্রের মাঝখানে তীরের কোন চিহ্ন নেই, নীচে শুধু জল আর উপরে আকাশ। পর্যবেক্ষকটির মনে হবে নিশ্চল, অসীম জলরাশির উপরে তিনি জাহাজের ডেকে বসে আছেন। তাঁর এই-রূপ ধারণা (subjective impression) কিন্তু একটি বাস্তব ঘটনার প্রকাশ। বাস্তব ঘটনাটি হল যে, তরঙ্গের সঙ্গে সমান বেগে গতিশীল জাহাজের আপেক্ষিকে তরঙ্গগুলি স্থির।

এখন মনে করা যাক যে, জাহাজটি আলোর বেগে যাচ্ছে। তাহলে ডেকে অবস্থিত পর্যবেক্ষকটির নিকট আলোর বেগ হবে শূন্য। এতে অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হবে। জাহাজটির পিছনের দিকে (stern) কোন আলো জ্বলে উঠলে জাহাজের সামনের দিকে কোন পর্দায় সেই আলো পৌঁছতে পারবে না। বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রটি, যার প্রবাহে তরঙ্গ আকারে আলো পাওয়া যাচ্ছিল, জাহাজে শীর্ষ (crest) ও তল (trough) সমন্বিত স্থির তরঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকবে। এটির সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের আলোর ধারণার কোন মিল থাকে না।

যদি কেউ আলোর বেগে কোন আলোর রশ্মির সঙ্গে ছুটতে থাকে, তবে রশ্মিটিকে সে দেখবে একটি স্থির তরঙ্গ, যার মানে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুযায়ী রশ্মিটি আর আলো নয়।

যদি ঘণ্টায় 72 কিঃ মিঃ অর্থাৎ সেকেণ্ডে 20 মিটার বেগে একটি চলন্ত

ট্রেনের মাঝখানে একজন যাত্রী হুইসেল বাজায়, হুইসেলটি থেকে নির্গত শব্দ-তরঙ্গটির বেগ মাটিতে দাঁড়ানো কোন পর্যবেক্ষক পরীক্ষা করে বলবেন ট্রেনের গতির দিকে সেকেণ্ডে 360+20=380 মিটার, এবং ট্রেনের গতির উল্টোদিকে সেকেণ্ডে 360−20=340 মিটার। এখানে মনে রাখতে হবে যে, শব্দের উৎসটির হুইসেলটির ট্রেনে অবস্থিতিহেতু তার বেগ ট্রেনের বেগের সমান।

কিন্তু ট্রেনটির দুই প্রান্তে অবস্থিত গার্ড ও ড্রাইভার একই সময়ে ঐ শব্দটি শুনতে পাবেন কারণ তারা দু-জনেই ঐ ট্রেনে বসে আছেন বলে তাদের ও হুইসেলটির বেগ সমান। শব্দের উৎসের বেগের উপর শব্দের আপেক্ষিক বেগ নির্ভর করে।

আবার এই ব্যাপারটিকে বিপরীতভাবে (reciprocally) ভেবে দেখলে একই ফল হবে। মনে করা যাক যে, ঐ ট্রেনটি একটি গুমটির দিকে সেকেণ্ডে 20 মিটার বেগে আসছে। গুমটিতে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ঘণ্টার শব্দটি সেকেণ্ডে 360 মিটার বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রেনে বসা একজন পর্যবেক্ষক ঐ শব্দের বেগ মেপে দেখবেন সেকেণ্ডে 360+20= 380 মিটার, আবার যখন ট্রেনটি গুমটি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে পর্যবেক্ষক মেপে বলবেন ঐ একই শব্দের বেগ সেকেণ্ডে 360−20=340 মিটার। এখানে ট্রেনে বসা পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিকে শব্দের উৎসটির গতি আছে, যেমন ট্রেনে বসা যাত্রীর কাছে লাইনের পাশে গাছকে ট্রেনটির উল্টোদিকে একই বেগে যাচ্ছে মনে হবে।

আবার মনে করা যাক যে, রাম ও শ্যাম নামে দুই ব্যক্তি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া হচ্ছে। রাম বললে যে, সে শ্যামের কোন কথা শুনতে চায় না, কিন্তু শ্যাম তার বক্তব্য বলবেই। তখন রাম যদি শব্দের চেয়ে দ্রুত বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে 360 মিটারের বেশী বেগে দৌড়ে যেতে পারে, শ্যামের কোন কথা তার কানে এসে পৌঁছবে না। আবার শ্যাম হয়ত কিছু বলেছে যা রাম সবটা শুনতে পায় নি কিন্তু অশ্রুত কথাগুলি শোনবার ইচ্ছা থাকলে রামকে 360 মিটারের বেশী বেগে দৌড়তে হবে, যাতে অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গকে ধরতে পারে, যাকে আইনস্টাইন বলতেন 'catching up' বা 'ধরে ফেলা'।

আজকাল শব্দের বেগের চেয়ে অধিকতর দ্রুতগামী বিমান উদ্ভাবিত

হয়েছে। সুতরাং এই উদাহরণটি পরীক্ষা করা বাস্তবে সম্ভবপর হয়েছে। আধুনিক কালে রকেটের যুগে মহাকাশযাত্রীরা রকেটে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন। রকেটটি যখন মাটির থেকে প্রচণ্ড শব্দে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হয়, মহাকাশযাত্রীরা সে শব্দ শুনতে পাবেন না, যদি রকেটের বেগ উৎক্ষিপ্ত হবার সময়েই সেকেণ্ডে প্রায় 8 কিঃ মিঃ বা 5 মাইল হয়।

উপরের উদাহরণগুলিতে আপেক্ষিক বেগগুলি সহজ সনাতন রূপান্তর অর্থাৎ সাধারণ যোগ-বিয়োগের দ্বারা বের করা যায়। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলবে কি? মনে করা যাক যে, উল্লিখিত ট্রেনটি ঘণ্টায় 72 কিঃ মিঃ বা সেকেণ্ডে 20 মিটার বেগে গুমটির দিকে এগুচ্ছে। গুমটিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি ঘণ্টা না বাজিয়ে একটি মশাল জ্বালল। এখন ট্রেনে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের কাছে কি পূর্বে বর্ণিত শব্দের বেগের মত, আলোর আপেক্ষিক বেগ আলোর প্রকৃত বেগের সঙ্গে ট্রেনের বেগের যোগ কি বিয়োগ হবে? না, তা হবে না। আলোর বেগের কোন পরিবর্তন হবে না। এমন কি ট্রেন বা কোন মহাকাশযান সেকেণ্ডে 10,000 কিঃ মিঃ বেগে ছুটলেও ঐ চলন্ত যানে পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগের কোন পরিবর্তন হবে না। আলোর বেগের ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয় মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে 1881 খ্রীস্টাব্দে এবং পরে আবার 1887 খ্রীস্টাব্দে।

কল্পিত ঈথার সমুদ্রের আপেক্ষিকে পৃথিবীর বেগ খুব সঠিকভাবে বের করবার ইচ্ছায় মাইকেলসন ও মর্লে যে অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটির নাম ইন্‌টারফেরোমিটার (Interferometer)। যন্ত্রটিতে দুটি নল, একটি পূব-পশ্চিমে এবং অপরটি প্রথমটির মাঝখানে সংলগ্ন, উত্তর-দক্ষিণ দিকে। এদের সঙ্গে কতকগুলি আয়না এমনভাবে সাজানো যে, একটি আলোর রশ্মিকে দু-ভাগ করে একই সময়ে দুটি নল দিয়ে দু-দিকে পাঠানো যেতে পারে। পৃথিবী সূর্যের চারধারে কক্ষপথে আবর্তনকালে পৃথিবীর গতি-হেতু ঈথার স্রোত পৃথিবীর গতির উল্টোদিকে হবে। এখন আলোর তরঙ্গ যদি ঈথার স্রোতের গতির উল্টোদিকে হয়, অর্থাৎ আলোক পৃথিবীর গতির দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে পাঠানো যায়, তাহলে আলোর বেগের মান সনাতন নিয়মানুযায়ী প্রকৃত বেগের কিছুটা কম হওয়া উচিত। পৃথিবীর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 19 মাইল অথবা সেকেণ্ডে প্রায় 30 কিঃ মিঃ। সুতরাং আলোর

গতি পশ্চিম থেকে পূবে হলে, আলোর বেগ হওয়া উচিত সেকেণ্ডে 1,86,000−19=1,85,981 মাইল অথবা 300000−30=299970 কিঃ মিঃ এবং আলো ঈথারের স্রোতের দিকে গেলে বেগ হওয়া উচিত সেকেণ্ডে 1,86000+19=1,86,019 মাইল অথবা 300000+30=300030 কিঃ মিঃ।

সাধারণ স্কুলের অঙ্ক দিয়ে বা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, নদীর স্রোতের উজানে সাঁতার দিয়ে একটি যে কোন দূরত্বে গিয়ে আবার স্রোতের দিকে সাঁতরে পূর্ব স্থানে আসতে যে সময় লাগবে, তার মান স্রোতের আড়াআড়ি ভাবে একই দূরত্বে গিয়ে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসতে যে সময় লাগবে তার মানের চেয়ে বেশী হবে। সুতরাং একটি আলোক রশ্মিকে দু-ভাগ করে একই সময়ে এক ভাগকে পশ্চিম-পূর্ব নলে আর অপর ভাগকে উত্তর-দক্ষিণ নলে পাঠিয়ে দুটি সময় বের করলে প্রথম সময়টির মান হওয়া উচিত দ্বিতীয় সময়টির মানের চেয়ে বেশী। কিন্তু নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সময়ের কোন পার্থক্য হচ্ছে না, অর্থাৎ আলোর বেগের মানের কোন রকম তারতম্য হচ্ছে না। এই যন্ত্রটি এত নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে তৈরি হয়েছিল যে, আলোর প্রচণ্ড বেগের থেকে এক মাইলের কোন ভগ্নাংশ যদি তফাৎ হত, তবে তা ধরা পড়ত।

এই পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞানীরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিজ্ঞান-জগতে দুরূহ সমস্যা উপস্থিত হল। হয় ঈথার বলে কোন মাধ্যম নেই, যার অর্থ হল যে, শক্তির তরঙ্গ-তত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়, অথবা কোপার্নিকাসের তত্ত্ব ভুল অর্থাৎ পৃথিবীর কোন গতি নেই।

তখনকার দিনের বিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদেরা চিন্তা করতে লাগলেন এই পরীক্ষার ফলের মানে বের করতে এবং কি করে এই অদ্ভুত ব্যাপারের সদুত্তর পাওয়া যায়। কেউ কেউ ইচ্ছামত কল্পনার দ্বারা চেষ্টা করতে লাগলেন—কোন্ কল্পনাতে এটিকে খাপ-খাওয়ানো যায়। তখনকার সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কল্পনার কথা বললেন ফিৎজেরাল্ড (Fitzgerald)। এটি হল যে, কোন চলন্ত বস্তু তার গতির দিকে কিছুটা সংকুচিত হয়, এবং এই সংকোচনের মান নির্ভর করে বস্তুটির বেগের উপর। লোরেনৎস (Lorentz) এই কল্পনার কিছুটা উন্নতিসাধন করলেন। তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এটির বিচার করলেন। তিনি বললেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুই

মৌলিক বৈদ্যুতিক আধানের দ্বারা গঠিত। বিদ্যুৎ-গতিবিদ্যার (electro-dynamics) নিয়মানুযায়ী বস্তুটির গতিতে বলের (force) সৃষ্টি হয়। এই বল আধানগুলিকে গতির দিকে চেপে রাখে এবং সেইজন্যে বস্তুটি গতির দিকে সংকুচিত হয়। তিনি বললেন যে, ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষায় আলোর বেগের মানের তারতম্য না পাওয়ায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এটি সাধারণ সনাতন বলবিদ্যার ব্যাপার। আলোর বেগের মান প্রকৃতই পৃথিবীর গতির দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম-পূবে রাখা নলটিতে কমে যায়, কিন্তু এই নলটি পৃথিবীর বেগের জন্যে দৈর্ঘ্যে সমানানুপাতে ছোট হয়ে যায় বলে আলোর তরঙ্গের এই দিকে প্রবাহের সময়ের মান ও উত্তর-দক্ষিণ দিকের নলে আলোর প্রবাহের সময়ের মান সমান থাকে, কারণ পৃথিবীর গতির লম্বের (perpendicular) দিকে আলোর বেগ ও নলের দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় না। পশ্চিম-পূব দিকে রাখা নলটির দৈর্ঘ্যের তফাৎ বোঝা যাবে না এইজন্য যে, যে স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্যটি মাপা যাবে সেটিও সমান অনুপাতে ছোট হয়ে যাবে।

লোরেনৎস সনাতন পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলির যেমন ঈথারের অস্তিত্ব, পরম বেগ (absolute velocity)—কোন কিছুর পরিবর্তন করলেন না। কিন্তু তাঁর এই সব কল্পনা যদিও পরিলক্ষিত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়, তথাপি এইগুলিতে প্রকৃত 'স্বাভাবিকতা' (naturalness) এবং আইনস্টাইন যাকে বলতেন 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতা ও সুসামঞ্জস্য' (inner perfection and harmony)—এইগুলির অভাব ছিল, কারণ এইসব কল্পনা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ এড হক (ad hoc) ভিত্তিতে। লোরেনৎসের এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 1895 খ্রীস্টাব্দে এবং পরে তাঁর গাণিতিক সূত্রগুলি প্রকাশিত হয় 1904 খ্রীস্টাব্দে। এইগুলি আরও অধিকতরভাবে আলোচিত হয় পোয়াঁকারের (Poincare) দ্বারা।

এমনি মনে হয়েছিল প্লাঙ্ক যখন কণাবাদ আবিষ্কার করলেন। তিনি নিজে প্রথম প্রথম তাঁর আবিষ্কারের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন যে, বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শক্তির বণ্টনের পরীক্ষার ফল ও তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য পাবার জন্যেই তাঁকে ঐরূপ কল্পনা নিতে হয়েছে। আইনস্টাইন এই কণাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর 'আলোক-বিদ্যুৎ তত্ত্বের' দ্বারা, যা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

আইনস্টাইন লোরেন্ৎসের ব্যাখ্যার অল্পকাল পরেই 1905 খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপনা করলেন। তাঁর এই মতবাদে লোরেন্ৎসের কল্পনাগুলিকে কিছুটা যথার্থ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লোরেন্ৎসের কল্পনা যে এই সংকোচনের ব্যাপারটি স্বাভাবিক বা বাস্তব ঘটনা (physical fact), সেটি ঠিক নয়, এটি হয় বিশ্বজনীন কতকগুলি প্রাকৃতিক বাস্তব নিয়মানুসারে।

লোরেন্ৎসের তত্ত্বে পাওয়া যায় চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্যের সংকোচন, সময়ের শ্লথগতি (time dilation), এবং আলোর অপরিবর্তনীয় বেগ। তাঁর তত্ত্বে এই সব রূপান্তরকে বলা হয় লোরেন্ৎস রূপান্তর (Lorentz transformation)। আইনস্টাইনের তত্ত্বে এই সবই পাওয়া যায়, কিন্তু একটি কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারের, যেমন বিদ্যুৎগতিজনিত ভিত্তিতে নয়, বিশ্বজনীন নিয়মের ভিত্তিতে, যে নিয়মে আইনস্টাইন মহাকাশ ও সময়ের ধারণাকে নূতন অর্থে ও বিশ্বকে একটি সম্পূর্ণ নূতন বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এইখানেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব।

1905 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যাবিদদের ধারণা ছিল যে, মহাকাশ অনন্ত, অনন্যগত বা পরনির্ভরশীল নয়। মহাকাশ সমস্ত গাগনিক বস্তু ধারণকারী একটি আধার বা পাত্রবিশেষ। এই মহাকাশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ঈথার মাধ্যম, যার ভিতরে তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয় আলোর তরঙ্গ। মহাকাশের স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে কোন চলন্ত বস্তুর পরম বেগ (absolute velocity) বের করা যেতে পারে।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, বস্তুহীন মহাকাশের কোন অস্তিত্বই নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। এই বিষয়ে তিনি তাঁর দু-শ' বছর পূর্বে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ লাইবনিৎসের (Leibnitz) মহাকাশ সম্বন্ধে ধারণাকে গ্রহণ করলেন। লাইবনিৎস বলেছিলেন "Space is the order or relation of things among themselves. Without things occupying it, it is nothing." অর্থাৎ "মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতরে বিন্যাস। মহাকাশে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে, সেগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছুই নয়।"

সময় সম্বন্ধেও এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, সময় অনন্যগত,

অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরোধনীয় প্রবাহ, যা অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বয়ে চলেছে। নিউটন মনে করতেন যে, যদি এমন কতকগুলি ঘড়ি পাওয়া যায়, যা নিখুঁত ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল সময় নির্দেশ করে এবং এই ঘড়িগুলি বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে থাকে, সেই পর্যবেক্ষকেরা বিশ্বের যে কোন স্থানে পরস্পরের আপেক্ষিকে চলন্ত যে বস্তু বা মাধ্যমেই (medium) থাকুন না কেন, এই সব ঘড়ি সব সময়েই সমান গতিতে চলবে এবং যে-কোন মুহূর্তে সব ঘড়িতে সমান সময় নির্দেশিত হবে, কোন প্রকার পার্থক্য থাকবে না। সময়ের এই বিশেষত্বর জন্যে এর ভিত্তিতে সব পর্যবেক্ষক তাঁদের পর্যবেক্ষণীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

আইনস্টাইন তাঁর মতবাদে সময় সম্বন্ধে বললেন যে, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। বিশ্বের যে কোন আধারে সময়ের গতি এক—এই ধারণা ভুল। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। কোন রঙের ধারণার মত সময়ের ধারণাও উপলব্ধির বিষয়; যেমন চোখ না থাকলে রঙ বলে কিছু নেই, তেমনি প্রতিটি মুহূর্ত অথবা প্রতিটি ঘণ্টা কিংবা প্রতিটি দিন ইত্যাদি ঘটনাগুলির দ্বারা চিহ্নিত না হলে সময় বলে কিছু নেই। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে হলে কোন একজন পর্যবেক্ষককে উল্লেখ করতে হবে একটি নির্দিষ্ট স্থির-সম্পর্ক নির্ধারক কাঠামো থেকে কত দূরে ঘটনাগুলি ঘটেছে; তাঁকে আরও উল্লেখ করতে হবে কোন্ সময়ে সেগুলি ঘটেছে, এবং সেই সময়টি জানবার জন্যে তাঁর নিজস্ব কোন উপায় জানতে হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ঘটনার সময়ের অভিজ্ঞতা পান ঘড়ি থেকে। মানুষের তৈরী ঘড়ির যন্ত্রের ক্রিয়া সৌর জগতের নিয়মের উপর নির্ভরশীল। সৌর জগতের বাইরে মহাকাশে আমাদের পার্থিব সময়ের ধারণা অর্থহীন। আপেক্ষিকতাবাদে ঘড়ির উল্লেখে বুঝতে হবে শুধু মানুষের তৈরী ঘড়িই নয়— ঘড়ি বলতে বুঝতে হবে—যে যন্ত্র অবিরাম নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে এবং যার দোলনকাল বা পর্যাবৃত্ত কাল (periodic time) সব সময়েই একই মানের। পৃথিবী একটি ঘড়ি, কারণ নিজের অক্ষরে চারদিকে একবার সম্পূর্ণ-ভাবে ঘুরতে এটির সময় লাগছে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট। একটি পরমাণুও ঘড়ি, কারণ ভিতরে নিয়মিত ভাবে আবর্তনরত ইলেকট্রন রয়েছে। বিশ্বে বহু

সুনির্দিষ্টভাবে কম্পনরত বা পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন বস্তু আছে। আর এই সব মৌলিক যন্ত্র, যেমন মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণু, বিশ্বের সর্বস্থানে অসাধারণ সমতা বজায় রাখে। এইরূপ যে-কোন একটিকে সময়জ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন বললেন যে, সময় অপরিবর্তনীয় নয়, বিশ্বে অপরিবর্তনীয় যে বিষয়টি—তা হল আলোর বেগ। কোন একজন পর্যবেক্ষক ঘটনাগুলি ঘটতে দেখছেন আলোর জন্য এবং এই অবিচল বেগধারী আলোর সঙ্কেত প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে তাঁর নিজের নির্ভুল সময় জানতে সাহায্য করবে, তিনি মহাকাশের যেখানেই থাকুন না কেন।

বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগের মানের এই কল্পনাটি (hypothesis) আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার মূল ভিত্তি। মাইকেলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করেই তিনি এই কল্পনার সাহায্য নিলেন। তিনি বললেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পৃথিবীতে যেমন আলোর বেগের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না কিংবা ঈথারের অস্তিত্বও উপলব্ধি করা গেল না, তেমন বিশ্বের যে-কোন স্থানে এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফল একই পাওয়া যাবে। বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কল্পিত মাধ্যম ঈথারের অস্তিত্ব মেনে নেবার কোন প্রয়োজন নেই। আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র শুধু একই মানের নয়, আলোর বেগ সর্বোচ্চ। কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারবে না।

শব্দের বেগ যেমন তার উৎসের বেগের উপর কিংবা গ্রাহকের বেগের উপর নির্ভরশীল, আলোর বেগ সেরূপ নয়। আলোর বেগের অবিচলতা প্রাকৃতিক ঘটনাতে প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশে অনেক যুগ্ম-তারকা (double star) আছে। এগুলি উভয়ের একটি সাধারণ অভিকর্ষ-বিন্দুকে কেন্দ্র করে (centre of gravity) পরস্পরের চারদিকে আবর্তন করছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এইরূপ আবর্তনকালে পৃথিবীর অভিমুখে আগমনকারী তারকাটি থেকে নির্গত আলোর বেগ পৃথিবীর থেকে বিপরীত দিকে গমনকারী তারকাটি থেকে নির্গত আলোর বেগের সমান।

বিশ্বে পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, তারকা ইত্যাদি সব বস্তুই পরস্পরের আপেক্ষিকে অবিচল বেগে চলন্ত অবস্থায় আছে বলে কোপার্নিকাসের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত

ভূ-কেন্দ্রিক (geocentric) তত্ত্বে, যাতে পৃথিবীকে স্থির বলে মনে করা হত, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, যেমন সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদির সময় নির্ধারণ সঠিকভাবেই বের করা যেত। বর্তমান যুগেও সব গতিশীল বস্তুর একটির আপেক্ষিকে অন্যগুলির গতি ও বেগ জানতে হলে প্রথমটিকে স্থিতাবস্থায় আছে মনে করে তথ্যগুলি বের করতে হবে।

আইনস্টাইন আরও বললেন যে, সময় সম্পর্কিত কতকগুলি ধারণা, যেমন 'এখন' (now). 'যুগপত্তা' (simultaneity) ইত্যাদি অর্থহীন। এই সব ধারণা ছিল যখন সময়কে মনে করা হত 'invariant', যার প্রবাহ মনে করা হত বিশ্বের সর্বত্র সর্ব মাধ্যমে একই বেগে চলেছে, অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে সর্বত্র সময় নির্দেশ এক—পার্থক্য নেই। যেহেতু আপেক্ষিকতাবাদে সময়ের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে, কোন ঘটনা কোন্ মুহূর্তে ঘটছে কিংবা দুটি ঘটনা ঘটবার মুহূর্তগুলি নির্ভর করবে পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন বেগে চলন্ত মাধ্যমের উপর। কোন দুটি ঘটনার 'যুগপত্তা' কিংবা কোনটি 'আগে' কিংবা 'পরে' —এসব বলা ভুল।

'এখন' বা এই মুহূর্তে বিশ্বের কোন দূর প্রান্ত থেকে ধরা যাক এক লক্ষ আলোক বর্ষ দূরত্বে অবস্থিত কোন তারার আলো কোন বিজ্ঞানীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এসে পড়েছে, অর্থাৎ তারাটির থেকে আলো এক লক্ষ বছর আগে যাত্রা করে এইমাত্র ঐ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এসে পৌঁছল। কিন্তু তিনি বলতে পারবেন না যে, তিনি এইমাত্র বা এখনি তারকাটিকে দেখলেন, কারণ এই এক লক্ষ বছর সময়ের ভিতরে হয়ত তারকাটি বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

পৃথিবীতে কিংবা যে কোন মাধ্যমে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের কাছে বিশ্বের কোন ঘটনা 'এখন', দুটি ঘটনার এটি 'আগে' ও ঐটি 'পরে', কিংবা দুটি ঘটনা একই মুহূর্তে ঘটেছে—এই সব যে ভাবে প্রতীয়মান হবে, পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক দ্রুতবেগে ধাবমান অন্য কোন মাধ্যমে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে এই সব ঘটনা অন্যভাবে প্রতীয়মান হবে, অর্থাৎ প্রথম জনের কাছে যা 'এখন' মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় জনের কাছে তা মনে হবে না। মনে হবে হয়ত ঘটনাটি আগেই ঘটে গেছে। প্রথম জনের কাছে যা 'আগে' ও 'পরে', দ্বিতীয় জনের কাছে হয়ত তা ঠিক উল্টো মনে হবে। আবার প্রথম জনের

কাছে যে দুটি ঘটনা 'যুগপৎ' (simultaneous) বলে মনে হবে, দ্বিতীয় জনের কাছে ঘটনা দুটি আদৌ 'যুগপৎ' বলে মনে হবে না, হয়ত মনে হবে একটি 'আগে' ও অন্যটি 'পরে' হচ্ছে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইনের মূল দুটি কল্পনার একটি হল আলোর বেগ অপরিবর্তনীয়। এই বিষয়টি কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল যে, কোন একটি নিখুঁত জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে (perfect inertial system) পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে এই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে (uniform velocity) চলন্ত যে-কোন অনুরূপ মাধ্যমেই এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য হবে।

আইনস্টাইনের নিজের কথায়—"কল্পনা করা যাক যে, দু-জন পদার্থ-বিদ্যাবিদের প্রত্যেকের কাছে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করবার সর্ব-প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে। মনে করা যাক যে, এক জনের গবেষণাগার একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের কোথাও অবস্থিত এবং অপর জনের গবেষণাগারটি অবস্থিত কোন একদিকে অবিচল বেগে চলন্ত এক ট্রেনের কামরায়। আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথা হল যে, এই দু-জন বিজ্ঞানী যদি তাঁদের নিজ নিজ স্থানে থেকে তাঁদের যন্ত্রপাতির দ্বারা প্রকৃতির নিয়মাবলী নিখুঁতভাবে বের করতে চেষ্টা করেন তবে তাঁরা দু-জনেই একই ফল পাবেন, প্রকৃতির নিয়মাবলীতে কোন প্রকারের পার্থক্য দেখতে পাবেন না এবং তা নির্ভর করবে যদি ট্রেনটির বেগ সব সময়েই সমান থাকে, কোন প্রকার ঝাঁকুনি যদি না থাকে। তারও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতির নিয়মাবলী কোন মাধ্যমের গতির উপর নির্ভর করে না।"

উপরে উক্ত বিষয়টিকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, পদার্থবিদ্যার তত্ত্বাদি ও নিয়মাবলী এরূপ হতে হবে যে, নিখুঁত জাড্যগুণসম্পন্ন কাঠামো-গুলিতে সম্পাদিত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জানা যাবে না যে, এইরূপ কোন কাঠামো অপর একটি সম্পূর্ণ একরূপ কাঠামোর সাপেক্ষে অবিচল বেগে চলেছে কিংবা অচল অবস্থায় আছে। মহাকাশ-সময়ের প্রতিসাম্যের (space-time symmetry) বিশ্বজনীনতার দিক থেকে এই মতবাদের মূল্য অসাধারণ।

যেহেতু আইনস্টাইনের এই মতবাদ প্রযুক্ত হবে পরস্পরের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে চলন্ত মাধ্যমগুলিতে, সেইজন্যে এই মতবাদকে বলা হয় 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ'। এর বছর দশেক পরে তিনি এই বিষয়টিকে সাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মাবলী একটি মাধ্যমে অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে অন্য যে-কোন বেগে চলন্ত কোন মাধ্যমে এই সব নিয়মাবলী অকাট্য হবে। সেইটিই হল 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ'। এর বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ও নিউটন কর্তৃক সমর্থিত মহাকাশের ও সময়ের ধারণাই শুধু পরিবর্তন করলেন না—তিনি বললেন যে, সময় ও মহাকাশকে কখনও আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না, বলতে হবে মহাকাশ-সময়-সন্ততি (space-time-continuum)। সব বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব এই দুইয়ের ভিতরে, কারণ এই দুটি অবিভাজ্য। সময়ের সমস্ত পরিমাপই হল মহাকাশের ভিতরে, আবার মহাকাশের যে-কোন পরিমাপ নির্ভর করে সময়ের পরিমাপের উপরে। সেকেণ্ড, মিনিট, মাস, বছর, ঋতু ইত্যাদি সবই হলো মহাকাশে সূর্য, চন্দ্র, তারকা এদের আপেক্ষিকে পৃথিবীর অবস্থান।

আইনস্টাইনের ছাত্রজীবনের অধ্যাপক মিন্‌কভস্কি (Minkowski) বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক রূপ দিয়েছেন। মিন্‌কভস্কি এক জায়গায় লিখেছেন, "Space and time separately have vanished into the merest shadow, and only a sort of combination of the two preserves only reality"—অর্থাৎ "মহাকাশ ও সময় পৃথকভাবে কিছুই নয় এবং শুধু এই দুয়ের মিলন ও অবিচ্ছিন্নতাই হল বাস্তবে সত্য।" তিনি বিশ্বকে জ্যামিতিক রূপে বুঝিয়েছেন। আপেক্ষিকতাবাদে 'বস্তুর' চেয়ে 'ঘটনার' (events) প্রাধান্য বেশী। মিন্‌কভস্কি 'ঘটনার' ধারণাকে বুঝিয়েছেন একটি কণিকার মহাকাশে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে (special point) ও একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে (given instant) অবস্থিতির দ্বারা। এজন্যে একটি 'ঘটনাকে' প্রকাশ করা যায় চারটি স্থানাঙ্ক (co-ordinate) সম্বলিত একটি বিন্দুর দ্বারা ঃ তিনটি মহাকাশসংক্রান্ত, যেমন অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা এবং উচ্চতা, আর চতুর্থটি হল সময়ের মান ভিন্ন এককে (unit)। তিনি

এইরূপ বিন্দুকে বললেন 'জাগতিক বিন্দু' (world point)। কোন কিছুর গতি প্রকাশিত হবে এইরূপ 'জাগতিক-বিন্দুর' সঞ্চার-পথের (locus) দ্বারা। এই সঞ্চার-পথকে বলা হয়েছে 'জাগতিক-রেখা' (world line)। বিশ্বের সব কিছু সংক্রান্ত এইরূপ ঘটনাবলীর সমষ্টিগত ফল হল চার মাত্রার (four-dimensional) 'জাগতিক-বিন্দুসমূহ'—যা হল চার মাত্রার মহাকাশ-সময়-সন্ততি এবং একেই মিন্‌কভস্কি বলেছেন বিশ্ব।

আইনস্টাইন বলেছেন—সাধারণ মানুষ, যারা অঙ্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন, চার-মাত্রার জিনিসের কথা চিন্তা করতে পারেন না। সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে সেটা এক-মাত্রার (one dimensional), যেমন একটি রেল লাইন। যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুটি মাত্রা আছে, যেমন একটি খেলার মাঠ, সেটি দুই মাত্রার। যার তিনটি মাত্রা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যেমন একটি ঘর, সেটি তিন-মাত্রার। 'Continuum' শব্দটিকে বাংলায় বলা যেতে পারে সন্ততি। এটি হল সেই জিনিষ যেটি continuous বা অবিচ্ছিন্ন, যাতে কোন ছেদ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি রুলার (ruler), যার সাহায্যে আমরা সরল রেখা টানতে পারি, একটি এক-মাত্রাবিশিষ্ট space-continuum বা মহাকাশ-সন্ততি। বেশীর ভাগ রুলারই ইঞ্চিতে কিংবা সেন্টিমিটারে ও তাদের ক্ষুদ্র অংশে—দশ কি ষোল ভাগে চিহ্নিত থাকে। কিন্তু কল্পনাতে লক্ষ ভাগে বা কোটি ভাগে বা কোটি কোটি ভাগে চিহ্নিত মনে করা যেতে পারে। তত্ত্বগতভাবে continuum বা সন্ততির বিশেষত্ব এই যে, তার যে-কোন দুটি বিন্দুর ভিতরের স্থানকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বিভক্ত মনে করা যেতে পারে। একটি রেল লাইন হল এক-মাত্রার মহাকাশ-সন্ততি। সেই লাইনে, মনে করা যাক হাওড়া থেকে বর্ধমান, কোন ট্রেন গেলে, ট্রেনের গার্ড একটি স্থানাঙ্ক বিন্দুর সাহায্যে (co-ordinate point), যেমন একটি স্টেশন কিংবা মাইল-নির্দেশক প্রস্তর খণ্ড, তাঁর দূরত্ব জানতে পারেন। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তাঁর অবস্থান ঠিক করতে হবে দু-মাত্রা দিয়ে কারণ সমুদ্রের উপরিভাগ দু-মাত্রার মহাকাশ-সন্ততি। সুতরাং ক্যাপ্টেন তাঁর অবস্থান ঠিক করবেন latitude ও longitude বা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা থেকে। একজন বিমানের পাইলট যখন আকাশে উড়ে যান, মানে তিন-মাত্রার মহাকাশ-সন্ততির ভিতর দিয়ে যান, তিনি তাঁর

অবস্থান ঠিক করবেন তিনটি মাত্রা যথা অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও উচ্চতা দিয়ে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে দেখতে গেলে মহাকাশ একটি তিন মাত্রার সন্ততি (three-dimensional continuum)।

কিন্তু গতিশীল কোন কিছুর সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে, কেবলমাত্র মহাকাশে অবস্থানই যথেষ্ট নয়, কিভাবে বস্তুটি সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করছে তাও জানতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কলকাতা-দিল্লী মেল ট্রেন হাওড়া থেকে দিল্লী যায় বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে। এই ট্রেনটির চলাচলের সঠিক বিবরণ দিতে হলে শুধু কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে যাচ্ছে বললে চলবে না, কোন্ জায়গায় কোন্ সময়ে যাচ্ছে তাও বলতে হবে। তবে জানা যাবে ট্রেনটি এই সময়ে এই জায়গায় আছে। আর এটি জানা যায় time table থেকে। তেমনি কোন প্লেন কলকাতা-লণ্ডন যাতায়াত করলে, শুধুমাত্র তিনটি মাত্রা উল্লেখ করলেই চলবে না, সময়ের উল্লেখ অতি আবশ্যক। মনে করা যাক প্লেনটি কোন স্থান দিয়ে উড়ে যাবার সময় হঠাৎ আগুন লেগে নীচে পড়ল। তখন এয়ার অফিসের কর্মকর্তাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও উচ্চতা ছাড়াও জানতে হবে ঠিক কোন্ সময়ে বিপদটি হয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সময় হল চতুর্থ মাত্রা (fourth dimension)। যদি কোন বিমানের কোন শহর থেকে আর একটি শহরে উড়ে যাবার পথ কল্পনা করতে হয়, তবে সেই পথটিকে মধ্যবর্তী কতকগুলি জায়গায় নামা, আবার ওঠা, এই সব দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা চলবে না, ভাবতে হবে একটি অবিচ্ছিন্ন বক্রাকার পথ—চার মাত্রায় মহাকাশ-সময়-সন্ততির ভিতর দিয়ে (four dimensional space-time continuum)।

এই সদাচঞ্চল বিশ্বে প্রতিটি বস্তুই গতিশীল। এই মুহূর্তে পৃথিবী মহাকাশের যেখানে আছে, পর মুহূর্তে অন্যখানে সরে গেছে সেকেণ্ডে প্রায় 19 মাইল বা 30 কিঃ মিঃ বেগে, সূর্য তার সৌরজগৎ নিয়ে সেকেণ্ডে 200 মাইল বা 320 কিঃ মিঃ বেগে ছায়াপথের ভিতরে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করছে। ছায়াপথের যে স্থানে সূর্য আজ অবস্থিত সেখানে ফিরে আসতে লাগবে প্রায় 200 মিলিয়ান বা 20 কোটি বছর, যাকে বলা হয় এক গ্যালাকৃটিক বছর (galactic year); কিন্তু ছায়াপথের সেই জায়গায়

ফিরে এলেও আমাদের ছায়াপথ ততদিনে মহাকাশে দূরে, অনেক দূরে চলে গেছে, কারণ বিশ্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে আর গ্যালাক্সিগুলি পরস্পরের থেকে সেকেণ্ডে প্রায় 150 কিঃ মিঃ বেগে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে।

লোরেন্ৎস (Lorentz) আইনস্টাইনের কৃতিত্বকে প্রশংসা করে বলেছেন, "Einstein's achievement is that he was first to formulate the principle of relativity as a universal strict and exact law"—"আইনস্টাইনের কৃতিত্ব যে তিনিই প্রথম আপেক্ষিকতাবাদকে একটি বিশ্বজনীন যথার্থ নিয়মের ভিত্তিতে উপস্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছেন।"

আপেক্ষিকতাবাদে যে সব বেগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলি সবই অতি দ্রুতমানের, যা আলোর বেগের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় যে সব বেগের ধারণা আছে, সে সবই হল আলো বেগের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মানের, এমন কি পৃথিবীর বেগের তুলনায়ও অনেক কম। আজকাল রকেটের বেগের মান সেকেণ্ডে প্রায় 12 কিঃ মিঃ করা সম্ভবপর হয়েছে।

এই সব ক্ষুদ্রমানের বেগের বেলায় কোন দুটি চলন্ত বস্তুর একটির আপেক্ষিকে অপরটির বেগ বের করতে হলে—সাধারণ যোগ বিয়োগ করে বের করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শব্দের বেগের সঙ্গে উৎসের কি গ্রাহকের বেগের যোগ বিয়োগের দ্বারা শব্দের আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করা. অথবা জাহাজের ডেকে ভ্রমণরত ব্যক্তির বেগ—যে সব ব্যাপার পূর্বে বলা হয়েছে।

আরও একটি সহজ ও সাধারণের জানা একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুটি ট্রেন পাশাপাশি লাইনে সমান বেগে, মনে করা যাক, ঘণ্টায় 60 কিঃ মিঃ বেগে, একই দিকে চলেছে। প্রথম ট্রেনটির একটি কামরায় রাম বসে আছে এবং দ্বিতীয়টিতে ঠিক উল্টো দিকের কামরায় শ্যাম বসে আছে। তাদের পরস্পরের কাছে মনে হবে যে, তাদের দুটি ট্রেনই থেমে আছে, যদি না তারা জানালা দিয়ে বাইরের অন্য কিছু দেখে অথবা ট্রেন দুটির কোন ঝাঁকুনি না থাকে। আবার দুটি ট্রেনের গতি যদি উল্টোদিকে হয়, তবে রামের মনে হবে শ্যামের ট্রেনটি অতি দ্রুত চলে গেল, আর শ্যামের মনে হবে রামের ট্রেনটি অতি দ্রুত চলে গেল। এই দুটি ব্যাপারেই ট্রেনের বেগ বিদ্যালয়ের যে-কোন ছাত্র অঙ্ক কষে বের করতে পারে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অঙ্কে আপেক্ষিক বেগের নিয়মে জানে যে, দুটি বস্তুর ভিতরে আপেক্ষিক বেগ বের করতে হলে যে বস্তুটির আপেক্ষিকে অপরটির বেগ বের করতে হবে, সেটিকে স্থিতাবস্থায় আনতে হবে, অর্থাৎ তার বেগের সমপরিমাণ বেগ ঠিক তার গতির উল্টোদিকে প্রয়োগ করতে হবে, অবশ্য অঙ্কের খাতায়। এই পরিমাণ বেগ ঠিক একই দিকে অপর বস্তুটির উপর প্রয়োগ করে মোট বেগ বের করলে সেটিই হবে আপেক্ষিক বেগ।

উপরে বর্ণিত রাম ও শ্যামের ট্রেন দুটির কথা ধরা যাক। দুটি ঘণ্টায় 60 কিঃ মিঃ বেগে যাচ্ছে, মনে করা যাক, পূব থেকে পশ্চিমে। যখন তারা একই দিকে যায়, রামের আপেক্ষিকে শ্যামের বেগ বের করতে হলে রামের ট্রেনকে স্থিতাবস্থায় আনতে 60 কিঃ মিঃ বেগ প্রয়োগ করতে হবে উল্টোদিকে, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে, এই 60 কিঃ মিঃ বেগ ঠিক একই দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে প্রয়োগ করতে হবে শ্যামের ট্রেনে এবং যেহেতু সেটিও পূব থেকে পশ্চিমে 60 কিঃ মিঃ বেগে যাচ্ছে, শ্যামের ট্রেনটির আপেক্ষিক বেগ হবে $60-60=0$ কিঃ মিঃ, অর্থাৎ শূন্য বেগ। তেমনি মনে হবে শ্যামের কাছে রামের ট্রেনের বেগ। দু-জনের কাছে মনে হবে তাদের ট্রেন চলছে না।

আবার এই ট্রেন দুটি যদি উল্টোদিকে চলন্ত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ রামের ট্রেন পূব থেকে পশ্চিমে, আর শ্যামের ট্রেন পশ্চিম থেকে পূবে, তবে রামের ট্রেনকে স্থিতাবস্থায় আছে ভাবতে গেলে 60 কিঃ মিঃ বেগ প্রয়োগ করতে হবে পশ্চিম থেকে পূবে, তার মানে শ্যামের ট্রেনের গতির দিকে। তা হলে এই বেগ একই দিকে প্রয়োগ করলে শ্যামের ট্রেনের আপেক্ষিক বেগ হবে $60+60=120$ কিঃ মিঃ। শ্যামের আপেক্ষিকে রামের ট্রেনটির আপেক্ষিক বেগও একই হবে। দু-জনের প্রত্যেকের কাছে মনে হবে অপরজন অতি দ্রুত বেগে ঘণ্টায় 120 কিঃ মিঃ বেগে ছুটে চলে গেল। এই পদ্ধতি হলো সনাতন রূপান্তর অনুযায়ী।

কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক সূত্রানুযায়ী ঐরূপ দুটি বস্তুর বেগের যোগফল কখনও আলোর বেগের চেয়ে বেশী হতে পারবে না। ভবিষ্যতে রকেটের বেগ হয়ত আলোর বেগের কিছুটা কাছাকাছি করা সম্ভবপর হবে। মনে করা যাক যে, এইরূপ একটি মহাকাশযানে একজন ব্যক্তি পৃথিবীর

আপেক্ষিকে সেকেণ্ডে 150,000 কিঃ মিঃ, অর্থাৎ আলোর বেগের অর্ধেক বেগে যাচ্ছে এবং অপর একটি মহাকাশযান প্রথমটির দিকে একই বেগে আসছে। তা হলে সনাতন নিয়মানুযায়ী একটির আপেক্ষিকে অপরটির বেগ হবে সেকেণ্ডে 150,000+150,000=300,000 কিঃ মিঃ, অর্থাৎ আলোর বেগ। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী এই বেগ হবে সেকেণ্ডে 240,000 কিঃ মিঃ।

আপেক্ষিকতাবাদে ব্যবহৃত লোরেন্‌ৎস রূপান্তর সূত্রগুলির (Lorentz transformation laws) দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, এক মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে তার নিজের মাধ্যমে কোন দূরত্ব বা দৈর্ঘ্যের মান, এবং কোন সময়ের মান তার আপেক্ষিকে চলন্ত অন্য এক মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে কিরূপ প্রতীয়মান হবে। আবার এতে আরও জানা যায় যে, প্রথম মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে দ্বিতীয় মাধ্যমের ঘটনাগুলি অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের ও সময়ের মান ইত্যাদি যেরূপ প্রতীয়মান হবে, দ্বিতীয় মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে প্রথম মাধ্যমের ঐরূপ ঘটনাবলী ঠিক সেইরূপ প্রতীয়মান হবে। একে বলা হয় পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় reciprocal.

সহজ করে বোঝাবার জন্যে মনে করা যাক যে, প্রথম মাধ্যমটি হল পৃথিবী, এবং দ্বিতীয় মাধ্যমটি পৃথিবীতে সংলগ্ন কোন স্থানাঙ্ক নির্ধারকের আপেক্ষিকে সরল পথে এক অবিচল বেগে ছুটে চলেছে। এই বেগের মান ধরা যাক সেকেণ্ডে v কিঃ মিঃ। তা হলে পৃথিবীতে সংলগ্ন কোন একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য, ধরা যাক একটি ডাণ্ডার দৈর্ঘ্য যদি l হয়, তবে চলন্ত মাধ্যমে কোন একজন পর্যবেক্ষকের কাছে ডাণ্ডাটির দৈর্ঘ্য হবে $l'=l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$, যেখানে c হল আলোর বেগ (সেকেণ্ডে 300,000 কিঃ মিঃ)। আবার চলন্ত মাধ্যমে কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের কাছে ঠিক ঐ অনুপাতে (ratio), অর্থাৎ $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ অনুপাতে ছোট দেখাবে।

চলন্ত মাধ্যমে একটি ঘড়ির কোন সময়ের মান যদি হয় t', এবং পৃথিবীতে একটি ঘড়ির সেই সময়ের মান হয় t, তবে $t'=t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$, অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে চলন্ত মাধ্যমে সময়ের প্রবাহ

ধীরে বয়ে চলেছে। আবার চলন্ত মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে তার সময় ঠিকই আছে, পৃথিবীর সময়ের গতি ঐ একই অনুপাতে ধীরে চলেছে।

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝা যাক। মনে করা যাক যে, প্রথম মাধ্যমটি হল পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর আয়তন প্রকৃত পৃথিবীর আয়তনের বহু গুণ বড় এবং তার উপরিভাগ সমতল। দ্বিতীয় মাধ্যমটি হল একটি ট্রেন, যেটির দৈর্ঘ্য হল 300,000 কিঃ মিঃ, অর্থাৎ আলো এক সেকেণ্ডে যে দূরত্বে যেতে পারে এবং ট্রেনটির বেগ হল সেকেণ্ডে 240,000 কিঃ মিঃ, অর্থাৎ আলোর বেগের $\frac{4}{5}$ অংশ। ট্রেনের কামরায় এক পর্যবেক্ষক তাঁর কামরাটির দৈর্ঘ্য তাঁর নিজের স্কেল দিয়ে মেপে দেখলেন 100 মিটার। তিনি ট্রেনের বাইরে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধু পর্যবেক্ষককে কামরার ভিতর থেকে তাঁর কামরার দৈর্ঘ্যের কথা বললেন। কিন্তু বাইরের বন্ধুটি তাঁর হিসেব মত মেপে দেখলেন কামরাটির দৈর্ঘ্য মোটে 60 মিটার। প্রত্যেকের কাছে মনে হবে অপরজনের হিসেব ভুল। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী দু-জনের হিসেবই ঠিক। উপরে বর্ণিত দৈর্ঘ্যের সূত্র দিয়ে দুটি দৈর্ঘ্য যাচাই করে দেখা যাক।

$$l'=l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\therefore\ l'=100\sqrt{1-(\tfrac{4}{5})^2}=100\times\tfrac{3}{5}=60 \text{ মিটার।}$$

দেখা গেল যে, ট্রেনের পর্যবেক্ষকের হিসেবের 100 মিটার দৈর্ঘ্য ট্রেনের বেগের জন্যে বাইরের পর্যবেক্ষকের হিসেবে 60 মিটার।

তেমনি ট্রেনের ভিতরে টেবিলে রাখা একটি সম্পূর্ণ গোলাকার ডিনার প্লেট বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে চ্যাপ্টা—ট্রেনের গতির দিকে ব্যাস, গতির লম্বর দিকে ব্যাসের $\frac{3}{5}$ অংশ মনে হবে।

আবার এই ব্যাপারের বিপরীত ভাব দেখা যাক। বাইরের পর্যবেক্ষকের হাতে একটি 10 মিটার দৈর্ঘ্যের সরল ডাণ্ডা আছে। তিনি যদি ডাণ্ডাটি ট্রেনের গতির দিকে সমান্তরাল ভাবে ধরে রাখেন, ট্রেনের বন্ধুটি চলন্ত কামরার ভিতর থেকে ডাণ্ডাটির দৈর্ঘ্য দেখবেন $10\times\frac{3}{5}=6$ মিটার। যদি ডাণ্ডাটি ট্রেনের গতির দিকে লম্বভাবে ধরে রাখেন, ট্রেনের পর্যবেক্ষকটি এই অবস্থাতে ডাণ্ডাটির দৈর্ঘ্য 10 মিটারই দেখবেন, কারণ সঙ্কোচন মনে হবে শুধু ট্রেনের গতির দিকে।

এখন সময়ের শ্লথগতি (time dilation) সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করা যাক যে, পূর্বোল্লেখিত ট্রেনটি সেকেণ্ডে 240,000 কিঃ মিঃ বেগে একটি স্টেশন পেরিয়ে ছুটে চলেছে। মনে করা যাক যে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকা স্টেশন মাস্টারের ঠিক নিকটে ট্রেনটি আসবামাত্র প্রথম কামরাটির সামনের দিকের দেয়াল থেকে একটি আলো জ্বলে উঠল। এই সামান্য ঘটনা আলো জ্বলে ওঠার ফল ট্রেনে পর্যবেক্ষকের কাছে ও স্টেশন মাস্টারের কাছে তফাৎ মনে হবে। ট্রেনে অবস্থিত পর্যবেক্ষকটি দেখবেন যে, ঐ আলোর রশ্মিতে 300,000 কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ট্রেনটির সবচেয়ে পিছনের কামরার পিছনের দেয়ালটি ঠিক এক সেকেণ্ড পরে আলোকিত হয়ে উঠল। কিন্তু স্টেশন মাস্টার দেখবেন যে, পিছনের দেয়ালটি আলোকিত হয়ে উঠতে $\frac{3}{5}$ সেকেণ্ড অর্থাৎ আধ সেকেণ্ডের সামান্য কিছু বেশী লাগল। দুই পর্যবেক্ষকের একই ব্যাপারের দুটি বিভিন্ন সময়ের হিসেব আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী নির্ভুল।

আলোর বেগ অপরিবর্তনশীল এবং এটি কোন মাধ্যমের বেগের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং চলন্ত ট্রেনটির ভিতরে আলোর বেগ সেকেণ্ডে 300,000 কিঃ মিঃ, এবং ট্রেনটির দৈর্ঘ্য 300,000 কিঃ মিঃ হওয়ার জন্যে ট্রেনের পর্যবেক্ষকের হিসেব মত আলোর পিছনের দেয়ালে পৌঁছতে লাগল এক সেকেণ্ড। কিন্তু স্টেশন মাস্টারের কাছে ট্রেনটির ঐরূপ বেগের জন্যে সেটির দৈর্ঘ্য মনে হবে $300{,}000 \times \frac{3}{5} = 180{,}000$ কিঃ মিঃ। সুতরাং আলোর বেগ পৃথিবীতেও সেকেণ্ডে 300,000 কিঃ মিঃ হওয়ায় স্টেশন মাস্টারের কাছে মনে হবে আলোর পিছনের দেয়ালে পৌঁছতে লাগছে $\frac{180{,}000}{300{,}000}$ অর্থাৎ $\frac{3}{5}$ সেকেণ্ড।

আবার অন্যভাবেও এটি বোঝা যায়। বিভিন্ন মাধ্যমের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে তার সময়ের তুলনায় অন্যের সময় ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে, সেজন্যে $t' = t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ সূত্র অনুযায়ী সময়ের মান হল $\frac{3}{5}$ সেকেণ্ড।

আমরা জানি যে, মহাকাশযানে মহাকাশযাত্রীদের হৃৎস্পন্দন, নাড়ীর গতি ইত্যাদি সর্বক্ষণ টেলিমিটার-যোগে রেডিও-তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সেগুলিকে মাপা হতে থাকে। রেডিও-তরঙ্গের আর আলোর বেগ সমান।

ভবিষ্যতে যদি মহাকাশযানের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হয়, তবে পৃথিবী থেকে মনে হবে মহাকাশযাত্রীদের হৃৎস্পন্দন বা নাড়ীর গতি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মহাকাশযাত্রীরা কিছু তফাৎ অনুভব করবেন না। তাঁদের হিসেব মত তাঁদের দৈহিক ক্রিয়া একই প্রকার আছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দূরত্বের কিংবা সময়ের আপেক্ষিক মান সেরূপ কিছুই বোঝা যাবে না যদি মাধ্যমগুলির বেগ আলোর বেগের তুলনায় অতি সামান্য হয়, যেমন বর্তমানকালে পৃথিবীতে যে কোন চলন্ত বস্তুর বেগের মান—যা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই। লোরেন্‌ৎসের সূত্র অনুযায়ী 'v' যদি 'c'-র তুলনায় খুবই নগণ্য হয়, তবে $\frac{v}{c}$–অনুপাতটি প্রায় শূন্য মনে করা যেতে পারে, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের কি সময়ের মান পৃথিবীতে বা চলন্ত মাধ্যমে একই থাকবে। আবার এই সামান্য বেগে চলন্ত দুটি মাধ্যমের আপেক্ষিক বেগও সাধারণ সনাতন নিয়মাবলীর দ্বারা বা সাধারণ যোগ বিয়োগের দ্বারা বের করা যাবে।

বাস্তব জগৎকে বুঝতে হলে তিনটি বিষয় জানা দরকার: 'সময়', 'দূরত্ব' ও 'ভর'। পূর্ব অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে যে, 'সময়' ও 'দূরত্ব' এই দুটির মান আপেক্ষিক। আপেক্ষিকতাবাদে জানা যায় যে, বস্তুর 'ভর' বস্তুটির গতির অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সাধারণ লোকে বস্তুর ভর (mass) ও ওজনের (weight) তফাৎ বুঝতে পারে না। সাধারণতঃ কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে (quantity of matter) 'ভর' বলা হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যায় 'ভর' হল পদার্থের একটি মৌলিক ধর্ম (fundamental property), যাকে বলা যায় জড়তা বা inertia। এই গুণটি হল বস্তুটির স্থিতাবস্থার কিংবা গতির কোনপ্রকার পরিবর্তনকে বাধা দেওয়া। একটি ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি সাইকেল নিয়ে যদি তুলনা করা যায়, তবে নড়াতে কিংবা চলন্ত অবস্থা থেকে থামাতে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির থেকে অনেক বেশী বলের দরকার, কারণ প্রথমটির ভর দ্বিতীয়টির থেকে অনেক বেশী। সনাতন পদার্থবিদ্যায় কোন বস্তুর ভরের মান সব সময়েই একই থাকে—কোন প্রকারে এর পরিবর্তন হয় না। যেমন একটি ইঞ্জিন 80 কিঃ মিঃ বেগেই যাক, কি 80,000 কিঃ মিঃ বেগেই যাক, সনাতন

বিজ্ঞানে বলে যে, ইঞ্জিনটির ভর একই থাকে। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদে জানা যায় যে, একটি চলন্ত বস্তুর ভর কখনও এক মানের থাকে না, পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিকে বস্তুটির বেগ দ্রুততর হতে থাকলে ভর বেড়ে যেতে থাকবে। অবশ্য এখানেও বেগ বলতে পূর্বের ন্যায় বুঝতে হবে আলোর বেগের কাছাকাছি। কারণ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে বেগ, সে বেগে ভরের পরিবর্তন এতই সামান্য হয় যে, তা মাপার কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে ভরের এই পরিবর্তন বুঝতে হলে জানতে হবে যে আলোর বেগই বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। অন্য কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না। কোন বস্তুর উপর বাইরের বল বাড়িয়ে যদি বেগ বাড়ানো হতে থাকে, তবে যতই বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হতে থাকবে, বস্তুটি ততই বাইরের বলকে অধিক থেকে অধিকতর ভাবে বাধা দিতে থাকবে, যার জন্যে ত্বরণ (acceleration) কমতে থাকবে। এতে মনে হবে যেন বেগের মান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির ভর বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুটির বেগের মান যত আলোর বেগের কাছাকাছি হতে থাকবে, তার ভরের মান তত অনন্তমুখী হবে। এই অবস্থায় বস্তুটির বেগ কখনও আলোর বেগের সমান হতে পারবে না।

আপেক্ষিকতাবাদের অন্যান্য সূত্রের ন্যায়, ভরের পরিবর্তনের সূত্র হল :

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

এখানে m হল v বেগে চলন্ত বস্তুটির ভর, m_0 হল বস্তুটি স্থিতাবস্থায় থাকার সময়ে ভর, এবং c হল আলোর বেগ। এই সূত্রটি থেকে বোঝা যায় যে, যদি v আলোর তুলনায় নগণ্য হয়, তবে $\frac{v^2}{c^2}$ হবে প্রায় শূন্য, অর্থাৎ $m=m_0$, তার মানে আলোর তুলনায় নগণ্য বেগে চলন্ত বস্তুর ভরের সেরূপ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হবে না। কিন্তু যদি বস্তুটি আলোর বেগের তুলনীয় কোন বেগে, ধরা যাক $\frac{4}{5}$ অংশ বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে 240,000 কিঃ মিঃ বেগে যায়, তবে বস্তুটির ভর হয়ে যাবে $\frac{5}{3}$ গুণ বেশী। যদি 10 মিটার ব্যাসের ও 60 কিলোগ্র্যাম ওজনের একটি গোলক (sphere) পৃথিবীর

পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিকে সেকেণ্ডে 240,000 কিঃ মিঃ বেগে ছুটতে থাকে, তবে পর্যবেক্ষকটির মনে হবে গোলকটির গতির দিকে সেটি চ্যাপটা হয়েছে, গতির দিকের ব্যাস হয়েছে 6 মিটার এবং গোলকটির ভর বেড়ে হয়েছে 100 কে. জি। পৃথিবী থেকে মনে হবে, চলন্ত গোলকটিতে সময় ধীরে চলেছে, সে কাজ পৃথিবীতে হতে লাগে 1 সেকেণ্ড, চলন্ত গোলকটিতে সেই কাজ হতে হলে পৃথিবী থেকে মনে হবে সময় লাগছে $\frac{5}{3}$ সেকেণ্ড।

বস্তুর বেগের সঙ্গে ভরের এইরূপ আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যাওয়ার তত্ত্ব থেকে আইনস্টাইন একটি পরমাশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যার ফলে তিনি বর্তমান বিজ্ঞানে এক অমূল্য সূত্র দিয়েছেন। তিনি ভাবলেন যে, যেহেতু একটি চলন্ত বস্তুর বেগ বেড়ে গেলে ভর বেড়ে যায় এবং যেহেতু গতি থেকে পাওয়া যায় গতিশক্তি (kinetic energy), সেহেতু অনুমান করা যেতে পারে যে, চলন্ত বস্তুটির শক্তির আধিক্য থেকে ভরের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে শক্তির ভর আছে!

তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে গাণিতিক রূপ দিলেন এই ভাবে যে, বেগের আধিক্যহেতু যে পরিমাণ শক্তির আধিক্য হয়, তাকে যদি বলা যায় E, তবে এই শক্তির ভর m হবে $\frac{E}{c^2}$, যেখানে c হল আলোর বেগ। অর্থাৎ v বেগে চলন্ত বস্তুটির ভরের মান স্থিতাবস্থায় যদি থাকে m_0, তবে তা বেড়ে হবে m_0+m, অর্থাৎ $m_0+\frac{E}{c^2}$। এখানে মনে রাখতে হবে যে, বস্তুটির স্থিতাবস্থার ভর m_0 হল জড়ত্বজনিত ভর, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় inertial mass।

এই থেকে আইনস্টাইন অতি বিখ্যাত একটি অনুসিদ্ধান্ত (corollary) প্রকাশ করলেন। এটি হল ভর ও শক্তির তুল্যতা (equivalence of mass and energy)। যে কোন বস্তুতে তার স্থিতাবস্থায় জড়ত্বজনিত ভরের তুল্য অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। যদি m_0 গ্র্যাম (gram) হয় বস্তুটির স্থিতাবস্থায় ভর, তবে এই পরিমাণ ভরের অন্তর্নিহিত শক্তি হল $m_0 \times c^2$ আর্গ, আর্গ হল শক্তির একক (unit)। যেহেতু এই শক্তি নির্ভর করছে c^2 অর্থাৎ আলোর বিপুল বেগের (তিন লক্ষ কিঃ মিঃ/সে) বর্গের উপর, সেহেতু এই

অন্তর্নিহিত শক্তির অবিশ্বাস্যরকম প্রচণ্ডতা বোঝা যেতে পারে। সব জিনিষেরই যে স্থিতাবস্থার ভর আছে, তা নয়। ফোটন অর্থাৎ আলোর বা যে-কোন শক্তির কণিকার এরূপ কোন ভর নেই, কারণ আলো মানেই হল সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেন্টিমিটার বেগে চলন্ত বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ, যে বেগ স্থির বা সর্বপ্রকার চলন্ত মাধ্যমে একই মাপের থাকে বলে কখনও কোথাও আলোকে স্থির ভাবা যায় না।

আইনস্টাইনের এই অতি বিখ্যাত সূত্রটির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক গ্র্যাম ভরের বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী মোট শক্তি পাওয়া যাবে—

$m_0 \times c^2 = 1 \times (3 \times 10^{10})^2$

$= 9 \times 10^{20}$ আর্গ।

$= 5{\cdot}6 \times 10^{32}$ ইলেকট্রন-ভোল্ট, সংক্ষেপে ই-ভো। কোন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে এক ভোল্ট (volt) পরিমাণ বিভব-পার্থক্য (potential difference) আছে এরূপ দুটি স্থানের মাঝে একটি ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, তাই হল এক ই-ভো।

$= 2 \times 10^{13}$ ক্যালরি, যেখানে ক্যালরি হল তাপের একক।

$= 25 \times 10^{6}$ কিলো-ওয়াট-আওয়ার, সংক্ষেপে কি-ও-আ (K. W. H.), যেখানে কি-ও-আ হল বিদ্যুৎ-শক্তির একক।

উপরের হিসেব থেকে বোঝা যাবে, কি বিপুল শক্তি লাভ করা যেতে পারে যদি এক গ্র্যাম বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এক গ্র্যাম ভর থেকে তাপশক্তি পাওয়া যাবে 2×10^{13} অর্থাৎ 20 লক্ষ কোটি ক্যালরি। এক কিলোগ্র্যাম জলকে 0° ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে 100° ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম করে বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজন হয় 10^5 অর্থাৎ এক লক্ষ ক্যালরি। তা হলে এক গ্র্যাম ভরের শক্তি থেকে দু-লক্ষ টনেরও বেশী জলকে গরম করে বাষ্প করা যাবে।

আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায়, তবে প্রতিটি বাড়ীতে মাসে গড়ে 100 কি-ও-আ পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হলে এক গ্র্যাম ভরের তুল্য শক্তি 20 হাজারেরও কিছু বেশী বাড়ীতে এক বছর বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে।

কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এখনও বিজ্ঞানে কোন বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয় নি, কিংবা সম্পূর্ণ বস্তুকে তাপশক্তিতে পরিণত করা যায় নি। আমরা বর্তমানে কয়লা কি কাঠের মত বস্তু পুড়িয়ে যে তাপ পাই, সে হল রাসায়নিক বিক্রিয়াতে। এতে তাপশক্তি অতি সামান্যই পাওয়া যায়। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এক গ্র্যাম কয়লাকে পুড়িয়ে কত সামান্য পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়। এখন পরমাণুর লুক্কায়িত শক্তি নির্গত করে ব্যবহার করা যেভাবে সম্ভবপর হয়েছে, তা হল (1) ইউরেনিয়ামের মত ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনকে (atomic nucleus) নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করে বিভাজনের (fission) দ্বারা এবং (2) অধিক উষ্ণতায় একাধিক হাল্‌কা পরমাণু-কেন্দ্রীনের সংযোজনের (fusion) দ্বারা।

বিভাজনের ফলে মূল কেন্দ্রীনটি দুটি একেবারে অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয় এবং এতে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াই ব্যবহৃত হয় পরমাণু-বোমা তৈরি করতে, কিংবা পারমাণবিক চুল্লীতে (atomic reactor), যা ব্যবহৃত হচ্ছে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (thermal power station)। সংযোজনের ফলে একাধিক হাল্‌কা কেন্দ্রীনের মিলনে অপেক্ষাকৃত ভারী কেন্দ্রীন তৈরি হয় এবং এক্ষেত্রেও বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়। সূর্যের শক্তির মূলে রয়েছে এই প্রক্রিয়া। তাপের এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় হাইড্রোজেন বোমায়।

বিভাজন সম্পর্ক সহজে ও সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। পারমাণবিক বিজ্ঞানে ভর এককের (mass unit) মান হল $1{\cdot}6603 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম। এই সংখ্যাটিকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় U অক্ষরটি দিয়ে। এই ভর একক U-এর মাপে একটি প্রোটনের ভর হল $1{\cdot}0078\ U$, অর্থাৎ $1{\cdot}6724 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম। একটি প্রোটন হল একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন (nucleus)। হাইড্রোজেন পরমাণুকে উল্লেখ করা হয় H অক্ষরটি দিয়ে। ইউরেনিয়াম মৌলিক পদার্থটিকে বোঝানো হয় U অক্ষরটি দিয়ে। এই U-এর যে আইসোটোপটিকে (isotope) সহজে বিভাজন করা যায়, সেটির ভর সংখ্যা (mass number) হল 235 এবং এটিকে বলা হয় U^{235}। একটি U^{235}-এর ভর হল $235{\cdot}04393\ U$, অর্থাৎ $390{\cdot}2435 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম।

তাহলে দেখা গেল যে, বহু টন কয়লা না পুড়িয়ে খুব অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম থেকে তার লুকায়িত শক্তি নির্গত করে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর দ্বারা খরচও কম হবে, অর্থাৎ গ্রাহকেরা সস্তা দামে বিদ্যুৎ পাবে এবং দেশের কয়লা সংরক্ষিত হবে। এই কয়লা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এবার সংযোজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সূর্য কিংবা যে কোন তারকাতে সব সময়েই প্রচণ্ড পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। প্রতি 4টি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন সূর্যের কিংবা তারকার আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড উষ্ণতায় একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু মূল 4টি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের ভর একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। সুতরাং এই সামান্য পরিমাণ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আবার সূর্য কিংবা যে-কোন তারকা থেকে প্রতি মুহূর্তে বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হচ্ছে, অর্থাৎ সূর্য কিংবা যে কোন তারকা সর্বদাই ঐ নির্গত শক্তির তুল্য পরিমাণ ভর হারাচ্ছে।

হিসেবে দেখা যায় যে, সূর্য থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $8{\cdot}8\times10^{25}$ ক্যালরি তাপ নির্গত হচ্ছে। তা হলে সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে এই তাপের তুল্য ভর হারাচ্ছে। এর পরিমাণ আইনস্টাইনের সূত্র দিয়ে অঙ্ক কষে বের করলে হবে $8{\cdot}8\times10^{12}$ গ্রাম, অর্থাৎ 88 লক্ষ টন।

সূর্যের এই দ্রুত ক্ষয় দেখে আমাদের চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ সূর্যের ভর হল 2×10^{27} টন। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে 88,00,000 টন ভর কমলেও শুধু এই কারণে সূর্যের সব ভর নিঃশেষ হতে লাগবে $\frac{2\times10^{27}}{8{\cdot}8\times10^{12}}$ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি কোটি বছর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভরের আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যাওয়া বিবেচ্য হবে আলোর বেগের তুলনীয় বেগে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার কোন কোন যন্ত্রে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণিকাগুলির বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হয়। সুতরাং এই সব যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনাকালে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের হিসেব করতে হবে ঐ সব কণিকার আপেক্ষিক ভর, নতুবা যন্ত্র তৈরি ব্যর্থ হবে। অতি উচ্চ মানের বেগের ক্ষেত্রে নিউটনীয় বলবিদ্যা (Newtonian mechanics) সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান জগতে এই আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাবের পূর্বে বিজ্ঞানীরা অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন দুটি নিত্যতা তত্ত্ব (conservation laws), যথা শক্তির নিত্যতা (conservation of energy) এবং ভরের নিত্যতা (conservation of mass)। এই দুটি তত্ত্বকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অনন্যগত (independent) বলে মনে করতেন। পদার্থের বা ভরের বিনাশ নেই। শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। যেমন কোন একটি বস্তুকে পোড়ালে, হয়ত সাধারণ-ভাবে দেখলে মনে হবে বস্তুটি নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির কঠিন পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে গেল কতকগুলি গ্যাসে, যেমন কার্বনডায়োক্সাইড (carbon dioxide), জলীয় বাষ্প (water vapour) ইত্যাদি এবং ভস্ম ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যে। যদি একেবারে নির্ভুলভাবে পোড়াবার আগে বস্তুটির ভর ও পোড়াবার পরে ফলস্বরূপ যে সব কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের সবগুলির ভর নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে, পোড়াবার আগের ও পরের ভর সমান, শুধুমাত্র রূপ পাল্‌টেছে।

তেমনি শক্তির বিনাশ নেই, শুধুমাত্র রূপান্তর হয়। একটি লোহাকে যদি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হতে থাকে, তবে যে যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy) খরচ করা হচ্ছে, তার থেকে উদ্ভব হচ্ছে তাপ শক্তি, আলো, শব্দ ইত্যাদি। এই সব শক্তির পরিমাণ হবে ঐ যান্ত্রিক শক্তির সমান।

আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে এই দুটি নিত্যতা তত্ত্বকে একীভূত করলেন বা দুটি তত্ত্বের ঐক্য সাধন করলেন।

আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাবের পূর্বে এক কাপে ঠাণ্ডা চা ও সমান আয়তনের এক কাপে গরম চায়ের ভরের ভিতরে কোন পার্থক্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকেই বলতেন যে, না, কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন যাঁর এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে, তিনি বলবেন, "হ্যাঁ, দুটি কাপের চায়ের ভরের ভিতরে পার্থক্য আছে। যে কাপে গরম চা আছে তার ভর বেশী, কারণ গরম চায়ে যে তাপ দেওয়া হয়েছে, তার তুল্য ভরই দুটি কাপ চায়ের ভরের পার্থক্য। অবশ্য এটি তত্ত্বীয় দিক থেকে বলা হল, কারণ এই নগণ্য পরিমাণ ভরের মান নির্ণয় করা কোন যন্ত্রে সম্ভব নয়।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

(General Theory of Relativity)

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ আলোচনা করার পূর্বে নিউটনের তত্ত্বগুলির, বিশেষ করে মহাকর্ষ-তত্ত্বের (Law of Gravitation) আলোচনা করার প্রয়োজন, কারণ আইনস্টাইন নিউটনের তত্ত্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

আমরা অভিজ্ঞতায় এই বিশ্বের যে-কোন বস্তুকে হয় অচল বা স্থির, না হয়ত সচল অবস্থায় দেখি। যদি একটি বস্তু সব সময় একই স্থানে থাকে, অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাপেক্ষে যদি কখনও তার স্থান পরিবর্তন না করে, তবে বস্তুটির অবস্থাকে বলি স্থিতাবস্থা (at rest), যেমন পাহাড়, গাছ-পালা, বাড়ীঘর ইত্যাদি। কিন্তু যদি বস্তুটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অবস্থান করতে থাকে, কিংবা পারিপার্শ্বিক বস্তুর আপেক্ষিকে স্থান পরিবর্তন করতে থাকে, তবে আমরা বলি বস্তুটি সচল বা গতিশীল।

কিন্তু এই বিশ্বে প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন এক প্রকার গতিতে আছে বলে প্রকৃত স্থিতাবস্থা বলতে কিছু নেই। গতি কিংবা স্থিতাবস্থা সবই আপেক্ষিক। আমরা পৃথিবীতে বাস করি এবং বিজ্ঞানের সাধারণ ব্যাপার-গুলির জন্যে পৃথিবীকে স্থিতাবস্থায় আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, যার জন্যে ঘর, বাড়ী, পাহাড় ইত্যাদিকে বলি যে, এগুলি অচল বা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু এখন মহাকাশযাত্রীরা চাঁদ কি মঙ্গলগ্রহ থেকে দেখবেন যে, পৃথিবীর কোন কিছুই স্থির নেই, কারণ পৃথিবীতে অবস্থিত সমস্ত বস্তুই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে একটি জটিল গতিতে মহাকাশের ভিতর দিয়ে সচল অবস্থায় আছে।

"পৃথিবী স্থির নয়, সূর্যের চারদিকে আবর্তনরত"—1543 খ্রীস্টাব্দে কোপার্নিকাসের এই তত্ত্বের আবিষ্কারের পর নিউটনের 1687 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গতি-তত্ত্ব, মহাকর্ষ-তত্ত্ব, বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি আবিষ্কারের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ এই দেড়-শ' বছরের কম সময়ে বর্তমানে জ্ঞাত পৃথিবীর জটিল গতির সব তথ্য এবং বিশ্বের অনেক রহস্য জানা যায় নি। সদা

চঞ্চল এই বিশ্বের প্রকৃতি ও বিশ্বের বস্তুগুলির আপেক্ষিক গতির থেকে কি করে আলাদাভাবে প্রকৃত (true) বা পরম (absolute) গতি জানা যেতে পারে—এই সবের জ্ঞান লাভ করবার জন্যে নিউটন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সঠিক সমাধান না পাবার জন্যে খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর অনুমান ছিল যে, "স্থির নক্ষত্রগুলির সুদূরাঞ্চলে অথবা বোধ হয় তাদেরও ওপারে কোন কিছু আছে, যা নিশ্চিতরূপে স্থির। সেই একান্ত স্থির বস্তুটির সাপেক্ষে অন্য বস্তুগুলির পরম বেগ বের করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, এটি বাস্তবে প্রমাণ করা মানুষের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর নয়। আবার তিনি আর এক ধারণা পোষণ করতেন, যে, মহাকাশ (space) নিজেই সেই পরম স্থির সম্পর্ক নির্ধারণকারী কাঠামো, যার সাপেক্ষে তারকা, ছায়াপথ (Galaxy) ইত্যাদি সমস্ত বস্তুর পরম বেগ বের করা যেতে পারে। তিনি মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব (physical reality) স্বীকার করতেন এবং মনে করতেন, যে এটি স্থির (stationary) এবং অনড় (immovable)।

তারপর প্রায় দু-শ' বছর পরে যখন বিজ্ঞানে আলোর তরঙ্গ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তখন প্রয়োজন হল একটি কল্পিত মাধ্যমের, যাকে বলা হল ঈথার। গত শতাব্দীর শেষের দিকে লোরেন্‌ৎস বললেন যে, এই ঈথার সমুদ্র হল স্থির এবং এর আপেক্ষিকে পরম বেগ বের করা যেতে পারে।

কিন্তু পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে, আইনস্টাইন কি ভাবে নিউটনের মহাকাশের ধারণার পরিবর্তন করে এবং তথাকথিত ঈথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন। আমরা জানতে পেলাম যে, বিশ্বে কোন পরম ধ্রুব সম্পর্ক-নির্ধারণকারী কাঠামো বলে কিছু নেই। এই চঞ্চল বিশ্বে সব বস্তুই সচল এবং তাদের গতি বের করা যায় শুধু পরস্পরের আপেক্ষিকে, কারণ মহাকাশে কোন দিক নেই, কোন সীমা নেই, বিজ্ঞানীদের কাছে আলোকে মাপকাঠি বিবেচনা করে কোন বস্তুর পরম বেগ বের করতে যাওয়া নিরর্থক, কারণ আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র সম বা অবিচল এবং এই বেগ আলোর কোন উৎসের কিংবা গ্রাহকের বেগের উপর নির্ভর করে না।

গতির আপেক্ষিকতার বিষয় নিউটন চিন্তা করতেন একটি জাহাজের

উদাহরণ দিয়ে। শান্ত ও স্থির সমুদ্রে একটি চলন্ত জাহাজে একজন যাত্রী তাঁর দাড়ি কামানো কিংবা চা পান ইত্যাদি কাজগুলি অতি সহজ ও কোন প্রকার অসুবিধে বোধ না করে সম্পন্ন করতে পারেন। তাঁর কাছে মনেই হবে না যে, জাহাজটি গতিতে আছে এবং সেটির বেগ পাঁচ নট (knot), কি পনের নট, কি পঁচিশ নট যাই হোক না কেন। জাহাজের বাইরে অবস্থিত কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা না করলে তিনি জাহাজের গতির কিছুই বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু যদি সমুদ্র হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে অথবা জাহাজটি হঠাৎ তার দিক পরিবর্তন করে, তাহলে যাত্রীটি উপলব্ধি করবেন যে, জাহাজটি সচল অবস্থায় আছে।

এই সব বিষয় চিন্তা করে নিউটন ধারণা করলেন যে, সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও স্থির সমুদ্রে একটি মসৃণ এবং শব্দ ও ঝাঁকুনিহীন গতিতে চলন্ত জাহাজের ভিতরে কোন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা জাহাজটির বেগ বের করা সম্ভবপর নয়। তিনি তাঁর বই 'Principia'-তে লিখলেন, "কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত বস্তুগুলির নিজেদের ভিতরে গতি সব সময় একই থাকবে, সেই স্থানটি স্থিতাবস্থায় থাকুক কিংবা একটি সরল পথে সমবেগে যেতে থাকুক।" এই তত্ত্বকে আরও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ঃ "একটি মাধ্যমে বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি অকাট্য প্রমাণিত হলে, সেগুলি ঐ মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বা সমবেগে চলন্ত অন্য সব মাধ্যমে সমানভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।" এই হল গ্যালিলীয় বা নিউটনীয় আপেক্ষিক-তত্ত্ব। এই তত্ত্বে শুধু বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু আমরা আইনস্টাইনের 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' দেখছি যে, এইরূপ মাধ্যমগুলিতে শুধু বলবিদ্যার নয়, প্রকৃতির সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি সমানভাবে অকাট্য হবে। এই মাধ্যমগুলিকে হতে হবে সম্পূর্ণরূপে জাড্যগুণসম্পন্ন, যাকে বলা হয় 'Perfect Inertial System'। এই বিষয়গুলি পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

আমরা নিউটনের প্রসিদ্ধ তিনটি গতি-নিয়ম (Laws of Motion) থেকে জানতে পারি (1) জাড্য নিয়ম (Law of Inertia) ও বলের (Force) ধারণা; (2) বস্তুর ভর, তার বেগ ও তার উপর প্রদত্ত বলের ভিতর সম্বন্ধ, এবং বলের পরিমাণ নির্ণয়; (3) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ধারণা।

যে সব বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত শক্তির অভাব, সেগুলি প্রকৃতিতে জাড্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ বস্তুগুলির নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। এগুলি অচল অবস্থায় থাকলে, চিরকাল সেই অবস্থায় থাকবে, যদি না বাইরে থেকে কোন কিছু সেগুলির উপর কাজ করে। কিংবা যদি সম্পূর্ণরূপে মসৃণ ও বাতাস ইত্যাদি প্রতিরোধকারী বল থেকে মুক্ত সমতল-ভূমির উপর দিয়ে এগুলি চলতে থাকে, তবে চিরকাল সমগতিতে সরল পথে চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা জানি যে, কোন জড় বস্তুকে একবার সচল অবস্থায় রাখলে অন্তর্নিহিত কর্মশক্তির অভাবের জন্য বস্তুটি কিছু দূর গিয়ে থেমে যাবে, কারণ সম্পূর্ণরূপে মসৃণ এবং ঘর্ষণ ও বাতাস ইত্যাদির প্রতিরোধকারী বল শূন্য সমতল মাধ্যম পাওয়া বাস্তবে সম্ভবপর নয়।

এই যে একটা কিছু, যেটি কোন জড় বস্তুর উপর কাজ করলে সেই বস্তুটির অচল বা সচল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাকে বলা হয় বল (force)।

এখন দেখা যাক বস্তুর ভরের ধারণা কি ভাবে পাওয়া যায়। কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে বলা হয় ভর (mass), আবার অন্যভাবেও ভরের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির স্বাভাবিক জাড্যগুলির জন্যে সেটির অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টাকে বাধা দেয়। বস্তুটির এই গুণকে বলা হয় ভর। কোন একটি বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করে বস্তুটির বেগের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, ঐ বস্তুটির দ্বিগুণ ভরের বস্তুর সমপরিমাণে বেগের পরিবর্তন সাধনের জন্যে প্রথম বলের দ্বিগুণ মানের বলের প্রয়োজন হবে। একটি 10 কিলোগ্র্যাম ভরের পাথরকে ঠেলে বেগসম্পন্ন যে বলের প্রয়োজন, একটি 100 কিলোগ্র্যাম ভরের পাথরকে সমপরিমাণ বেগ-সম্পন্ন করতে তার চেয়ে 10 গুণ বেশী বলের প্রয়োজন।

বস্তুর এই ভরকে বলা হয় জাড্যগুণজনিত ভর বা inertial mass। বিভিন্ন ভরের দুটি বস্তুকে সমান ভাবে চালিত করতে হলে যে দুটি বলের প্রয়োজন, সেই বল দুটি ঐ বস্তু দুটির ভরের সমানুপাতিক।

কোন বস্তুর উপর একটি বল কাজ করতে থাকলে বস্তুটির বেগ বেড়ে-যেতে থাকে, অর্থাৎ বেগ ত্বরান্বিত হতে থাকে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় accelerated। কোন সচল বস্তুর চলার দিকে বলটি কাজ করতে থাকলে বেগ ত্বরান্বিত হবে, যার থেকে আমরা ত্বরণের (acceleration) ধারণা পাই।

ত্বরণকে বলা হয় প্রতি সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্তন, সেজন্যে ত্বরণের একক হিসাবে দূরত্ব প্রতি 'বর্গ সেকেণ্ডে' ব্যবহৃত হয়।

নিউটনের গতিতত্ত্ব থেকে বল, ভর ও ত্বরণের সম্বন্ধ পাওয়া যায়,—কোন বস্তুর ভর m হলে এবং তার উপরে একটি বল p কাজ করলে, বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ ত্বরণ হবে। এই ত্বরণের মান যদি হয় a, তবে $m = \frac{p}{a}$। বলকে যতক্ষণ বাড়ানো বা কমানো যাবে, ত্বরণ সমানুপাতিক-ভাবে বাড়বে বা কমবে। এই বল ও ত্বরণের অনুপাত হল ভর। ভরের একক সি. জি. এস. পদ্ধতিতে (সেন্টিমিটার গ্র্যাম সেকেণ্ড পদ্ধতি) হল গ্র্যাম ও এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে (ফুট পাউণ্ড সেকেণ্ড পদ্ধতি) হল পাউণ্ড।

বলটি যদি সচল বস্তুর গতির উল্টোদিকে কাজ করে, যেমন ঘর্ষণ, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির ফলে, কিংবা চলন্ত গাড়ীতে ব্রেক প্রয়োগ করার ফলে, তা হলে বস্তুটির বেগ কমতে থাকবে, যাকে বলা হয় মন্দন অথবা ইংরেজীতে retardation।

ত্বরণের একক সি. জি. এস. পদ্ধতিতে হল প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার। এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে একক হল প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক ফুট।

বলের একক সি. জি. এস. পদ্ধতিতে হল ডাইন (dyne) অর্থাৎ এক ডাইন মানের বল এক গ্র্যাম ভরের উপর কাজ করলে ত্বরণ হবে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার। তেমনি এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বলের একক হল পাউণ্ডাল (poundal) অর্থাৎ এক পাউণ্ডাল মানের বল এক পাউণ্ড ভরের উপর কাজ করলে ত্বরণ হবে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক ফুট।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিতাবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে অর্থাৎ 1905 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সনাতন পদার্থবিদ্যায় ভরকে মনে করা হত অপরিবর্তনীয়, যার মান বস্তুটির বেগের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আমরা বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদে জেনেছি যে, কোন বস্তুর ভরের মান বস্তুটির বেগের উপর নির্ভর করে। বেগ বাড়লে ভর বেড়ে যাবে। বেগ ও ভরের সম্বন্ধ পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, কোন সমতল ভূমিতে অবস্থিত একটি ছোট মারবেলগুলি, একটি টেনিস বল এবং একটি কামানের গোলা এইরূপ বিভিন্ন ভরের বস্তুর উপর একই মানের বল প্রয়োগ করলে, বস্তু তিনটি বিভিন্ন বেগে অর্থাৎ বিভিন্ন ত্বরণে চলতে থাকবে। সবচেয়ে কম ভরের বস্তু, এক্ষেত্রে মারবেল গুলিটির ত্বরণ সবচেয়ে বেশী হবার জন্য সবচেয়ে দ্রুত যাবে এবং সবচেয়ে বেশী ভরের বস্তুটি, অর্থাৎ কামানের গোলাটি সবচেয়ে আস্তে যাবে। বস্তুর এইরূপ ভরকে বলা হয় জাড্যগুণজনিত ভর বা inertial mass।

কিন্তু যদি এই তিনটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তিনটি বস্তুই একই সময়ে পৃথিবীর উপরে এসে পড়বে, অর্থাৎ তাদের নীচে পড়বার বেগ সমান হবে। এটির উল্লেখ করা হয়েছে গ্যালিলিওর "পতনশীল বস্তুতত্ত্বের" আলোচনাতে। এই ব্যাপারটির সঠিক কারণ জানা গেল নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব থেকে।

আমরা গল্পে পড়েছি যে, নিউটন গাছ থেকে একটি আপেলকে বোঁটা থেকে খসে গিয়ে নীচে মাটিতে পড়তে দেখে, এর কারণ ব্যাখ্যার জন্যে চিন্তা করতে করতে তাঁর প্রসিদ্ধ মহাকর্ষ-তত্ত্ব (Law of Gravitation) আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে নিউটন তাঁর পূর্বসূরীদের গবেষণালব্ধ ফল বিশদভাবে পর্যালোচনা করে সুগভীর চিন্তাশক্তির দ্বারা এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন। তত্ত্বটি হল :

এই বিশ্বে প্রতিটি বস্তুকণা অন্য প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক (directly proportional) এবং এদের আভ্যন্তরিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional)।

বস্তুকণা দুটির ভর যদি হয় m_1 ও m_2 এবং তাদের আভ্যন্তরিক দূরত্ব যদি হয় d, এবং তাদের পারস্পরিক আকর্ষণহেতু বলকে যদি বলা যায় F,

তবে $F \propto m_1 \times m_2$,

এবং $F \propto \frac{1}{d^2}$

অর্থাৎ $F \propto \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$

যার থেকে পাই $F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$

এখানে G হল মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (gravitational constant)। এর মান হল সি. জি. এস. পদ্ধতিতে $6 \cdot 6576 \times 10^{-8}$।

মহাকর্ষ-তত্ত্বে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, এই বিশ্বের বস্তুগুলি যে আয়তনেরই হোক না কেন, প্রত্যেকটির ভরকে মনে করতে হবে বস্তুটির একটি কেন্দ্রে স্থাপিত। এই বিন্দুকে বলা হয় ভার-কেন্দ্র (centre of gravity)। বিশ্বের সব বস্তুকে মনে করতে হবে ভর-বিন্দু বা mass point।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী তার কাছাকাছি উপরের সব বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে এবং এই আকর্ষণজনিত বলকে বলা হয় অভি-কর্ষ। এই অভিকর্ষের ফলেই আপেল বোঁটা থেকে খসলে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। এই অভিকর্ষের জন্য পৃথিবীর কাছাকাছি উপর থেকে প্রতিটি বস্তু পৃথিবীর দিকে ক্রমবর্ধমান বেগে ধাবিত হয়, অর্থাৎ ত্বরণ হয়, যাকে বলা হয় অভিকর্ষজ ত্বরণ (acceleration due to gravity)।

এই যে একটি ভর অপর একটি ভরের দিকে আকৃষ্ট হয়, এইরূপ ভরকে বলা হয় মহাকর্ষীয় ভর বা gravitational mass। বস্তুর জাড্যগুণজনিত ভরের কথা আমরা পূর্বে জেনেছি। সুতরাং প্রতিটি বস্তুর দুটি ভরের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোন বস্তুর ভরের মান, কিংবা দুটি বস্তুর ভরের অনুপাত দু-রকম ভাবে জানা যেতে পারে। যে-কোন বস্তুর, মনে করা যাক একটি গাড়ীর জাড্যগুণজনিত ভরের মান জানা যেতে পারে কোন সম্পূর্ণ মসৃণ অনুভূমিক সমতলের (horizontal plane) উপর গাড়ীটিকে রেখে কোন নির্দিষ্ট মানের বল প্রয়োগ করে যে ত্বরণ পাওয়া যায়, সেই বল ও ত্বরণের অনুপাত থেকে। এখানে যে অভিকর্ষ-বল (force of gravity) ঐ গাড়ীটিকে সমতলভূমির উপর অবস্থিত করে রেখেছে, তার কোন পরিবর্তন নেই এবং ঐ গাড়ীটির জাড্যগুণজনিত ভরের মান বের করতে অভিকর্ষ কোন কাজে লাগছে না।

কিন্তু বস্তুটির ভর আমরা দ্বিতীয় উপায়ে বের করতে পারি যেটি সর্বসাধারণের জানা আছে। সে উপায় হল একটি তুলা বা দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার। তুলা কোন কাজেই লাগত না যদি অভিকর্ষ না থাকত।

তাহলে ভরের মান নির্ণয় করবার দুটি প্রক্রিয়ার পার্থক্য হল যে, প্রথমটি অভিকর্ষের কিছুই করবার নেই, আর দ্বিতীয়টি হল মূলতঃ অভিকর্ষনির্ভর।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে কি আমরা মনে করতে পারি যে, কোন দুটি ভরের অনুপাত দুটি বিভিন্ন উপায়ে বের করলে সমান হবে? একটু বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে যে, দুটি সর্বতোভাবে সমান। প্রথম উপায়ে দুটি স্থিতাবস্থায় অবস্থিত বস্তুকে সমান বেগে গতিশীল করতে যদি দুটি বলের, যার একটি অপরটির দ্বিগুণ—প্রয়োজন হয়, তবে অধিকতর বল যে বস্তুটির উপর প্রয়োগ করা হয়েছে, তার ভর অন্য ভরটির দ্বিগুণ হবে। আবার ঐ বস্তু দুটি যদি মানদণ্ডে মাপা যায়, তবে দেখা যাবে পূর্বোল্লিখিত ভারী বস্তুটির ভর হাল্‌কা বস্তুটির ভরের দ্বিগুণ।

কোন একটি বস্তুর জাড্যগুণজনিত ভর এবং মহাকর্ষীয় ভর যে সমান; তা বুঝতে আর একটি উদাহরণ দেখা যাক। প্রথম বস্তুর ভর ও ওজনের পার্থক্য বোঝা যাক। কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণ হল ভর, এই বস্তুটিকে পৃথিবী যে অভিকর্ষ বলে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, সেটিই হল ওজন। তা হলে ওজন হল একটি বল। কোন বস্তুকে যদি বিভিন্ন স্থানে, যেমন সমতলে এবং উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ওজন করা যায়, তবে বস্তুটির ভর একই থাকলেও ওজন তফাৎ হবে, পাহাড়ের উপরে ওজন হব কম। এর কারণ হল যে, ওজন হচ্ছে ভর ও অভিকর্ষজ ত্বরণের গুণফল। সমতলভূমি পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু স্থানের চেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটতর বলে প্রথম স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান অধিকতর হবে। অভিকর্ষজ ত্বরণকে উল্লেখ করা হয় 'g' অক্ষরটি দিয়ে। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের মান সমুদ্রের নিকট সমতলের উপর এক বর্গ সেকেণ্ডে 981 সেঃ মিঃ। এখন এক গ্রাম ভরের কোন বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করবে 1×981 অর্থাৎ 981 ডাইন বলের দ্বারা, এবং এটিই হল বস্তুটির ওজন। একে বলা হয় গ্রাম-ভার (gram-weight), অর্থাৎ এক গ্রাম-ভার ওজন হল 981 ডাইন। এখানে বস্তুটির ভর হল মহকর্ষীয় ভর।

এখন যদি একটি সম্পূর্ণরূপে মসৃণ অনুভূমিক সমতলের উপর একটি বস্তুকে রেখে 981 ডাইন বল প্রয়োগ করে ত্বরণ পাওয়া যায় প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 981 সেঃ মিঃ, তবে বস্তুটির ভর দেখা যাবে এক গ্র্যাম এবং এই ভর হল জাড্যগুণজনিত ভর। তা হলে দেখা গেল যে, বস্তুটির দু-রকম ভরই একই মানের।

কোন বস্তুর উভয় প্রকার ভরই সমান বুঝতে হলে আর একটি উদাহরণ হল গ্যালিলিওর "পড়ন্ত বস্তুর তত্ত্ব", যার উল্লেখ পূর্বে কয়েক বার করা হয়েছে। অসমান ভরের কয়েকটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে ছেড়ে দিলে পৃথিবীর উপরে পড়তে বস্তুগুলির প্রত্যেকটির সময়ের মান একই হবে, যার অর্থ হল বস্তুগুলির বেগ তাদের ভরের উপর নির্ভর করে না। এই সহজ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফলটির দ্বারা দুটি ভরের অর্থাৎ জাড্যগুণ-জনিত ও মহাকর্ষীয় ভরের সমতা বুঝতে হলে একটু বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন।

আমরা জেনেছি যে, স্থিতাবস্থায় আছে এমন একটি বস্তুর উপর কোন বাইরের বল কাজ করলে বস্তুটি সচল হয়ে একটি বেগ লাভ করে। বস্তুটি তার জাড্যগুণজনিত ভরের মান অনুযায়ী ঐ বলের ক্রিয়াতে কম কি বেশী সাড়া দেবে, ভর বেশী হলে গতির চেষ্টাকে অধিকতর বাধা দেবে, আর ভর কম হলে বাধাও কম হবে ঃ অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, কোন বস্তু বাইরের বলের প্রয়োগে যে সাড়া দেবে, তা নির্ভর করবে জাড্য-গুণজনিত ভরের উপর। যদি এটিই হত যে, পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে একই বলে আকর্ষণ করে, তবে যে বস্তুটির জাড্যগুণজনিত ভর সবচেয়ে বেশী, সেটি অন্য সব বস্তুর চেয়ে অনেক ধীরে পৃথিবীর উপর এসে পড়ত। কিন্তু গ্যালিলিও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন ভরের বস্তু একই সময়ে এসে পড়ে। এর মানে হচ্ছে যে, পৃথিবী বিভিন্ন ভরের বস্তুকে বিভিন্ন বলে আকর্ষণ করে।

পৃথিবী একটি পাথরকে যখন নিজের দিকে অভিকর্ষজ বলে আকর্ষণ করে, তখন সে পাথরটির জাড্যগুণজনিত ভরের বিষয় কিছুই জানে না। পৃথিবীর এই যে "আহ্বান", যাকে বলা যেতে পারে "calling force of the earth", নির্ভর করে পাথরটির মহাকর্ষীয় ভরের উপর। পৃথিবীর ঐ "আহ্বানের" "উত্তরে" পাথরটির বেগ, যাকে বলা যেতে পারে "answering motion of

the stone" নির্ভর করবে পাথরটির জাড্যগুণজনিত ভরের উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে একই ভাবে তারা পৃথিবীর উপরে এসে পড়ে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর "বেগ জাগানো উত্তর" এক, কোন তফাৎ নেই। এর থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেতে পারে যে, মহাকর্ষীয় ভর ও জাড্যগুণজনিত ভর সমান।

এই সিদ্ধান্তকে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি পতনশীল বস্তুর ত্বরণ বস্তুটির মহাকর্ষীয় ভরের অনুপাতে বেড়ে যায় এবং জাড্যগুণজনিত ভরের অনুপাতে কমে যায়। আর যেহেতু সমস্ত পড়ন্ত বস্তুরই একই মানের ত্বরণ আছে, সেজন্যে এই দুই প্রকার ভর সমান।

এই যে প্রতিটি বস্তুর দুই প্রকার ভরের সমতা, এই ব্যাপারটি বহুদিন হল বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। কিন্তু তাঁরা এই ব্যাপারটিকে মনে করতেন যে, এটি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক (purely accidental) এবং এই ব্যাপারটিকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে কোনপ্রকার গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু এই ব্যাপারটির অসাধারণত্ব ও গুরুত্ব আইনস্টাইনের চিন্তায় ধরা পড়ল, যার ফলে তিনি খুঁজে পেলেন একটি প্রধান সূত্র, যা দিয়ে তিনি তাঁর আপেক্ষিকতাবাদকে "বিশেষ" (special) পর্যায় থেকে "সাধারণ" বা "বিশ্বজনীন" (general) পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এই সম্পর্কে আইনস্টাইনের লেখা থেকে কিছুটা অংশ অনুবাদ করা হচ্ছে ঃ

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমস্যার সমাধানের মূল সূত্র নিহিত আছে একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে। এই ঘটনাটি গ্যালিলিও এবং নিউটনের সময় থেকেই বিজ্ঞানজগতে বিদিত, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাকে পরিহার করা হয়েছে এবং কোনরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, সেই ব্যাখ্যাটি হল যে, কোন বস্তুর জাড্য ও ওজন এই দুটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক বিষয়ের পরিমাপ করা হয় কেবলমাত্র একটি ধ্রুবক দিয়েই, যাকে বলা হয় ভর। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন একটি স্থানাঙ্ক-নির্ধারকে বা মাধ্যমে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বলা যাবে না যে, এটি ত্বরান্বিত বেগে চলন্ত অবস্থায় আছে কিংবা এটি সরল পথে সমবেগে চলছে, এবং পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির কারণ একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (এটিই হল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তুল্যতা)।"

'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' প্রযুক্ত হবে শুধু কাঠামো বা মাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত পূর্ণতার ও সর্ব ব্যাপারে একটি সুসামঞ্জস্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল আইনস্টাইনের চরিত্রের বিশেষত্ব। সেইজন্যে যে মাধ্যমগুলি পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে চলন্ত অবস্থায় আছে, সেগুলি তো বটেই, তা ছাড়াও কোন নিয়ম না মেনে চলে খামখেয়ালীভাবে (arbitrarily) চলন্ত অবস্থায় আছে, অথবা নিয়মিত ত্বরান্বিত বেগে (accelerated velocity) আছে, এইরূপ সব মাধ্যমগুলিতেও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একইভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে। এটিই তিনি তাঁর সাধারণ বা বিশ্বজনীন আপেক্ষিকতাবাদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এক স্থানে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বলেছেন, "প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যে, যে-কোন ভাবে চলন্ত কাঠামোগুলিতে তাদের রূপ একই থাকে। এটি সম্পন্ন করাই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কর্তব্য।"

একটি উঁচু বাড়ীতে ওঠানামা করতে যে লিফ্‌টের ব্যবহার হয়, আইনস্টাইন সেইরূপ একটি লিফ্‌টের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। এটিকে যথাসাধ্য সহজ করে এখানে উল্লেখ করা হল।

একটি লিফ্‌টকে মনে করা যাক। সেটিতে একটি কাঁচের জানালা আছে, যা দিয়ে বাইরে থেকে কোন পর্যবেক্ষক ভিতরের ব্যাপারগুলি দেখতে পারেন। লিফ্‌টির ভিতরটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য (vacuum) এবং দেয়ালগুলি এমনভাবে তৈরি যে, বাইরে থেকে কোন হাওয়া আসতে পারে না, যাকে বলা যেতে পারে airtight। লিফ্‌টিতে কোন ঘর্ষণজনিত বাধাও (frictional resistance) নেই। এই লিফ্‌টির ভিতরে একজন পর্যবেক্ষক বসে আছেন। কল্পনা করা যাক যে, এই লিফ্‌টি হঠাৎ খুব উঁচু থেকে শিকলটি ছিঁড়ে পড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু আমাদের কল্পিত এই লিফ্‌টটি এত উঁচু থেকে পড়ছে যে, মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার সময়ের ভিতরে কতকগুলি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হল।

ভিতরের পর্যবেক্ষকটি পকেট থেকে কতকগুলি বস্তু, যেমন একটি রুমাল, একটি ঘড়ি, একটি ছুরি ও একটি কলম বের করে ছেড়ে দিলেন। এখন দেখা যাক বস্তুগুলির গতি সম্বন্ধে বাইরের পর্যবেক্ষক ও ভিতরের পর্যবেক্ষক কি মতামত পোষণ করেন।

বাইরের পর্যবেক্ষক জানালা দিয়ে দেখবেন যে, সমস্ত বস্তুগুলি অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্যে নীচের দিকে পড়ছে। কিন্তু তাঁর নিজের স্থানাঙ্ক কাঠামোর আপেক্ষিকে সমস্ত লিফ্‌টটি অভিকর্ষজ ত্বরণ নিয়ে নীচে পড়ছে, তার মানে লিফ্‌টের দেয়াল, ছাদ, মেঝে সব একই ত্বরণে নীচে পড়ছে।

তা হলে ঐ রুমাল, ঘড়ি ইত্যাদি বস্তুগুলি থেকে মেঝের দূরত্ব কখনই পরিবর্তিত হচ্ছে না। ভিতরের পর্যবেক্ষকটির কাছে মনে হবে যে, বস্তুগুলিকে তিনি যেখানে ছেড়েছিলেন, ঠিক সেইখানেই রয়ে গিয়েছে। লিফ্‌টের বাইরের জগতের সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা নেই বলে তিনি বুঝছেন না যে, অভিকর্ষের জন্যে এটি নীচে পড়ছে। তিনি বলবেন যে, বাইরের কোন বল বস্তুগুলির উপর কাজ করছে না বলে ঐ বস্তুগুলি সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থায় আছে, ঠিক যেমনটি হবে একটি জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে (inertial system)। আরও মজার ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করবেন। তিনি যে-কোন বস্তুকে উপরের দিকে, কি নীচের দিকে, বা যে কোন দিকে ঠেলে দিলে, সেই দিকেই বস্তুটি সমবেগে চলতে থাকবে, অবশ্য যতক্ষণ না পর্যন্ত দেয়ালে, কি ছাদে, অথবা মেঝেতে গিয়ে লাগে। সেইজন্যে লিফ্‌টের ভিতরটি নিউটনের জাড্য-তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি আদর্শ মাধ্যম হবে। তার মানে এই লিফ্‌টিতে প্রাকৃতিক সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে। এই লিফ্‌টিকে একটি আদর্শ জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অবশ্য সময়ের ও স্থানের দিক থেকে এটি সীমাবদ্ধ।

আমরা যদি পাশাপাশি আর একটি এইরূপ লিফ্‌ট কল্পনা করি, এটিও বাধাহীনভাবে পড়বার জন্যে এটিকেও মনে করা যেতে পারে যে, এটি প্রথমটির আপেক্ষিকে এক সমবেগে চলন্ত অবস্থায় আছে। আর এই জন্যে লিফ্‌ট দুটি বা মাধ্যম দুটিকে মনে করা যেতে পারে তারা আদর্শ জাড্যগুণসম্পন্ন এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দুটিতেই ঠিক এক। একটিতে বিভিন্ন পরিমাপ অপরটিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে লোরেনৎস-পরিবর্তন সূত্র অনুযায়ী।

এখন উপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখা যাক যে, আমরা কি জানতে পারলাম।

বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে লিফ্‌টির ও সেটির ভিতরের বস্তুগুলির গতি নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে বলে মনে হবে। তিনি

দেখবেন যে, এগুলির গতি অবিচল (uniform) নয়, কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্যে বেগ ত্বরিত।

কিন্তু লিফ্‌টির ভিতরে যে সব পদার্থবিদ্ জন্মাচ্ছেন ও বড় হচ্ছেন, তাঁদের বিচারবুদ্ধিতে সব বিষয় অন্য প্রকার মনে হবে। তাঁরা বুঝতেই পারবেন না যে, তাঁদের মাধ্যমটি অভিকর্ষীয় বলে নীচে পড়ছে কিংবা শূন্যে মহাকাশে সমস্ত বাইরের বল থেকে মুক্ত হয়ে স্থিতাবস্থায় আছে। তাঁরা বলবেন যে, মাধ্যমটি নিখুঁত জাড্যগুণসম্পন্ন এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলগুলিকে সেইভাবে মনে করবেন।

আবার অন্যভাবে এই ব্যাপারটিকে কল্পনা করা যাক। মনে করা যাক যে, লিফ্‌টকে মহাকাশে প্রকৃতই এক শূন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই স্থানটি সমস্ত গাগনিক বস্তুর মহাকর্ষ থেকে বহু দূরে, অর্থাৎ ঐ লিফ্‌টির চারদিকে মহাকাশে বহু লক্ষ মাইল পর্যন্ত কোন মহাকর্ষজ বল নেই। বিজ্ঞানীরা লিফ্‌টটির ভিতরে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতসারে লিফ্‌টটির ছাদে একটি শিকল বেঁধে কোন কৌশলে উপরের দিকে এক সমত্বরিত বেগে (uniform acceleration) টেনে তোলা হচ্ছে, অর্থাৎ লিফ্‌টটির বেগ ত্বরিত হয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উপরে উঠছে। ভিতরে অবস্থিত বিজ্ঞানীদের কাছে তাদের অবস্থা কিরূপ বিবেচিত হবে? তাঁরা দেখবেন যে, পূর্ববর্তী লিফ্‌টটিতে তাঁরা ও বস্তুগুলি যেমন ভারশূন্য অর্থাৎ অভিকর্ষ কিংবা বাইরে কোন বল থেকে মুক্ত ছিলেন, এবারে তা নয়। তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে তাঁদের পা মেঝেতে বেশ চাপ দিয়ে আছে, অর্থাৎ পায়ের নীচে মেঝের চাপ অনুভব করছেন। যদি তাঁরা একটু লাফ দেন, তবে পূর্বের ন্যায় সহজে ছাদের দিকে উঠে যান না, বরং মেঝেতেই ফিরে আসেন। এটি হবে এই জন্যে যে মেঝেটি ত্বরিত বেগে উপরে উঠে আসছে। যদি তাঁরা ঘড়ি, কলম ইত্যাদি বস্তুগুলি পূর্বের ন্যায় ছেড়ে দেন, তবে দেখবেন যে সেগুলি নীচে মেঝেতে পড়ছে, যেমনটি হয় পৃথিবীতে। যদি অনুভূমিক দিকে (horizontal direction) কোন বস্তুকে তাঁরা ছুঁড়ে দেন, তবে সেটি পূর্বের ন্যায় সমবেগে একটি সরল পথে না গিয়ে, একটি অধিবৃত্ত পথে (parabolic curve) বেঁকে গিয়ে মেঝেতে পড়বে, যেমনটি হয় পৃথিবীর উপরে একটি বস্তুকে অনুভূমিক দিকে ছুঁড়ে দিলে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, লিফ্‌টের ভিতরে অবস্থিত বিজ্ঞানীরা মনে করবেন যে, তাঁরা যে ঘরটিতে আছেন সেটি পৃথিবীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ঠিক সেইরূপ হচ্ছে। তাঁরা কিছুই বুঝতে পারবেন না যে, তাঁরা একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থায় আছেন, না মহাকাশে একটি সমস্ত বাইরের বল থেকে মুক্ত শূন্য স্থানে এক সমত্বরণে উপরে দিকে উঠেছেন।

কিন্তু ঐ শূন্য স্থানে বাইরের পর্যবেক্ষক বলবেন যে, তাঁর মাধ্যম একটি আদর্শ জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যম, কারণ সেই স্থানে মহাকর্ষজ বল সম্পূর্ণরূপে অবর্তমান, কিন্তু লিফ্‌টটি অর্থাৎ যে মাধ্যমটিতে বিজ্ঞানীরা আছেন, সেটি একটি সমত্বরিত বেগে উপরে উঠছে।

এই দুটি উদাহরণেই লিফ্‌টির বাইরের ও অভ্যন্তরের পর্যবেক্ষদের মতের পার্থক্যের মীমাংসা করা অসম্ভব। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মাধ্যম-লব্ধ পরীক্ষার ফলই সঠিক বলে দাবী করবেন। বিচারবুদ্ধিতে দুই শ্রেণীর পর্যবেক্ষদের মতামতই সঙ্গতিপূর্ণ বলে গ্রহণ করতে হবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির মাধ্যমে প্রকৃতির বিষয়গুলির একটি সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা সম্ভবপর, এমন কি যদিও মাধ্যম দুটি পরস্পরের আপেক্ষিকে সমভাবে গতিশীল নয়। কিন্তু এইরূপ বর্ণনার জন্য মহাকর্ষই যেন একটি মাধ্যমের বিষয়গুলিকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে অন্য মাধ্যমে পরিবর্তন করার জন্যে "সেতু" স্বরূপ। প্রথম উদাহরণটিতে বাইরের পর্যবেক্ষকের নিকট মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব) অস্তিত্ববান, কিন্তু ভিতরের পর্যবেক্ষকের নিকট এইরূপ অস্তিত্ব নেই। বাইরের পর্যবেক্ষকের বিবেচনায় একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে লিফ্‌টির ত্বরিত বেগ বর্তমান, কিন্তু ভিতরের পর্যবেক্ষকের কাছে বিবেচিত হবে স্থিতাবস্থা ও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অবর্তমানতা। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে তাঁর মাধ্যমে মহাকর্ষ নেই, এটি একটি খাঁটি জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যম এবং লিফ্‌টটি একটি সমত্বরিত বেগে উপরে উঠছে; অথচ ভিতরের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে যে, তাঁর মাধ্যমে একটি মহাকর্ষ ক্ষেত্র বর্তমান।

এই দুটি উদাহরণের উভয় পর্যবেক্ষকই নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিতে সঠিক কথা বলছেন। কিন্তু একজন নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর কাছে মনে হবে দুই

পর্যবেক্ষকের মত বিবিন্ন এবং ঐ দু-জনের বিচারবুদ্ধিকে সঙ্গতিপূর্ণ করার সেতু হল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বের একটি অতি প্রয়োজনীয় স্তম্ভ হল ; মহাকর্ষীয় ভরের ও জাড্যগুণজনিত ভরের তুল্যতা (equivalence of gravitational and inertial masses)। এই অতি মহামূল্য তথ্যটি অতীতে বিজ্ঞানীদের কাছে কিংবা সনাতন পদার্থবিদ্যায় অকিঞ্চিৎকর বলে অবহেলিত হয়েছে, কিন্তু এটিই বর্তমান বিজ্ঞানের একটি স্তম্ভ আপেক্ষিকতাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

নিউটনের পরবর্তী প্রায় আড়াই-শ' বছর ধরে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করাতে নিউটনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সমস্ত বলবিদ্যার ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়গুলি গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে একটি খাঁটি যন্ত্ররূপে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং আরও মেনে নেওয়া হয়েছে যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একটি বিরাট যন্ত্রের অংশের মত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে নিউটনের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

কিন্তু আইনস্টাইনের প্রধান বিশেষত্বই ছিল যে, তিনি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বা মতবাদকে—সেটি বিজ্ঞানের হোক, ধর্মবিষয়ক হোক বা যে-কোন বিষয়ক হোক—যাচাই না করে মেনে নিতেন না। এইজন্যে তিনি মানতে রাজী হলেন না যে, মহাকর্ষের ও জাড্যের তুল্যতা প্রকৃতির একটি আকস্মিক ঘটনা। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে ধরা পড়ল এই ব্যাপারটির গুরুত্ব, যার থেকে সৃষ্টি হল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। এই বিষয়টি পূর্ব অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বের সিদ্ধান্তই হল যে, দুটি বিন্দুতে অবস্থিত দুটি ভর কোন কিছুর সংযোগ কিংবা কোন মাধ্যম ব্যতীতই একে অন্যকে আকর্ষণ করছে, পরস্পরের উপর যুগপৎ আকর্ষণ হচ্ছে, অর্থাৎ পরস্পরের প্রভাব বা ক্রিয়া পরস্পরের উপর অনুভূত হচ্ছে, এই বিন্দু দুটি যত দূরেই থাকুক না কেন—একে বলা হয় "action at a distance"। বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এই সিদ্ধান্তের নির্ভুলতায় সন্দেহ জাগে। এমনকি নিউটন নিজেও আকর্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। কিন্তু কোপার্নিকাসের তত্ত্বের প্রকাশের পর গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করে গবেষণার দ্বারা গ্রহ, উপগ্রহাদির আবর্তন বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করেন, যার

দ্বারা গ্রহ, উপগ্রহাদির আবর্তন বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করেন, যার দ্বারা কোপার্নিকাসের তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যালিলিওর সমসাময়িক কেপ্‌লার তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে আবর্তনের পদ্ধতির বিষয় বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর তত্ত্বের গাণিতিক সূত্র দিয়ে যেতে পারেন নি।

এই দুই মহাবিজ্ঞানীর পরে, প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওর মৃত্যুর বছরে নিউটনের জন্ম। তিনি উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য ইত্যাদি গাগনিক বস্তুগুলির চলনের গাণিতিক সূত্র বের করলেন, যা হল মহাকর্ষ সূত্র বা তত্ত্ব। দেখা গেল যে, গাগনিক বলবিদ্যার সব ঘটনারই কয়েকটি বিষয় ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় এই মহাকর্ষ সূত্রে। এই কয়েকটি বিষয় পরে আলোচিত হবে। এই সূত্রে দুটি বস্তুর ভর ও তাদের ভিতরে দূরত্বই হল বিবেচিত, সময়ের কোন প্রশ্নই নেই। দুটি বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ যুগপৎ। শুধু একটি বস্তু থাকলে এই আকর্ষণের বা প্রভাবের কোন অস্তিত্বই নেই। এই আকর্ষণের ধারণা পেতে হলে অন্ততঃপক্ষে দুটি বস্তুর অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে।

আইনস্টাইন নিউটনের এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হলেন না। বিশেষ করে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত যে, মহাকর্ষ হল একটি বল, যার যুগপৎ উৎপত্তি হয় কোন কিছুর সংযোগ ব্যতীত দুটি ভর-বিন্দুর ভিতরে, সেই ভর-বিন্দু দুটির একটি এখানে, অপরটি সেখানে, এখান থেকে সেখানের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ মাইল, কি কোটি কোটি মাইল হতে পারে। এই যে কল্পনা—পৃথিবী মহাকাশে একটি বস্তুকে নিজের দিকে একটি বলের দ্বারা আকর্ষণকরতে পারে, যে বল অতি বিস্ময়কর ও নিশ্চিত রূপে বস্তুটির জাড্যগুণজনিত বাধার (inertial resistance) সমান—এই কল্পনাকে আইনস্টাইন অত্যন্ত অসম্ভব বলে মনে করলেন। সেইজন্যে তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের পর কয়েক বছর গভীর চিন্তা করে ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে 1915 খ্রীস্টাব্দে মহাকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। এই তত্ত্বটিই হল তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ।

তাঁর এই তত্ত্ব নিউটনের তত্ত্বের চেয়ে বিশ্বকে আরও অধিকতর বাস্তব রূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়ে আইনস্টাইন নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন।

আইনস্টাইনের মতে প্রকৃত মহাকর্ষ (gravitation) নিউটনের মহাকর্ষের

ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা একটি কিছু। এটি একটি "বল" নয়। আইনস্টাইন "বল" বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। সমস্ত রকম বলকে "শক্তির" (energy) সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায় এবং প্রতিটি শক্তিকে একটি "ক্ষেত্র" (field) রূপে বিবেচনা করা যায়।

বস্তুগুলি পরস্পরকে 'আকর্ষণ' করতে পারে—এই ধারণাটি বিজ্ঞানে এতদিন চলে এসেছে প্রকৃতির ভ্রান্ত যান্ত্রিক রূপের কল্পনা থেকে। যতদিন পর্যন্ত লোকে বিশ্বাস করবে যে, এই বিশ্ব একটি বিরাট যন্ত্র, ততদিন এটিই ভাবা স্বাভাবিক যে, এই বিরাট যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির ভিতরে বল বিদ্যমান আছে, যেমন একটি যন্ত্রে প্রতিটি অংশ অন্যান্য অংশগুলির উপর একটি নির্দিষ্ট বল প্রয়োগ করছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাস্তবে বিশ্ব আদৌ একটি যন্ত্র নয়। সুতরাং আইনস্টাইনের মহাকর্ষ-তত্ত্বে বল বলে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। তিনি মহাকর্ষকে একটি ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করেছেন।

'মহাকর্ষীয় আকর্ষণ' (gravitational attraction)—নিউটনের এই সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে তিনি বললেন 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' (gravitational field)। তাঁর এই মতবাদে তিনি প্রকাশ করলেন যে, এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে সমস্ত বস্তুর আচরণ বা গতিবিধি—যেমন গ্রহগুলির আবর্তনের কারণ সূর্যের কোন বলের দ্বারা আকৃষ্ট হবার জন্যে নয়, কারণ হল সূর্যের চারদিকে মহাকাশে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বের জন্যে গ্রহগুলি সহজ পথ ধরে গড়িয়ে যেতে থাকে। এইরূপে তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর গতির কারণ বুঝিয়েছেন মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা দিয়ে এবং বলা যেতে পারে মহাকাশ-সময়-সন্ততির (space-time continuum) গঠনের (structure) বা জ্যামিতিক গুণসম্পন্ন হবার জন্যে।

এই সম্পর্কে আইনস্টাইনের লেখা থেকে কিছুটা অংশ অনুবাদ করা হচ্ছে—"সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী কোন বস্তুবিহীন অবস্থায় মহাকাশের অস্তিত্ব নেই। মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব হল একটি ক্ষেত্র. যার সংগঠনে চারটি অংশ—তিনটি হল মহাকাশের সাধারণ তিনটি মাত্রা ও চতুর্থটি হল সময়। এদের ভিতরে যে বিশেষ প্রকার নির্ভরতার সম্বন্ধ, সেটিই মহাকাশের যথার্থ বাস্তব রূপকে প্রকাশ করে। আর যেহেতু সাধারণ

আপেক্ষিকতাবাদ প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করে, সেহেতু কোনরূপ কণিকা বা ভর-বিন্দু কোন অপরিহার্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে পারে না, অথবা গতির ধারণাও করতে পারে না। কোন কণিক হল শুধুমাত্র মহাকাশে একটি সীমাবদ্ধ স্থান, যেখানে ক্ষেত্রশক্তির অথবা শক্তির ঘনত্ব বেশী।"

বিগত শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার নূতন ও বৈপ্লবিক মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে, এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ও প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, এবং হার্ৎজের কাজের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, যার জন্যে অনেক কিছু নূতন করে ভাবতে হচ্ছে এবং প্রকৃতির বাস্তবতার এক নূতন রূপ প্রকাশ করেছে। এটি হল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বিষয়ে মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা।

আমরা দেখি যে, একটি চুম্বকের কাছে একটি লোহার টুকরো নিয়ে এলে লোহাটি চুম্বকটির দিকে সরে আসে। পূর্বে মনে করা হত যে, লোহাটিকে চুম্বকটি 'আকর্ষণ' করছে, তার মানে এটিও মহাকর্ষ তত্ত্বের মত একটি 'দূর থেকে ক্রিয়া'র (action at a distance) উদাহরণ। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে যে, চুম্বকটি তার চারদিকে মহাকাশে একটি ভৌত বা বাস্তব অবস্থা (physical reality) গঠন করে, যাকে বলা হল চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field)। এই ক্ষেত্রটির গঠনাকৃতি এমন যে, লোহাটি সেই ক্ষেত্রে এলে চুম্বকটির দিকে এগিয়ে আসবে।

আজকাল বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানে এই চৌম্বক ক্ষেত্রটির রূপ কি প্রকার, কারণ এটিকে দৃশ্যমান করা যায় চুম্বকটির উপরে একটি শক্ত কাগজ ধরে রেখে কাগজটির উপরে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে কাগজটিকে আস্তে করে ঝাঁকালে।

তেমনি একটি বৈদ্যুতিক আধান (electric charge) তার চারদিকে মহাকাশে সৃষ্টি করে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (electric field)। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রেরা আরও জেনেছে যে, একটি গোলাকৃতি তামার তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তারটির কেন্দ্রে অবস্থিত একটি চৌম্বক কাঁটা (magnetic needle) নড়তে থাকে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, চলন্ত বিদ্যুৎ-আধান, যা হল বিদ্যুৎ-প্রবাহ, একটি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

আবার একটি চুম্বককে যদি একটি তামার তারের কুণ্ডলীর (coil of copper wire) সামনে আনা যায়, কি সামনে থেকে দূরে নেওয়া যায়, অর্থাৎ তারের কুণ্ডলীটি যে চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত তার শক্তি বাড়ান কি কমান যায়, তবে তারটির ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এটিই হল বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের (electric generator) মূল প্রণালী।

প্রকৃতিতে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের এবং একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বাস্তব অস্তিত্ব আজকাল কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। একটি পরিবর্তনীয় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র ; আবার একটি পরিবর্তনীয় চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র।

ক্ষেত্রেই অবস্থান করে শক্তি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি ব্যাটারীর দুই প্রান্তকে একটি সুইচ সহ যদি একটি বৈদ্যুতিক বর্তনীর (electric circuit) সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়, তবে সুইচটিকে চালু করলে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং বর্তনীর চারদিকে মহাকাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। এখন যদি সুইচটিকে খুলে বা অফ করে দেওয়া যায়, তবে আমরা দেখতে পাই সুইচটির ভিতরে একটি বিদ্যুৎ ঝলক (electric spark)। এর কারণ হল বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চৌম্বক ক্ষেত্রটি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হবে আর সুইচে ঐ আলোর ঝলকটির সৃষ্টি হবে। ঐ ঝলকটির শক্তি এল চৌম্বক ক্ষেত্রটি থেকে। এর অর্থ হল যে, ক্ষেত্র হল শক্তির আধার। তা হলে যতই মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকল, প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের কল্পনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান, যা হল বস্তু, সেই বস্তুর গুরুত্ব ততই কমতে থাকল।

তারপর ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে জানা গেল যে, কোন বর্তনীতে বৈদ্যুতিক আধানের দ্রুত দোলনের ফলে চারদিকের মহাকাশে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের (electromagnetic field) সৃষ্টি হয়, যেটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে আলোর বেগে। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ দিয়ে আমরা এই ক্ষেত্রের স্বরূপ জানতে পারি, বিদ্যুৎপ্রবাহের বর্তনীর নিকটে ও দূরে ক্ষেত্রটির গঠন কিরূপ হবে ও সময়ের সঙ্গে কিভাবে ক্ষেত্রের শক্তি পরিবর্তিত হতে থাকবে— এই সবও জানতে পারি! দোলায়মান বা স্পন্দিত বৈদ্যুতিক আধান থেকে

শক্তি মহাকাশে একটি নির্দিষ্ট বেগে ছড়িয়ে যেতে থাকে; আর এই যে শক্তির স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া—যা হল শক্তির সচল অবস্থা, এটি হল তরঙ্গের প্রকৃতি। হার্ৎজের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হল, জন্ম হল বর্তমান রেডিওর।

নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব ও ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র-তত্ত্ব তুলনা করলে কয়েকটি বিশিষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

নিউটনের তত্ত্বের দ্বারা আমরা সূর্য ও পৃথিবীর ভিতরে আকর্ষণ বের করে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বের করতে পারি। এই তত্ত্বটি পৃথিবীর গতির সঙ্গে বহু দূরে অবস্থিত সূর্যের ক্রিয়ার যুগপৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে। এখানে বল উৎপাদনের বিষয়ে পৃথিবী ও সূর্য দুটি বস্তুই হল অভিনেতা।

কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে কোন বস্তুরূপী অভিনেতা নেই। তাঁর সমীকরণের দ্বারা বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের তত্ত্ব ও তথ্যাদি জানা যায়। নিউটনের তত্ত্বের মত ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বহু দূরে অবস্থিত দুটি বস্তুর, 'এখানে' একটির অবস্থা এবং 'সেখানে' আর একটির অবস্থা নির্ণয় করে না। তাঁর এই তত্ত্বে আমরা জানতে পারি যে, কোন জায়গায় যে-কোন মুহূর্তে ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে ঠিক তার নিকটতম স্থানের ও এইমাত্র বিগত মুহূর্তে ক্ষেত্রের শক্তির উপর। আমরা জানতে পারি যে, মহাকাশে একটু দূরে ও একটু পরে ক্ষেত্রের অবস্থা কিরূপ হবে, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় অগ্রসর হয়ে আমরা মহাকাশের বহু দূর পর্যন্ত ক্ষেত্রের অবস্থা জানতে পারি। বহু দূরে কি ঘটেছিল, তা থেকে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রার জ্ঞানের সমষ্টি আমাদের এখানকার অবস্থার পরিচয় দেয়। নিউটনের তত্ত্বে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন থেকে বস্তুর ভিতরে ক্রিয়া জানা যায়, যেটি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অসঙ্গতিপূর্ণ আর ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের ধারণা থেকে অনেক সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ প্রকৃতির বাস্তব রূপের অনেক বেশী পরিচয় পাওয়া যায়।

অয়েরস্টেড (Oersted) ও ফ্যারাডের (Faraday) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের ঐক্যসাধন করা হল। ম্যাক্সওয়েল তাঁর তত্ত্বের দ্বারা আলোর ও বিদ্যুতের ঐক্যসাধন করলেন, কারণ আলোর তরঙ্গ মহাকাশে প্রতীয়মান হয় গতিশীল তরঙ্গায়িত বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের রূপে।

মহাকাশে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা থেকে আইনস্টাইন মহাকর্ষকেও ক্ষেত্র রূপে বিবেচনা করবার প্রেরণা পান। একটি চুম্বক যেমন তার চারদিকে মহাকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে, যার গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্যেই একটি লোহার টুক্‌রো চুম্বকটির দিকে এগিয়ে আসে, তেমনি আইনস্টাইনের মতবাদ হল যে, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি মৌলিক কণিকা, ধূলিকণা, গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা ইত্যাদি সব মহাকাশের ক্ষুদ্র, বৃহৎ বস্তুগুলির প্রত্যেকটি তার নিজের চারদিকে মহকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে এবং একটি বস্তু একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের আওতায় এলে, বস্তুটির চলার পথ সৃষ্টি হবে ঐ ক্ষেত্রের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে। এই কারণেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতরে অবস্থিত বলে নিজের নিজের চলবার সহজতম পথ পেয়েছে, এতে আকর্ষণ বা বল বলে কোন ক্রিয়া নেই। পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত চাঁদের পৃথিবীর চারদিকে আবর্তনের কারণ একই এবং এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্যেই কোন বস্তুকে ছেড়ে দিলে, যেমন কোন ফল বোটা থেকে খসে পড়লে, বস্তুটি পৃথিবীর দিকে গড়িয়ে যাবে।

আইনস্টাইন বললেন যে, মহাকাশ সমস্ত বস্তু ধারণকারী কোন অনমনীয় (rigid) এবং পরিবর্তনাতীত (immutable) কাঠামো নয়, পরন্তু মহাকাশ এবং সময় যে দুটিকে অনন্যগত (independent) বলে মনে করা হত, সে দুটি অবিচ্ছিন্ন এবং এই সন্ততি কোন নির্দিষ্ট আকারশূন্য, নমনীয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্তনশীল ; প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব এই সন্ততিকে নুইয়ে দেয় (bends), মুচড়িয়ে দেয় (distorts) এবং যত বেশী বস্তুর ঘনত্ব হবে, ততই সন্ততির নুইয়ে পড়ার ও বিকৃতির মাত্রা অধিকতর হবে। যেখানেই বস্তু কিংবা গতি আছে, সেখানেই সন্ততি বিকৃত হবে। যেমন একটি মাছ সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় তার চারপাশে জলে আলোড়ন আনে, তেমনি একটি তারকা, একটি ধূমকেতু কিংবা একটি গ্যালাক্সি এই সন্ততির ভিতর দিয়ে চলবার সময় সন্ততির বিকৃতি ঘটায়।

তা হলে জানা গেল যে, বস্তুহীন মহাকাশের অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে, আর প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী, যার গঠন হল এবরোখেবরো, উঁচুনীচু আল-দেওয়া জমির মত।

যেহেতু কোন বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের গঠন নির্ভর করবে বস্তুটির ভর ও বেগের উপর, মহাকাশের, বরং বলা যেতে পারে মহাকাশ-সময়-সন্ততির জ্যামিতিক গঠন নির্ভর করবে সমস্ত বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সমষ্টিগত ক্ষেত্রের উপর। বিশ্বের অগণিত বস্তুর ভরের অবস্থিতিহেতু যে সমষ্টিগত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে এই সন্ততি নিজের উপর নুইয়ে পড়ে গোলকের মত একটি বিরাট মহাজাগতিক বক্র আকার (closed cosmic curve) প্রাপ্ত হয়েছে।

আইনস্টাইনের ধারণামত বিশ্ব হল "finite but unbounded"—অর্থাৎ "মহাকাশ-সময়-সন্ততি অন্তহীন নয়, কিন্তু সীমাহীন।" বিজ্ঞানী গ্যামো (Gamow) বলেছেন, এই ধারণায় দুটি গঠনের কথা মনে হয়, একটি হল গোলক ও অপরটি হল ঘোড়ার পিঠে বসবার জন্যে চামড়ার জিনের (saddle) মত। বিজ্ঞানী জীন্স মহাকাশ-সময়-সন্ততির আকৃতির তুলনা করেছেন একটি ঢেউতোলা (corrugated) উপরিভাগবিশিষ্ট সাবানে বুদ্বুদের সঙ্গে। এই সাবানের বুদ্বুদের ভিতরে বিশ্ব নয়, বিশ্ব হল উপরিভাগটি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, সাবানের উপরিভাগ দুই মাত্রার, কিন্তু বিশ্বের বুদ্বুদের উপরিভাগ চার মাত্রার—তিন মাত্রার মহাকাশ ও চতুর্থটি হল সময়। আর সাবানের ফেনা যেমন সাবানের বুদ্বুদ তৈরি করে, এই বিশ্বের বুদ্বুদ তৈরি হয়েছে শূন্য মহাকাশের সঙ্গে শূন্য সময়কে ঝালাই করে (welded)।

আইনস্টাইন বিশ্বের এই বক্র রূপের ধারণা পেয়েছেন ইউক্লিডীয়ান জ্যামিতি মন থেকে মুছে ফেলে। আমরা ইউক্লিডের জ্যামিতিতে পড়েছি যে, দুটি বিন্দুর ভিতরে ক্ষুদ্রতম রেখাটি হল সরল রেখা ; একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল 180°। কিন্তু এগুলি প্রযোজ্য হতে পারে একটি সম্পূর্ণরূপে সমতলভূমিতে। কিন্তু পৃথিবীর আকার যদি চিন্তা করা যায়, তবে তার আকৃতি একটি গোলকের মত বলে লণ্ডন ও নিউ-ইয়র্কের মত কোন দুটি স্থানের ক্ষুদ্রতম দূরত্ব অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে একটি ফিতে দিয়ে মাপতে গেলে ভুল হবে। ক্ষুদ্রতম দূরত্বটি হবে বিদ্যালয়ের ভূগোলের ছাত্রদের জানা একটি "বৃহৎ বৃত্ত" (great circle), যেটি কল্পিত করা যায় নোভাস্কশিয়া (Novascotia), নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland), আইসল্যাণ্ড (Iceland) ইত্যাদির উপর দিয়ে অবস্থিত। পৃথিবীর গোলকের

আকারের জন্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির দ্বারা সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। এইজন্যে বিশ্বে কোন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলো সরল পথে যেতে পারে না, কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এরূপ যে, তার ভিতরে সরল রেখা বলে কিছু নেই। আলো যে ক্ষুদ্রতম পথে যায়, তা হল একটি বক্রপথ, যার আকৃতি নির্ভর করে ঐ মহকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপর। উদাহরণ স্বরূপ, আলো মহাকাশের সৌরজগতের ভিতরে বস্তুর ও ঘনত্বের আধিক্যহেতু যেরূপ বক্র পথে যাবে, মহাকাশের আন্তঃনক্ষত্রের (inter-stellar) কিংবা আন্তঃগ্যালাক্সির স্থানে আলো মোটেই সেইরূপ বক্রপথে যাবে না, তার পথ হবে অনেকটা সরল, কারণ মহাকাশের এই সব স্থানে বস্তুর সংখ্যা ও ঘনত্ব এত কম যে, নেই বললেই চলে, যার হেতু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বিকৃতিও অনেক কম।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' প্রকাশের পর কয়েক বছর গভীর চিন্তার পর আইনস্টাইন বিশ্বের জটিল আকৃতির রূপ দিয়ে 1916 খ্রীস্টাব্দে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশ করেন। বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের বাস্তব গঠন যেমন ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের (field equation) দ্বারা জানা যায়, এবং মহাকাশের যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে ঐ ক্ষেত্রের শক্তি (field strength) জানা যায়, তেমনি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাস্তব অস্তিত্ব এখন স্বীকৃত এবং এই ক্ষেত্রের গঠন জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা এবং এই সমীকরণের দ্বারা কোন মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের কোন স্থানে একটি একক ভরের (unit mass) উপর কিরূপ ক্রিয়া হবে, অর্থাৎ ভরটির গতির বেগ ও দিক কি হবে, তা জানা যায়।

আমরা জেনেছি যে, বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের বেলায় শক্তি তরঙ্গের আকারে যায়, যাকে বলে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ (electromagnetic waves)। এই তরঙ্গের অস্তিত্ব পরীক্ষার দ্বারা গবেষণাগারে প্রমাণ করলেন হার্ৎজ, সে কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু রেডিও-তরঙ্গ নয়, তাপ, আলো, এক্স-রশ্মি ইত্যাদি সব রকমের বিকীর্ণ শক্তিই হল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ। এই বিষয়টি পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। যখন কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঈথারের অস্তিত্ব পাওয়া গেল না, তখন আইনস্টাইন বললেন যে, ঈথারকে কোন মাধ্যম না ভেবে মনে করা যেতে পারে যে, এটি মহাকাশের একটি গুণ, যার জন্যে শক্তি

তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। তিনি তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বেলাতেও এইরূপ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের (gravitational waves) অস্তিত্ব আছে। মহাকর্ষের প্রভাব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তরঙ্গের আকারে এবং এই তরঙ্গের বেগ আলোর সমান। বিদ্যুচ্চোম্বক তরঙ্গ যেমন তামার তারে কিংবা যে-কোন ভাল বিদ্যুৎ-পরিবাহীতে (electrical conductor) বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ বস্তুর বৈদ্যুতিক আধানের উপর কাজ করে, তেমনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বস্তুর ভরের উপর কাজ করে। কিন্তু সাধারণতঃ এই মহকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তি হল দুর্বল। একটি অক্ষের (axis) চারদিকে ঘূর্ণনরত একটি দণ্ডের থেকে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গত হয়, আইনস্টাইন সেই তরঙ্গের সমীকরণ বের করেন।

জ্যোতির্বিদ্যার সমস্যাগুলির (astronomical problems) সমাধান যেমন নিউটনের তত্ত্বের দ্বারা করা যায়, আইনস্টাইনের তত্ত্বের দ্বারাও তেমনি করা যায়। যদি সব প্রকৃতির ঘটনার বেলাতে এইরূপ হতো, তবে বিজ্ঞান-জগতে প্রায় আড়াই-শ' বছর ধরে সর্বজনস্বীকৃত নিউটনের সহজ তত্ত্বগুলিরই প্রচলন অব্যাহত থাকত, আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলি অতি জটিল ও অদ্ভুত বলে বিবেচিত হয়ে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার উত্তর নিউটনীয় তত্ত্বের দ্বারা পাওয়া যায় না। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বের দ্বারা সেই সমস্যাগুলির সমাধান পাওয়া যায়। সেজন্যে বিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনের তত্ত্বের স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্ব

(Theory of Stimulated Emission)

বিকিরণের নিঃসরণ বলতে বোঝা যায় যে শক্তির নিঃসরণ। এই শক্তি আসছে পরমাণু থেকে। এটি আলোচনা করার পূর্বে বিদ্যুতের ইতিহাস কিছুটা জানা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় প্রথম আবিষ্কার করেন খ্রীস্ট জন্মের 600 বছর পূর্বে মিলেটাসের থেলস (Thales of Miletus)। তিনি দেখলেন যে, অ্যাম্বার (amber) নামে হল্‌দে রঙের স্ফটিকজাতীয় পদার্থকে কিছু দিয়ে ঘষলে সেটিতে একটি বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, যার জন্যে অ্যাম্বারটিকে ছোট ছোট কতকগুলি কাগজের টুকরোর কিছুটা উপরে ধরলে টুকরোগুলি লাফিয়ে উঠে অ্যাম্বারটির গায়ে লেগে থাকে। এই গুণটিকে বলা হল ইলেকৃট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ। 'ইলেকৃট্রিসিটি' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ ইলেক্‌ট্রন (গ্রীক ভাষায় যার মানে হল অ্যাম্বার) থেকে। আমরা এখন জানি যে, একটি কাঁচের, কি এবোনাইটের, কি রেজিনের, কি ঐ জাতীয় কোন বস্তুকে এক টুক্‌রো ফ্ল্যানেল কিংবা সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে এই বিশেষ গুণটি পাওয়া যায়।

তারপর ভোল্টা, ফ্যারাডে প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নানারূপ আবিষ্কারের ফলে আজ বিদ্যুৎকে আমরা বর্তমান অবস্থায় পেয়েছি এবং এই বিদ্যুৎ হল মানব-সভ্যতার ও জ্ঞানের এত উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল—দুই তরল বা বায়ব পদার্থ তত্ত্বে (two fluid theory)। এই তত্ত্ব-মতে প্রত্যেকটি অনাহিত (electrically uncharged) বস্তুতে সম-পরিমাণে দুই রকমের বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতাহিত তরল কি বায়ব পদার্থ আছে। কোন ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত (positively charged) বস্তুতে ধনাত্মক তরল কি বায়ব পদার্থটি বেশী পরিমাণে আছে। আবার ধনাত্মক পদার্থটি কোন বস্তুতে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে সেই বস্তুটি হবে ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত। যে-কোন প্রকার বিদ্যুৎসংক্রান্ত বিষয়েই, সে ঘর্ষণজনিত বা স্থির (frictional or static) বিদ্যুৎই হোক কিংবা

চল-বিদ্যুৎই (current electricity) হোক, এই তত্ত্ব প্রযুক্ত। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে এমন কতকগুলি অচিন্তনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কৃত হয়, যা বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। এদের ভিতরে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য তিনটির এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম আবিষ্কারটি হল 1895 খ্রীস্টাব্দে রোয়েন্টগেন (Röntgen) কর্তৃক এক্স-রশ্মি, দ্বিতীয়টি হল 1896 খ্রীস্টাব্দে বেকরেল (Becquerel) কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা (spontaneous radioactivity) এবং তৃতীয়টি হল টমসন (Thomson) কর্তৃক ইলেকট্রন।

দু-দিকে আবদ্ধ একটি কাঁচের নলে অবস্থিত অতিরিক্ত মাত্রায় নিম্নচাপের গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে টমসন বিদ্যুতের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা বিদ্যুতের কণা আবিষ্কার করেন। এই বিদ্যুতের একক (unit) সম্বন্ধে পূর্বেই বিজ্ঞানীদের কিছুটা ধারণা হয়েছিল। 1881 খ্রীস্টাব্দে স্টোনে (Stoney) ঘোষণা করলেন যে, অবিচ্ছিন্ন তরল বা বায়ব পদার্থ বলতে যা বোঝায় বিদ্যুৎ তা নয়, বিদ্যুৎ হল খণ্ড খণ্ড টুক্‌রোর সমষ্টি, যার একক আছে এবং তিনি সেটিকে বললেন ইলেকট্রন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল ফ্যারাডে কর্তৃক 1832 খ্রীস্টাব্দে সিলভার নাইট্রেট, কপার সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের দ্রবণের (solution of chemical compounds) তড়িৎ-বিশ্লেষণের (electrolysis) ফল। কিন্তু স্টোনে ইলেকট্রনের সঠিক বিবরণ দিতে পারেন নি। ইলেকট্রনের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল টমসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। তারপর জানা গেল যে, ইলেকট্রন শুধু যে বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম অংশ তা নয়, বস্তুরও ক্ষুদ্রতম অংশ। এর ভর জানা গেল 9.1×10^{-28} গ্র্যাম, ব্যাস প্রায় 10^{-13} সেন্টিমিটার এবং এটি ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত, যার পরিমাণ প্রায় $1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব।

এই ইলেকট্রনের আবিষ্কারের ফলে দু-হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে প্রচলিত ধারণা যে,বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু—সেই ধারণার আমূল পরিবর্তন হল। পরমাণু আর অবিভাজ্য রইল না। বিজ্ঞানীদের মনে কৌতূহল জাগল পরমাণুর অভ্যন্তরে কি আছে, তার গঠন কি প্রকার—এই সব তথ্য জানবার জন্যে ; সৃষ্টি হল পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার (atomic physics), যদিও এই বিজ্ঞানের প্রথম গোড়াপত্তন হয় 1869 খ্রীস্টাব্দে মেণ্ডেলিয়েফ (Mendeleyev)

কর্তৃক পর্যায়-সূত্রের (Periodic Law) আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। কণিকা-জগৎ (micro-world) সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হলেন বিজ্ঞানীরা।

পূর্ব ধারণামত বিভিন্ন সব মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ পরমাণুগুলি নিজ নিজ পদার্থের গুণবিশিষ্ট, যেমন হাইড্রোজেনের পরমাণুতে আছে সেই গ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অক্সিজেনের পরমাণুতে আছে এই গ্যাসের গুণ; যত প্রকার পদার্থ, তত প্রকার পরমাণু। কিন্তু এখন জানা গেল, প্রতিটি পদার্থের সর্বশেষ অন্যতম অংশ হল ইলেকট্রন, যা সব পদার্থের ক্ষেত্রেই এক, হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন, অক্সিজেনের ইলেকট্রন বলে কিছু নেই। বিশ্বের মাঝে যেখানে যত ইলেকট্রন আছে, যুক্ত ইলেকট্রন ও পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন, সব এক।

একটি পরমাণুর ব্যাস প্রায় 10^{-8} সেন্টিমিটার আর একটি ইলেকট্রনের 10^{-13} সেন্টিমিটার। সুতরাং একটি পরমাণুর আকার হল একটি ইলেকট্রনের $10^{-8}/10^{-13}=10^{5}$ অর্থাৎ এক লক্ষ গুণ বড় এবং পরমাণুর আয়তন (volume) হল ইলেকট্রনের আয়তনের $(10^{5})^{3}=10^{15}$ গুণ, অর্থাৎ 10 কোটির কোটি গুণ বড়।

টমসন, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগলেন পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে পরমাণু বৈদ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ (neutral)। কিন্তু পরমাণুর ভিতরে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত ইলেকট্রন, তা হলে এই ঋণাত্মক বিদ্যুৎকে প্রশমিত (neutralize) করবার জন্যে পরমাণুর ভিতরে থাকতেই হবে সমপরিমাণে ধনাত্মক বিদ্যুতের।

টমসন বললেন যে, যে-কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে আছে তার ওজন (atomic weight) অনুযায়ী সেই সংখ্যক ইলেকট্রন ও সমান পরিমাণে ধনাত্মক বিদ্যুতাধান। এই ধনাত্মক আধানগুলি পরমাণুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘের মত, ইলেকট্রনগুলি এই মেঘে ভাসছে। কিন্তু পরমাণুর এই গঠন থেকে পরমাণু থেকে আলোর বিকিরণের কোন যথোপযুক্ত মীমাংসা পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞানীরা তখন জানতে চেষ্টা করছেন আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব। কোন বস্তুকে গরম করতে থাকলে একটি উষ্ণতাতে বস্তুটি থেকে

প্রথমে লাল আলো বের হয় ও উষ্ণতা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর রং লাল থেকে কমলা, হল্‌দে, সবুজ হয়ে বেগ্‌নীর দিকে যেতে থাকে, অর্থাৎ আলোর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে। তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) নিয়মানুসারে তাপ বাড়াতে থাকলে অণু, পরমাণুগুলি অধিকতর উত্তেজিত হতে থাকে, তাদের চলাচল বেড়ে যেতে থাকে ও অণুগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু এর থেকে আলোর উৎপত্তির সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না।

এখানে বলা যেতে পারে যে, পদার্থবিদ্যায় যখন এইরূপ সমস্যা চলছে, তখন আইনস্টাইন 1905 খ্রীস্টাব্দে আলোর কণিকারূপ প্রতিষ্ঠিত করলেন প্লাঙ্কের কণাবাদের (quantum theory) সাহায্যে, তার মানে আলোর দ্বৈত রূপ স্বীকৃত হল। এ বিষয়টি "আলোক-বিদ্যুৎ" (photo-electricity) পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সে সময়ে আইনস্টাইন পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করছেন না। বোধ হয় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বা বহির্জগতের (macro-world) ভৌত অস্তিত্বের (physical reality) ও আকার সম্বন্ধে চিন্তায় মগ্ন থাকায় কণিকা জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। তিনি এই বিষয়টি চিন্তা করেন 1916 খ্রীস্টাব্দের পরে, অর্থাৎ তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে পূর্ণরূপ দিয়ে প্রকাশ করবার পরে। সেটিকে কিছু পরে আলোচনা করা হবে।

1911 খ্রীস্টাব্দে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এক বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলে জানা গেল যে, প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে একটি কঠিন বস্তু আছে এবং এটি ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত। তিনি এটিকে বললেন কেন্দ্রীন (nucleus)। তিনি আরও বললেন যে, পরমাণুটির প্রায় সমস্ত ভরই এই কেন্দ্রীনে অবস্থিত।

আগেই জানা ছিল যে, মৌলিক পদার্থগুলির পারমাণবিক ভর উল্লেখিত হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরকে একক ধরে, যেমন অক্সিজেনের পরমাণু ভর হল 16, তামার 63, ইউরেনিয়ামের 238 ইত্যাদি। যে পদার্থের পরমাণু বিবেচিত হবে, তার কেন্দ্রীনে থাকবে তার পারমাণবিক ভরসংখ্যক ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণিকা (এই কণিকাই পরে প্রোটন বলে পরিচিত হয়েছে) এবং কেন্দ্রীনের বাইরে থাকবে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনের কিছু

সংখ্যা কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলির সঙ্গে জড়িত থেকে ঐ সংখ্যক প্রোটনকে আধান-নিরপেক্ষ করে দেবে এবং কেন্দ্রীনের বাকী প্রোটনগুলির জন্যে কেন্দ্রীনটি ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত হবে। এই বাকী প্রোটনগুলির অথবা কেন্দ্রীনের বাইরের ইলেকট্রনগুলির সংখ্যা হবে ঐ পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যার (atomic number) সমান। একটি উদাহরণ ধরা যাক। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভরসংখ্যা হল 238 ও পারমাণবিক সংখ্যা হল 92। সুতরাং কেন্দ্রীনেব 238টি প্রোটনের ভিতরে 146টি (238-92) প্রোটন সমান সমান সংখ্যক ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আধান-নিরপেক্ষ হয়েছে। 1932 খ্রীস্টাব্দে চ্যাডউইক (Chadwick) কর্তৃক নিউট্রন আবিষ্কারের পর অবশ্য এই ধারণা অন্যরূপ হয়েছে। এখন ধারণা হল যে, কেন্দ্রীনে প্রোটনের ও কেন্দ্রীনের বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যা হল পরমাণুটি পারমাণবিক সংখ্যার সমান এবং কেন্দ্রীনের বাকী কণিকাগুলি হল নিউট্রন, অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে 92 প্রোটন ও 146টি নিউট্রন এবং কেন্দ্রীনের বাইরে আছে 92টি ইলেকট্রন।

রাদারফোর্ড আরও বললেন যে, কেন্দ্রীনের বাইরে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে অবিরাম আবর্তন করছে, যেমন করছে গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে। কেন্দ্রীনের আধান ও তার বাইরের প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান বিপরীতধর্মী বলে তাদের ভিতরে একটি আকর্ষণ রয়েছে। ইলেকট্রনটি স্থিতাবস্থায় থাকলে সেটি কেন্দ্রীনের টানে তার কাছে চলে আসত। কিন্তু ইলেকট্রনটি কেন্দ্রীনের চারদিকে আবর্তন করছে বলে পরস্পরের আকর্ষণজনিত বল ইলেকট্রনটিকে আবর্তন করবার যথোপযুক্ত কেন্দ্রাভিগ (centripetal) বল যোগাচ্ছে, যেমন একটি সূতোর এক প্রান্তে একটি ঢিল বেঁধে অপর প্রান্তটি হাতের মুঠোয় ধরে উপযুক্ত বেগে ঘোরালে ঢিলটি বৃত্তাকারে আবর্তন করতে থাকে ও সূতোটি টান হয়ে সব সময়ে সমান দৈর্ঘ্যে থাকে। ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করবার জন্যে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুযায়ী শক্তি আলোর বেগে বৈদ্যুতিক-চৌম্বক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে যাবে।

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের এই সিদ্ধান্তে আলোর উৎপত্তি বিষয়ে কিছুটা উত্তর পাওয়া গেল। কিন্তু সমস্যা হল যে, আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলি থেকে শক্তি নির্গত হতে থাকলে তাদের শক্তি কমে যেতে থাকার জন্যে

আবর্তনের বেগ কমতে থাকবে। সুতরাং কেন্দ্রীনের আকর্ষণের জন্যে ক্রমশঃই সেগুলির আবর্তনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে এবং অবশেষে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের উপরে গিয়ে পড়বে, যার ফলে পরমাণুটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে সময় লাগবে এক সেকেণ্ডের এক কোটি ভাগ। কিন্তু পরমাণুগুলি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না।

1912 খ্রীস্টাব্দে রাদারফোর্ডের ছাত্র নীল্‌স্ বোর (Niels Bohr) পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাঁর অতি বিখ্যাত দুঃসাহসিক ও প্যারাডক্সিক্যাল বা আপাত-বিরোধী সত্য কল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আইনস্টাইনের আলোক-বিদ্যুতের ব্যাখ্যাতে আলোকে কণিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেইজন্যে কণাবাদের সাহায্যে রাদারফোর্ডের মডেলের কিছুটা সংশোধন করলেন। কণাবাদের সাহায্যে পরমাণুর গঠন ও বাইরে থেকে তাপ বা কোনরূপ শক্তি পেলে কি করে পরমাণু থেকে আলোর বিভিন্ন শক্তির কণিকা বা ফোটন নির্গত হয়, তার এক বিস্ময়কর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি হাইড্রোজেন পরমাণুর মডেলের কথা বললেন, কারণ এই পরমাণুটির হল সবচেয়ে সরল। এটিতে আছে একটি ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন্। তিনি বললেন যে, পরমাণুতে কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনের আবর্তন করবার বহুসংখ্যক কক্ষপথ আছে। কিন্তু প্রতিটি কক্ষপথ একটি বিশিষ্ট মাত্রার শক্তি-স্তরের। এই শক্তি-স্তরগুলিকে 1, 2, 3……ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা (integers) দিয়ে অভিহিত করা হল। কেন্দ্রীনের নিকটতম কক্ষপথটি হল 1 নম্বর। এটিই হল নিম্নতম শক্তি-স্তরের। তারপর কক্ষ-পথগুলির অবস্থান কেন্দ্রীন থেকে ক্রমশঃ দূরে থেকে আরও দূরে হবে এবং তাদের শক্তি-স্তরও বিশিষ্ট মাত্রায় বাড়তে থাকবে। কক্ষপথের দূরত্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীনের আকর্ষণও কমতে থাকবে। সর্বাধিক দূরে অবস্থিত ইলেকট্রনের উপর কেন্দ্রীনের আকর্ষণও খুবই সামান্য হবে।

একটি ইলেকট্রন যখন এইরূপ কোন একটি স্থায়ী (stationary) কক্ষপথে আবর্তন করেছে, তখন কোনরূপ শক্তি বিকীর্ণ করছে না। এই কল্পনাকেই বলা হয়েছে দুঃসাহসিক, কারণ তখনকার দিনে প্রচলিত সনাতন পদার্থবিদ্যার (classical physics) তত্ত্বানুযায়ী এটি অবিশ্বাস্য। বোর আরও বললেন যে, কোন কক্ষপথে আবর্তনরত একটি ইলেকট্রনের শক্তি হল এমন একটি

সংখ্যা যাকে প্লাঙ্কের ধ্রুবক h (যার মান হল $6 \cdot 6 \times 10^{-27}$ আর্গ-সেকেণ্ড) দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফলটি একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের জন্যেই বলা যেতে পারে যে, পরমাণুর আভ্যন্তরীন কোন ইলেকট্রনকে আবর্তনের জন্যে সম্ভাব্য সব রকম কক্ষপথের মধ্য থেকে কেবল কতকগুলি বিশেষ বা অনুমোদিত (permitted) শক্তি-স্তরের কক্ষপথকে বেছে নিতে হয়।

বোর বললেন যে, কোন পরমাণুর বাইরে থেকে তাপ বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক কোন শক্তি বা উত্তেজনা (excitement) পেলে পরমাণুটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, যার জন্যে ইলেকট্রনটি উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন হয়ে উপযুক্ত শক্তি-স্তরের কক্ষপথে লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যেই আবার নিজের স্বাভাবিক নিম্নতম শক্তি-স্তরের কক্ষপথে কিংবা অন্তঃস্থ কোন শক্তি-স্তরের কক্ষপথে নেমে আসে। এই নেমে আসার সময়ের ভিতরেই ইলেকট্রনটি থেকে শক্তিকণা বা ফোটন পরমাণু থেকে নির্গত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে আলোর অনুভূতি জাগায়।

ধরা যাক যে, যে শক্তি-স্তরের কক্ষপথে ইলেকট্রনটি লাফিয়ে উঠেছিল সেই স্তরের শক্তি হল E_2 এবং যে কক্ষপথে নেমে এল সেটি শক্তি-স্তর E_1 ; তাহলে প্লাঙ্কের তত্ত্বানুযায়ী $h \times f = E_2 - E_1$, যেখানে f হল সেকেণ্ডে কম্পাঙ্ক

$$\text{অর্থাৎ } f = \frac{1}{h}(E_2 - E_1)$$

যে শক্তির ফোটনটি নির্গত হল, তার কম্পাঙ্ক হল $\frac{1}{h}(E_2 - E_1)$।

এটির মান যদি হয় $3 \cdot 75 \times 10^{14}$-এর কাছাকাছি, তবে আলোটির রং হবে লাল, যদি 6×10^{14}-এর কাছাকাছি হয়, তবে রং হবে সবুজ ইত্যাদি।

তাহলে দেখা গেল যে, এই প্রক্রিয়াতে বাইরের কোন প্রকার শক্তির ফোটনকে অনুত্তেজিত পরমাণু শোষণ করে উত্তেজিত হলে তার ভিতরের ইলেকট্রন উচ্চশক্তিসম্পন্ন হয়। এই শক্তির মান অনুযায়ী আবর্তনের যোগ্য কোন অনুমোদিত কক্ষপথের শক্তি-স্তরে ইলেকট্রনটি লাফিয়ে উঠে আবর্তন করবে, কিন্তু এই আবর্তনের সময় কোন শক্তি বিকীর্ণ করবে না। এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীনের আকর্ষণে ইলেকট্রনটি

নীচের কোন শক্তি-স্তরের কক্ষপথে নেমে আসবে, এই সময়টুকুর ভিতরেই বাড়তি শক্তি বিকীর্ণ করবে। এই শক্তিই পরমাণু থেকে নির্গত হবে আইনস্টাইন কর্তৃক আবিষ্কৃত আলোর বা শক্তির ফোটন আকারে এবং এই ফোটন ও শোষিত শক্তির ফোটন একই প্রকারের হবে। একটি বিশেষ শক্তির ফোটন কোন পরমাণু থেকে নির্গত হবার অর্থ হল এই যে, সেই পরমাণুটিতে অন্ততঃপক্ষে এমন দুটি শক্তি-স্তর আছে, যে স্তর দুটির শক্তির বিয়োগফল হল নির্গত ফোটনের শক্তির সমান।

একটি পরমাণুর ক্ষেত্রে যে ব্যাপার ঘটে, বহু পরমাণুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে ঝাঁক ঝাঁক ফোটন এসে আমাদের চোখে অনুভূতি জাগায় বলে আমরা আলোকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখি। এই বিকিরণকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ (spontaneous emission)।

এখন দেখা যাক, কোন বস্তু সাধারণ উষ্ণতায় (room temperature) কোন আলো বিকিরণ করে না, কিন্তু উষ্ণতা বাড়াতে থাকলে প্রথমে লাল আলো ও পরে রং বেগ্‌নীর দিকে যেতে থাকে কেন।

সাধারণ উষ্ণতায় বস্তুটির অণু, পরমাণুগুলি যদিও এলোমেলোভাবে চলাচল করছে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষও হচ্ছে, কিন্তু এতে শোষিত শক্তির মান খুবই কম, যার জন্যে ইলেকট্রনগুলি সেরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়ে উপযুক্ত শক্তি-স্তরের কক্ষপথে যেতে পারছে না। উষ্ণতা বাড়তে থাকলে অণু, পরমাণুগুলির চলাচল ও পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে যেতে থাকে বলে শক্তির মানও বাড়তে থাকে। উষ্ণতার মান বৃদ্ধি পেয়ে পরমাণুগুলিকে উপযুক্ত মাত্রায় শক্তি দিলে ইলেকট্রনগুলি উপযুক্ত উচ্চশক্তি-স্তরে উঠে আবার নিম্নশক্তি-স্তরে নেমে আসে ও লাল আলোর ফোটন বিকীর্ণ করে, অর্থাৎ ঐ দুই শক্তি-স্তরের শক্তির পার্থক্য লাল আলোর শক্তির ফোটনের সমান। তারপর উষ্ণতা আরও বাড়তে থাকলে পরমাণুগুলি অনুরূপভাবে অধিক থেকে অধিকতর শক্তি শোষণ করতে থাকে, যার ফলে তাদের ইলেকট্রনগুলি উচ্চ থেকে উচ্চতর মানের শক্তি-স্তরে ওঠানামা করতে থাকে এবং সেইজন্য আলোর উচ্চ থেকে উচ্চতর মানের শক্তির ফোটন অর্থাৎ হল্‌দে, সবুজ, নীল বেগ্‌নী ইত্যাদি রঙের আলোর ফোটন নির্গত হতে থাকে।

বোরের এই হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সাড়া জাগাল। তাঁর এই কল্পনাতে আলোর উৎপত্তির ও উষ্ণতা বাড়াবার সঙ্গে বিভিন্ন রঙের আলোর বিকিরণের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। যদিও কিছুটা সমস্যা রয়েই গেল, বিশেষ করে অধিক ভরের পদার্থগুলির পরমাণুর জটিলতার ক্ষেত্রে। পরে অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী সেগুলির সমাধান করেন।

বোরের পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাতে আইনস্টাইন খুবই কৌতূহলী হয়েছিলেন, কারণ এটি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ-তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তাঁর নিজের আবিষ্কৃত আলোর কণিকারূপ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে খুবই সাহায্য করল। কিন্তু তিনি তখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পূর্ণরূপ প্রকাশ করবার জন্যে গভীরভাবে চিন্তিত থাকায় বোধ হয় বোরের কল্পনার বিষয়টিতে সেরূপ মনঃসংযোগ করতে পারেন নি। 1916 খ্রীস্টাব্দে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হবারপর তিনি বোরের পরমাণুর গঠনের ব্যাখ্যার দিকে মন দিলেন। যদিও এটি তরঙ্গ-তত্ত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, তথাপি তিনি এর চমৎকারিত্বে ও অভিনবত্বে মুগ্ধ হলেন।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই শতাব্দীর প্রথম বছরে প্লাঙ্ক কর্তৃক কণাবাদের আবিষ্কারে শক্তির অবিচ্ছিন্নতা আর রইল না এবং গ্যালিলিও ও নিউটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের ভিত্তি ধ্বসে পড়ল। তারপর এই কণাবাদের ভিত্তিতে আইনস্টাইন নিজে আলোকে কণিকারূপে প্রকাশ করবার জন্যে নিজেই তাঁর প্রিয় তরঙ্গ-তত্ত্বের যুক্তি লঙ্ঘন করলেন। অনেক বছর পর্যন্ত বিকীর্ণ শক্তির বা আলোর কণিকারূপের দ্বারা পদার্থবিদ্যার উন্নতির জন্যে সেরূপ কোন সুষ্ঠু ও সুযুক্তিপূর্ণ মতবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ফল লাভ করা যাচ্ছিল না। এই কণিকারূপ পদার্থবিদ্যার সনাতন ভিত্তির একরূপ ধ্বংসসাধন করেছে কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত বলবিদ্যার (mechanics) কিংবা বিদ্যুৎগতিবিদ্যার (electrodynamics) সেরূপ কোন উচ্চ শ্রেণীর তত্ত্ব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হল না। এই সময়ে বোরের পরমাণুর ব্যাখ্যাকে আইনস্টাইন স্বাগত জানালেন। তিনি শেষ জীবনে তাঁর আত্মজীবনীতে বোরের এই কল্পনা সম্বন্ধে লিখেছেন, "বোরের মত প্রতিভা-সম্পন্ন বিজ্ঞানীর অনুপম ও সহজাত ধারণাতে আলোর বর্ণালীর রেখাগুলির অর্থাৎ আলো সম্বন্ধে ও রসায়নবিদ্যার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুর আভ্যন্তরীণ

শক্তি-স্তরগুলির সম্বন্ধে চমৎকার তত্ত্বগুলি তখন আমার কাছে অতি বিস্ময়কর ও আলৌকিক বলে মনে হয়েছিল—এমন কি আজও তা সেইরূপ বলে মনে হয়। এই আবিষ্কার মানুষের চিন্তাজগতে উচ্চতম শ্রেণীর সঙ্গীতের মাধুর্যের মত !"

1917 খ্রীস্টাব্দে বোরের আবিষ্কৃত পরমাণুর মডেল, নিজের আবিষ্কৃত শক্তির ফোটন ও প্লাঙ্কের আবিষ্কৃত বিকিরণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করে আইনস্টাইন কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের (Black body radiation) এক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

আমরা "আলোক-বিদ্যুৎ" (photo-electricity) পরিচ্ছেদে জেনেছি যে, কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের বেলায় দেখা যায় যে, তাপীয় সাম্যাবস্থায় (thermal equilibrium) বস্তুদেহ একটি কম্পন সংখ্যার যতগুলি ফোটন শোষণ করে (absorb), ঠিক ততগুলিই বিকিরণ করে (emit)। এই বিষয়ে কয়েকটি বিখ্যাত তত্ত্ব পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ষ্টীফান-বোল্টস্ম্যান (Stefan-Boltzmann তত্ত্ব, ভীনের (Wien) তত্ত্ব, র‍্যালে-জীন্সের (Raleigh-Jeans) তত্ত্ব। কিন্তু কোন তত্ত্বেই বিকীর্ণ শক্তি ও সমস্ত প্রকার কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গে শক্তির বণ্টন সম্বন্ধে কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লাঙ্ক অবশেষে শক্তিকে কণা বা কণিকারূপে (quantum) কল্পনা করে তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ-সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রে সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল।

আইনস্টাইন 1917 খ্রীস্টাব্দে প্লাঙ্কের এই বিকিরণ-তত্ত্বকে নূতনরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এটিই আইনস্টাইনের উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্ব (Stimulated emission theory) বলে পরিচিত।

আইনস্টাইনের এই মতবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, ফোটন বস্তুদেহে শোষিত হবার পর পরমাণুগুলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ফোটন নির্গত হয়। এ বিষয়টি জানা গিয়েছে বোরের ব্যাখ্যা থেকে। এখানে একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখতে হবে যে, বস্তুদেহের প্রতিটি পরমাণু থেকেই আমরা প্রয়োজনীয় স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ পাই না। এই শোষণ-বিকিরণ ব্যাপারটি পরমাণুর ইলেকট্রনের বিভিন্ন উপযুক্ত শক্তি-স্তরে ওঠানামা থেকে সম্ভবপর হয়। এটি সম্পূর্ণ সম্ভাব্যতার (chance) ব্যাপার। স্বতঃবিকিরণ হল পরমাণুর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন পরমাণু শক্তির ফোটন

বিকিরণ করবে কি করবে না, তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। শোষণের সম্ভাবনাকে যদি ধরা হয় দশ ভাগের এক ভাগ, তবে 10 লক্ষ ফোটন বস্তু-দেহের অনুত্তেজিত পরমাণুর উপর বর্ষিত হলে এক সেকেণ্ডে 1 লক্ষ ফোটনের শোষিত হবার সম্ভাবনা আছে। এই ফোটনগুলির স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ হয়।

আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে বললেন যে, স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ছাড়াও আর এক প্রকারে বিকিরণ আছে। সেটি হল উদ্দীপিত বিকিরণ। কোন এক প্রকার ফোটনের দ্বারা উত্তেজিত পরমাণুতে সে সব ইলেকট্রন তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তি-স্তর ছেড়ে উচ্চতর শক্তি-স্তরে অবস্থান করছে, সেই উচ্চস্তরের ইলেকট্রন-গুলির উপরে ঠিক একই প্রকারের শক্তির ফোটন বর্ষিত হলে পূর্বের উত্তেজক ফোটন ও পরের উদ্দীপিত ফোটন, একই পরিমাপের এই দুই ফোটন পরমাণু থেকে একই দিকে নির্গত হয়। এখানেও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন। উদ্দীপিত বিকিরণের সম্ভাবনাকে যদি বলা যায় দশ ভাগের এক ভাগ, তাহলে শোষণের মত 10 লক্ষ উত্তেজিত পরমাণু থেকে আমরা 1 লক্ষ উদ্দীপিত বিকিরণের ফোটন পাব।

তাহলে কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের সব ব্যাপারগুলি মিলিয়ে দেখা গেল যে, উচ্চ উষ্ণতায় শোষিত ফোটন সংখ্যার অতি অল্পই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হয়, আর বাকীগুলি, বিশেষ করে নিম্ন কম্পাঙ্কের বিকিরণ সম্ভব হয় এই উদ্দীপিত বিকিরণের দ্বারা।

আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব প্রকাশের প্রায় দশ বছর পরে ডিরাক বলেছেন যে, উদ্দীপিত বিকিরণের তরঙ্গগুলির দিক, কম্পন-সংখ্যা, দশা (phase) ও সমবর্তন (polarisation) হুবহু এক। স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের তরঙ্গগুলি বড় খামখেয়ালী—দিক বা সময়ের জ্ঞান তাদের একেবারে নেই। উত্তেজিত পরমাণু থেকে তারা কে যে কখন বেরিয়ে আসছে, তার ঠিক নেই। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের তরঙ্গগুলি মোটেই সুসঙ্গত নয়, অথচ উদ্দীপিত বিকিরণে আমরা পাই পুরোপুরি সুসঙ্গত বিকিরণ। সুসঙ্গত তরঙ্গ বলতে বোঝায় সুষম (uniform), অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন (continuous) এবং অবিচল (steady) গুণসম্পন্ন তরঙ্গ।

আইনস্টাইন তাঁর এই উদ্দীপিত বিকিরণ-তত্ত্বে খুব খুশী ছিলেন না, কারণ পরমাণু থেকে এইরূপ বিকিরণ পরিসাংখ্যিক (statistical) প্রকৃতির ও

সংখ্যা হবে খুবই বেশী। 'ব্রাউনীয় বিচলন' পরিচ্ছেদে পরিসাংখ্যিক ও সম্ভাব্যতার বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সংখ্যায় পরিসাংখ্যিক সম্ভাব্যতা (statistical probability) তত্ত্ব প্রযুক্ত হলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। তার উপর শক্তির তরঙ্গরূপে বিকিরণ এবং সব সময়েই অনিশ্চিত কণিকারূপে বিকিরণ—এই দুইয়ের মধ্যে খাপ খাওয়ানো সম্ভবপর বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "এটির সঙ্গে একদিকে যেমন তরঙ্গের ধারণার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার অন্যদিকে তেমনি মৌলিক প্রক্রিয়াগুলির কাল ও দিক সম্ভাবনার উপরে ছেড়ে দিতে হয়।" মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি, যেমন কোন একটি ইলেকট্রনের বোরের কল্পিত এক কক্ষপথ থেকে অন্য এক কক্ষপথে লাফিয়ে ওঠানামা সম্পূর্ণরূপে সম্ভাব্যতার বিষয়।

আইনস্টাইন তাঁর অনুভূতির বলে বা স্বজ্ঞান (intuition) দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কণাবাদ ক্রমশঃ পদার্থবিদ্যাকে সম্পূর্ণ এক নতুন পথে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে পরমাণুতে ইলেকট্রনের চলাচলই প্রধান হয়ে উঠবে। বোরের এই অভিনব আবিষ্কার তার সংকেত দিচ্ছে। এইভাবে তরুণ বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে ক্রমশঃ আপাত-বিরোধী (paradoxical) সত্য ও অচিন্তনীয় সব কল্পনা ও তত্ত্ব আবিষ্কার করবে, যা দে-কার্তে ও স্পিনোজার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ থেকে সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দে যে সুন্দর ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বের রূপের সৃষ্টি হয়েছিল, যা নিউটনের কল্পিত যান্ত্রিক রূপের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল এবং যা অবশেষে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা সমন্বয় ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই রূপের ধ্বংসসাধন করবে। সেইজন্যে আইনস্টাইন যদিও নিজে বোরের মডেলের অভিনবত্বে চমৎকৃত হয়েছিলেন ও তার ভিত্তিতে নিজে উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্বের সৃষ্টি করে প্লাঙ্কের বিকিরণ-তত্ত্বের নূতন রূপ দিলেন, তথাপি 1920 খ্রীস্টাব্দে বোরের সঙ্গে যখন বার্লিনে তাঁর সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন এই সব আলোচনা কালে আইনস্টাইন বলেছিলেন—পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের গতিবিধিসংক্রান্ত তথ্যাদি যদি সব সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তার অর্থ হবে পদার্থবিদ্যার শেষ। তার মানে এই যে, যে পদার্থবিদ্যার কথা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সনাতন ভিত্তিক পদার্থবিদ্যার ধ্বংস হবে।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যে কত সত্য হয়েছিল, তা বোঝা যায় যখন 1924 খ্রীস্টাব্দে লুই দ ব্রগ্‌লির বস্তুর তরঙ্গরূপ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর থেকে দ্রুত পদার্থবিদ্যায় পরিবর্তন সাধিত হতে লাগল। ইলেকট্রনের ও অন্যান্য মৌলিক কণিকার (elementary particles) চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে কণাবাদের ও আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে বোরের নেতৃত্বে হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার প্রমুখ কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী সৃষ্টি করলেন এক নূতন পদার্থ-বিদ্যা, যাকে বলা হল কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Quantum mechanics)। মতবাদ তত্ত্ব, কার্যকারণ সম্বন্ধ (causality) ইত্যাদির বদলে স্থান পেল পরিসংখ্যান, সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।

এখানে আইনস্টাইনের উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন। এটি তত্ত্ব হিসেবে বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত ছিল কিন্তু এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না অনেক বছর পর্যন্ত, কারণ এত উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের, যাকে এখন বলা হয় অণু-তরঙ্গ (micro-waves), সৃষ্টি হয়নি। অবশেষে যখন এইরূপ অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হল এবং তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল, তখন 1954 খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক টাউন্‌স্ (Charles H. Townes) আইনস্টাইনের এই কল্পনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগিয়ে প্রথম মেসার (Maser) সৃষ্টি করলেন। তার কিছুকাল পরে তৈরী হল লেসার (Laser)। বর্তমান কালে মেসার ও বিশেষতঃ লেসার খুবই পরিচিত। মেসার হল Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation অর্থাৎ বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বা অণু-তরঙ্গের তীব্রতা বর্ধন, আর লেসার হল Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation বা বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণের দ্বারা আলোর তীব্রতা বর্ধন।

লেসার আলোর এক আশ্চর্য উৎস। লেসারের তীব্র রশ্মি দিয়ে ইস্পাতের মত কঠিন পদার্থে নিমেষে গর্ত করে ফেলা যায়। এই উৎসের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোক-ধারাকে চিকিৎসকরা অনেক সময় অস্ত্রোপচারের জন্যে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করেন। আবার, মানুষের অক্ষিপটের কোন স্নায়ু ছিঁড়ে গেলে বাইরে থেকে নিমেষের জন্যে তীব্র লেসার-রশ্মি ব্যবহার করে তা জোড়া দিয়ে

দেওয়া যায়। আকাশে কোন বস্তুর উপস্থিতি ও দূরত্ব নির্ণয়ের জন্যে রেডারের বেতার তরঙ্গের পরিবর্তে লেসারের সুসঙ্গত আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। লেসারের সাহায্যে একদিকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অন্য দিকে তেমন আকাশ-পথেই ক্ষেপণাস্ত্রকে বিনষ্ট করা সম্ভব। লেসার ব্যবহার করে বস্তুর ত্রৈমাত্রিক (three-dimensional) প্রতিবিম্ব তৈরি করা গেছে। যোগযোগ ব্যবস্থায় লেসারের বিপুল সম্ভাবনা বোঝা যায় এই থেকে যে, বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিসনের সংকেতকে বহন করবার জন্যে যেখানে বহু বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করতে হয়, সেখানে পৃথিবীর যাবতীয় রেডিও ও টেলিভিসনের সংকেতকে লেসার থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গ একাই বহন করতে পারে।

গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের উত্তরসূরী আইনস্টাইনই বোধ হয় বিশ্বের সমগ্র ও সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্ণ বাস্তবরূপের কল্পনাকারী, ঘটনার কার্যকারণে আস্থাবান ও প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনাতে পূর্ণতার ছবিতে বিশ্বাসী শেষ বিজ্ঞানী। তাঁর ও বোরের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, আইনস্টাইন শেষ জীবন পর্যন্ত কণা-বলবিদ্যার সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞানীদের পরিসাংখ্যিক সম্ভাব্যতার ও অনিশ্চয়তার বিষয়গুলির মূল ভিত্তি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন সনাতন বিজ্ঞানের আদর্শের মধ্যে, আর বোর আনন্দ পেয়েছেন প্রাকৃতিক সত্যের নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্যে নতুন নতুন পথ খুঁজতে—যে পথ সনাতন বিজ্ঞানের সমন্বয় আদর্শের সঙ্গে মেলে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান

(Bose-Einstein Statistics)

বিশ্ববিশ্রুত আইনস্টাইন আর ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু—এই দুই মনীষীর নাম বহন করে যে বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানটি বিজ্ঞান জগতে "বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান" বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

1924 খ্রীস্টাব্দে আচার্য বসু ঢাকায় অধ্যাপনাকালে প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের উপর গবেষণা করেছিলেন। উদ্দেশ্য, প্লাঙ্কের প্রসিদ্ধ সূত্রটির আবিষ্কারের মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল, তা দূর করে এক অভিনব উপায়ে সূত্রটি পুনরাবিষ্কার করা। প্লাঙ্কের এই সূত্রটির বিষয়ে পূর্বে দুটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

কণাবাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরকথা আজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে অবিদিত নেই। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ-তত্ত্বের আবিষ্কারের পরে জানা গিয়েছে যে, আলো, তাপ ইত্যাদি বিকীর্ণ শক্তিই আলোর বেগে এই তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে যায়। প্লাঙ্ক এই শক্তিকে কণারূপে কল্পনা করে তাঁর সূত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এই বিষয়টি "আলোক-বিদ্যুৎ" পরিচ্ছেদে বিশদ-ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই কণাকেই পরে আইনস্টাইন ফোটনরূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বসু অগ্রসর হলেন ফোটনকে বস্তুকণার তুল্যরূপে বিবেচনা করে, কারণ আইনস্টাইনের আবিষ্কারের পরে শক্তি ও বস্তুর তুল্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই প্লাঙ্কের সূত্রটিকে অন্যভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে বসু বাধ্য হলেন পরিসংখ্যানের (statistics) সমস্যা হিসেবে বিষয়টির সমাধান করতে। তিনি শক্তির তরঙ্গ-চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করলেন, শুধুমাত্র বস্তু কণার তুল্যরূপের উপর নির্ভর করে চেষ্টা করলেন প্লাঙ্কের সূত্রকে উপস্থাপিত করতে।

কিন্তু এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বসুকে এক নূতন গণনা

পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল। তখনকার দিনে বস্তুকণার দ্বারা গঠিত গ্যাসের ব্যাখ্যা দিতে হলে যে ধরনের পরিসাংখ্যিক পন্থা প্রয়োগ করা হত, তা থেকে আলাদা রাস্তায় তাঁকে যেতে হল। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ বসু ফোটনদেরকে এক বস্তুকণার গ্যাস হিসেবে কল্পনা করেন ও পরিসাংখ্যিক গতিবিদ্যার নিয়মাবলী প্রয়োগ করেন। চলিত চিন্তাধারা থেকে তাঁর পন্থার পার্থক্য হল এই যে, বসুর পন্থার মধ্যে যেটি নূতন, সেটি হল তাঁর ফোটন সম্বন্ধে অভিনব প্রস্তাব এবং পরিসংখ্যার রীতি; অর্থাৎ ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অন্য ফোটন থেকে ভিন্ন ভাবা সম্ভব নয়। তিনি বস্তু কণাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিস্থিতির (states) মধ্যে বন্টন করবার চেষ্টা করলেন না, বরং তিনি সন্ধান বের করলেন কি ভাবে পরিস্থিতিসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই পরিস্থিতিসমূহের বৈশিষ্ট্য কি? না, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণাগুলি যেন এক একটি পরিস্থিতির পরিচায়ক হিসেবে থাকতে পারে। এই গণনাবলীর সঙ্গে বসু জুড়ে দিলেন প্রয়োজনীয় ভৌত শর্তাবলী (physical conditions); যেমন—সামগ্রিক তেজশক্তির ও পরিস্থিতির সংখ্যার নির্দিষ্টতা। এই দুয়ের সহায়তায় তিনি নূতন করে আবিষ্কার করলেন প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র।

বসুর গবেষণার কাজটি আইনস্টাইনের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তবে এই আলোড়নের হেতু প্লাঙ্কের সূত্রের নব উপস্থাপনা নয়, সেটি হল বসুর পন্থার নবীনতা ও তার তাৎপর্য। আইনস্টাইন এই কাজটির সম্বন্ধে বলেন, "বোস যে ভাবে প্লাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন, তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কণা-তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে।"

আইনস্টাইন যে কতটা অভিভূত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর দ্রুত পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা থেকে। এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম দেখালেন যে, বসুর এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূর-প্রসারী। তিনি বসুর নূতন পন্থা প্রয়োগ করলেন পারমাণবিক বস্তুকণার দ্বারা সংগঠিত সমষ্টির উপর। বসুর পরিসাংখ্যিক নিয়ম প্রয়োগে তিনি সৃষ্টি করলেন একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কণাবাদ। তিনি এই কাজটিকে গ্যাসের গতি-তত্ত্বে প্রয়োগ করে অতি অল্পমাত্রায় গ্যাসের আচরণাদির ব্যাখ্যা

করেছিলেন। এই হেতু বসুর নূতন গণনা-প্রণালী খ্যাতি পেল "বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান" বলে।

আচার্য বসুর এই আবিষ্কারের পরে তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করে ফের্মি ও ডিরাক অন্য একপ্রকার পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেন। সেটিকে বলা হয় "ফের্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান"।

এখানে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ছাড়াও পাই-মেসন, কে-মেসন, মিউ-মেসন, নিউট্রিনো ইত্যাদি বহু প্রকার মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গিয়েছে। এই মৌলিক কণিকার বৃহৎ তালিকাকে নানা অংশে ভাগ করে পড়তে সুবিধে হয়। প্রথমতঃ এগুলিকে দুটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আচার্য বসুর পরিসংখ্যানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে একটি শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে বোসন (Boson)। এগুলি তাঁর আবিষ্কৃত পরিসংখ্যানের নিয়ম মেনে চলে, আর অন্য শ্রেণীকে ফের্মির নামানুযায়ী বলা হয় ফের্মিয়ন (Fermion)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব
(Unified Field Theory)

এই তত্ত্বের মূল অর্থ নিহিত আছে প্রথম শব্দটিতে। প্রকৃতির বিভিন্ন সত্য জানা যাবে একটি বা অতি সামান্য কয়েকটি তত্ত্ব থেকে, এই ছিল আইনস্টাইনের বিশ্বাস। তিনি একস্থানে বলেছেন, "সমস্ত বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য হল যথাসম্ভব অল্প সংখ্যক কল্পনা বা তত্ত্ব থেকে যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যক অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপারের নিষ্পত্তি সাধন করা।"

বিশ্বতত্ত্ববিৎ আইনস্টাইন বিশ্বের সম্বন্ধে কোন অলৌকিক কিংবা তুরীয় ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি বিশ্বের সত্যকে বিজ্ঞানের সূত্রে জানতে চেষ্টা করেছেন বলে অনেকে তাঁকে বলেছেন জড়বাদী, নাস্তিক। প্রতিটি ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রকৃতির পরমা শক্তির প্রকাশের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন কার্য-কারণ সম্বন্ধ, অনুভব করতেন সুষ্ঠু সামঞ্জস্য ও অন্তর্নিহিত পূর্ণতার ছবি। প্রকৃতির বিবিধের মাঝে আছে মহৎ মিলন, মহৎ সমন্বয়, এই ধারণায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই যে পরমাশক্তির অস্তিত্ব, তাই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর, এই শক্তির প্রতিটি সুন্দর প্রকাশের অনুভূতিই ছিল তাঁর ধর্ম। তাই তিনি এই কথাই একাধিক বার নানাভাবে বলেছেন, "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit which reveals itself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forming my idea of God".

বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষের নানারূপ আবিষ্কার, গবেষণা, তত্ত্ব, মতবাদ, যুক্তি বিচার ক্রমশঃ অভিসারী (converg-

ing) হচ্ছে, ক্রমশঃ কতক কতক ব্যাপার একীভূত হয়ে মিলে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, প্রথম ধাপে বিশ্বে অজস্র প্রকার বস্তুর মূল উপাদান দেখা গেল 92টি মৌলিক পদার্থ। এতে বহু সংখ্যাকে কমিয়ে 92টি সংখ্যায় আনা গেল। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই 92টি মৌলিক পদার্থের প্রতিটি ইলেকট্রন ও প্রোটন নামে দুটি (তখনও নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় নি) মাত্র মৌলিক কণিকার উপাদানে গঠিত। এই তো গেল বস্তুর বেলা। তারপর বিকীর্ণ শক্তির বেলায় দেখা গেল যে, গামা রশ্মি, এক্স-রশ্মি, বেগ্‌নী পারের আলো, দৃশ্যমান আলো, তাপ, রেডিও-তরঙ্গ —সব হল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। অবশেষে বিশ্বের সব উপাদান এসে দাঁড়াল মাত্র কয়েকটি মূল জিনিষে যথা—মহাকাশ, সময়, বস্তু, শক্তি এবং মহাকর্ষ, কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে দেখালেন বস্তুর ও শক্তির তুল্যতা এবং মহাকাশ-সময়-সন্ততির অবিচ্ছিন্নতা। এইভাবে চিন্তা করে 1916 খ্রীস্টাব্দের পর থেকে আইনস্টাইনের প্রচেষ্টা হল চরম সূত্রটি বের করে তখনও বিচ্ছিন্ন ভাবের ব্যাপারগুলিকে একাঙ্গীভূত করা।

তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। আবার ম্যাক্স-ওয়েল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র। আইনস্টাইনের চিন্তা হল কি করে মহাকর্ষের ও বিদ্যুচ্চৌম্বকত্বের, বিশ্বের এই দুটি প্রধান ব্যাপারের নিয়মাবলী একীভূত করা যায়। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে, আপেক্ষিকতাবাদ যেমন মহাকর্ষীয় বলের কল্পনাকে বদলে মহাকাশ-সময়-সন্ততির জ্যামিতিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করল, তেমনি বিদ্যুচ্চৌম্বক বলকেও ঐরূপ কোন জ্যামিতিক গুণে পরিণত করা সম্ভবপর হবে। তিনি এই বিষয়ে একস্থানে বলেছেন, "মহাকাশের একটি মহাকর্ষীয় ও অপরটি বিদ্যুচ্চৌম্বক—এইরূপ দুটি বাস্তব বিষয়ের পরস্পরের অনন্যগত গঠন থাকতে পারে, এই কল্পনা তত্ত্বীয় জ্ঞানে মেনে নেওয়া অসম্ভব।"

প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া পারমাণবিক জগতে আরও দুটি ক্ষেত্র আছে। একটি হল পরমাণুর কেন্দ্রীনে খুবই ক্ষমতাশালী ক্ষেত্র ও অপরটি হল কেন্দ্রীনের বাইরে একটি দুর্বল ক্ষেত্র। অবশ্য পরে অনেক মৌলিক কণিকা ও তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোন ঘটনার মূলে কোন্ সত্য আছে সেটি আবিষ্কার না করে তার লক্ষণ দেখে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এইজন্যে মাইকেলসন-মর্লের আলোর বেগসম্পর্কিত বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলের লোরেনৎসের ব্যাখ্যাটিকে যদিও তিনি প্রশংসা করেছিলেন, তথাপি এটিতে তিনি অন্তর্নিহিত পূর্ণতার অভাব বোধ করেছিলেন। তাই তো তাঁর চিন্তায় প্রকাশ পেল বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। সেইজন্যে কণাবাদের প্রয়োগে বিজ্ঞানীরা কার্য-কারণভিত্তিক সনাতন পদার্থবিদ্যার ধ্বংসসাধন করবে, যে বিষয়টি পূর্বে "উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ত্ব" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে, সেই বিষয় ভেবে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 1924 খ্রীস্টাব্দ থেকে পদার্থবিদ্যার গতি যে দিকে ধাবিত হল এবং এই শতাব্দীর বিশের দশকের শেষের দিকে যে কণিকার গতি থেকে উদ্ভূত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (quantum mechanics) সৃষ্টি হল, যার পর থেকে দ্রুত সব অভিনব ও উদ্ভট পরিসাংখ্যিক কল্পনার উদ্ভব হতে থাকল এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নানারূপ মৌলিক কণিকার আবিষ্কার হতে লাগল, এই সবের জন্যে এতদিনকার যে পদার্থবিদ্যার আবিষ্কৃত ও মতবাদে প্রকৃতির ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় সমন্বয় ও পূর্ণতার অভাব ঘটে নি, সেই পদার্থ-বিদ্যার পরিণতির কথা ভেবে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। নূতন বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে অস্বীকার না করে তিনি সেই সত্যকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন, যে সত্য না জানার জন্যে কণিকা জগতে এইরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, সেই সত্যকে জানতে পারলে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের মীমাংসা পাওয়া যাবে এবং বিশ্বের যে-কোন ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, কারণ বহির্জগতের ও কণিকা-জগতের মূল সত্য আলাদা হতে পারে না। তিনি এই সব বিজ্ঞানীর সম্বন্ধে বলেছেন যে, এঁরা আসল মূল সত্যকে জানতে পারছেন না, কিন্তু একদিন এঁদের কেউ সেই সত্যকে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করবেন।

এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই বইটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি হাইজেনবার্গ ও ম্যাক্স বর্ন্ কর্তৃক কণিকা জগতে অনিশ্চয়তা (uncertainty) এবং সম্ভাব্যতা (probability) আবিষ্কারের কথা প্রসঙ্গে।

1979 খ্রীস্টাব্দের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন বিজ্ঞানী হলেন আবদুস সালাম (Abdus Salam)। তিনি মৌলিক কণিকার (elementary particles) উপর কাজের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিও আইনস্টাইনের অভিমত সমর্থন করেন যে, মহাকর্ষ ক্ষেত্র, বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র, পরমাণুর কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে খুবই ক্ষমতাশালী ক্ষেত্র ও কেন্দ্রীনের বাইরে একটি দুর্বল ক্ষেত্র এই চারটিকে একীভূত করবার বিষয়টি অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে 1978 খ্রীস্টাব্দে একটি বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তা 1979 খ্রীস্টাব্দের 20 অক্টোবর তারিখে Statesman পত্রিকার একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকে কিছু অংশ নীচে উল্লেখ করা হল।

"আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ 20 বছর ধরে চেষ্টা করেছেন মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎকে একীভূত করবার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি যে, যদিও এইরূপ ঐক্য সাধন সম্ভব এবং অবশ্যই পরিণামে তা হবে, কিন্তু তিনি কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার করে যেতে পারেন নি যেটি সবাই বিশ্বাস করতে পারেন এবং আরও প্রয়োজনীয় যে, যেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করা যেতে পারে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আইনস্টাইন যে ঐক্যের চেষ্টা করেছিলেন, গত পাঁচ বছরে আবিষ্কৃত মতবাদ দ্বারা কিছুটা ভিন্ন রূপে সেটির সার্থক হবার সম্ভাবনা হয়েছে। গত পাঁচ বছরের আবিষ্কার দেখে মনে হয় যে, সম্ভবতঃ কেন্দ্রীনের বাইরের দুর্বল বল আর বৈদ্যুতিক বলের (electrical force) মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।"

এই প্রবন্ধটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে প্রবল ক্ষমতাশালী বল এবং মহাকর্ষকে একই বলের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে প্রমাণ করা যেতে পারে। সালাম বলেন যে, এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে হলে এত প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন, যা তৈরি করবার মত ত্বরণ-যন্ত্র (accelerator) এখনও তৈরি করবার কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সচরাচর যা ঘটে না (unusual' kind), এরূপ কোন পরোক্ষ (indirect) প্রমাণ থাকতে পারে।

পূর্বে উল্লেখিত বিশের দশকে মাঝামাঝি কণাবাদের ভিত্তিতে হাইজেনবার্গ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যায় কণা-বলবিদ্যার (quan-

tum mechanics) প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা দেখলেন যে, microcosom বা কণিকাজগতের ঘটনাবলীতে সনাতন পদার্থবিদ্যার (classical physics) নিয়মাবলী দ্বারা তাঁদের সমস্যার কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কার্য-কারণের বদলে সাহায্য নিলেন পরিসংখ্যানের (statistics)। এই বিষয়টি এই বইয়ের উপক্রমণিকায় আলোচিত হয়েছে। সনাতন পদার্থ-বিদ্যার নিয়মাবলী অবহেলিত রইল। বিজ্ঞানীরা এগুলির বিষয় সেরূপ চিন্তা করেন না।

কিন্তু macrocosm বা বহির্জগতে প্রত্যেকটি ঘটনাতে একটি সুন্দর কার্য-কারণ আছে, যা আইনস্টাইন বরাবর প্রকৃতির সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি এই তরুণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার দ্বারা ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা যদিও অস্বীকার করলেন না, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, কণা-বলবিদ্যার মূল সত্যটি এই সব বিজ্ঞানী খুঁজে পান নি। এটি খুঁজতেই তিনি তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ 30 বছর খুবই চেষ্টা করেছেন তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের মীমাংসা পাবার জন্য।

1955 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হাইজেনবার্গ 1959 খ্রীস্টাব্দে আইন-স্টাইনের একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "The rapid increase in the body of knowledge about elementary particles and fields is the primary reason for Einstein's failure", অর্থাৎ মৌলিক কণিকাগুলির ও ক্ষেত্রগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান দ্রুত বেড়ে যাওয়াই আইনস্টাইনের ব্যর্থতার কারণ। কিন্তু 25 বছরের কম সময়ের মধ্যেই আবদুস সালাম আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের যথার্থতা অন্ততঃ আংশিক-ভাবে অনুমোদন করলেন এবং এই বিষয়ে কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আরও দু-জন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ভিনবার্গ ও অধ্যাপক শেলভনও একই মত পোষণের জন্য একসঙ্গে এই পুরস্কার পেলেন। পর-মাণুর কেন্দ্রীনের বাইরে যে দুর্বল বল আছে, তার চরিত্র বিদ্যুচ্চৌম্বক বলেরই মত—এইটিই এই তিনজন বিজ্ঞানী বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের তত্ত্বে।

মহাজাগতিক সত্যকে জানতে বিজ্ঞানীরা দু-ভাবে চেষ্টা করেছেন, এক হল যন্ত্রের দ্বারা—যথা উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আর অপরটি হল গাণিতিক সূত্রের দ্বারা। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষভাগ থেকেই

পদার্থবিদ্যার দুটি মূল ভিত্তি হল আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টামবাদ থেকে উদ্ভূত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। বহির্জগতের ধারণা পেতে হলে নির্ভর করতে হবে আপেক্ষিকতাবাদের উপরে। মহাকাশ, সময়, মহাকর্ষ এবং অন্যান্য যে সব প্রাকৃতিক সত্যের অস্তিত্ব, যা এত দূরে যে তা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নাগালের বাইরে কিংবা যা কল্পনাতীতভাবে বৃহৎ, এই সবের জ্ঞান লাভ করা যায় আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা।

পরমাণুর ধারণা, বস্তু ও শক্তির মূল কণিকা, এবং যে সব প্রাকৃতিক সত্য এত ক্ষুদ্র যে, ধরাছোঁয়ার বাইরের শুধু নয়, কোন রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেগুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না—এই সব সত্যের ধারণা পাওয়া যায় কণা-বলবিদ্যায়। আইনস্টাইন গভীরভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন এই দুইয়ের ভিতরে মিলন স্থাপন করতে।

এই সময়ে আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, বস্তুর মূল গুণ জাড্যকে কি ক্ষেত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এইটি করতে পারলে বস্তুর পারমাণবিক গঠনের ব্যাপারটি ক্ষেত্রের ধারণার দ্বারা মীমাংসা করা যেতে পারে। এখন শক্তিকে ক্ষেত্রের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুতরাং বস্তুকেও ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, সমস্ত বিশ্বকে ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে ধারণা করা যেতে পারে। যেখানে ক্ষেত্রের ঘনত্ব কম, সেখানে শক্তি এবং যেখানে ক্ষেত্রের ঘনত্ব বেশী, সেখানে বস্তু। সেই হবে পদার্থবিদ্যার পরম সত্যলাভ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং বস্তু ও ক্ষেত্রকে আজ পর্যন্ত একীভূত করা সম্ভব হয় নি।

এখন দেখা যাক দ্য ব্রগ্‌লির আবিষ্কারের তাৎপর্য কি, যা পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারায় তুমুল আলোড়ন নিয়ে এল। 1924 খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর সংখ্যার "ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন" (Philosophical Magazine) পত্রিকাতে লুই দ্য ব্রগ্‌লি (Louis de Broglie) নামে এক অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানীর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল। নিবন্ধটির মূল ব্যাপারটি হল বস্তুর তরঙ্গ রূপের অস্তিত্ব। তিনি লিখেছেন যে, যে-কোন বস্তুর—সে বস্তুটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণিকা কিংবা ইলেকট্রন যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় বস্তুটি হবে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গগুলির

মত এই বস্তু-তরঙ্গগুলিও সম্পূর্ণরূপে শূন্য স্থান দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এতে কোন প্রকার মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, যার জন্যে বলা যেতে পারে যে, এগুলি সাধারণ যান্ত্রিক বা মাধ্যম সৃষ্ট তরঙ্গ (mechanical waves) নয়। এই তরঙ্গগুলির সঙ্গে বিদ্যুৎ-আধানের কোন সম্বন্ধ নেই। কোন বস্তু বিদ্যুতাহিত হোক বা না হোক, বস্তুটি গতিতে থাকলেই সেটিতে তরঙ্গগুলির সৃষ্টি হবে। সেইজন্যে এগুলি বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গও নয়। দ্য ব্রগ্‌লি একটি গাণিতিক সূত্র বের করলেন, যার দ্বারা কোন চলন্ত বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে বস্তুটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বের করা যাবে। সূত্রটি হল—

$$\lambda=\frac{h}{mv},$$

যেখানে λ হল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, h হল প্লাঙ্কের ধ্রুবক, যার মান হল $6{\cdot}6\times10^{-27}$ আর্গ-সেঃ, m হল ভর ও v হল বেগ।

উপরিউক্ত h সংখ্যাটি থেকে বোঝা যায় যে, এই তরঙ্গগুলি হল কণা-প্রকৃতির। এই সূত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তরঙ্গগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের গ্রহ পৃথিবী, এটির ভর হল 6×10^{27} গ্র্যাম, এর সূর্যের চারদিকে আবর্তনের বেগ হল সেকেণ্ডে 3×10^{6} সেঃ মিঃ। সুতরাং দ্য ব্রগ্‌লির সূত্রানুযায়ী পৃথিবী বস্তুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—

$$\lambda=\frac{6{\cdot}6\times10^{-27}}{6\times10^{27}\times3\times10^{6}}=3{\cdot}7\times10^{-61} \text{ সেন্টিমিটার।}$$

উপরের 10^{-61} সেন্টিমিটার সংখ্যাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কী কল্পনাতীত ক্ষুদ্র। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত কোন যন্ত্রের দ্বারা এত ক্ষুদ্র মানের কোন কিছু মাপা বা তার অস্তিত্বের বাস্তবতার চিহ্ন ধরা বা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

তারপর ধরা যাক একটি চলন্ত পাথরের টুকরো। মনে করা যাক যে, পাথরটির ভর হল 100 গ্র্যাম এবং সেটি ছুটছে সেকেণ্ডে 100 সেন্টিমিটার বেগে। তাহলে দ্য ব্রগ্‌লির সূত্রানুযায়ী পাথরটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—

$$\lambda=\frac{6{\cdot}6\times10^{-27}}{100\times100}=6{\cdot}6\times10^{-31} \text{ সেন্টিমিটার}$$

আবার একটি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, যার অস্তিত্ব কখনও কোনরূপে বাস্তবে প্রমাণ করা যাবে না।

সর্বশেষে ধরা যাক ক্ষুদ্রতম কণিকা ইলেকট্রন, যার ভর হল 9×10^{-28} গ্রাম, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে 10^{-27} গ্রাম। ইলেকট্রনের বেগ অনেক মানের হতে পারে, এমন কি আলোর বেগের প্রায় সমান হতে পারে। এটি নির্ভর করবে কিরূপ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কত বিভব-পার্থক্যের (potential difference) ক্ষেত্রে এটি চলন্ত অবস্থায় আছে। মনে করা যাক যে, বিভব-পার্থক্য হল এক ভোল্ট। এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনটির বেগ হবে সেকেণ্ডে 6×10^{7} সেন্টিমিটার। তাহলে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপের দৈর্ঘ্য—

$$\lambda=\frac{6\cdot6\times10^{-27}}{10^{-27}\times6\times10^{+7}}=1\cdot1\times10^{-7} \text{ সেন্টিমিটার}$$

অন্য দুটি সংখ্যা থেকে এই সংখ্যাটির অনেক পার্থক্য। 10^{-7} সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অঞ্চলে (range) অবস্থিত এবং এই পরিমাণ দৈর্ঘ্যের অস্তিত্ব ফোটোগ্রাফি প্লেটে পাওয়া সম্ভবপর এবং পাওয়া গিয়েছেও, যা কিছু পরেই উল্লেখ করা হচ্ছে।

দ্য ব্রগ্‌লি তাঁর নিবন্ধে এই আশা পোষণ করলেন যে, বস্তু ও বিকিরণের অর্থাৎ শক্তির পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে, যদি ইলেকট্রনকে কণিকারূপে না ভেবে তরঙ্গরূপে ভাবা যায়।

দ্য ব্রগ্‌লির এই নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে শ্রোয়েডিঙ্গার (Schrödinger) তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, যা তরঙ্গ বলবিদ্যা (wave mechanics) নামে পদার্থবিদ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই তত্ত্বে তিনি দ্য ব্রগ্‌লির "বস্তুর তরঙ্গ" মতবাদের অনুরূপ ধারণার সুসঙ্গত গাণিতিক রূপ দিলেন। এতে তিনি এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, যা দিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনে তরঙ্গ-ধর্ম আরোপ করে কণাঘটিত ব্যাপারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

1927 খ্রীস্টাব্দে ডেভিসন (Davisson) ও জারমার (Germer) তাঁদের গবেষণাগারে ফোটোগ্রাফি প্লেটে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপকে ধরতে পারলেন। এতে প্রমাণিত হল যে, ইলেকট্রনের প্রকৃতই তরঙ্গরূপ আছে, যার জন্যে ইলেকট্রনে তরঙ্গ-ধর্ম বর্তমান। তাঁরা আরও দেখলেন যে, তাঁদের বাস্তবে আবিষ্কৃত ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্য ব্রগ্‌লির সূত্রানুযায়ী দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পরে আরও প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শুধুমাত্র ইলেকট্রন নয়, সমস্ত

পরমাণু এবং এমন কি অণুরও তরঙ্গরূপ আছে। বস্তুকে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তিপ্রস্তর, তার মানে বস্তুই বিশ্বের আদি উপাদান, যার ক্ষয় নেই। কিন্তু তার প্রায় 60 বছর পরেই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে বস্তুর রূপ পাল্টে গেল, বস্তুর কঠিনত্ব আর রইল না, বস্তু থেকে পদার্থ খসে পড়তে লাগল। বিশ্বের রূপ দাঁড়াল তরঙ্গসমষ্টি, তার মানে এই বিরাট বিশ্বে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি আলাদা আলাদা আর কিছুই রইল না, সবই কেবল এক-রূপ তরঙ্গের সমষ্টি, এই সব তরঙ্গ কোনরূপ মাধ্যমে সৃষ্ট হয় না, সৃষ্ট হয় সম্পূর্ণ শূন্যে (void)।

এই সময়ে পদার্থবিদ্যায় অদ্ভুত ও উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হল, যার একদিকে হল বস্তুর তরঙ্গ ও অপরদিকে হল আলোর বা শক্তির কণিকা, যাকে বলা যেতে পারে কণিকার তরঙ্গ (waves of particles) ও তরঙ্গের কণিকা (particles of waves)। এই দুটি সম্পূর্ণ উল্টো প্রকৃতির ব্যাপারে যে গভীর পার্থক্য প্রতীয়মান হচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক দশক পূর্বে হাইজেনবার্গ (Heisenberg) ও ম্যাক্স বর্ন্ (Max Born) এই প্রভেদের ভিতরে সেতু-বন্ধন করলেন। তাঁরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই ঘটনাগুলিকে অভিনব গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচার করলেন। এই গাণিতিক পদ্ধতি কারোর ইচ্ছানুসারে কোয়ান্টাম ঘটনাবলীর (quantum phenomena) তরঙ্গ আকারের কিংবা কণিকা আকারের নিখুঁত বর্ণনা দিতে সক্ষম হল। তাঁরা বললেন যে, কোন পদার্থবিদ্যাবিদের পক্ষে একটি ইলেকট্রনের গুণাগুণ সম্বন্ধে চিন্তা করবার কোন সার্থকতা নেই, গবেষণাগারে তাঁকে কাজ করতে হয় ইলেকট্রন রশ্মি নিয়ে এবং এক একটি রশ্মিতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন, যা কণিকা বা তরঙ্গ যে রূপেই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানীদের কোন অসুবিধে নেই; তাঁকে কাজ করতে হবে বহু সংখ্যক নিয়ে, কখনও একটি বা অল্প কয়েকটি নিয়ে নয়, সেইজন্যে পরিসংখ্যানের ও সম্ভাব্যতার নিয়মাবলী মানতে হবে, যা করা হয় গ্যাসের অণুদের ক্ষেত্রে।

এখানে 1927 খ্রীস্টাব্দে হাইজেনবার্গের আবিষ্কৃত "অনিশ্চয়তা নীতি" (Uncertainty Principle) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। তিনি বললেন যে, কোন একটি কণিকার গতি, অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে

কণিকাটির কোথায় অবস্থিতি ও বেগের মানের পরিমাপ, সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, পরিমাপ করা যেতে পারে শুধুমাত্র অবস্থিতির স্থানের ও বেগের মানের সম্ভাব্যতা। কোন কণিকার কোথায় অবস্থিতি, সেটি যত বেশী সঠিকভাবে নির্ণয় করতে যাওয়া যাবে, তার বেগের মানের পরিমাপ তত বেশী অনিশ্চিত হবে, আবার উল্টোভাবে বলা যেতে পারে যে, কণিকাটির বেগের মান যত বেশী সঠিকভাবে নির্ণয় করতে চেষ্টা করা হবে, কণিকাটির অবস্থিতির বিষয়টি তত বেশী অনিশ্চিত হবে। আমাদের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার উপরে নির্ভর করতেই হবে, কারণ কোন যন্ত্র দিয়ে ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকাকে কখনো গোচরীভূত করা যাবে না।

এই ব্যাপারটিকে একটু বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখতে হলে আমাদের একটি অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কোন বস্তুকে অন্ধকারে দেখা যায় না, তার উপরে আলোর রশ্মি ফেলতেই হবে। আলো বস্তুটির উপরে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আসে বলে আমরা বস্তুটিকে বর্ধিত আকারে দেখতে পাই। এতে প্রথম শর্তটিই হল যে, যে আলো ব্যবহার করা হবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ঐ বস্তুটির আয়তনের (size) চেয়ে ছোট হতে হবে। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল 0·4 থেকে 0·8 মাইক্রন (micron) অর্থাৎ 4×10^{-5} থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার পর্যন্ত, কারণ এক মাইক্রন হল 10^{-6} মিটার বা এক সেন্টিমিটারের 10 হাজার ভাগের এক ভাগ। সুতরাং পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে এরূপ ক্ষুদ্রতম বস্তুর আয়তন হতে হবে কমপক্ষে 1 থেকে 2 মাইক্রন অর্থাৎ 0·0001 থেকে 0000·2 সেন্টিমিটার, যাতে আলো ঐ বস্তুটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আসতে পারে কিংবা ফোটোগ্রাফি প্লেটে ধরা পড়তে পারে।

কিন্তু যদি বস্তুটি আলোর তরঙ্গের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র আকারের হয়, তবে সাধারণ বুদ্ধিতেই অনুমিত হয় যে, আলো বস্তুটিকে অতিক্রম করে চলে যাবে, মনেই হবে না যে, বস্তুটি আলোর পথে আছে।

ইলেক্ট্রনের ব্যাস 10^{-13} সেন্টিমিটারের মত বলে এর আকার বা আয়তন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় 10 কোটি ভাগের এক ভাগ। ফলে আলো এটিকে উদ্ভাসিত (illuminate) করতে পারবে না এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। এমন কি পরমাণুর ব্যাস 10^{-8} সেন্টিমিটারের

মত অর্থাৎ আলোর তরঙ্গের প্রায় 1000 ভাগের এক ভাগ বলে পরমাণুকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাবে না।

তা হলে আলোর তরঙ্গ ছাড়া কোন্ তরঙ্গ দিয়ে ইলেকট্রনকে উদ্ভাসিত করা যেতে পারে ? এক্স-রশ্মিও হবে না, কারণ এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও ইলেকট্রনের মাপের চেয়ে বহুগুণে বড়। এক হতে পারে গামা রশ্মি দিয়ে। গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইলেকট্রনের মাপের চেয়েও ক্ষুদ্রতর আকারের হতে পারে। কিন্তু গামা রশ্মি দিয়ে ইলেকট্রনকে উদ্ভাসিত করতে গেলে ইলেকট্রনটি কোথায় চলে যাবে, তার পাত্তাও পাওয়া যাবে না। কারণটি বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

যখন আলোর সাহায্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আমরা একটি ধূলিকণিকা বা কোন রোগের বীজাণু দেখি, তখন কি হয় বোঝা যাক। একটি ধূলিকণিকা হল কোন পদার্থের একটি অতি ক্ষুদ্র কণিকা। মনে করা যাক যে, পদার্থটির ঘনত্ব (density) প্রতি সেন্টিমিটারে (cubic centimeter) 10 গ্র্যাম (লোহার চেয়ে বেশী) এবং কণিকাটির ব্যাস এক মাইক্রন অর্থাৎ 10^{-4} সেন্টিমিটার। তা হলে ধূলিকণিকাটির ভর হবে এর আয়তন ও ঘনত্বের গুণ ফল। আয়তন হল প্রায় $(10^{-4})^3$ অর্থাৎ 10^{-12} ঘন সেন্টিমিটার। সুতরাং ভর হবে $10^{-12}\times10=10^{-11}$ গ্র্যাম। এখন ধূলিকণিকাটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৃশ্যমান অঞ্চলে (visible range) অতি ক্ষুদ্র মানের বেগে, ধরা যাক সেকেণ্ডে 10^{-4} সেন্টিমিটার, ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটির ভরবেগ (momentum) হবে $10^{-11}\times10^{-4}$ অর্থাৎ 10^{-15} গ্র্যাম সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড। মনে করা যাক যে, এটিকে প্রত্যক্ষীভূত করবার জন্যে একটি আলোর রশ্মি, মনে করা যাক 0·5 মাইক্রন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সবুজ আলোর ফোটন ধূলিকণিকাটির উপরে নিক্ষেপ করা হবে। ফোটনটির ভরবেগ দ্য ব্রগ্‌লির সূত্র থেকে হবে—

$$mv=\frac{h}{\lambda}=\frac{6{\cdot}6\times10^{-27}}{{\cdot}5\times10^{-4}}=\text{প্রায় } 10^{-22} \text{ গ্র্যাম. সেঃ মিঃ/সেঃ।}$$

দেখা যাচ্ছে যে, এই সবুজ আলোর ফোটনের ভরবেগ ধূলিকণিকাটির ভরবেগের (momentum) এক কোটি ভাগের এক ভাগ। আমরা জানি যে, যখন কোন দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন এদের ভিতরে প্রতিক্রিয়া নির্ভর করবে প্রতিটি বস্তুর ভরবেগের উপরে, যেমন একটি চলন্ত ট্যাক্সির ভরবেগ

একটি ভারবোঝাই দ্রুত বেগে চলন্ত লরীর ভরবেগের চেয়ে অনেক কম। এদের ভিতরে যদি সংঘর্ষ হয়, তবে ট্যাক্সিটি ছিটকে অনেক দূরে যাবে, লরীটির নড়চড় বা অবস্থার সেরূপ কোন পরিবর্তন হবে না, আর এই সংঘর্ষের পরের অবস্থা নির্ভর করবে ভরবেগের পার্থক্যের উপরে। তেমনি উপরিউক্ত আলোর ফোটনটি যখন ধূলিকণিকাটির উপরে গিয়ে পড়ল, তখন আলোর ফোটনটি ছিট্‌কে এসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পড়বে, কিন্তু ধূলিকণিকাটির ভরবেগ কোটি গুণ বেশী বলে এটির স্থানচ্যুতি বা বিকৃতি কিছুই ঘটবে না। ফলে ধূলিকণিকাটিকে পরিষ্কার দেখা যাবে।

এখন ইলেকট্রন ও গামা রশ্মির ব্যাপারটি আলোচনা করা যাক। ইলেকট্রনটির ভরবেগ সবচেয়ে বেশী হবে যখন এটির বেগ-প্রায় আলোর বেগের সমান হবে। ধরা যাক যে এটির বেগ আলোর বেগের সমান, অর্থাৎ সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেন্টিমিটার। তা হলে ইলেকট্রনের ভরকে প্রায় 10^{-27} গ্র্যাম ধরলে, এর ভরবেগ হবে 3×10^{-17} গ্র্যাম. সেঃ মিঃ/সেঃ। যে গামা রশ্মিটি এই ইলেকট্রনের উপরে এসে পড়বে ধরা যাক তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হল প্রায় 10^{-14} সেন্টিমিটার। তা হলে এই রশ্মির ফোটনের ভরবেগ অর্থাৎ এই ফোটনটির

$$mv=\frac{h}{\lambda}=\frac{6{\cdot}6\times10^{-27}}{10^{-14}}\ 6{\cdot}6\times10^{-13} \text{ গ্র্যাম সেঃ মিঃ/সেঃ।}$$

অর্থাৎ এই ফোটনটির ভরবেগ ইলেক্‌ট্রনটি ভরবেগের প্রায় কয়েক হাজার গুণ বেশী। তা হলে ফোটনটি ইলেনট্রনটির উপর পড়লে ফল দাঁড়াবে একটি শিশুর খেলনা গাড়ীর (toy carriage) চলন্ত অবস্থায় একটি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে হলে খেলনা গাড়ীটির যে দশা হবে, অর্থাৎ সেটির কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, কণিকা-জগতে যন্ত্রের ক্ষমতা অতি সীমিত। কণিকাদের বেগ ও অবস্থান কোন যন্ত্রের দ্বারা সঠিকভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব। সেইজন্যেই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা-নীতির আবিষ্কার। তাহলে যেহেতু ইলেকট্রনগুলিকে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন বহু সংখ্যার সমষ্টিগতভাবে, সেজন্যে এককভাবে ইলেকট্রন কণিকাই হোক, কি তরঙ্গই হোক, ব্যবহারের দিক দিয়ে ফলের কোন পার্থক্য হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দু-জন পদার্থবিদ্যাবিদ্ সমুদ্রতীরে বসে ঢেউকে বিচার করবার সময় একজন হয়তো বলবেন

যে, "ঢেউটির গুণ ও তীব্রতা (intensity) বোঝা যায় এটির চূড়া ও তলের (crest and trough) অবস্থান দেখে"। আবার অপরজন হয়তো অনুরূপ সঠিক ধারণা বলবেন, "তুমি যাকে চূড়া বলছ সেটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই জন্যে যে, এতে তুমি যাকে তল বলছ, সেখানকার চেয়ে এতে অধিক পরিমাণে জলের অণু আছে।" অনুরূপভাবে শ্রোয়েডিঙ্গারের গাণিতিক রূপকে বর্ন্ তাঁর সূত্রে ব্যবহার করে বললেন, "waves of probability" বা "সম্ভাব্যতার তরঙ্গ"। এইভাবে "বস্তুর তরঙ্গ" হল "সম্ভাব্যতার তরঙ্গ"।

আমরা ইলেকট্রনকে অথবা পরমাণুকে অথবা সম্ভাব্যতার তরঙ্গকে যে ভাবে দেখিই না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিজেদের পছন্দমত কল্পনা করে নিতে পারি যে, আমরা একটি তরঙ্গপূর্ণ বিশ্বে কিংবা বস্তুপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। কিংবা বিশ্বকে অভিহিত করা যেতে পারে কোন কোন বিজ্ঞানীর দেওয়া নামে "universe of 'wavicles'" অর্থাৎ "waves" ও "particles"-এর মিশ্রিত নামে। একে বাংলায় বলা যেতে পারে "তরণিকা" অর্থাৎ "তরঙ্গ" ও "কণিকার" মিশ্রণ।

এইভাবে কণিকা জগতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, বিশৃঙ্খলা, এল কার্য-কারণের অভাব। অথচ বহির্জগতের ঘটনাবলীতে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার অথবা কার্য-কারণের অভাব দেখা যায় না। আইনস্টাইন এই সব বিজ্ঞানীর কাজকে অবহেলা করলেন না, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখলেন যে, কণিকা-জগতের চিন্তাধারায় একটি গলদ রয়ে গিয়েছে, যার জন্যে সত্যকে জানা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে, উপস্থিত হয়েছে বিশৃঙ্খলা। আসল সত্য একদিন জানা যাবেই।

আমাদের ভারতীয় উপনিষদে ও অন্যান্য দর্শনে বিশ্বের ঘটনাবলী নির্ভর করে কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপরে, প্রকৃতির বিভিন্নের মাঝে আছে সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাঁর লেখা কাব্যে ও সঙ্গীতে এই প্রভাব বেশ বোঝা যায়। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা, সীমা দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সে যদি কেবলমাত্রই পার্থক্য হত, তাহলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তাহলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে, কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।" তিনি পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারার সঙ্গে

পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞানে কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব আর থাকছে না এবং তার স্থানে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতা। তাই 1930 খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন সম্ভাব্যতার বিষয়ে। আইনস্টাইন জবাবে বলেছেন, "যে সব ঘটনাবলী বিজ্ঞানকে এই মতবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা কার্য-কারণকে বিদায় করে দিচ্ছে না।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তা না হতে পারে, কিন্তু এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কণিকা জগতে কার্য-কারণের স্থান নেই এবং তার স্থানে জানা যাচ্ছে অন্য এক বল কণিকাদের উপরে কাজ করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব তৈরি করেছে। আইনস্টাইন জবাবে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে শৃঙ্খলা আছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পদার্থগুলি কাজ করছে, কিন্তু কণিকাদের বেলাতে এই শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় না। মেঘগুলিকে দূর থেকে দেখলে একরকম দেখায়, কিন্তু যদি খুব কাছে গিয়ে দেখা যায়, মেঘগুলিতে প্রকাশ পাবে বিশৃঙ্খল জলকণার রাশি।

1927 খ্রীস্টাব্দে সল্‌ভে বিজ্ঞান সভাতে কণা-বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। যে সব পদার্থবিদ্যাবিদ এই মতবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁদেরকে বর্ণ্‌ আখ্যা দিলেন "grumblers" অর্থাৎ "গলদ আবিষ্কারক" বলে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সৃষ্টিকারক বিজ্ঞানীরা ও তাঁদের সহায়ক হিসাবে এসেছিলেন কয়েকজন প্রত্যক্ষবাদী (positivism) বিজ্ঞানী। আইনস্টাইন ছিলেন এই মতবাদের সমালোচক দলের পুরোভাগে। তিনি এই সভাতে ও পরে লিখিতভাবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, বিশ্বের বাস্তব সত্যের ছবি এই মতবাদে পাওয়া যায় না—এটি হল প্রত্যক্ষবাদীদের মত।

বোর কয়েকবার আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নূতন মতবাদ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করেন ও আইনস্টাইনকে নূতন পথে আনতে চেষ্টা করেন। একবার অবিচ্ছিন্নতা (continuity) ও দ্বৈতরূপ (duality) নিয়ে তর্কাতর্কিতে বোর বললেন, "আপনি কি লাভ করতে প্রত্যাশা করেন? আপনি নিজে যে পদার্থবিদ্যায় আলোর দ্বৈতরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যদি উদ্বিগ্ন হন যে, আলোর একটি রূপ থাকাই

বাঞ্ছনীয় এবং সেই রূপটি হওয়া উচিত তরঙ্গ, তবে জার্মান সরকারকে আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (photo-electric cell) ব্যবহার করতে বারণ করে দিন, আর যদি মনে করেন যে, আলো হল কণিকা, তবে ডিফ্রাক্সন্ গ্রেটিং (diffraction grating) ব্যবহার করা বন্ধ করে দিন।" এই ডিফ্রাক্সন গ্রেটিং দিয়েই আলোর তরঙ্গ-রূপ পাওয়া যায়।

1944 খ্রীস্টাব্দে বর্ণের নিকট আইনস্টাইনের লেখা এক চিঠিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। সেই লেখা থেকে কিছুটা অংশ এখানে দেওয়া হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় আমরা দু-জনে উল্টোপথে গিয়েছি। আপনি পাশা-ক্রীড়ক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন এবং আমি বিশ্বাস করি শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বে সব কিছুর বাস্তব অস্তিত্বে এবং সেই সত্য জানবার জন্যে আমাকে অদ্ভুত কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। আমি আশা করি যে, একদিন কোন একজন বিজ্ঞানী আমার উপলব্ধির চেয়ে অধিকতর বাস্তব পদ্ধতিতে, কিংবা অধিকতর বোধগম্য ভিত্তিতে এই সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন। কণাবাদের প্রথম বিরাট সাফল্য আমাকে ঐ পাশা খেলাতে বিশ্বাস করাতে পারবে না।"

"ঈশ্বর পাশা খেলেন না।" আইনস্টাইন আবার "ঈশ্বর" বলতে বুঝিয়েছেন প্রকৃতির শক্তির কার্য-কারণ ভিত্তিতে প্রকাশের ছদ্ম নামকে। প্রাকৃতিক সত্যের তত্ত্বগুলি পাশার দান নয় যে, এটি হতে পারে, আবার ওটিও হতে পারে, অর্থাৎ পরিসাংখ্যিক নয়, এগুলি ঘটনার সম্ভাব্যতার বিষয় বলে না, বের করে বাস্তব ঘটনাবলীকে। আমরা উপরের চিঠি থেকে বুঝতে পারি যে দীর্ঘ 20 বছর পরেও কণাবাদ সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি আইনস্টাইনের মনোভাব কিছুই বদলায় নি।

1928 খ্রীস্টাব্দে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সৃষ্টিকারকদের অন্যতম, তরুণ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাবিদ্ ডিরাক মনে করলেন যে, সনাতন পদার্থবিদ্যা থেকে উদ্ভূত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বেশীদিন স্থায়ী নাও হতে পারে, কারণ সনাতন পদার্থবিদ্যায় বিবেচিত হয়েছে কেবল মাত্র বস্তুর আপেক্ষিকভাবে লঘু গতির। কিন্তু ইলেকট্রনের বেগ অত্যন্ত বেশী, এমন কি আলোর বেগের কাছাকাছি যেতে পারে। আলোর বেগ আপেক্ষিকতাবাদে সর্ব্বোচ্চ বেগ বলে বিবেচিত

হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে এইরূপ দ্রুতগতির চলন্ত বস্তুর বিষয় বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং ডিরাক কোয়ান্টামবাদ বিষয়ক গাণিতিক সূত্রে, যেমন শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-সমীকরণ, আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগ করতে মনস্থির করলেন।

এই শতাব্দীর দুটি শ্রেষ্ঠ মতবাদকে একসঙ্গে প্রযুক্ত করে ডিরাক তাঁর সূত্রে এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ফল পেলেন। তিনি গাণিতিক সূত্রে প্রমাণ পেলেন বিপরীত ইলেকট্রনের (anti-electron) অস্তিত্বের, অর্থাৎ এমন একটি কণিকার অস্তিত্ব, যাকে ইলেকট্রনের যমজ বলা যেতে পারে, অর্থাৎ ইলেকট্রনের মত সর্বপ্রকারে এক, শুধুমাত্র পার্থক্য বিদ্যুৎ-আধানের প্রকৃতিতে। ইলেকট্রনে বিদ্যুৎ-আধান ঋণাত্মক আর ডিরাকের সূত্রমত নূতন কণিকায় বিদ্যুৎ-আধান ধনাত্মক। ডিরাক এই নূতন কণিকার নামকরণ করলেন পজিট্রন (positron)।

ঐ সময়ে আমেরিকায় অ্যাণ্ডারসন (Anderson) ও ইংল্যাণ্ডে ব্ল্যাকেট ও অকসিয়ালিনি (Occhialini) মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণাকালে তাঁদের যন্ত্রে এই পজিট্রনের অস্তিত্ব পেলেন। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংঘর্ষে দুটি কণিকাই বিলুপ্ত হয়ে আইনস্টাইন তত্ত্ব-মতে সৃষ্টি হয় শক্তির ফোটনের। সুরু হল বিপরীত-বস্তুর (anti-matter) সম্বন্ধে অনুসন্ধান। পাওয়া গেল বিপরীত-প্রোটন, বিপরীত-নিউট্রন ইত্যাদি। এইভাবে কণিকার তালিকা বড় হতে লাগল।

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মতবাদ যে, প্রতিটি কণিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে একটি ক্ষেত্র এবং কণিকাটিকে অন্যান্য কণিকাদের পরস্পরের ভিতরের ক্রিয়াগুলির (interactions) প্রেরকরূপে ব্যবহৃত হওয়ার (transmit) নিমিত্তমাত্র (agent) বলে বিবেচনা করা হয়, যেমন ফোটন বিবেচিত হয় ইলেকট্রন ও অন্যান্য বিদ্যুতাহিত কণিকাগুলির পরস্পরের ভিতরের বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্রিয়াগুলির প্রেরকরূপে।

আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের আবিষ্কারের চেষ্টাকে হাইজেনবার্গ সমালোচনা করে বললেন, "এইসব কণিকার উপরে বিভিন্ন প্রকার বলের ক্ষেত্রের জটিল ক্রিয়া কাজ করছে। সেইজন্যে এটি বোঝা কঠিন, কি

ভাবে তাদের আচরণাদিতে একটি বিশিষ্ট সহজ তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।"

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে 1959 খ্রীস্টাব্দে হাইজেনবার্গ আবার বলেছিলেন, "আবিষ্কৃত মৌলিক কণিকাগুলির ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সম্বন্ধে দ্রুত জ্ঞান বেড়ে যেতে থাকাই আইনস্টাইনের ব্যর্থতার কারণ হল।"

এইসব বিজ্ঞানীর মতে বিশ্বের সম্বন্ধে এতদিনকার প্রচলিত অখণ্ড রূপের ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে, কণিকা দিয়ে গঠিত বিশ্বকে বিচার করতে হবে কণিকা-জগতের ধারণা দিয়ে, যার জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের সমন্বয় পূর্ণ কল্পনা ও সেই সংক্রান্ত তত্ত্ব ও মতবাদ এখন অচল। কণিকা-জগৎ সম্বন্ধে ধারণা কোনদিন কোন যন্ত্র দিয়ে করা যাবে না যেহেতু তার প্রধান কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রাদির গঠনও কণিকাভিত্তিক। আর এই কারণেই কোন ব্যাপারের কার্যকারণ সম্বন্ধে নির্ণয় করতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই, কারণ কণিকাদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সম্ভাব্যতার উপরে নির্ভর করে।

যা হোক, আইনস্টাইন তাঁর সমকালীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর নিজের আদর্শের মিল না থাকায় সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন এবং কণাবাদ ভিত্তিক মতবাদে কিসের অভাবহেতু কণিকা-জগতে এইরূপ কল্পনাতীত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল, সেটি খুঁজতে লাগলেন, যাতে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের মীমাংসা করা যায়। দীর্ঘ 30 বছর ধরে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করে গিয়েছেন।

তরুণ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন বলে তাঁর এই একাকীত্বে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হল, "আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময়ে তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হত তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে মনে করা হতে লাগল পথ হারিয়ে ফেলা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে অসমর্থ একজন বিজ্ঞানীর বিচ্ছিন্নতা।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনস্টাইন এই নূতন মতবাদকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁর সমালোচনার প্রকৃত অর্থ ছিল কণাবাদভিত্তিক মতবাদের একটি সীমা নির্দেশ করা এবং এই সীমার বাইরে অধিকতর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারের সম্ভাবনার ধারণা পোষণ করা।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় বোর বলেছেন, "আইনস্টাইন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমি এই কথা আজ বলতে চাই যে, তিনি তাঁর পূর্ণতার আদর্শের জন্যে অদম্য আগ্রহ, ঘটনার তত্ত্বাবলীতে সনাতন বিজ্ঞানের নিয়মাদির প্রযুক্তি এবং সমস্ত বাস্তব বিশ্বকে জানবার একীভূত পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে কণা বলবিদ্যার অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। পদার্থবিদ্যার প্রতিটি ধাপ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নূতন আর এক ধাপ আবিষ্কারের সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা দূর করে পদার্থবিদ্যাকে উন্নত করার জন্যে বিজ্ঞানীদের নূতন উদ্যমে কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রতিটি ধাপে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই মনীষীর বিরুদ্ধ ও অর্থপূর্ণ সমালোচনা না থাকলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অগ্রগতি অনেক মন্থর হত।"

দ্য ব্রগ্‌লি আইনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ স্মরণীয় হয়ে থাকবে পদার্থবিদ্যায় অসাধারণ প্রেরণার জন্য, যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায়রূপে বিবেচিত হবে। এই কয়েকটি বছরে নির্মিত যে দুটি প্রসিদ্ধতম কীর্তিস্তম্ভ, মানুষের বিজ্ঞান-জগতে বহু শতাব্দী ধরে বিরাজ করবে, তা হল আপেক্ষিকতাবাদ ও কণাবাদ। প্রথমটি সম্পূর্ণরূপে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের চিন্তা থেকে উদ্ভূত আর দ্বিতীয়টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন প্লাঙ্ক, কিন্তু সেটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে রয়েছে আইনস্টাইনের চিন্তার অবদান।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত

আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে যে সব সিদ্ধান্তে বা অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলি প্রত্যেকটিই এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ভাবে এক এক করে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ভর ও শক্তির তুল্যতা

প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত মিশর, আরব ও পরে ইটালী ও গ্রীসে এক শ্রেণীর লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে, কোন কোন ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়। এদেরকে বলত অ্যালকেমিস্ট (alchemist)। এই সব লোক কোন প্রকার সাফল্যলাভ করেছিলেন কিনা, তাতে খুবই সন্দেহ আছে। কারণ বর্তমান যুগে যে সব যন্ত্র দিয়ে এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত (transmutation) করা সম্ভবপর হচ্ছে, সেই সব যন্ত্র তখন আবিষ্কৃত হয় নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ্যাবিৎ (experimental physicist) রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম 1919 খ্রীস্টাব্দে গবেষণাগারে নাইট্রোজেন পরমাণুকে রেডিয়ামের মত একটি স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় (spontaneously radioactive) পদার্থ থেকে নির্গত উচ্চশক্তি-সম্পন্ন আল্ফা কণিকা (alpha particle) দিয়ে আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুর সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে শক্তি মুক্ত (liberated) না হয়ে শোষিত (absorbed) হয়। বোধ হয় সর্বপ্রথম শক্তি উৎপন্নকারী পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়াটি করতে সক্ষম হন রাদারফোর্ডের ছাত্র কক্‌ক্রোফ্‌ট (Cockcroft) ও ওয়াল্‌টন (Walton) 1931 খ্রীস্টাব্দে। তাঁরা একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন, যা দিয়ে প্রোটন রশ্মিকে অতি দ্রুত বেগ-সম্পন্ন করে উচ্চশক্তিশালী করবার পর সেই রশ্মির আঘাতে লিথিয়াম পরমাণুকে বিভাজন করে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন এবং এই প্রক্রিয়াতে যে সামান্য ভর শক্তিতে পরিণত হয়, তা দেখা গেল

আইনস্টাইনে সূত্র $E=m\times c^2$-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের এই অতি ক্ষুদ্র ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। কিন্তু রাদারফোর্ড 1937 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বাস করে যেতে পারেন নি যে, পরমাণুর থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি পাওয়া সম্ভবপর হবে।

আর কখনও কল্পনা করেন নি $E=m\times c^2$ সূত্রটির আবিষ্কর্তা আইনস্টাইন স্বয়ং যে, পদার্থ থেকে ভরকে তার তুল্য শক্তিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যাবে এবং সেটি হবে তাঁর জীবদ্দশাতেই। এটি সম্ভব করলেন গবেষণাগারে রসায়নবিদ্ অটো হান্ (Otto Hahn) ও তাঁর সহকর্মী স্ট্রাস্ম্যান (Strassman) 1938 খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে। এই প্রক্রিয়াটি হল—একটি ধীরগতিসম্পন্ন (slow) নিউট্রন কণিকা দিয়ে ইউরেনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আঘাত করে বিভাজন করার ফলে দুটি কম ভরের পদার্থের কেন্দ্রীনের—যেমন বেরিয়াম ও ক্রিপ্‌টন—এবং দুটি বা তিনটি নিউট্রন কণিকার সৃষ্টি হয়। এই বেরিয়াম ও ক্রিপ্‌টন কেন্দ্রীন দুটির ও নিউট্রনগুলির ভরের যোগফল একটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে অতি সামান্য পরিমাণে কম। এই সামান্য ভরটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের এই অনুসিদ্ধান্তটির দ্বারা আরও বুঝতে পারলেন যে, সূর্য ও অন্যান্য তারকাগুলির সর্বক্ষণ প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণ করার মূল কারণ কি। সূর্যের মত অন্যান্য সব তারকাগুলির আভ্যন্তরীণ দু-কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াসের মত প্রচণ্ড উষ্ণতার জন্যে প্রতি 4টি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির কিছুটা ভর শক্তিরূপে নির্গত হচ্ছে। এটিই হল ভয়াবহ হাইড্রোজেন বোমারও মূল প্রক্রিয়া।

আইনস্টাইনের এই ছোট অনুসিদ্ধান্তটির অপর দিকটি হল যে, শক্তির ভর আছে, যা পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ সূত্রটিকে একটু ঘুরিয়ে লিখলেই অর্থাৎ $m=\frac{E}{c^2}$। E পরিমাণ শক্তিকে আলোর বেগের বর্গ দিয়ে ভাগ করলেই সেই শক্তির তুল্য ভর পাওয়া যাবে। এটি থেকে আমরা জানতে পারি যে,

আলো ও অন্যান্য সব বিকীর্ণ শক্তির ফোটনের ভর আছে। এর যাথার্থ্যের প্রমাণের উদাহরণ পরে দেওয়া হবে।

আবার এটিকে আর এক ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেটি হল শক্তির বস্তুতে রূপান্তর অর্থাৎ materialization of energy। এখন বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে সৃষ্ট হয়েছে গামা শক্তির ফোটনের মত একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন শক্তির ফোটন থেকে একজোড়া বস্তুকণিকা, যার একটি হল পরিচিত ইলেকট্রন ও অপরটি হল ইলেকট্রনের ঠিক বিপরীত পদার্থ (anti-matter) পজিট্রন কণিকা (positron)। পজিট্রনের ভর, আয়তন ও বৈদ্যুতিক আধানের পরিমাণ ঠিক ইলেকট্রনের মত। কিন্তু আধানটি হল বিপরীত-ধর্মী। ইলেকট্রনের আধান হল ঋণাত্মক আর পজিট্রনের আধান হল ধনাত্মক। প্রোটন ও পজিট্রনের পার্থক্য হল যে, দুটি প্রায় সব দিক নিয়েই এক, শুধু প্রোটনের ভর 1836 গুণ বেশী। প্রকৃতিতে কোন পজিট্রন কণিকার যদি একটি ইলেকট্রন কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, তবে দুটি বস্তুকণিকাই বিলুপ্ত হয়ে শক্তির ফোটনে পরিণত হয়।

ভর ও বেগের সম্বন্ধ

আমরা আপেক্ষিকতাবাদে জেনেছি যে, কোন বস্তুর ভর তার বেগের উপর নির্ভরশীল। তবে এই বেগ হতে হবে আলোর বেগের তুল্য। আমাদের লক্ষণীয় কোন বস্তু নেই, যা এই দ্রুত বেগে ধাবমান হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কোন কোন যন্ত্র এমন ভাবে তৈরি করা হয়, যাতে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণিকাগুলিকে আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি বেগে চলন্ত করতে হয়। প্রোটন-সিংক্রোট্রন ইত্যাদি যন্ত্রে কণিকাগুলির বেগ একটি নির্দিষ্ট উচ্চ মানে তুলতে হয়, যাতে উচ্চমানের গতিশক্তি (kinetic energy) হতে পারে, যার দ্বারা কোন পরমাণুর কেন্দ্রীনে সজোরে আঘাত করা ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এই সব যন্ত্র তৈরি করবার সময় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের মনে রাখতে হয় আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র যে, ঐ দ্রুত বেগে এই সব কণিকার ভর কতটা বেড়ে যাবে। এই হিসেব মনে না রেখে যন্ত্র তৈরি করলে কোনও সুফল পাওয়া যাবে না।

বেগের সঙ্গে সময়ের গতির সম্বন্ধ

আমরা আপেক্ষিকতাবাদে জেনেছি, যে আলোর বেগের তুলনীয় কোন বেগে চলন্ত এক মাধ্যমে সময়ের গতি শ্লথ হয়, অর্থাৎ সময় ধীরে চলে। যদি ভবিষ্যতে মহাকাশযানের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি করার ক্ষমতা অর্জন করা যায়, তবে সর্বপ্রকারে মিল আছে এইরূপ দুটি ঘড়ির একটি সেই মহাকাশযানে ও একটি পৃথিবীতে রাখলে বোঝা যাবে যে, মহাকাশযানের ঘড়িটিতে সময় পৃথিবীর ঘড়ির সময়ের চেয়ে ধীরে চলেছে। কিন্তু অন্য উপায়েও এই বিষয়টির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে।

ঘড়ির তাৎপর্য কি? ঘড়ি বলতে বুঝতে হবে যে, একটি কোন বস্তু একটি সুষম ও সুনিয়মিত ছন্দে চলে বা যার চলন পর্যাবৃত্ত (periodic)। এই অর্থে পৃথিবী একটি ঘড়ি, কারণ এটি নিজের অক্ষের চারদিকে প্রতি 23 ঘণ্টা 56 মিনিটে একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থাৎ এটির ঘূর্ণনের একটি সুষম ও সুনিয়মিত ছন্দ আছে। তেমনি একটি পরমাণুও একটি ঘড়ি, কারণ এটির থেকে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি কম্পাঙ্কবিশিষ্ট আলোর তরঙ্গ নির্গত হয়, এবং এই আলোর তরঙ্গগুলি পরমাণুটির বর্ণালীতে (spectrum) উজ্জ্বল রেখারূপে প্রতীয়মান হয়। তা হলে একটি মৌলিক পদার্থের, যেমন হাইড্রোজেন, পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক (frequency) সময়ের হিসেব দেবে। বিভিন্ন বেগে চলন্ত হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক সেই বেগে সময়ের গতির সম্বন্ধে ধারণা দেবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট মানের দ্রুত বেগে গতিশীল হাইড্রোজেন পরমাণুর কম্পাঙ্ক হচ্ছে প্রায় স্থিতাবস্থায় আছে এরূপ হাইড্রোজেন পরমাণুর কম্পাঙ্ক থেকে কিছুটা কম, এবং এই কমের পরিমাণ আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী কমের সঙ্গে আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে যাচ্ছে।

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব ও আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র-তত্ত্ব এই দুটি দ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর প্রায় সব ব্যাপারেই ব্যাখ্যা করা যায়। পুরনো নিউটনীয় তত্ত্বকে বলা যেতে পারে নূতন আইনস্টাইনীয় তত্ত্বের একটি অংশ, যার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, সেখানে নিউটনীয় তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রবল,

সেখানে নিউটনীয় তত্ত্বে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্রে পাওয়া যায়।

আমাদের সৌরজগতের উদাহরণ ধরা যাক। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, শুধু বুধ গ্রহ বাদে, সূর্যের চারদিকে বেষ্টিত উপবৃত্তাকার কক্ষপথে (closed elliptical orbit) আবর্তন করছে। তাদের প্রত্যেকের পুরো আবর্তনের সুনির্দিষ্ট একটি পর্যাবৃত্ত সময় আছে। কিন্তু বুধ গ্রহের আবর্তনে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। পুরাকাল থেকেই জ্যোতির্বেত্তারা জানেন যে, বুধ গ্রহটি তার প্রতি-বার আবর্তনের অর্থাৎ তার প্রতি বছরের পর পুরনো কক্ষপথে যায় না, তার কক্ষপথটি প্রতি বছর একটু একটু করে আবর্তন করছে, অর্থাৎ কক্ষপথটির অনুসূর বিন্দুটি (perihelion) অতি সামান্য পরিমাণে সরে যাচ্ছে। অনুসূর বিন্দুটি হল কোন গ্রহ বা ধূমকেতুর কক্ষের যে বিন্দুটি সূর্যের নিকটতম। বুধ গ্রহের কক্ষটির আবর্তন এতই সামান্য যে, সম্পূর্ণভাবে একবার আবর্তন করতে সময় লাগবে তিন মিলিয়ন বছর অর্থাৎ 30 লক্ষ বছর। নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বে এর উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্রে এর সঠিক উত্তর পাওয়া গেল, বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে এই গ্রহটি অন্য সব গ্রহের তুলনায় সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উচ্চতম শক্তির স্থানে আছে এবং গ্রহটির বেগও প্রচণ্ড। এই দুটি কারণে আইনস্টাইনের সূত্রের দ্বারা হিসেব মত যে ব্যতিক্রম হবে, ঐ কক্ষপথটির আবর্তনের বা অনুসূর বিন্দুটির আবর্তনের পরিমাণ ঠিক সেই ভাবে মিলে যায়। তার মানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রকৃ-তিকে আরও সঠিকভাবে জানতে সাহায্য করে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বর্ণিত আর একটি ঘটনা পরীক্ষায় সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মনে করা যাক যে, একটি অতি বৃহৎ আবর্তনরত থালার ধারের কাছে অবস্থিত আছে একটি ঘড়ি ও থালাটির কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত আছে অপর একটি ঠিক একই প্রকারের ঘড়ি। দেখা যাবে যে, ধারের কাছে অবস্থিত ঘড়িটির সময় কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত ঘড়িটির সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে চলেছে, কারণ থালাটির কেন্দ্র থেকে যত ধারের দিকে যাওয়া যাবে, ততই সেখানকার বেগ কেন্দ্রের নিকটের আপেক্ষিকে অনেক বেশী হতে থাকবে। ঠিক একই ভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বলা হয়েছে যে, দুটি ঠিক এক প্রকারের ঘড়ির একটিকে সূর্যে রেখে ও অন্যটিকে

পৃথিবীতে রেখে দেখা যাবে যে, সূর্যে অবস্থিত ঘড়িটির পর্যাবৃত্ত সময়, অর্থাৎ চলার সময়, পৃথিবীর ঘড়িটির চেয়ে বেশী। তার মানে সূর্যের ঘড়িটি ধীরে চলেছে। এর কারণ হল সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্র পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই ব্যাপারটির যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি পরমাণুকে ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে আর পরমাণুটি সময় নির্দেশ করবে তার থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক থেকে। পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে তো আর কোন ঘড়ি সূর্যে রাখা যেতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করলেন। কারণ সূর্যে যে সব পরমাণু আছে, পৃথিবীতেও সেই সব বর্তমান। তাঁরা বেছে নিলেন সোডিয়াম মৌলিক পরমাণু। আমরা জানি যে, সোডিয়াম পরমাণুর বর্ণালী হল একটি উজ্জ্বল হল্‌দে রেখা। তা হলে আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী সূর্যে অবস্থিত সোডিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক পৃথিবীতে অবস্থিত সোডিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক থেকে কম হবে ; অর্থাৎ সূর্যের সোডিয়াম পরমাণুর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণুর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছুটা বড়। সূর্যের সোডিয়াম পরমাণুর আলোর বর্ণালীর সঙ্গে পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণুর আলোর বর্ণালী তুলনা করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন যে. সূর্যের সোডিয়াম পরমাণুর হল্‌দে রেখাটি পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণুর হল্‌দে রেখাটির থেকে কিছুটা লালের দিকে সরে গিয়েছে, যাকে ইংরেজীতে বলে shift towards the red। আমরা জানি যে, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বড় হবে, তত সেটি লালের দিকে যাবে, কারণ আলোর সাতটি রঙের ভিতরে লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। আর ভায়োলেট বা বেগ্‌নী রঙের আলোর দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। আলোর বর্ণালীতে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন যে, সূর্যের সোডিয়াম পরমাণুর হল্‌দে রেখাটি যতটা লালের দিকে সরে গিয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণটি পাওয়া যাচ্ছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রানুযায়ী হিসেবমতে। বিজ্ঞানীরা চমৎকৃত হলেন।

আশ্চর্যতম বিষয়টি হল যে, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে বললেন

যে, আলোর ভর আছে বলে আলো কোন বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বস্তুটির দিকে নুয়ে পড়বে। আমরা দেখেছি যে, পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে একটি বল সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলে, বলটি একটি বক্রকার অধিবৃত্তাকার পথ রচনা করে পৃথিবীর উপরে গিয়ে পড়বে। কারণ হল পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্যে বলটির ভরের উপর একটি ক্রিয়া হয় এবং বলটি ক্রমশঃ পৃথিবীর দিকে সরে আসতে আসতে অবশেষে মাটির উপর পড়ে। তেমনি যদি একটি টর্চ লাইট থেকে আলো সামনের দিকে নিক্ষেপ করা যায়, তবে আলোটির ভর আছে বলে পৃথিবীর দিকে নেমে আসবে। কিন্তু আলোর ভরের মান খুবই সামান্য বলে আলোর সরল পথ থেকে একটু নীচে নুইয়ে পড়ার পরিমাণ আমাদের নজরে পড়বে না। কিন্তু যদি আলো কোন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের, যা পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, ভিতর দিয়ে যায়, যেমন সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, তবে আলো তার পথ থেকে সূর্যের দিকে সরে যাবে এবং তিনি অঙ্ক কষে বললেন যে, এই সরে যাওয়ার পরিমাণ হবে একটি বৃত্তের চাপের 1·75 সেকেণ্ড (1·75 seconds of an arc)।

আইনস্টাইন বললেন যে, তাঁর এই মতবাদকে প্রমাণ করতে হলে সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে যার আলো আসছে, এইরূপ কোন তারকাকে দেখতে হবে এবং যেহেতু সাধারণতঃ আকাশে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের জন্যে কোন তারকার আলো দেখা যাবে না, সেই হেতু কোন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় এটি লক্ষ্য করতে হবে, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফী প্লেটে তারকাটির আলো ধরতে হবে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর আকাশে সূর্য থাকবে অথচ অন্ধকার হবার দরুণ তারকার আলো ফোটোতে ধরতে অসুবিধা হবে না। তারপর 6 মাস পরে সূর্য যখন ঐ তারকাটির পাশ থেকে অনেকটা দূর সরে যাবে, তখন ঐ তারকাটি থেকে আলোর ফোটো আবার নিতে হবে। এই দুই ফোটো মিলিয়ে দেখলে:তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য অবশ্যই প্রমাণিত হবে। তিনি তাঁর মতবাদের বিষয়ে এত নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বেশ জোরের সঙ্গে একথা লিখলেন যে, তিনি যা বলেছেন, তা সত্য হতেই হবে।

ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা এডিংটন (Eddington) ছিলেন আপেক্ষিকতাবাদের একজন প্রকৃত বোদ্ধা। তিনি এই ব্যাপারটির গুরুত্ব

বুঝতে পারলেন। 1919 খ্রীস্টাব্দের 29শে মে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের খুব নিকট দিয়ে আসবে হায়াডাস (Hyades) নামে তারকাপুঞ্জের আলো। এডিংটন ঐ সুযোগ গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন।

1919 সালের 29শে মে তারিখে যথাসময়ে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হল। এডিংটন তারকাপুঞ্জের ফোটো নিলেন, তারপর কয়েক মাস পরে আবার ঐ তারকা-পুঞ্জের ফোটো নিলেন। দুটি ফোটো মিলিয়ে বিচার করে ঘোষণা করা হল যে, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে যা বলেছেন, তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মতবাদের গণনানুসারে আলোর রশ্মি সূর্যের দিকে নুয়ে পড়বে একটি বৃত্তের চাপের 1·75 সেকেণ্ড পরিমাণ। এডিংটন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পেলেন 1·68 সেকেণ্ড। কিছুটা পার্থক্য হল যন্ত্রের সীমিত ক্ষমতার জন্য। 1919 সালের 7ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরতির প্রথম বার্ষিকী দিবসে বিশ্ববাসী চমৎকৃত হয়ে কাগজে বড় বড় হরফে লেখা খবর পড়লেন—"বিজ্ঞানে যুগান্তর, নিউটনীয় তত্ত্বের আমূল পরিবর্তন সাধন।" এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিক কালে সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদের এই বিষয়টি আরও নির্ভুলভাবে কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তারকার আলোর বদলে তাঁরা রেডিও রশ্মি ব্যবহার করেছেন। সূর্যের উজ্জ্বল আলোর জন্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আলোকবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রগুলির (optical instruments) দ্বারা পর্যবেক্ষিত ঘটনাগুলিকে যাচাই করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয় এবং নির্ভুলতা সম্বন্ধে এই সব যন্ত্রগুলির ক্ষমতা সীমিত। যেহেতু সূর্যগ্রহণের সময়টুকু অতি অল্প, সেহেতু তারকার আলোর দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ও অতি অল্প ও সীমিত। কিন্তু রেডিও রশ্মির ব্যবহারে সূর্যের উজ্জ্বলতা কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারে না। সূর্য-দেহের অতি নিকট দিয়ে চলন্ত রেডিও রশ্মির দ্বারা অনেক বেশী সময় পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভবপর। তা ছাড়া রেডিও রশ্মির দ্বারা পরিমাপে আলোর রশ্মির দ্বারা পরিমাপের চেয়ে অধিকতর নির্ভুল ফল পাওয়া যাবে, কারণ সূর্যের মহাকর্ষের দরুণ রশ্মির বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ সূর্যের থেকে রশ্মির দূরত্বের ব্যস্ত অনুপাত (inversely proportional)।

1970 সালের 15ই জুন তারিখের ফিজিকাল রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত

একটি নিবন্ধে জানা যায় যে, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজির ওয়েনস ভ্যালি রেডিও অবজারভেটারীর কয়েকজন রেডিও-জ্যোতির্বেত্তা (radio astronomers) বেতার সঙ্কেতের সাহায্যে সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদের নির্ভুলতা যাচাই করেছেন। তাঁরা কোয়াসার (quasar) থেকে নির্গত রেডিও রশ্মির সাহায্য নিয়েছিলেন।

অল্প কয়েক বছর পূর্বে কোয়াসার নামে গাগনিক বস্তুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত 120টির কিছু বেশী কোয়াসারের অস্তিত্ব জানা গিয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায় নি। এগুলি মহাকাশে বহু হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্বেত্তারা এ পর্যন্ত যে সব তথ্য জানতে পেরেছেন, তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এগুলি মহাকাশে অতি বিরাটকায় তারকা এবং সবচেয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন। এগুলি থেকে সর্বদা প্রচণ্ড শক্তি আলো, রেডিও তরঙ্গ ও বেগ্‌নীপারের রশ্মিরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

এরূপ দুটি কোয়াসার, জ্যোতির্বিদ্যায় যাদের নামকরণ করা হয়েছে 3C279 ও 3C273 বলে, তাদের থেকে নির্গত রেডিও রশ্মির সাহায্য বিজ্ঞানীরা নিয়েছেন। প্রতি বছর অক্টোবর মাসে 3C279 কোয়াসারটি পৃথি-বীর দিক থেকে সূর্যের ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে চলে যায়। এই কোয়াসারটির নিকটেই আছে 3C273 কোয়াসারটি। কিন্তু এই দ্বিতীয় কোয়াসারটি সূর্য ও পৃথিবীর সরাসরি রেখা (direct line) থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত। তাঁরা যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারলেন যে, 3C279 কোয়াসারটির থেকে নির্গত রেডিও রশ্মি সূর্যদেহের অতি নিকট দিয়ে পৃথিবীতে আসবার সময়ে রশ্মিটির গতিপথ সূর্যের দিকে নুয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 3C273 কোয়াসারটি সূর্য থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকবার জন্যে তার থেকে যে রেডিও রশ্মি পৃথিবীর দিকে আসছে, তার গতিপথের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাঁরা এই দুটি রশ্মিকে তুলনা করে 3C279 কোয়াসার থেকে নির্গত রেডিও রশ্মির সূর্যের দিকে নুয়ে পড়ার (angle of deflection) পরিমাণ মেপে দেখলেন এক বৃত্তের চাপের 1·77 সেকেণ্ডে, অর্থাৎ আইনস্টাইনের গণনানুসারে 1·75 সেকেণ্ডের প্রায় কাছাকাছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে আইনস্টাইনের মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত তো হলই এবং নুয়ে পড়ার পরিমাণও আইনস্টাইনের গণনার মানের প্রায় সমান।

রেডিও রশ্মির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা অন্যভাবে এই মতবাদের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন। বেতার তরঙ্গ ও আলোর তরঙ্গ একই প্রকারের, অর্থাৎ দুটির বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ ও তাদের বেগও এক। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ও গ্রহ পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্ব সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করছেন। 1970 সালের 13ই নভেম্বর তারিখে একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে, মার্কিন মহাকাশ ও মহাকাশ-পরিক্রমা সংস্থা পূর্ব দিন ঘোষণা করেছেন যে, রেডিও-সঙ্কেতের উপর মহাকর্ষের ক্রিয়া নিয়ে সম্প্রতি যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে, তাতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়েছে। ডক্টর জন অ্যাণ্ডারসনের নেতৃত্বাধীনে একদল বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে যে, দুটি 'ম্যারিনার' মহাকাশ-যান পাঠান হয়েছিল, তারা তাদের কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে সূর্যের চারদিকে আবর্তনের কক্ষপথে। পৃথিবী থেকে 25 কোটি মাইল বা প্রায় 40 কোটি কিলোমিটার দূরে থেকে তারা এখন সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলেছে। 'ম্যারিনার' মহাকাশ-যান লক্ষ্য করে পৃথিবী থেকে রেডিও সঙ্কেত পাঠান হয়েছিল। সেই সঙ্কেত ওদের গায়ে লেগে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগের হিসেবে যাতায়াতে যতটা সময় লাগা উচিত ছিল, তার চেয়ে 43 মিনিট বেশী সময় লেগেছে এবং বিলম্বটা হয়েছে রেডিও সঙ্কেত সূর্যের নিকট দিয়ে আসবার সময় সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে।

এই সব থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আইনস্টাইন তাঁর ধ্যানের নেত্রে বিশ্বের যে বাস্তব রূপ দেখতে পেয়েছেন, বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী

জার্মানির অন্তর্গত ছোট শহর উল্‌মে আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন 1879 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখে। 1979 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখ ছিল তাঁর শততম জন্মদিন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 1978 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখ থেকে 1979 খ্রীস্টাব্দের 14ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত এই বছরটি নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ঐ বিরাট মনীষীর জন্ম-শতবার্ষিকী রূপে পালন করেন। আমাদের দেশেও বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থা এই জন্মশত-বার্ষিকী নানা অনুষ্ঠান করে পালন করেন।

এই বছরে কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা নিজেরাই আইনস্টাইনের জীবনী সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন করেন ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই মনীষীর জীবন ও কার্য সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতরে মানুষ আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা-মূলক বিতর্কের আয়োজন করা হয় ঐ মনীষীকে সম্যক রূপে জানবার জন্য। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতরে বৈজ্ঞানিক কার্যে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আগ্রহ জন্মাবার জন্য তাদের দ্বারা প্রস্তুত নানারূপ বৈজ্ঞানিক মডেলের প্রতিযোগিতা-মূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই বছর মাঝে মাঝে সভা-সমিতি করে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের দ্বারা আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী, তাঁর মানবতা বোধ এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞান, এক বিশ্ব-সরকার গঠন, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদির ধারণা সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। নানা স্থানে, যেমন কলকাতার বিড়লা প্রদর্শশালায় আইনস্টাইনের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক কার্যা-বলীকে বোঝাবার জন্য ছবির এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আকাশবাণীর কলকাতা এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অন্যান্য কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে আইনস্টাইন সম্বন্ধে কথিকার ও আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়। আইনস্টাইন ছাত্রাবস্থা থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত যে যে স্থানে গিয়েছেন শিক্ষা

গ্রহণের জন্য, অধ্যাপনার জন্য, বক্তৃতা দিবার জন্য প্রভৃতির ব্যাপারে, সেই সব স্থান ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ইত্যাদির আলোকচিত্র দেখাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন কলকাতার দূরদর্শন কেন্দ্র। এ ছাড়া মাঝে মাঝে তাঁর কাজ সম্বন্ধে বোঝাবার জন্যও ছবি এঁকে দেখান হয়। তাঁর সম্বন্ধে নানা আলোকচিত্র প্রদর্শনের কতকগুলি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। দেখান হল উল্‌মে তাঁর পূর্বপুরুষদের সমাধি ক্ষেত্র, দেখান হল মিউনিখ, জুরিখ, মিলান, বার্ন, প্রাগ, বার্লিন, প্যারিস, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানে বিখ্যাত 112 নং মারসার রোডে তাঁর বাসগৃহ, দেখান হল সেই বাড়িটিতে তাঁর Study অর্থাৎ লেখাপড়ার ঘরটি, এই পাঠকক্ষটিতে বিশ্বের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করতে, এই কক্ষটিতে তিনি রেখেছিলেন তিন জনের আলোকচিত্র। দুজন হলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যাঁদের একজন হলেন ফ্যারাডে ও অপরজন হলেন ম্যাক্সওয়েল। তাঁদের আবিষ্কারের কথা আইনস্টাইন কিশোর বয়সে পড়ে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন ও শূন্যে ক্ষেত্র সৃষ্টির কথা প্রমাণ করেন। তাঁর বহু আবিষ্কারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার হল বিদ্যুৎ সৃষ্টি করার যন্ত্র অর্থাৎ generator। ম্যাক্সওয়েলের আলোর প্রকৃতি ও গতির আবিষ্কার আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করেছিল। কিশোর বয়স থেকেই আলোর এই প্রকৃতির ও গতির কথা চিন্তা করতে করতেই আবিষ্কার করলেন 1905 খ্রীস্টাব্দে মাত্র 26 বছর বয়সে যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ, প্রথমে বিশেষ ও পরে সাধারণ। অপর আলোকচিত্রটি হল গান্ধীজীর, যাঁর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গান্ধীজী নিরস্ত্র ও অহিংসভাবে ভারতকে পরাধীনতার হাত থেকে স্বাধীন করবার জন্য বিরাট শক্তিশালী বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর লক্ষাধিক অনুগামিগণ বহুবার কারাবরণ, অমানুষিক নির্যাতন ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ায় বিস্মিত হয়ে তিনি গান্ধীজীর প্রতিটি কাজের সংবাদ রাখতেন। তিনি গান্ধীজীর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধনিবন্ধে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন, এ সব উল্লেখিত হয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

1945 খ্রীস্টাব্দের 6ই অগাস্ট হিরোসিমাতে ও 9ই অগাস্ট নাগাসাকিতে

আমেরিকা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে লক্ষ লক্ষ লোকের নিহত ও বহু লক্ষ লোকের আহত হওয়ার খবর পেয়ে আইনস্টাইনের গভীর মনস্তাপ ও আত্মগ্লানি হয়, যার জন্য বেশ কয়েক মাস তিনি বাড়ি থেকে বের হতেন না এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল নিজেকে এর জন্য দায়ী ভেবে। তিনি গভীর দুঃখে বলেছিলেন যে, আবার যদি নূতন করে জীবন শুরু করা সম্ভবপর হত, তবে তিনি বিজ্ঞানের সাধনা না করে মিস্ত্রী বা ছুতোর হতেন। এই সময়ে একদিন আন্তেনিনা ভ্যালেন্তিনা আইনস্টাইনের সঙ্গে এই পাঠকক্ষের পশ্চিমদিকের জানালার ধারে বসে পরমাণু বিস্ফোরণের বিষয় আলোচনাকালে আইনস্টাইন বললেন, "এতে আমার ভূমিকা ছিল একটি ডাক বাক্সের। টাইপ করা চিঠিটি আমার কাছে আনা হলে আমি তাতে সই করেছিলাম।"

ভ্যালেন্তিনা লিখছেন, "আমরা তাঁর প্রিন্সটনের গৃহের পাঠকক্ষে বসে আলাপ করছিলাম। বড় জানলাটি দিয়ে বাইরের ধূসর রঙের আলো এসে তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত মুখের কোঁকড়ানো চামড়ার উপরে এসে পড়েছে। চোখের দৃষ্টিতে গভীর ব্যথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি বললাম, তবু 'You pressed the trigger first' (অর্থাৎ আপনি প্রথম ঘোড়াটি বা বোতামটি টিপেছিলেন), এই কথা শুনে তিনি তাঁর মাথাটি আমার দিক থেকে সরিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন সবুজ বাগানের শেষ প্রান্তে দিগন্তকে আড়াল করে রাখা বড় বড় গাছগুলির মাথার দিকে। তারপর যেন গাছের মাথার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এইভাবে ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ আমিই প্রথম বোতামটি টিপেছিলাম।" এই সব ঘটনা আলোচিত হয়েছে বইয়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে।

1933 খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আইনস্টাইন সপরিবারে চিরকালের জন্য জার্মানি ছেড়ে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার জন্য চলে আসেন। তখন তাঁকে অস্থায়ীভাবে একটি বাড়িতে থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়। 112 নং মারসার রোডের বাড়িটি তখন তৈরি শুরু করা হল। এই বাড়িটি তৈরি হলে আইনস্টাইন সবাইকে নিয়ে এই বাড়িতে বাস করতে লাগলেন এবং বিশ্বের জ্ঞানীগুণীদের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী এল্‌সা গুরুতর ভাবে মূত্রাশয়ের রোগে বেশ কিছুদিন ভুগে 1936 খ্রীস্টাব্দে এই বাড়িতেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখনকার এই

বাড়িটির ও আইনস্টাইনের অবস্থার যে বিশদ বিবরণ লিখেছেন ইনফেল্ড (Infeld) তাঁর আত্মজীবনীতে, তা আলোচিত হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। আইনস্টাইন মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই বাড়ীতেই ছিলেন। 1955 খ্রীস্টাব্দের 13ই এপ্রিল তারিখে তিনি পেটের ডান পাশে তীব্র ব্যথা অনুভব করাতে তাঁকে প্রিন্সটন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। 18ই এপ্রিল তারিখে ভোর 1টা বেজে 25 মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এরপর দূরদর্শন কেন্দ্রে দেখান হল যে, আইনস্টাইন রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছেন ; দেখান হল আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ একটি সোফায় বসে আলোচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ 1930 খ্রীস্টাব্দের 14 জুলাই বার্লিনে আইনস্টাইনের কাপুতের বাড়িতে দেখা করতে গেলে এই দুই মনীষীর মধ্যে সুন্দর আলোচনা হয়, তখন এই আলোকচিত্রটি তোলা হয়। তাঁদের আলোচনাটি বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং এই আলোকচিত্রের একটি কপি বইটিতে ছাপান হয়েছে। এই দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রটির একটি কপি যোগাড় করা হয়েছে 'দেশ' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষের কাছ থেকে এবং সেটি নিয়ে আসেন ঐ পত্রিকারই প্রখ্যাত লেখক শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্ত। সেই জন্য লেখক এই দুই জনের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

এর পরে দূরদর্শনে দেখান হল আইনস্টাইন সকাশে জবাহরলাল নেহেরু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে। জবাহরলাল নেহরু 1949 খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্র-পুঞ্জে বক্তৃতা দিতে গেলে প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের বাড়িতে যান শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে, এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। এরপর দেখান হল একটি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র (compass)। 4/5 বছর বয়সের সময় আইনস্টাইনের একবার অসুখ হলে তাঁর বাবা তাঁকে এই যন্ত্রটি কিনে দেন। এটির তাৎপর্য তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে খুবই রেখাপাত করে। ঐ চৌম্বক কাঁটাটির সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান এবং যে-কোন দিক থেকে ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণ আন্দোলিত হয়ে আবার উত্তর-দক্ষিণে ফিরে আসা—এই ক্রিয়াটি বালকের মনে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। আইনস্টাইন ভবিষ্যতে এক জায়গায় ঐ যন্ত্রটি তাঁর শিশুমনে যে গভীর ও স্থায়ী অনুভূতি জাগিয়েছিল সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, "এইরূপ বিস্ময় জাগরিত হয় যখন

আমাদের কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের মনের কতকগুলি বদ্ধমূল কল্পনার সংঘাত ঘটে।" প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অনুভূতিই পরে তাঁর মনে 'extra-personal' বা মনের চেতনা-নিরপেক্ষ জগতের সত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়েছিল, এটি আলোচিত হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে।

এরপর দূরদর্শনে দেখান হল যে, আইনস্টাইন কপট ক্রোধের ভঙ্গী করছেন। আইনস্টাইন যখন প্রথম প্রিন্সটনে এসে কাজে যোগ দিলেন, তখন অল্পকালের ভিতরেই তিনি তাঁর তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেললেন। এটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। যখনই যেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতেন, তিনি বালক-বালিকাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলতেন, বালক-বালিকারাও তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করত। প্রিন্সটনের তরুণ ছাত্ররা তাঁর সম্বন্ধে একটি গান লিখে ফেলল। তিনি যখনই ক্যাম্পাসের ভিতরে রাস্তা দিয়ে যেতেন, তারা তাদের প্রিয় মানুষটিকে দেখে এই গানটি সমস্বরে গেয়ে উঠত আর তিনি কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে ছাত্রদিগকে আঙুল দিয়ে কলা দেখিয়ে, জিভ ভেংচে তাঁর তরুণ বন্ধুদেরকে আরও আনন্দিত করে তুলতেন। এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বইয়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে।

এছাড়া এই দূরদর্শন কেন্দ্র বেতার কেন্দ্রের মত গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা আইনস্টাইনের বিষয়ে কথিকাও প্রচার করেন, আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর, বিশেষ করে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করেন। এতে অংশগ্রহণ করেন আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল অধ্যাপকগণ।

আইনস্টাইনের জন্মশত বার্ষিকীতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তর ঘোষণা করেন যে, প্রতি বছর আইনস্টাইনের জন্মদিন 14ই মার্চ তাঁর বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ও বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যে তাঁর স্মরণে একটি 50,000 ডলারের 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে। ঐ পুরস্কারটি দেওয়া হবে তাঁকে, যিনি একান্তভাবে বিশ্বে শান্তির জন্যে চেষ্টা করবেন।

1980 খ্রীস্টাব্দের 15ই মার্চ তারিখের Statesman দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে, পূর্বদিন অর্থাৎ 14ই মার্চ রাষ্ট্রপুঞ্জের

সদর দপ্তর ঘোষণা করেছেন যে, সেই বছরের 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' শান্তি পুরস্কারটি সর্বপ্রথমই দেওয়া হল ইডেনের 78 বছর বয়স্কা মিসেস অ্যালভা মিরডালকে (Mrs Alva Myrdal)। তিনি ভারতে সুইডেনের একজন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত ও সুইডেনের নিরস্ত্রীকরণ দপ্তরের (Disarmament) একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রী। তাঁর স্বামী মিঃ গানার মিরডল (Mr Gunnar Myrdal) অর্থবিজ্ঞানে একবার নোবেল পুরস্কার পান।

পুরস্কারটি দেবার সময় একটি অনুষ্ঠানে বলা হয় যে, মিসেস অ্যালভা মিরডাল যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা আন্তরিক প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন বিশ্ববাসীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগাবার জন্য যে, যদি সত্বর যথার্থ সংযত পন্থা না নেওয়া হয়, তবে বিশ্বযুদ্ধের ঘোর বিপদ ঘনীভূত হবে এবং বিশ্ব দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীণ হবে।

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও পত্রিকাদির তালিকা

পুস্তক বা পত্রিকা	লেখক	প্রকাশক ও তারিখ
Ideas and Opinions	Albert Einstein (Edited by Carl Seelig)	Crown Publishers, 1956
The Universe and Dr. Einstein	Lincoln Barnett	The New American Library, 1960
Albert Einstein	B. Kuznetsov	Progress Publishers, Moscow. 1965
Albert Einstein	Arthur Beckard	G. P. Putnamis Sons, U. S. A, 1959
The Evolution of Physics	Albert Einstein and Leopold Infeld	The Syndics of the Cambridge University Press, London, 1961
ABC of Relativity	Bertrand Russell	The New American Library, 1962
ABC of Quantum Mechanics	V. Rydnik	Peace Publishers, Moscow
Matter and Man	M. Vasilyev and K. Stanyukovich	Peace Publishers, Moscow
A Star called the Sun	George Gamow	Bantam Pathfinder Edition, USA, 1965
The Limitations of Science	J. W. N. Sullivan	The New American Library, 1961
My Views	Compilation of Einstein's writings by S. Bandopadhyay	Rupa & Co. Calcutta, 1967

পুস্তক বা পত্রিকা	লেখক	প্রকাশক ও তারিখ
The Philosophy of Spinoza	Edited by Joseph Ratner	Carlton House, New York.
Kinetic Theory of Gases	James Jeans	The Cambridge University Press, 1946
Greek Science	Benjamin Farrington	Penguin Books, 1953
স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস	ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী	The Central Books Agency, Calcutta, 1965
পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়	ডঃ জয়ন্ত বসু	আশা প্রকাশনী, কলিকাতা, 1979
Science to-day (Science Magazine)		Nov, 1969 and Oct. 1970 (Times of India Publication)
'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা		জানুয়ারী, 1964 সংখ্যা ও শারদীয়, 1968 সংখ্যা
'দেশ' পত্রিকা (সাপ্তাহিক)		14ই মে, 1955 সংখ্যা

বঙ্গীয়
বিজ্ঞান
পরিষদ